পাক-ভারতের রূপরেখা

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী

শ্যামা প্রকাশনী

—চাকদহ :: নদীয়া—

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭৫

প্রকাশক : অরুণ গুহ, শ্যামা প্রকাশনী, চাকদহ, নদীয়া

মুদ্রণ : পশুপতি কর্মকার, শ্রীমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৫/১এ, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রুফ : সুভাষ মৈত্র ও কনক মৈত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী : খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

আমার সবকিছু লেখার পেছনেই ছিল যাঁর অফুরন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা—তিনি আমার ছোট ভাই—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। বর্তমান প্রবন্ধগুলো লেখার সময়ও তিনি উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন এবং আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নাই। শুধু ছোট ভাই-ই নন, তিনি ছিলেন আমার বন্ধু, সুহৃদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সহকর্মী। আমরা উভয়েই রাজনীতিক্ষেত্রে আসি একটি বিপ্লবী-সংস্থা "অনুশীলন সমিতি"র মাধ্যমে। পরে অবশ্য আমাদের চলার পথে পার্থক্য দেখা দেয়। কংগ্রেসের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধী একটি বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে যখন নেতৃত্ব নেন, তখন আমি কংগ্রেসেই যোগ দিই কিন্তু জিতেশ তাঁর সেই পুরাতন পথেই চ'লতে থাকেন। পথের পার্থক্য আমাদের হ'লেও—আমাদের উভয়েরই মন একই স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দৃঢ় সূত্রের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তাঁরই পরলোক আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম।

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

লেখকের নিবেদন

১৯৬২ সালে ভারতে এসে ভারতীয় নাগরিকত্ব নেওয়ার কিছুকাল পর থেকে "সাপ্তাহিক বসুমতী"তে ধারাবাহিকভাবে "পাক-ভারতের রূপরেখা" লিখতে সুরু করি। লেখাগুলো যখন সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হ'তে থাকে তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকেই আমাকে ঐ লেখার জন্ম অভিনন্দন জানান। "বসুমতী সাহিত্য মন্দির" ও লেখাগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্ম বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় আমার সাথে একটা চুক্তি করেন। কিন্তু পরে আমি জানতে পারি যে বসুমতী পত্রিকা কর্তৃপক্ষের জনৈক প্রধান ব্যক্তি নাকি ঐ চুক্তি মেনে নিতে রাজী হন না; সুতরাং ঐ চুক্তির সমাধি ওখানেই হয়ে যায়। তারপর চাকদহ 'শ্যামা-প্রকাশনী'র শ্রীমান অরুণ গুহ প্রবন্ধগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং একটা চুক্তিও সম্পাদন করেন। শ্রীমান অরুণ গুহের বিশেষ আন্তরিকতা ও আগ্রহের জন্মই ঐ প্রবন্ধগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হ'ল। সেজন্ম তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্মবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সেই সাথে ধন্মবাদ জানাই—আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু ও সহকর্মী রংপুর জেলার গাইবান্ধার ভূতপূর্ব অধিবাসী শ্রীমান ব্রজমাধব দাসকে। তিনিও অবিভক্ত বাংলার রংপুরের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৪৬ সালে "বেঙ্গল-এ্যাসেম্বলী"র সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দেশ বিভাগের পরেও আয়ুব সরকারের সামরিক শাসন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের বিধানসভার সদস্য হিসাবে ছিলেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। শ্রীমান ব্রজমাধব ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ত্যাগ করে এসে বহরমপুরের খাগড়া অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে বাস করছেন।

আমার লেখার আর একজন উৎসাহদাতা ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রকে জানাই আমার ধন্মবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালীন সমগ্র আলোচনাকে নিম্নোক্ত চারটি পর্যায়ে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করাই

আমার উদ্দেশ্য ছিল—(১) মুসলিম লীগের শাসনকাল, (২) যুক্তফ্রণ্ট সরকারের রাজত্বকাল, (৩) সামরিক শাসনের কাল এবং (৪) আয়ুবী মৌলিক গণতন্ত্রের (!) কাল। কিন্তু শারিরীক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে আমাকে লেখা বন্ধ করতে হয়। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থে দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত আলোচনা আছে। বাকী পর্বগুলো ভবিষ্যতে সক্ষম হ'লে লিখব এবং সেটা 'পাক-ভারতের রূপরেখা' ২য় খণ্ড নামে প্রকাশিত হবে।

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

সূচী

—এই লেখকের অন্যান্য বই—

১। India Partitioned and minorities in Pakistan.

২। বিপ্লবী জীবন।

পূর্বাভাষ

॥ এক ॥

ভারতবর্ষ! একটি মহান দেশ, এই ভারতবর্ষ—এই দেশের সঙ্গে কত যুগ-যুগান্তরের কত মধুর স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে! সুদূর অতীতের কত গৌরবময় কথা—তার কীর্তি, তার কৃষ্টি, তার সভ্যতার কত না কথা বেদ-পুরাণে ও কিংবদন্তিতে আজও ছড়িয়ে আছে—জড়িয়ে আছে তালপত্রের ও ভূর্জপত্রের পুঁথিতে বা পর্বতগাত্রে ও শিলাস্তূপে। বিশ্বের ইতিহাসও ভারতবর্ষের সেই গৌরবময় যুগের কৃষ্টি ও সভ্যতা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে নিয়েছে। এই ছিল ভারতের অতীত দিনের ইতিহাস। প্রাকৃতিক নিয়মেই আলো ও অন্ধকার পিছু পিছু চলে—সেই নিয়মেই ভারতবর্ষের গৌরবময় আলোর যুগের পরে নেমে আসে এক অন্ধকার যুগ—পরাধীনতা ও দাসত্বের যুগ। আমরা যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীতে এই ভারতবর্ষে জন্মেছিলাম, তাঁরা সকলেই অন্ধকার যুগের সন্তান। অন্ধকার যুগের সন্তান আমরা ভুলে গিয়েছিলাম ভারতবর্ষের অতীত দিনের গৌরবের কথা—বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের ঘৃণ্য অনুকরণই সেদিন হয়েছিল আমাদের চরম ও পরম কাম্য আদর্শ ও উপজীব্য। প্রাকৃতিক নিয়মেই আবার এই অন্ধকার যুগেরও দিন ঘনিয়ে আসে। ভারতবর্ষের মাটিতেই জন্ম নেন মহামতি রানাডে, গোখলে, তিলক, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন, মহাত্মা শিশির কুমার, মতিলাল ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপৎ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষিগণ, যাঁরা ভারতবাসীর কাছে তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান জানান ভারতের অতীত গৌরবের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে। দেশের তরুণের বুকে সাড়া জাগে—নতুন উষার আলো ভারতবর্ষে আবার দেখা দিতে শুরু করে। মুষ্টিমেয় তরুণ সেদিন স্বাধীনতার সূর্য দেখার জন্য পাগল হয়ে ওঠেন—তাঁরা সেদিন বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, নিজেদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সুখ-সম্পদের আশাকে গৌণ স্থান দিয়ে দেশকে ও দেশের স্বাধীনতাকেই মুখ্য স্থান দেন। ভারতবর্ষের অন্ধকারময় দিনের এমনই এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আমিও জন্ম গ্রহণ করি, ভারতবর্ষের মাটিতেই ভারতবাসী হিসাবে।

ভারতবর্ষের মাটি ও আমার মা-ই তাঁদের কোলে আমাকে প্রথম আশ্রয় দেন। তারপর থেকে প্রতিদিনে, প্রতিমুহূর্তে তাঁরা উভয়েই আমার জীবনে তাঁদের অপরিমিত সেবা-যত্ন-রস ও আহার জুগিয়ে এই দেহের পুষ্টিসাধন করেছেন। মায়ের সেবা প্রত্যক্ষভাবেই পেয়েছি; তাই, তাঁকে জেনেছি, বুঝেছি, ভালবেসেছি এবং তাঁকে ভালবেসেই বাড়ির সকলকে—তারপরে গ্রামের সকলকে ভালবাসতে শিখেছি। মাটির দান—মাটির সেবা অপ্রত্যক্ষ—তাঁকে দেখতে পাই নি, তাই, তাঁকে তখনও ভালবাসতে এবং তাঁকে ভালবেসে দেশকে তখনও ভালবাসতে শিখি নি। অবশেষে সেই সুদিনও আমার জীবনে আসে—মাটির দান, মাটির সেবা বুঝতে ও জানতে পারি—মাটিকে ভালবাসতে শিখি এবং তাঁকে ভালবেসেই গোটা দেশকে ভালবাসি। আমার জীবনে এই দিনটি আসে ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে, উপযুক্ত মনীষীদের কারো কারো ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসে, কারো কারো বা অগ্নিবর্ষী, জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে বা কারো কারো বক্তৃতা পড়ে। দেশকে ভালবেসে সেদিন আমি স্বাধীনতার শপথ নিই। আমার আগেও অনেক মহাপ্রাণ তরুণ ও যুবকই ঐরূপ সঙ্কল্প নিয়ে, তাঁরা স্বাধীনতা লাভের ক্ষুরধার পথে পা বাড়িয়েছিলেন—তাঁরা তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের মত আবেদন-নিবেদনের পথ নেন নি—তাঁরা নিয়েছিলেন বিপ্লবের পথ—যে পথে আদর্শের জন্য নিঃশেষে দিতে হয় মানুষের কাছে যা সবচেয়ে প্রিয়, সেই প্রিয় প্রাণের ও সর্বস্ব ত্যাগের কোরবানি বা বলি। এইরূপ সঙ্কল্পিত প্রাণ মানুষের কাছে তাঁর আদর্শই হয় বড়, আর সবই তুচ্ছ—সেই আদর্শ, আদর্শ-সিদ্ধির পথে যা কিছু প্রতিকূল—যা কিছু প্রতিবন্ধক, তার সব-কিছুকে নির্মমভাবে নাশ করে তাঁরা হন সর্বনাশী সন্ন্যাসী। বিপ্লবী দলের সেই তরুণ যুবকদের একমাত্র আদর্শ হয়, দেশের স্বাধীনতা; তাই, স্বাধীনতার যারা পরিপন্থী—স্বাধীনতার যারা শত্রু তাদের প্রাণ নিতেও তাঁরা দ্বিধা করেন না—তাতেও তাঁদের হাত বা বুক একটুও কাঁপে না। অস্ত্র তাঁদের ছিল না অহিংসার মহামন্ত্র (!)—তাঁদের অস্ত্র ছিল, অগ্নি-নালিক (পিস্তল ও রিভলভার) বা শাণিত ছুরিকা। এই গুপ্ত বিপ্লবী দলে যাঁরা গিয়েছিলেন—আমার আগে ও আমার পরে—তাঁরা অনেকেই স্বাধীনতার শত্রুর প্রাণ নিয়েছেন এবং নিজেদের প্রাণ অকাতরে নির্ভীকভাবে দেশ-মাতার চরণে আহুতি দিয়েছেন। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন বোস, আস্‌ফাকুল্লা,

যতীন দাস, রামরক্ষা, নলিনী বাগ্‌চি, রাজেন লাহিড়ী, রোসান সিং, রামপ্রসাদ বিসমিল, কর্তার সিং, জওলা সিং, কাশীরাম, যতীন মুখার্জি, নীরেন দাসগুপ্ত, ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেও, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, বিনয় বোস, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, দীনেশ মজুমদার, তারিণী মজুমদার, প্রমোদ, অনন্তহরি, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ আরও—আরও অনেকেই তাঁদের নিজেদের প্রাণ বলি দিয়েছেন। এই স্বাধীনতার জন্যই আরও একজন শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী বীর যোদ্ধা—শ্রীরাসবিহারী বোস—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম ক'রে নিঃশেষে প্রাণ দিয়ে গেলেন। এই বিপ্লব-যুগেরই শ্রেষ্ঠ দান স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক নেতাজী বোস সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই শেষ আঘাত হেনে বৃটিশ-সিংহকে এমন বিপর্যস্ত করলেন যে "সিংহ" লেজ গুটিয়ে ক্ষত-স্থান চাটতে চাটতে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হ'ল। নেতাজী বোসই সর্বপ্রথমে ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা তুলে জগৎকে বিস্মিত ও চমকিত করেন। যাঁর মরণ-জয়ী সংগ্রামের ফলেই ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন, সেই "নেতাজী" আজ নিরুদ্দিষ্ট! মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর একখানি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত গ্রন্থে বলেছেন যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যদি ভারতবাসীর কারো কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়, তবে তিনি হলেন—নেতাজী বোস। এই নেতাজীরও ছাত্রাবস্থায়ই রাজনৈতিক জীবন সুরু হয়, বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে ও মাধ্যমে।

বিপ্লবী দলের আরও কত শত শত কর্মীকে দেখেছি ইংরেজের জেলে অমানুষিক নির্যাতনে দিন কাটাতে—কেউ বা সে অত্যাচার ও নিপীড়নে জেলখানার মধ্যেই তিল তিল ক'রে মৃত্যুবরণ করেছেন—আবার এও দেখেছি যে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এসেও অনাহারে, অর্ধাহারে, অচিকিৎসায় তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিপ্লবী কর্মীরা জেলখানায় সরকারের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেতেন, তা তথাকথিত অহিংস সত্যাগ্রহী বন্দীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। বিপ্লবী বন্দীদের জেলখানায় দেখেছি, তেলের ঘানি টানতে, ছোব্‌ড়া পেটাতে—জেলখানার যেসব কাজ সবচেয়ে কঠিন তা-ই করতে। আলিপুর জেলের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—মিঃ মলভেনী সাহেব—জেল-কমিশনের কাছে যে গোপন সাক্ষ্য দেন, তা'তে তিনি বলেছিলেন যে সরকার থেকে ঐ শ্রেণীর বন্দীদের উপর অযথা অন্যায় উৎপীড়ন করার জন্য গোপন নির্দেশ দেওয়া হ'ত।

আজও দেখছি, এই শ্রেণীর অনেক মুক্ত বন্দীই স্বাধীন ভারতেও

অবহেলিত জীবন যাপন করছেন—কেউ বা উপযুক্ত খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে কঠিন যক্ষা রোগে মরেছেন, কেউ বা এখনও ধুঁকছেন !

এই তো গেল, এক শ্রেণীর স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের কথা, মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেসের ডাকেও পরাধীন ভারতের কম লোক চরম আত্মত্যাগ করেন নি ! উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমানে, পাকিস্তানের অন্তর্গত) বীর পাঠান-সন্তানেরা—খান আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে মশা-মাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে ইংরেজের পুলিশের গুলীতে অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বীরের মত মরেছেন কিন্তু প্রাণ ভয়ে কেউ পেছু হটেন নি।

বাংলাদেশের বীর নারী মাতঙ্গিনী হাজরাও সিপাহীর গুলীতে প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু তবু হাত থেকে জাতীয় পতাকা ছাড়েন নি বা তার অসম্মান হ'তে দেন নি।

সারা ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ যাঁরা জেলে গিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও কয়েক লক্ষ হবে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবর্ষ কম ত্যাগ স্বীকার করে নি—রক্তও নেহাৎ কম দেয় নি। ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের বনিয়াদ গড়ে ওঠার পর থেকে ইংরেজ-বিতাড়নের জন্য সর্বভারতীয় ও স্থানিক সংগ্রাম পুনঃ পুনঃ অনেকই হয়েছে—জীবন ও অর্থহানিও অনেকই হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা ও বিহারে মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে তাঁদের কর্মতৎপরতা পুরোদমে চালান। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি পত্রে দেখা যায় যে তিনি লিখেছিলেন—"ফকিররা বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলায় প্রবেশ ক'রে সেখানে 'কেলি' সাহেবকে ঘিরে ফেলে তার জীবন বিপন্ন করেছেন। সেই বছরই তাঁরা ঢাকা ও রামপুর গোয়ালিয়ার (বর্তমান, রাজশাহীর) কুঠী দখল করে কুঠীয়াল 'বেনেট' সাহেবকে পাটনায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন।" শেখ মজনু ছিলেন, ঐ বিদ্রোহী ফকিরদের নেতা। প্রথম দিকে হিন্দু সন্ন্যাসীরাও ঐ ফকিরদের সাথে একসাথেই বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে এগিয়ে চলেছিলেন কিন্তু পরে, সন্ন্যাসীরা মোহনগিরির নেতৃত্বে পৃথক দল করেন। মোহনগিরির পরে ভবানী পাঠক ঐ দলের নেতৃত্বে আসেন এবং লেঃ ব্রেনান সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একদল সিপাহীর সাথে সংঘর্ষে মারা যান। মুসলমান সম্প্রদায়ের ওয়াহাবি নামধেয় এক উপ সম্প্রদায়ও আমীর খানের নেতৃত্বে ঊনবিংশ

শতাব্দীতে "কোম্পানীর" বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই দলেরই দণ্ডিত কয়েদী শের আলি আন্দামান দ্বীপে লর্ড মেয়োকে ছুরিকাঘাতে নিহত করেন। এই ওয়াহাবি সম্প্রদায়েরও প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল, বাংলাদেশ। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই গুরু রাম সিং-এর নেতৃত্বে পাঞ্জাবে নামধারী শিখরা একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা ক'রে কোম্পানীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার ও অমান্য করে চলেন। এই বিদ্রোহ "কুকা"-বিদ্রোহ নামে ইতিহাসে পরিচিত। কুকা-বিদ্রোহীরা পাঞ্জাবকে ২৩টি প্রদেশে ভাগ ক'রে তাঁদের "গভর্ণর" নিযুক্ত ক'রে "কোম্পানীর" রাজত্বের পাশাপাশি একটা সমান্তরাল সরকার চালান। তাঁদের নিজেদের "কোর্ট", নিজেদের পরিচালিত স্কুল ও ডাকঘর প্রভৃতিও সমানভাবে কাজ চালিয়ে যায়। এই কুকারা দাবী করেন যে তাঁরাই, পরবর্তীকালে মাহাত্মা পরিচালিত কংগ্রেসের অসহযোগ-আন্দোলনের পথিকৃৎ।

এই সবগুলিই স্থানিক বিদ্রোহ। ঐতিহাসিকরা এইগুলোকে স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্যা দেন নি। আমি ঐতিহাসিক নই—আমি ছিলাম, স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন ক্ষুদ্র সৈনিক মাত্র। স্বাধীনতা-সংগ্রামী সৈনিকের দৃষ্টিতে ও বিচারে আমি মনে করি, পরবশতার বিরুদ্ধে যে কোনও বিদ্রোহ-ই হোক না কেন, তা-ই স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; কারণ, ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের তারা প্রেরণা জোগায়, যেমন ঈস্টার-বিদ্রোহ সংগ্রামী আয়র্লণ্ডে এবং চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ভারতীয় বিপ্লবী সমাজে একটা আলোড়ন ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেই প্রেরণাই এনে দেয় মহত্তর ব্যাপক সংগ্রামের উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

ঐসব স্থানিক বিদ্রোহ ছাড়াও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এক ব্যাপক সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। ঐতিহাসিকরা এই সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব'লে বর্তমানে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। সেই সিপাহী বিদ্রোহও বাংলাদেশেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

আগাগোড়া সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাংলার অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি। স্বাধীনতার আধুনিককালের সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি রক্ত ঢেলে দিয়েছে, স্বাধীনতা দেবীর পদতলে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের তরুণরা তাঁদের

বুকের তপ্ত তাজা রক্ত অকাতরে যেমন দিয়েছেন, তেমনই ; ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বীর পাঠান সন্তানরাও অহিংস সত্যাগ্রহী সৈনিক হিসাবে তাঁদের রক্ত অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন—তাঁরা ঝাঁকে ঝাঁকে মশা-মাছির মত মরেছেন কিন্তু প্রতিপক্ষকে একটি আঘাতও করেন নি।

এই যে এত রক্তদান—এত ত্যাগ—এত দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগের ফলে যে স্বাধীনতা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আপোষে এসেছে, তার ফলে আর অতীতের গৌরবময় ভারতবর্ষ নেই—ভারতবর্ষ হয়েছে, পাক-ভারত-উপমহাদেশ! সংগ্রামী বাংলার প্রাণকেন্দ্র পূর্বাঞ্চল, "পূর্ব-পাকিস্তান" নামে ও ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের খণ্ডিত পাঞ্জাবসহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে "পশ্চিম পাকিস্তান" নামে এক নূতন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। ফলে, আজ পাঠান-বীর খান আবদুল গফুর খান দেশত্যাগী এবং পূর্ব পাকিস্তানের শত শত বীর যোদ্ধা বাস্তুহারা। যেদিন স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা প্রথম নেমেছিলাম, সেদিন আমরা সকলেই ছিলাম, ভারতবাসী। দেশকে ভালবেসে ভারতবাসী হিসাবে গর্বও বোধ করতে শিখেছিলাম এবং সেই ভালবাসা, সেই প্রেম, সেই গর্ববোধই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়ে ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, স্বাধীনতা যেদিন এল সেদিন সংগ্রামী ভারতীয়দের কেউ বা হলেন—ভারতীয়, আর কেউ বা হলেন—পাকিস্তানী! যে জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেমেছিলাম—যার উপরে ভিত্তি ক'রে সব সময়েই ভেবেছি—"আমি সর্বপ্রথমে ভারতবাসী, তারপরে আমি হিন্দু বা মুসলমান"—সেই জাতীয়তাবাদ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সাথে সাথেই খণ্ডিত হ'য়ে গেল। সংগ্রামী সৈনিকের সেই মর্মবেদনা কি বর্তমান কালের ভারতীয় সংগ্রামী নায়করা অন্তর দিয়ে অনুভব করেন? খান আবদুল গফুর খান সেই কথা স্মরণ ক'রে অতীতের সংগ্রামী সহকর্মীদের কাছে কেঁদেছেন। পূর্বপাকিস্তানের সংগ্রামী সৈনিকরা আজও মনে মনে কাঁদছেন—তাঁদের বুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা প্রকাশ করতে পারছেন না!

স্বাধীনতার পরের একটি ঘটনা আমার মনে সব সময়েই জেগে ওঠে। কলকাতায় এসেছি। দেখা হ'ল এক লেখা-পড়া না জানা বৌদির সঙ্গে। আমার দাদা (মাসতুতো) ছিলেন, সিরাজগঞ্জের উকিল। সেখানে তাঁদের পাকা বাড়ী ও জোত-জমা সবই ছিল কিন্তু তাঁরা দেশত্যাগ করে আসতে বাধ্য

হয়েছেন। বৌদি আমাকে বলেন—"এত জেল খেটে, এত দুঃখ-কষ্ট বরণ ক'রে ইংরেজকে তাড়িয়ে এমন স্বাধীনতাই আনলেন, যে স্বাধীনতার ফলে লোককে বাড়ি-ঘর ছেড়ে ভিক্ষুকের বেশে দেশান্তরী হ'তে হ'ল।" ইংরেজ এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে ব'লে আমি কোন অনুশোচনা করি না, বরং সেজন্য গর্বই বোধ করি কিন্তু আমার গর্ব সত্বেও আমি কিন্তু বৌদির প্রশ্নের উত্তর সেদিন দিতে পারি নি—আজও ভেবে কুল-কিনারা পাই না—উত্তর খুঁজে পাই না।

আজ জীবনের প্রান্তসীমায় এসে পেছনে ফিরে দেখছি, এই দেহের উপর দিয়ে তিয়াত্তরটি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কেটে গিয়েছে—পারিবারিক ও রাজনীতিক ঝড়-ঝঞ্ঝাও অনেকই গিয়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে আমি যখন জেলে, তখন আমার পিতামহ মারা গিয়েছেন—তাঁর সাথে শেষ দেখা হয় নি। দেখা না-হওয়ার ফলে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমার বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন। ১৯৩১-এ আমি যখন রাজশাহী জেলে, তখন আমার কাকা মারা গিয়েছেন। তারপরে ১৯২৯ সালে আমার স্ত্রী ৪ বছরের এক মেয়ে রেখে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। দেশ-সেবায় নেমে দেশকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু অর্থকরী বিদ্যা শিখি নি; তাই, আমি আগেও যেমন ছিলাম, আজও তেমনই অর্থহীন। এক এক জনের মৃত্যু খবর পেয়েছি বা স্বচক্ষে দেখেছি, মনে ব্যথাও পেয়েছি। পর মুহূর্তেই সামলিয়ে উঠেছি, এই ভেবে যে আমি তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বাধীনতা সৈনিক—আমার তো দুর্বলতা সাজে না। সর্বশেষ আঘাত পাই, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে, আমি যখন ঢাকা জেলে। খবর পেলাম, আমার সেই মাতৃহারা মেয়েটি, যার বিয়ে আমি জেলে থাকা কালেই ১৯৪১ সালে আমার ছোট ভাই—জিতেশ দিয়েছিল, সেই মেয়েটিও তার শ্বশুরবাড়ি দিনাজপুর শহরে একদিনের জ্বরে মারা গিয়েছে। ১৯৪০ সালে যেদিন আমি আমার গ্রামের বাড়ি থেকে ধৃত হয়ে রাজশাহী জেলের দিকে রওনা হই, মেয়েটি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল। আমার বিদায় অভিনন্দনের জন্য গ্রামের সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান গ্রাম্য সব রকমের বাদ্যযন্ত্র—ঢাক-ঢোল প্রভৃতি নিয়ে বাজনা বাজাচ্ছিলেন এবং জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছিলেন। আমার দৃষ্টি সামনে সেই দিকেই ছিল, পিছনে যে আমার মেয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছে, তার দিকে সেদিন ফিরেও তাকাই নি। সেই দেখাই আমার তাকে শেষ দেখা। ঢাকা জেলে

খবর পেয়ে বুকে দারুণ ব্যথা পেয়েছিলাম—সেটা ঠিকই কিন্তু বুক ফেটে গেলেও চোখ ফেটে জল বের হয় নি। এই তো গেল পারিবারিক ঝড়-ঝঞ্ঝা। রাজনীতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার ফলে প্রায় ২২ বছর কাল জেলে, অন্তরীণে বা ফেরারী অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। জাঙ্গিয়া-কুর্তা পরে গলায় মোটা লোহার হাঁসুলি ও কাঠের তক্তি পরে ডাণ্ডা-বেড়ি পায়ে নিয়েও জেল খেটেছি। ইংরেজের পুলিশের সাথে সশস্ত্র রাইফেলের গুলীতে আহতও হয়েছি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর সৈনিকদের মধ্যে বাংলা দেশেই আরও অনেকেই আছেন, যাদের জীবনে আমার চেয়েও আরও অনেক বেশি ঝড়-ঝঞ্ঝা এসেছে। তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা বরণের ইতিহাসের কাছে আমার ইতিহাস অতি অকিঞ্চিৎকর। এত ত্যাগ, এত দুঃখ-কষ্ট বরণ, এত রক্ত দানের পরেও কিন্তু স্বাধীনতা যখন এল, তখন ভারত ভেঙে দু'খানা হল। এই দেশ-ভাগের দারুণ মর্মবেদনায় একটি অতি করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ভূতপূর্ব আই-সি-এস (I. C. S.) একজন জেলাশাসক ও প্রধান সাহিত্যিক—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, তাঁর অমর একটি কবিতায়। সেই কবিতাটির কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

"তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?
তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?"

স্বাধীনতা এল কিন্তু ভারত ভেঙে দু'ভাগ—ভারত ও পাকিস্তান হল। পরিণতিতে সাথে সাথেই নিহত হল, ভারতবর্ষের জাতীয়তা বোধ—যে জাতীয়তা বোধ ছিল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাণ—স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের

সংগ্রামের উৎস। আজ ভারতের জাতীয় নেতারা পুনঃ পুনঃ তারস্বরে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন, জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে! এ যেন গাছের গোড়া কেটে মাথায় জল ঢালা! জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে চিন্তাশীল দেশবাসীর মনোবল শিথিল হয়ে গিয়েছে। বেরুবাড়ির অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিক আছেন, কিন্তু তাঁদের নাগরিকত্ব লোপ করে বিদেশীর পর্যায়ভুক্ত করার কথাবার্তা সবই পাকা হয়ে আছে। এমনিভাবে আরো কে যে কখন তাঁর নাগরিকত্ব হারিয়ে বিদেশী হবেন, তার ঠিক কি? দেশ ভাগের পর আমি একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে দেখেছি, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে যেটা প্রথমে গুজবরূপে শোনা যায়, তা-ই পরে বাস্তবরূপে দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহীতে থাকতে সেখানে মাঝে মাঝেই গুজব শুনেছি যে, মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানে আসবে। আজও সে গুজব বাস্তবরূপে দেখা দেয় নি ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতে তা বাস্তবে পরিণত হবে কি-না, তা কে বলতে পারে? দেশ বিভাগের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে—জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিহীন দুর্বল করা হয়েছে। শুধুই কি তাই? ক্ষয়-ক্ষতিও কম হয় নি—জনগণের দুর্ভোগও কম হয় নি। লিওনার্ড মোসলে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে "The Last Days of the British Raj" লিখেছেন—১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের (স্বাধীনতা লাভের সময়) পর পরবর্তী ৯ মাসের মধ্যে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ থেকে এক কোটি ষাট লক্ষ হিন্দু, শিখ ও মুসলমানকে তাঁদের বাস্তুত্যাগ করতে হয়েছে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ছয় লক্ষ লোক নিহত হয়েছেন। এই ছয় লক্ষ লোকের হত্যার এক ভয়াবহ পৈশাচিক বিবরণও তিনি দিয়েছেন। তাঁর ভাষাতেই সেই বিবরণটি তুলে ধরছি—

"But no, not just killed. If they were children, they were picked up by the feet and their heads smashed against the wall. If they were female children, they were raped. If they were girls, they were raped and then their breasts were chopped off. And if they, were pregnant, they were dis-embowelled."

এই বিবরণটা শুধু ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চল সম্পর্কেই দেওয়া। পূর্বাঞ্চলের পূর্ব পাকিস্তানে পরে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি

ভারতে চলে আসার পরে ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে "India partitioned and minorities in Pakistan" নামে একখানি বই প্রকাশ করে তাতে কিছু দিয়েছি। চোদ্দ বছরে পাকিস্তানে থেকে অনেক কিছুই দেখেছি এবং শুনেছি। ভারতে আসাও আমার ৪ বছর হয়ে গেল। এখানেও অনেক কিছুই দেখছি ও শুনছি। "পাক-ভারতের রূপরেখা"র সেই চিত্রটাই নিরপেক্ষ মন নিয়ে তুলে ধরতে চাই।

॥ দুই ॥

"স্বাধীনতা এল কিন্তু ভারত ভেঙে দু'ভাগ—ভারত ও পাকিস্তান হল।" ছিল, অখণ্ড এক ও অবিভাজ্য ভারতবর্ষ কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব সর্ত অনুযায়ী তাকে কেটে দু'ভাগ করতে হল—ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করে জন্ম নিল, পাকিস্তান। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পূর্ব সর্ত ছিল—হিন্দু-মুসলমানের মিলন চাই; অথবা উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক রাস্ট্র। সাম্প্রদায়িকতাবাদী "মুসলিম লীগের" প্রধান জিগিরই হল—মুসলমানের জন্য পৃথক বাস্তভূমি চাই-ই—হিন্দু-মুসলমান এক সাথে এক জাতীয় পতাকার নিচে বাস করতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে অল্প সংখ্যক জাতীয়তাবাদী ছাড়া অধিকাংশের মধ্যেই এই বি-জাতীয় দ্বি-জাতিতত্ত্ব বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। একদিনে এই মনোভাব গড়ে নি। হঠাৎও নয়। আজ থেকে ৬০ বছর আগে, অর্থাৎ দেশ-বিভাগের কিছু কম-বেশি ৪০ বছর আগে—ভারতবর্ষের মাটিতে এই বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয়—রোপণ করেন, সাম্প্রদায়িকতাবাদী তৎকালীন জনকয়েক তথাকথিত মুসলমান নেতা; আর প্রোথিত বীজ-ক্ষেতে ৪০ বছর ধরে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার জল-সিঞ্চন করে চলেন। তখন সরকারের প্রয়োজন ছিল, সাম্রাজ্য-রক্ষার। সাম্রাজ্য বজায় রাখতে গেলে ভেদ-নীতির দরকার। বিদেশী শাসিত দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ভেদ-নীতিকে রাজনীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করে থাকে। ইংরেজও এখানে তা-ই করেছিল।

ইংরেজ, ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তা প্রধানত মুসলমান নবাব-বাদশাহদের হাত থেকে রাজ্য দখল করে করেন; সুতরাং সাধারণ মুসলমান, ইংরেজ বিরোধীই ছিলেন। তাই, মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে বিদ্রোহও করেছেন। মোল্লা-মৌলবীরাও 'ফতোয়া' দিয়েছেন, কেউ যেন ইংরেজের ভাষা শিখে সরকারের সাথে সহযোগিতা না করেন। মুসলমানগণ, সেই সব 'ফতোয়া' মেনে তৎকালীন ইংরাজি শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েন। হিন্দুরা মনে করেন—তাঁরা ছিলেন, মুসলমানের অধীন, এখন হলেন ইংরেজের অধীন। মুসলমানের অধীন থাকাকালে মুসলমানের ভাষা আরবী-পার্শি তাঁরা শিখতেন। এখন যখন

ইংরেজ রাজার অধীন হলেন, তখন তাঁদের ভাষাই শিখতে হবে; তাই, হিন্দুরা ইংরেজি শিখতে এগিয়ে গেলেন; ফলে, রাজকার্যের দপ্তরে হিন্দুদেরই স্থান হল—মুসলমানরা সেদিক দিয়ে পিছিয়েই থাকলেন। কিন্তু অবস্থা তো চিরদিন একইরূপ থাকে না। পরিবর্তন, জগতের নিয়ম। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেয়। সৈয়দ আহমেদ খান (পরে, স্যার) শিক্ষায়-দীক্ষায় বড় হয়েছেন—পদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর দহরম-মহরমও হয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রধানদের প্ররোচনাতেই তিনি আরম্ভ করলেন, মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সেই আন্দোলনের প্রধান উপজীব্যই হোল হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার। তিনি দেশময় তুললেন ধর্মের জিগির। মানুষের সব আকর্ষণের সেরা আকর্ষণ হল, ধর্ম—বিশেষ করে, এই ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষে। মুসলমানদের মধ্যে সভা-সমিতি চলতে লাগলো। টাকাও উঠতে লাগলো। একটা আন্দোলন গড়ে উঠলো। এই আন্দোলনকে বলা হয়—আলিগড়-আন্দোলন। আলিগড়-আন্দোলনের "তাহ্জিবুল-ইখলাক" নামে একখানি সংবাদপত্র বের হল। এই সংবাদপত্রে মুসলমানদের নবজাগরণের আহ্বান জানিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বের হতে থাকলো। এই আন্দোলনের ফলেই গড়ে ওঠে—"আলিগড় মুসলিম কলেজ।" বর্তমানে একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—"আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।" আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সন্তান। তাঁদের শিক্ষার ভিত্তিও ছিল হিন্দু-বিদ্বেষ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে সব সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমান নেতৃত্বের আসনে গিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই হলেন, "আলিগড় মুসলিম কলেজের" প্রাক্তন ছাত্র। মরহুম লিয়াকৎ আলি খান ও শেখ আব্দুল্লা প্রমুখ ছিলেন, আলিগড়েরই ছাত্র। শিক্ষা, মানুষকে ভালও যেমন করতে পারে, আবার শিক্ষার নামে কু-শিক্ষা মানুষকে খারাপও তেমনি করতে পারে। তার প্রমাণ আমরা ভারত-বিভাগের মধ্যে দিয়েও দেখেছি—আজও তার বিষময় ফল ভোগ করে চলেছি। পরাধীন ভারতে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করতেন বিদেশী শাসক, অথবা তাঁদেরই 'জো হুকুম' তাঁবেদারগণ। এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে না-বলে পারছি না। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মূলনীতির যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে তা মনে হয় না। সবই যেন সেই বৃটিশ সরকারের আমলাতান্ত্রিকতার গড্ডালিকাপ্রবাহেই চলছে। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব

শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মহম্মদ করিম চাগলা সাহেব শিক্ষাকে অসাম্প্রদায়িক করার জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। আলিগড় ও কাশীর দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের "মুসলিম" ও "হিন্দু" বিশেষণটি বাদ দিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক জনমত বিক্ষুব্ধ হল—স্বাধীন ভারতের সরকার তার মধ্যে দেখলেন, আগুনের ফুলকি! সেই আগুনের ফুলকিতে হয়তো, সাধারণ নির্বাচনে ভোটের বাক্স পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে; সুতরাং, ভোটের স্বার্থ দেশের স্বার্থকে ছাপিয়ে উঠলো—গণতান্ত্রিক সংসদের অধিকাংশের ভোটে চাগলা সাহেবের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতার আয়ু আরও কিছুকাল থেকেই গেল। অতীত দেখেও যে আমাদের শিক্ষা হল না—এইটাই আফশোষ। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ভেদ-নীতি ছিল রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ; আর, স্বাধীন ভারতের ভোট-নীতিই হয়েছে, রাজনীতির মূলনীতি! এখানে সরকার পক্ষীয় ও বিরোধী-পক্ষীয় রাজনীতিকদের চলছে ক্ষমতা-ভোগ ও ক্ষমতা-দখলের রাজনীতি। এই রাজনীতির পাল্লায় পড়ে দেশের স্বার্থও সময়ে সময়ে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। হয়তো এই অবস্থারও পরিবর্তন আসবে। যত তাড়াতাড়ি আসে, ততই মঙ্গল। সাম্প্রদায়িকতাই দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু—তা' হিন্দুরই হোক, বা মুসলমানেরই হোক। সামাজ-জীবনের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে একে নির্মম হাতে কেটে বাদ দিতে না পারলে খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। ঘটনাচক্রে ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে যেতে হয়েছে কিন্তু ফিরে আসার আশা মনের কোণ থেকে ছেড়ে ছিল না। সেই জন্যই অ-সাম্প্রদায়িক ভারতের পাশে, গড়ে রেখে গিয়েছে এক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র—পাকিস্তান। সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ রাজনীতির এই খেলা খেলার জন্যই ইংরেজ-শাসক সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়েছে। শুধু প্রশ্রয়ই দেয় নি—প্ররোচনাও দিয়েছে! এই প্রশ্রয় ও প্ররোচনার ফলই হচ্ছে, সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর আলিগড় আন্দোলন।

এই আলিগড় আন্দোলনের সাথে এসে পরে যোগ দিলেন, আরও একজন গোঁড়া ধর্মান্ধ মুসলমান নেতা। তিনি হলেন, মেহেদি আলি খান। উত্তর-প্রদেশের এটোয়ায় তাঁর জন্ম হয়। খুব দরিদ্রের ঘরের সন্তান। তিনি তাঁর মামার আশ্রয়ে থেকে আরবি, পার্শি ও ইসলামের ধর্মতত্ত্ব পড়া শেষ করে উত্তরপ্রদেশের কালেক্টরিতে একটি কেরানীর পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁর

অধ্যবসায় ও মুরুব্বির জোরে তিনি ডেপুটি সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছিলেন। পরে সৈয়দ আহমদ খানের সুপারিশে তিনি হায়দরাবাদে নিজাম সরকারের অধীনে উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। ২০ বছর কাল তৎকালীন হায়দারাবাদের সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়ায় নিজামসরকারের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক বিভাগের সচিবরূপে কাজ করে যখন পাকা-পোক্ত একজন সাম্প্রদায়িক নেতা হলেন, তখন তিনি সেই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে আলিগড় গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন এবং সৈয়দ আহমেদ সাহেবের সহকারী রূপে আলিগড় আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুললেন।

এই সময়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টে তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ সরকার ভারতে প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন-সংস্কার করতে চান। ঘোষণাটি জনাব মেহেদি আলি খানকে (পরে, নবাব মহসিন-উল-মুলক বলে পরিচিত) বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। তিনি চিন্তা করে ঠিক করেন যে ঐ ঘোষণাকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে কাজে লাগাতে হলে প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকার গঠনের আইনের মধ্যে মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু করতেই হবে। কিন্তু করেন কি করে? অবশেষে দৃষ্টি পড়লো আলিগড় মুসলিম কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লিউ, এ, জে, আর্কিবল্ড সাহেবের ওপরে। সাহেব অধ্যক্ষকে নবাব মহসিন-উল-মুলক মেহেদি খান সাহেব ধরলেন যে ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর সাথে একটি মুসলমান প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দিতেই হবে। ইংরেজও তা-ই চায়। সে ইংরেজ পাটকলের সাহেবই হোক, বা রাজপ্রতিনিধিই হোক। সবারই উদ্দেশ্য তো একই। সাম্রাজ্য রক্ষা। অধ্যক্ষ সাহেবও তখনই ভাইসরয়কে মুসলমানদের একটি 'ডেপুটেশন'কে আলোচনার সুযোগ দিতে অনুরোধ জানালেন। হাতে হাতে ফলও মিললো। ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো রাজী হয়ে গেলেন। ৩৫ জন মুসলমান নেতার সমবায়ে গঠিত এক তথাকথিত প্রতিনিধি দল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এক স্মারকপত্র দিলেন—ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই স্মারকপত্রটি তৈরী করেছিলেন নবাব মহসিন-উল-মুলক সাহেব, নবাব ইমাদুল মুলক সাহেবের সহযোগে। এই স্মারকপত্রে অবশ্য, মুসলমানের জন্য শাসন-সংস্কারে পৃথক নির্বাচন প্রথা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার ভেতরেই ছিল, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের দেশ-বিভাগের বিষাক্ত বীজ। স্মারকলিপির এক স্থানে বলা

হয়েছিল যে, যে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা, রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের যে কোনও প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি, সেই সম্প্রদায় নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণেই তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণের স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। স্মারকলিপির ভাষাটাই এখানে উদ্ধৃত করছি:

"A community in itself more numerous than the entire population of any first class European Power except Russia may justly lay down adepuate recognition."

এই প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র হয়ে কথা বলেছিলেন, মহামান্য আগা খান। এই প্রতিনিধিদল যখন 'ভাইসরয়ের' কাছে তাঁদের স্মারকপত্র দেন, তখন পর্যন্ত মুসলমানদের কোনও প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে ওঠে নি। সম্ভবত প্রতিনিধিদল, রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকেই প্রেরণা পান। একটা রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলার। তার ফলেই, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কতিপয় নেতা ঢাকার নবাব বাড়িতে মিলিত হয়ে গড়েন—"মুসলিম লীগ"—মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

মহামান্য আগা খান সাহেবের নেতৃত্বে তো ভারতের বৃটিশ গভর্নর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধির কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হল। বড়লাট সাহেবও প্রতিনিধিদলকে যথেষ্ট উৎসাহ ও আশা দিলেন। তাহলেও বিলাতেও তো তদ্বির করা দরকার। নবাব মহসীন-উল-মুলক, তাই এখানেই চুপচাপ থেমে থাকলেন না। তিনি লণ্ডনে সৈয়দ আমীর আলি সাহেবের কাছে পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখে তাঁকে বৃটিশ সরকারের কাছে তদ্বির করার অনুরোধ জানাতে থাকেন। ফলও ফলে। সৈয়দ আমীর আলি সাহেব সেখানে একটি 'কমিটি' গড়ে ভারত-সচিব ও বৃটিশ সরকারের কাছে ভারতে প্রদত্ত স্মারকলিপিটির সারমর্ম উপস্থিত করেন। অবশেষে বৃটিশ সরকারও প্রস্তাবটি স্বীকার করে নেন। তাঁরাও তো এই-ই চাইছিলেন!

ভারতে মহামান্য আগা খানের নেতৃত্ব সফল হল। বৃটিশ কূটনীতির জয় হল। মাননীয় আগা খান সাহেবও যথেষ্টই আত্ম-প্রসাদ অনুভব করলেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে পরবর্তিকালের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সেটিও মহামান্য আগা খান ঘটিত ব্যাপার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। মিত্রপক্ষ তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। প্রগতিপন্থী মহান বিপ্লবী নেতা কামাল পাশা (পরে, "আতা-তুর্ক"—তুর্কী জাতির জনক)

তুর্কীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়ে 'খেলাফৎ' তথা ইসলামের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বের আধার ও ধর্মের গোঁড়ামি ভেঙে দিয়েছেন। তুর্কীকে তিনি আধুনিকতম দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এক নতুন তুর্কী গড়বেন। এটাই তাঁর পরিকল্পনা। বৃটিশ সরকার প্রমাদ গণলেন। অশিক্ষা ও কু-সংস্কারই হল, ধর্মের গোঁড়ামির ধারক ও বাহক। ধর্মের গোঁড়ামির সাথে সাথে অশিক্ষা ও কুসংস্কার দেশ থেকে উচ্ছেদ করছেন, মহান নেতা আতা-তুর্ক কামাল পাশা। তুর্কী আবার শক্তিশালী হয়ে উঠুক—ইংরেজ তা চান না। তাই, পাঠালেন সেখানে মহামান্য আগা খানকে। আতা-তুর্কের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা'ই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বিপ্লবী নেতা যে সহস্রলোচন—তাঁর যে দৃষ্টি সব দিকেই সে খবর তো আগা খান সাহেব জানতেন না। আতা-তুর্ক কামাল বললেন—"ইংরেজের দালাল হটো। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুর্কীর সীমানার ওধারে চলে যাও।" আগা খান সাহেব যেতে বাধ্য হলেন। ভারতে মহামান্য আগা খান বৃটিশের সৌজন্যে যে সাফল্য লাভ করেছিলেন, বিপ্লবের পথে পরিচালিত তুরস্কে তা' করতে পারলেন না। ভারতে তিনি পুরোপুরিই সফল হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রদত্ত স্মারকলিপি বৃটিশ সরকার সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ভারতের শাসন-সংস্কার আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথারই ব্যবস্থা হল। এই তথাকথিত শাসন-সংস্কারের মধ্য দিয়ে সেদিন যে বিষবৃক্ষের অতি ক্ষুদ্র বীজটি ভারতের মাটিতে রোপিত হয়েছিল, তা-ই ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাণ্ড মহীরুহরূপে দেখা দেয় এবং ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৪।১৫ই আগস্টে তাতে ফল ফলতে সুরু করে।

॥ তিন ॥

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। সর্ব-ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন। ভোটগ্রহণ হবে, পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে। প্রতি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মুসলমান ও অমুসলমান পৃথক পৃথক ভোট দেবেন। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ দেখতে পারেন না; মুসলমানও, হিন্দুর স্বার্থ দেখতে পারেন না! গণতন্ত্রের পূজারী ইংরেজের দেওয়া ভারতে ইহাই গণতন্ত্রের নমুনা! ১৯০৯ সালের মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে ভারতকে এই গণতন্ত্রই উপহার দিয়েছেন, বিলাতের বৃটিশ সরকার। সেইদিন যে বিষবৃক্ষের চারাটি রোপণ করা হয়েছিল, ভারতবর্ষের মাটিতে সেই চারা এখন ডালপালা বিস্তার করে প্রকাণ্ড একটা মহীরূহে পরিণত হয়ে সারা ভারতের আকাশ বাতাস ঢেকে ফেলেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন। মুসলমানগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—মুসলিম লীগের—শ্রেষ্ঠ নেতা (কায়েদ-ই-আজম) মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাহ সাহেব, মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে ঘোষণা করেন, তিনি নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে 'কলাগাছ'কে দাঁড় করালে তাঁকেই যদি নির্বাচক মণ্ডলী ভোট দেন, তাহলে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি বাসভূমি—"পাকিস্তান"—অবশ্যই দেবেন। এদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতারাও ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষের বিভাগ তাঁরা কিছুতেই মেনে নেবেন না; সুতরাং ভারত-বিভাগ করে পাকিস্তানও কোনদিনই হবে না। মহাত্মা গান্ধী তো বললেন যে, দেশবিভাগ যদি হয় তা হবে, তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে—তিনি জীবিত থাকতে দেশ-বিভাগ কিছুতেই তিনি মানবেন না। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ১৯৪৬ সালের সুরুতেই লক্ষ্ণৌ-এর এক বৃহৎ জনসভায় দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"মুসলিম লীগ হাজার বছর চেষ্টা করলেও ভারত-বিভাগ হয়ে 'পাকিস্তান' কিছুতেই হবে না। মুসলমানরা, মুসলিম লীগের এবং অমুসলমানরা কংগ্রেসের ঘোষণায় পুরোপুরিই বিশ্বাস করলেন। সারা ভারতে উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। কংগ্রেসের খরচায় এবং কংগ্রেসের কর্মীদের পরোক্ষ সাহচর্যে মুসলমান প্রার্থীও বে-নামে দাঁড় করান হল। অন্য প্রদেশের খবর জানি না। কিন্তু বাংলাদেশের খবর বিশেষ ভালভাবেই জানি।

এখানে হুমায়ুন কবীর প্রমুখের মাধ্যমে মুসলমান প্রার্থী মনোনয়ন করে মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড় করান হয়। প্রাদেশিক কংগ্রেসই সেই সব প্রার্থীর জন্ম খরচা যোগান। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। আমার জেলা রাজসাহীর ঐরূপ চারজন প্রার্থীর নির্বাচন চালানোর জন্য আমার হাত দিয়েই তাঁদের কাছে টাকা পাঠানো হয়। কিন্তু নির্বাচন শেষে দেখা গেল যে ঐ সব প্রার্থীদের মধ্যে কেউই নির্বাচিত হতে পারেন নি—জিন্নাহ সাহেবের মনোনীত "কলাগাছেই" মুসলমান ভোট বেশি পড়েছে। হুমায়ুন কবীর সাহেবদের মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত বে-নামী মুসলমান প্রার্থীদের জামানতের টাকাও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলি: পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ কংগ্রেসমহল থেকে আজ একটা কথা উঠেছে যে, কবীর সাহেব স্বাধীনতার আগে কোনও-দিনই কংগ্রেস সদস্য ছিলেন না। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের চারি আনার সদস্য ছিলেন কি না, তা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু এইটুকু জানি যে, তিনি একজন জাতীয়তাবাদী এবং কংগ্রেসের নীতির সমর্থক মুসলমান ছিলেন।

যাক, রাজসাহী জেলায় শুধু কেন, বাংলাদেশের কোনও জেলা থেকেই কংগ্রেস সমর্থিত একটি মুসলমানও নির্বাচিত হতে পারেন নি। একমাত্র জামালসাহেব সেবারের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেস দলে ছিলেন। কিন্তু তিনিও নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রমিক-কেন্দ্র থেকে।

সেবারের নির্বাচনে একমাত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান কংগ্রেস সদস্যগণ অধিকাংশ সংখ্যায় নির্বাচিত হয়ে সেখানে কংগ্রেসের মন্ত্রি-সভা গড়েন। সেটা সম্ভবপর হয়েছিল, কেবলমাত্র সীমান্ত গান্ধী নামে খ্যাত খান আব্দুল গফুর খানের এবং তাঁর ভাই ডাক্তার খান সাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। পাঞ্জাবে অবশ্য মুসলিম লীগ সংখ্যাধিক্য লাভ করতে পারে নি—সেখানে সংখ্যাধিক্য লাভ করেছেন, স্যর সেকেন্দার হায়াৎ খান ও তাঁর 'ইউ-নিয়নিস্ট' দল। ধর্মের জিগির তুলে এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে নানারূপ কল্পিত অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনীর মাধ্যমে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করে জিন্নাহ সাহেব ও তাঁর দল—মুসলিম লীগ—যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন হচ্ছে, ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের সর্বভারতীয় সাধারণ নির্বাচন। মুসলমানদের মধ্যে মুষ্টিমেয় জাতীয়তাবাদী

মুসলমান ছাড়া সকলেই মুসলমানের জন্য পৃথক বাসভূমি—'পাকিস্তানের'—ডাকে ও আওয়াজে মনে প্রাণে সাড়া দিয়েছিলেন। এমন কি উত্তরপ্রদেশের ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণও যাঁদের, 'পাকিস্তান' হলেও সেই পাকিস্তানে পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তাঁরাও পাকিস্তানকেই সমর্থন করে মুসলিম লীগের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। আজও তার জের যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, তা বলা যায় না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম লীগ সংগঠন হিসাবে না থাকলেও বহু মুসলমানের মধ্যেই অতীতের সেই মুসলিম লীগের মনোভাব ছাই-চাপা আগুনের মত এখনও ধিকি-ধিকি জ্বলছে। কেরালায় তো এখনও মুসলিম-সংস্থা হিসাবেই বহাল তবিয়তে আছে; আর তারা এতই সেখানে শক্তিশালী যে নির্বাচনের মুখে কখনও বা অ-সাম্প্রদায়িক কংগ্রেস, কখনও বা কম্যুনিস্ট সহ প্রগতিশীল বামপন্থী দল তাঁদেরই সাথে হাত মেলাচ্ছেন। নীতির বালাই কোন দলেরই দেখতে পাচ্ছি না। সারা দেশময় এই যে মনোভাব গড়ে উঠেছে, এটা পৃথক নির্বাচনরূপী বিষবৃক্ষেরই কলুষিত হাওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

এই তো গেল, মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীর কথা। হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীও কংগ্রেসের দেওয়া আশ্বাসে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে কংগ্রেস প্রার্থীদেরই সকলে ভোট দিয়েছিলেন! অ-মুসলমানদের মধ্যে সর্বত্রই 'কংগ্রেসের' জয়-জয়কার, আবার অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যেও 'মুসলিম লীগের' জয়কার। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও এইটেই চাইছিলেন। এর জন্যই তাঁদের ৪০ বছরের—১৯০৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত—সাধনা ও ষড়যন্ত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে গিয়েছে। ইংরেজ সহ মিত্রপক্ষের জয় হয়েছে। যুদ্ধে জিতলেও নিজ দেশে বৃটিশ সরকারের আর্থিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। তার উপর, ১৯৪২ সালের কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে দেখা গিয়েছে যে, ভারতীয় জনগণ আর ভারতে বিদেশী-সরকারকে চায় না। ভারতের সাম্রাজ্য বজায় রাখতে হলে বৃটিশ সরকারকে সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করতে হয়; ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশের উপরে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' যে মরণজয়ী স্বাধীনতার সংগ্রাম করেন, তাঁদের সেই দেশ-প্রেমের মনোভাব ভারতের তৎকালীন বেতনভুক সৈন্য ও পুলিশ দলের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাইয়ে নৌ-বাহিনী ও বিহারে পুলিশ-বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী

সরকার দেখলেন, তাঁদের ভারত ছাড়তেই হবে। ছাড়তেই যখন হবে, তখন সসম্মানে মহত্ব (?) দেখিয়ে সরে পড়াই ভাল। তা'তে ভারতীয় সংগ্রামী কংগ্রেস নেতাদের অন্তরে একটা প্রীতির ও সদিচ্ছার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সেই প্রীতি ও সদিচ্ছার ফাঁক দিয়ে আবার সময় মত যাতে কখনও ফিরে আসতে পারেন তার জন্য বৃটিশ জাতি ও তাঁদের সরকার একটা 'মতলব' খুঁজছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফল দেখে তাঁরা উৎসাহিতই হলেন। তাঁরা, বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই নির্বাচনের ফলাফলকে একটা প্রকাণ্ড হাতিয়ার হিসাবেই পেলেন। অ-সাম্প্রদায়িক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসের নেতারা, মুসলিম লীগই যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, যা, মুসলিম লীগের নেতারা দাবি করতেন, তা মেনে নিতেন না। ১৯০৬ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো এক সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়েই মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে যে মুসলমান প্রতিনিধিদলটি পৃথক নির্বাচনের দাবি নিয়ে দেখা করেন তাঁদের এক প্রতিনিধি স্থানীয় রাজনীতিক সংস্থা মুসলমানদের মধ্যে গড়ে তোলার অভাবে উপদেশ দেন। তার ফলেই গড়ে ওঠে, "মুসলিম লীগ"। সেদিন ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, সাম্রাজ্য বজায় রাখতে ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ: এখনকার উদ্দেশ্য হল ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ভারতকে দু'ভাগ করে মুসলমান ও অ-মুসলমানের দুটি পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি ও রাষ্ট্র গড়ে দেওয়া। একই দেশের দুই খণ্ডের একটি প্রগতিপন্থী অ-সাম্প্রদায়িক ও অপরটি, প্রগতি বিরোধী সাম্প্রদায়িক। মনোভাব নিয়ে দুইটি রাষ্ট্র পাশাপাশি থাকলে তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকবে এবং সেই বিবাদের ছিদ্র পথ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা আবার এসে "বানরের পিঠে ভাগের" সুযোগ পাবেন? ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয়েছিলও ষড়যন্ত্রের ফলে এবং ক্ষমতা-হস্তান্তর করে চলে যাওয়ার সময় দেশ-বিভাগ করাও একই উদ্দেশ্য সাধনের এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। কংগ্রেস-নেতারা ও আমরা দেশবাসীরাও সেই ষড়যন্ত্রের ফাঁদেই পা' দিলেম। আমরা কেউ-ই প্রতিবাদ করলেম না। নিঃশব্দে কিন্তু অশান্ত মনে সেই ভারত-বিভাগ মেনে নিলেম! মহাত্মা গান্ধীর মৃতদেহের উপর দিয়ে দেশ-বিভাগ হল না। তাঁর জীবিতকালেই ভারত-বিভাগ হল। ভারত বিভাগের পরে যে স্বল্পকাল —প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস কাল তিনি জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর প্রতি-দিনের প্রার্থনান্তিক সান্ধ্য ভাষণে দেশের অবস্থা দেখে তাঁর অন্তরের বেদনা

মূর্ত হয়ে অশ্রুরূপে ঝড়ে পড়েছে ; আর, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, যিনি দৃপ্ত কণ্ঠে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন যে, হাজার হাজার বছর চেষ্টা করলেও দেশ-বিভাগ, তথা পাকিস্তান হবে না, তিনিও দেশ-বিভাগ, তথা পাকিস্তাম মেনে নিলেন। জিন্নাহ সাহেবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মুসলমানদের কাছে সফল হল। সফল হতে নেহরুর ঘোষণা মত হাজার বছর লাগলো না। লাগলো, কিঞ্চিদধিক দেড় বছর।

ভোটের ফলাফলের উপর কূটনীতিক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রই চলে! দেশ-বিভাগের কোন ঘোষণা তখনও হয় না। সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই, 'মুসলিম লীগ' ঘোষণা করেন সম্মুখ সমর। ঐ সম্মুখ সমর কিন্তু বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়। তা' হল প্রধানত হিন্দুর বিরুদ্ধে। কলকাতার রাজপথ হিন্দু-মুসলমানের রক্তে গেল ভেসে। কত বাড়ি ঘর পুড়লো। কত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হল, তার ইয়ত্তা নেই! এই লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড একতরফা হয় নি। প্ল্যানটি ছিল একতরফা করারই কিন্তু অ-সংহত মুসলমান জনতার একাংশের অতি উৎসাহে অসময়ে কাজ আরম্ভ হওয়ায়, হিন্দুরাও সতর্ক হওয়ার সুযোগ পান ; ফলে, উভয় পক্ষেই সমানভাবে দাঙ্গা চলে। কলকাতায় বোধহয় মুসলমানই বেশি নিহত হন। সেই সময়কার দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় স্তম্ভের একটি বাক্য এখনও আমার মনে পড়ে। বাক্যটি ছিল—"লিয়া কত, (লিয়াকত আলি খান) আর দিয়া কত।" মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লিয়াকত আলি খান সাহেব ঐ "ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে" ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট শুক্রবারের জন্য, ঐ দিনটি ধার্য হয়েছিল। কলকাতায় ঐ দিনটি সু-সম্পন্ন করার প্ল্যান করেছিলেন, তৎকালীন মুসলিম লীগের দুর্ধর্ষ নেতা ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরদি সাহেব। তাঁর 'প্ল্যান' ছিল, জুম্মার নমাজের পর, সকালটা নিরুদ্বেগে কাটায় হিন্দুরা যখন আশ্বস্ত হয়ে বিশ্রামসুখে থাকবেন, তখন যুগপৎ হিন্দু বাড়ি আক্রমণ করে সব শেষ করে দেওয়া। উদ্দেশ্য ছিল, ঐ হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা দেখে অহিংস কংগ্রেস নেতারা আঁৎকে উঠবেন এবং দেশ-বিভাগে, তথা, পাকিস্তান—স্বীকারে রাজী হয়ে যাবেন। প্ল্যান-মাফিক কাজ হল না। সকালেই একদল মুসলমান লুঠ-পাট সুরু করে দিল। সেইদিন সকালে আমি আমাদের কংগ্রেসের এবং ব্যবস্থাপক সভার বিরোধীদলের নেতা শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের বাড়িতে যখন ছিলেম, তখন কিরণবাবুর কাছে প্রথমে আমাদের বন্ধু—অনুশীলন সমিতি

নামক বিপ্লবী দলের নেতা শ্রীরবি সেন মহাশয় ফোন করে জানান যে, মাণিকতলায় একটি কবিরাজের দোকান লুঠ হচ্ছে। তার পরেই ফোন করেন জনাব ফজলুল হক সাহেব। তিনি জানান যে, তাঁর বাড়ির সামনের পাইক-পাড়ার রাজবাড়ি লুট হচ্ছে; আর সেই লুটে পুলিশের লোকও অংশ গ্রহণ করছে। সেই খবর দুটি শুনেই আমি আমার "স্যাভয় হোটেল"-এর বাস-স্থানে ফেরার পরই দেখি, 'পূরবী' সিনেমা হাউসের সামনে দাঙ্গা সুরু হল। এই দাঙ্গা কয়েকদিন ধরে চলে। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় "Great killing" অর্থাৎ "প্রকাণ্ড হত্যাকাণ্ড" আখ্যা একে দেয়। কলকাতায় সোহরদ্দি সাহেব ব্যর্থ হলেন; সুতরাং বেপরোয়া সোহরদ্দি সাহেব মোল্লা-অধ্যুষিত সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত নোয়াখালি জেলাকে বেছে নিলেন। সুরু হল সেখানে নারকীয় বীভৎসতা। জমিদার রাজেন রায়ের ছিন্ন মস্তক থালায় সাজিয়ে গুণ্ডারা উপহার দিল, নেতা গোলাম সারওয়ারের কাছে। সেই সময়ে নমিতা নাম্নী একটি নাবালিকা মেয়ের মায়ের সোহরদ্দি সাহেবের উদ্দেশ্যে করুণ এক আবেদন "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়েছিল, দেখেছি। সেই আবেদন, সোহরদ্দি সাহেবের পাষাণ হৃদয় গলাতে পারে নি! আমার প্রাণে কিন্তু সেই আবেদন এমনই নাড়া দিয়েছিল যে, আজও তার দোলা স্তব্ধ হয় নি।

নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডেরই বদলা নিল, হিন্দু-অধ্যুষিত বিহারের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক অংশ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুসলমানদের উপরে। শোনা যায় সেখানে অন্যূন ত্রিশ হাজার মুসলমান শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিচারে নিহত হয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতার নির্মম পাশবিক আঘাতে।

বাংলা থেকে বিহার পর্যন্ত রক্ত আর আগুনের ঢেউ খেলে গেল। কংগ্রেস-নেতারা স্তম্ভিত, হতভম্ব। মুসলিম লীগের শ্রেষ্ঠ নেতা কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ ঘোষণা করলেন—বিশাল ভারতবর্ষ থেকে শুধু একটুকরো বাসভূমি মুসলমানদের জন্য দিলেই চিরশান্তি, পাক-ভারত উপমহাদেশে। শঙ্কিত ও আতঙ্কিত—কংগ্রেস-নেতারা অবশেষে বললেন—তথাস্তু, দেশ-বিভাগই হোক, তবু শান্তি আসুক!

দেশ-বিভাগ হল, কিন্তু শান্তি এল কি? না, আসে নি—আসতে পারে না। মুসলিম লীগের নীতির ভিত্তিই ছিল, হিন্দু বিদ্বেষের উপর। একেবারে 'ফ্যাসিস্ত' নীতি, জাতি-বিদ্বেষের উপর। মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ সাহেব

তারস্বরেই ঘোষণা করেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমান এক রাষ্ট্রে এক পতাকার নিচে বাস করতে পারে না। পাকিস্তানে আজও সেই নীতিই চলছে। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খান এই সেদিনেও বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমান এক সাথে বাস করতে পারে না।..." পাকিস্তানে তাই হিন্দুরা এখনও নিরুদ্বেগে বাস করতে পারছেন না। পাকিস্তান সৃষ্টির দিন থেকে যে বাস্তত্যাগ সুরু হয়েছে, তার শেষ আজও হয় নি। কোনও দিনই হবে কি না তা' ভগবানই জানেন!

রাজনীতিক নেতা হিসাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের এই চিত্র চোখের সামনে দেখেছিলেন। দেখে তিনি তাঁর অতি প্রিয় দেশবাসীকে—ভারতের জনগণকে সতর্কও করেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময়ে। তাঁর কণ্ঠস্বর আকাশপথে ভেসে এসে আছড়ে পড়েছিল ভারত-বাসীর দুয়ারে দুয়ারে। তিনি বলেছিলেন—যুদ্ধে ইংরেজ জিতলেও তাকে ভারত ছেড়ে যেতেই হবে। এবং যাওয়ার আগে তারা দেশ-বিভাগ করে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কিন্তু ভারতবাসী যেন সেই ধাপ্পার ফাঁদে পা না দেন; ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যেতেই হবে—ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে।

নেতাজীর আবেদনে আমরা সাড়া দিই নি—তাঁর কথা আমরা শুনি নি। আরও একজন দেশবরেণ্য অতীতের রাজনীতিক নেতা ও বর্তমান যুগের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিনে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বলেছিলেন যা' তা' তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করছি:

"The old communal division into Hindu and Muslim seems to have hardened into the figure of a permanent political division of the country. It is to be hoped that the Congress and the nation will not accept the settled fact as for ever settled or as anything more than a temporary expedient. For if it lasts, India may be seriously weakened, even crippled, Civil strife may remain always possible, possible even a new invasion and foreign conquest. The partition of the country must go. It is to be hoped by a slackening of tension by a progressive—under-standing of

the need of peace and concord, by the constant necessity of common and concerted action, even of an instrument of Union for that purpose. In this way unity may come about under whatever form—the exact force may have a pragmatic but not a fundamental importance. But by whatever means, the division must and will go. For without it the destiny of India might be seriously impaired and even frustrated. But that must not be."

উপরে উদ্ধৃত শ্রীঅরবিন্দের বাণীর মূল কথাই হল, কংগ্রেস ও জাতি (nation) যেন এই দেশ-বিভাগকে চিরস্থায়ী বলে কিছুতেই না মেনে নেন; ইহাকে যে-কোনভাবেই হোক, রদ করতেই হবে। তার পদ্ধতি হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব সমূলে দূর করতে হবে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা হৃদ্যতার পরিবেশ গড়ে ক্রমশ উভয়কে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে হবে। তাঁর শেষ কথা, যে-ভাবেই হোক, দেশ-বিভাগ রদ করতেই হবে; নচেৎ, ভারতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার—এমন কি, আবার বিদেশী আক্রমণ ও পরাধীনতাও আসতে পারে।

ভারত-বিভাগের পূর্বে নেতাজী যে সতর্কতার বাণী আমাদের জন্য রেডিও-র মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন, তা আমরা শুনি নি। দেশ-বিভাগে সম্মতি আমরা দিয়েছি—সকলে সম্মতি না দিলেও তা' প্রতিরোধ করার জন্য কোন বাধাও আমরা দিই নি। দেশ-বিভাগের পর আজ প্রায় কুড়ি বছর হতে চললো। শ্রীঅরবিন্দের বাণীর প্রতিই বা আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে চলেছি, তা-ও আজ জাতির ও জাতির নেতাদের ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের পথে আমরা এগুতে না পারলে, বিদেশী আক্রমণ ও পরাধীনতার আশঙ্কা আমাদের সামনে আছে। পাকিস্তানের শাসকরা ভারতের সাথে পাকিস্তানের হৃদ্যতার সম্পর্ক কিছুতেই গড়তে দেবেন না। তাঁরা বেশ ভালভাবেই জানেন যে, এই হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠলেই পাকিস্তান টিকবে না। জন্ম যার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উপরে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে। সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও বজায় রাখতে হবে। সেই জন্যই পাকিস্তানে থাকাকালে আমরা সেখানকার হিন্দুরা—যাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়—যখন যৌথ নির্বাচন দাবী করেছিলাম, মুসলিম লীগ সরকার যৌথ-নির্বাচনে

তো রাজী হন-ই নি. উপরন্তু অমুসলমানদের মধ্যে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের (Scheduled Caste) জন্য পৃথক পৃথক গোষ্ঠী-নির্বাচন প্রথা চালু করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তানের মুসলিম লীগপন্থী শাসকগোষ্ঠী তাঁদেরই রাষ্ট্রের নাগরিক—হিন্দুদের মনে করেন, ভারতের প্রতিনিধি! তাই, ভারত-বিদ্বেষ প্রচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সেখানে দেখা দেয় হিন্দু-নিধন বা হিন্দু পীড়ন? এই সত্যটা ভারতের শাসককুল ও ভারতের নাগরিকরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেই পথের সন্ধানও তাঁরা খুঁজে পাবেন। আমার অভিজ্ঞতাতে আমি সারা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি যে, পাক-ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে যদি না ওঠে, তাহলে ভারতের সমূহ বিপদ ঘটবে।

ইংরেজ সেই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশ-বিভাগ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানে পড়েছে, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, খণ্ডিত পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ এবং বাহাবালপুর প্রভৃতি কয়েকটি ভূতপূর্ব রাজন্য-শাসিত দেশীয় রাজ্য; আর পূর্ব-পাকিস্তান পড়েছে, অখণ্ড বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ ও সিলেট জেলা নিয়ে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট আয়তন ও লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৩,৬৪,৭৩৭ বর্গমাইল ও ৭৫,৮৪২,১৬৫ জন। এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের আয়তন সমগ্র পাকিস্তানের আয়তনের মাত্র শতকরা ষোল ভাগ, কিন্তু লোকসংখ্যা ৪,২০,৬৩,০০০ অর্থাৎ জনসংখ্যা এখানে পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে পূর্ব-পাকিস্তানের-ই পাকিস্তান শাসন করা উচিত কিন্তু তা' তো ইসলামিক সংবিধানের মাহাত্ম্যে হতেই পারল ন', বরং পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তানের 'কলোনি' হিসাবেই আজ পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে। এই তথ্যটি জানা থাকলে পাকিস্তানী শাসকদের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়নের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝা সহজ হবে।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান ১,১০০ মাইল। ভারতের উপর দিয়ে ছাড়া এই দুই অংশের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের আর কোন পথ নেই। সমুদ্র পথে যোগাযোগ অনেক সময়-সাপেক্ষ। তা' সত্ত্বেও ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দুই সীমান্তে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজের-ই এটা কূট-কৌশল। বর্তমান ভারতের দুই দিকে যেন দুইটি "হাউইজার" কামান

পেতে রাখা হয়েছে। এর ফলাফল আমরা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সঙ্ঘর্ষের সময়ে মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত কোন সঙ্ঘর্ষ বাধায় নি; তবু পশ্চিমবাংলায় বোমা পড়েছে, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা বোমারু বিমানের সাহায্যে। চীনের সাথে পাকিস্তানী শাসকদের মহরম-মহরম ও মিতালিও ভারতকে সায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই। এ্যাংলো-আমেরিকাও পাকিস্তানকে নানাভাবে মদৎ দিয়ে চলেছেন। উদ্দেশ্য যে সাধু (!) সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এবারে চীন যদি ভারতকে আক্রমণ করে, তাহলে ভারতকে ত্রি-মুখী অর্থাৎ তিন 'ফ্রণ্টে' লড়তে হবে। যুদ্ধ ঘনায়মান হয়ে উঠলে, ইংরেজ-আমেরিকাও হয়তো এগিয়ে আসবেন ভারতকে সাহায্য করার নামে; ফলে, ভিয়েতনামে যেমন আমেরিকা জেঁকে বসেছেন, এখানেও তাঁরা তা-ই করতে পারেন; ফলে, শ্রীঅরবিন্দ যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, অর্থাৎ স্বাধীনতা আবার হারানোর, তা' হওয়ার সম্ভাবনা খুবই আছে বলে আশঙ্কা হয়।

১৯০৬ সালে ইংরেজ সরকার ও ভারতবর্ষের একদল সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, সেই ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি হচ্ছে দেশ-বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি। পাকিস্তান আন্দোলন ও সৃষ্টির নেপথ্যে ছিলেন ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়, আর সামনা-সামনি ছিলেন কায়েদ-ই-আজম মিঃ জিন্নাহ ও তাঁর মুসলিম লীগ দল। জিন্নাহ সাহেবের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অসাধারণ বাগ্মিতা ও যুক্তি-তর্কের ক্ষমতা পাকিস্তান আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিল। তাই তিনি আজ পাকিস্তানের জনক বলে খ্যাত। আন্দোলনের প্রেরণা দিয়েছেন জিন্নাহ সাহেব; তাই তিনি শুধু পাকিস্তানের জনকই নন, আমার মতে তিনি পাকিস্তান-আন্দোলনের এটর্নি জেনারেলও। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ আয়ুব খান হয়েছেন "ফিল্ড মার্শাল"। দেশ-বিভাগের প্রাক্কালে তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান হিসেবে তাঁর অধীনস্থ সৈন্য-সামন্ত দিয়ে দেশত্যাগী হিন্দু-শিখদের যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছিলেন, তা'তে পাকিস্তানের 'ফিল্ড মার্শাল', তিনি যোগ্যতার সাথেই দাবী করতে পারেন। এই দিক দিয়ে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সোহরুদ্দি সাহেবের দানও কম তো নয়-ই, বরং সবচেয়ে বেশি। তিনি যদি কলকাতায় ও নোয়াখালিতে হত্যাকাণ্ড না ঘটাতে পারতেন, তাহলে বিহারেও নির্বিচারে মুসলমান নিধন হত না। এবং এত নিরীহ লোকের জীবন না গেলে, এত রক্ত ও অশ্রুর

বঙ্গা ভারতবর্ষে না বয়ে গেলে কংগ্রেস নেতারা দেশ-বিভাগে কিছুতেই রাজী হতেন না—পাকিস্তানও তাহলে হ'ত না ; সুতরাং সোহরদ্দি সাহেবেরও "ফিল্ড মার্শাল" খেতাব পাওয়ার অবশ্যই যোগ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি পান নি। তাঁর মত শক্তিশালী ও বেপরোয়া রাজনীতিক নেতা আমি দেখি নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দুইজন শক্তিশালী নেতাকে বের করেছিলেন ; উভয়েই ছিলেন মহাশক্তিশালী, কিন্তু বিপরীত মুখী ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের শক্তি প্রয়োগ করেছেন। সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর আপনার বলে কিছুই রাখেন নি—তাঁর দেহ-মন-জীবন পর্যন্ত দেশমাতৃকার চরণ-কমলে নিবেদন করেছিলেন ; আর সোহরদ্দি সাহেব সেই মহান্ দেশকে ভেঙে তাকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে গেলেন। একজন তাঁর শক্তি নিয়োগ করলেন দেশ-গড়ার কাজে, আর অপরজন তাঁর আসুরিকশক্তি প্রয়োগ করলেন দেশের ধ্বংসের কাজে। শক্তিশালী উভয়েই। অস্বীকার করার উপায় কারোর-ই নেই, কিন্তু উভয়ের মত ও পথ বিপরীতমুখী।

এত করে অবশেষে দেশ-বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি হল, কিন্তু সোহরদ্দি সাহেবের নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা অদৃশ্যে বসে হাসছিলেন। যখন বাংলার অঙ্গ কেটে পূর্ব বাংলা (তখনও পূর্ব-পাকিস্তান নাম হয় নি) হল; তখন কিন্তু চেষ্টা সত্বেও সোহরদ্দি সাহেব তার মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারলেন না। হলেন, খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব। সিলেট এসে যোগ দেওয়ায় সিলেটের সদস্যরা ও খণ্ডিত বাংলার এসেম্বলির সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে নাজিমুদ্দিন সাহেবই নেতা নির্বাচিত হলেন।

এটাই হল "পাক-ভারতের রূপরেখা"র পূর্বাভাষ।

প্রথম স্বাধীনতা দিবস

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ। রাতের আঁধার তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। পাখিরা বাসা ছাড়ে নি—বাসাতে থেকেই গুঞ্জন সুরু করেছি। লজ্জা-নম্রা নববধূ যেমন তার সুদীর্ঘ ঘোমটার আড়াল থেকে মিটি-মিটি চান, (উপমাটি কিন্তু অনেককাল আগের দিনের নব-বধূ সম্পর্কে!), পূর্ব দিগন্তে সবিতাও তেমনই, শারদ আকাশের পাতলা শাদা হাল্কা মেঘের ঘোমটার আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারার চেষ্টা করছেন—তাঁর দ্যুতি তখনও ফুটে ওঠে নি—গাঢ় লালিমা কেবল ফুটি-ফুটি করছে। সাধারণত মানুষ এই সময়ে প্রারম্ভিক শীতের নতুন আমেজে সুখ-নিদ্রায় আরাম উপভোগ করতেই অভ্যস্ত কিন্তু আজ অবস্থা বদলে গিয়েছে। সারা শহর (রাজসাহী) জেগে উঠেছে—পাখির কাকলিকে ছাপিয়ে উঠেছে, ঘরে ঘরে মানুষের উৎসবের কল-ধ্বনি। ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে শত শত তরুণ-তরুণী! তাঁদের উল্লাস ও জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছে। মুহুর্মুহু "কায়েদ-ই-আজম জিন্দাবাদ" ও "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" ধ্বনি। হাসি-কান্নার ভরা মন নিয়ে আমিও ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামি। ইংরেজশাসন শেষ হল, তাই মনে আনন্দোল্লাসের হাসি; আর, আমাদের মাতৃভূমি—ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল আমাদের জাগরণের চিন্তা ও নিদ্রার স্বপ্ন সেই ভারতবর্ষ, খণ্ডিত হল, তারই ব্যথার বুকভরা কান্না। এই মনোভাব নিয়ে রাস্তায় বের হই। পথ-পরিক্রমায় দেখি, রাস্তায় রাস্তায় স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তোরণ উঠেছে। ফুলে ও পাতায় তাকে অপরূপ সজ্জায় সাজান হয়েছে—নানা রং-বেরং-এর কাগজের ফুল ও মালা তার গায়ে শোভা পাচ্ছে। সে এক অপূর্ব উৎসবের দৃশ্য। মন ছুটে যেতে চায় উৎসবে মাতোয়ারা ভাই-বোনদের হাতে হাত মিলিয়ে চলতে কিন্তু কোথায় যেন একটু খটকা লাগে—একটু বাধা পাই—অন্তরের অন্তস্তলে যেন একটা কাঁটা বেঁধার ব্যথা ও যাতনা অনুভব করি। এ কী আমার মনের ক্ষুদ্রতা—নীচতা। হয়তো কিছুটা, হয়তো বা অভিমানী মনের একটা নিরর্থক

অহঙ্কার মাত্র। জনতা যে মুহুর্মুহু "পাকিস্তান জিন্দাবাদ"—"কায়েদ-ই-আজম জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, কই আমি তো তাঁদের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে চীৎকার করে ঐ ধ্বনি দিতে পারছি না—কোথায় যেন বিবেক বাধছে। দেশ স্বাধীন হয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হল—আমি সেই স্বাধীন দেশেরই একজন নাগরিক; অথচ সেই দেশেরই জয়ধ্বনি দিতে পারছি না! এ কী কম দুর্ভোগ—কম দুর্ভাগ্য। কে বুঝবে, দগ্ধ এই মরমের ব্যথা? নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ নেতারা হয়তো বোঝেন নি—বুঝলে তাঁরা পরদিনই, ১৫ই আগস্ট তারিখেই খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার উৎসবে মেতে উঠতে পারতেন না। জাঁক-জমকের মধ্যে সেই উৎসব পালন করতে পারতেন না। হয়তো নেতাদের মধ্যে একজন মাত্রই মহা-মানব—মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্মবেদনা বুঝেছিলেন; তাই তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে যখন ভারতেরই স্বাধীনতা উৎসবে কলকাতার রাজপথ জনতরঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি তাঁর বেলেঘাটার ভাঙা অস্থায়ী শিবিরে মৌনাবলম্বন করে উপবাসী হয়ে দিন কাটিয়েছিলেন। সবার অন্তরের ব্যথায়, তাঁর এই অনুভূতি-প্রবণতার জন্যই তিনি তাঁর দেশবাসীর কাছে হতে পেরেছিলেন, 'মহাত্মা'।

যাক, আমি সেদিন উৎসব-মুখর জনতার মধ্যে মিশেও তাঁদের একজন পূর্ণাঙ্গ শরিক হতে পারি নি। এ কথা আজ অকপটে স্বীকার করছি। এখানেই হয়তো আমার মনের ক্ষুদ্রতা—আমার মনের নীচতা! সেদিন মনে পড়েছিল, বাল্যকালে শোনা পদ্মপুরাণের 'মনসা-মঙ্গল' গানের একটি কলি। চাঁদসদাগর মনসা দেবীর ঘোরতর বিরোধী। তিনি মনসা দেবীকে 'দেবী' হিসাবে কিছুতেই স্বীকার করবেন না—তাঁকে পূজো তিনি কিছুতেই করবেন না। মনসা দেবীও না-ছোড়-বান্দা। প্রতিহিংসায় তিনি তাঁকে বশে আনার জন্য সদাগরের "সপ্ত-ডিঙা" সমুদ্রে ডুবিয়েছেন—একের পর এক করে সাতটি পুত্রকে সর্পাঘাতে হত্যা করেছেন—সংসারে কান্নার রোল উঠেছে; তবু—তবু চাঁদ সদাগর অটল-অচল। তিনি কিছুতেই মনসা দেবীকে পূজো করবেন না—তাঁর মুখে পূর্বাপর শুধু একই কথা—"যে হাতে পূজি আমি শিব শূলপাণি, সেই হাতে পূজিব আমি বেঙ-খেকো-কানি।" আমারও তখন মনে হয়েছিল, যে মুখে ভারত-মাতার বন্দনাগান করে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়েছি, যে মুখে স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সেনাপতি নেতাজীর সংগ্রামী বজ্রধ্বনি—

"জয়হিন্দ" (ভারতবর্ষের জয়ধ্বনি) দিয়েছি, সেই মুখেই খণ্ডিত ভারতবর্ষের অংশ নিয়ে গঠিত পাকিস্তানের জয়ধ্বনি দিই কী করে? মন সংশয়-দোলায় দুলেছিল—তখন তা' কাটিয়ে উঠতে পারি নি। এটাকে যদি আমার মনের ক্ষুদ্রতা বলতে হয়, তবে বলুক তা' বিশ্ববাসী-জনে। কোন ক্ষোভ নেই, কোন দুঃখ নেই। সত্যকে সত্য বলেই সেদিনও মেনে নিয়েছিলেম; আর আজ এতদিন পরেও সত্য, চিরদিন সত্য হয়েই আছে—মনের এই দ্বন্দ্বের কোনও মীমাংসার সূত্র আজও খুঁজে পাই নি। এটা শুধু আমারই কথা নয়। আমার মত আরও যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামী সৈনিক, আজও পাকিস্তানে আছেন, তাঁদের কেউ-ই আজ পর্যন্তও পাকিস্তানের জনতার সাথে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারেন নি—"কাশ্মীর আমাদের চাই-ই চাই!" স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের এই মানসিক দ্বন্দ্বের শেষ যে কবে এবং কোথায়, কে জানে?

প্রথম স্বাধীনতা উৎসবের দিনে আমার মনে অত্যন্ত প্রবলভাবেই ঐ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। এটা ছাড়াও আরও একটি ভাব সেদিন আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। সেটা হচ্ছে:—আমি যে একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী সৈনিক এবং আমাদেরই সংগ্রামের ফলেই, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ চলে যেতে বাধ্য হল এবং ইংরেজ গেল বলেই ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়েও, উভয় অংশই আজ স্বাধীন হল; আমার মনে সেদিন সেই অভিমান পুরোমাত্রাতেই ছিল এবং সেই অভিমানী মনের নিরর্থক অভিমান আমার আহত হয়েছিল, যখন দেখে-ছিলেম যে, জনতার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা, তাঁরা যেন আমাকে এড়িয়ে চলতেই চাইছেন। তখন বুঝি নি, কেন তাঁরা আমাকে এড়িয়ে চলতে চান? পরে, পূর্ববঙ্গ পরিষদ মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে জেনেছি যে আমরা, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি, তাঁরা তো 'পাকিস্তান'-এর জন্য সংগ্রাম করি নি, বরং পাকিস্তান-সৃষ্টির পথে বাধাই দিয়েছি। সুতরাং, আমরা বোধ হয় পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু (মুসলমান) সম্প্রদায়ের কাছে করুণারই পাত্র—শ্রদ্ধার পাত্র নই! মনের এইরূপ সংশয়-সঙ্কুল অবস্থায় জনতার মধ্যে থেকেও আমি যেন বিচ্ছিন্ন হয়েই পথ চলতে থাকি।

ক্রমশ আকাশে সূর্য দেখা দেয়—দিন সুরু হয়। দিনের আলোয় দেখি, কোথাও বা গৃহে গৃহে পাকিস্তানের নতুন সৃষ্ট জাতীয় পতাকা সকালবেলার বায়ুহিল্লোলে মৃদু মন্দভাবে হিল্লোলিত হচ্ছে, কোথাও বা সবে মাত্র পতাকা

উত্তোলনের তোড়জোড় চলছে। 'পাকিস্তান' হয়েছে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র। স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি জাতীয় পতাকা অবশ্যই থাকবে। পাকিস্তানেরও জাতীয় পতাকা হয়েছে। সেই পতাকার গোড়ার অংশ, অর্থাৎ যে অংশ পতাকা-দণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। সেই অংশ সাদা। সেই অংশটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতীক; আর, বাকী অংশের রং হল সবুজ এবং তার ওপরে, ইসলামের প্রতীক তারকা ও অর্ধচন্দ্র। সেই অংশটি, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতীক। এই পতাকা পরিকল্পনা নিয়ে কেউ কেউ, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুঃখদুর্দশা দেখে পরবর্তীকালে বলেছেন যে পতাকার পরিকল্পনা ঠিক ঠিকভাবেই করা হয়েছে—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্দেশে দণ্ড ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁদের ও বিশ্ববাসী সকলকে প্রকাশ্যভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন যে ইসলামিক রাষ্ট্র—পাকিস্তান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা কী ও কেমন হবে। যাঁরা পতাকা পরিকল্পনার ঐরূপ ভাষ্য করেন, তাঁদের আমি আর একটি ভাষ্যও (সেটি আমার নিজের) চিন্তা করে দেখতে বলি। সেটি হচ্ছে:—পতাকার ঐ সাদা অংশটি, যা হচ্ছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতীক, সম্পূর্ণ পতাকাটাকেই ধরে রেখেছে—ঐ অংশটি লোপ পেলে পতাকাটাই ভূ-লুণ্ঠিত হবে। আমার কাছে এই ভাষ্যটিই বেশি যুক্তিসহ মনে হয়। পাকিস্তান থেকে এ যাবৎ যত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক দেশ-ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরাই ভারতে এসে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন এখানে উন্নত ধরণের পাট তৈরি করছেন, ভূতপূর্ব পাকিস্তানী কৃষকেরা। তাঁরাই বন-জঙ্গল কেটে পতিত জমিকে শস্যশালিনী করে তুলেছেন—বিভিন্ন ধরণের তরি-তরকারি ফলিয়েছেন। বন ও জলাকে শহরে পরিণত করেছেন। তাঁরা এদিকে চলে আসার ফলে এদিককার উন্নতি যে পরিমাণে হয়েছে, পাকিস্তানের আর্থিক ক্ষতিও সেই পরিমাণই হয়েছে।

যাক, কথা প্রসঙ্গেই এই কথাগুলো অবান্তর হলেও এখানে এসে পড়েছে। আমি যেদিনের কথা বলছিলাম, অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের কথা—সেদিনে কিন্তু আমার মনে এসব কথা ওঠে নি—তখন, ওঠার উপযুক্ত সময়ও আসে নি। পরবর্তী কালের ঘটনাপ্রবাহই এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখেই আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে কলমের খোঁচায় দেশভাগ করলেও হাজার হাজার বছর একই আবহাওয়ায় একত্রে বাসের ফলে মানুষের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও একত্বের লৌহ কাঠামো

গড়ে উঠেছে, তাকে ভাগ করা সহজ তো নয়ই বরং তা' অসাধ্য এবং করতে গেলে ধ্বংসই ডেকে আনে। তাই, আমি মনে করি যে পাক-ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও যে সেই দেশের নাগরিক এই বোধ জাগিয়ে তোলার পূর্ণ সুযোগ দুই দেশেরই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের দেওয়া একান্ত উচিত। কিন্তু দুঃখের সাথে আমি লক্ষ্য করেছি যে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ সেই স্বাধীনতার প্রথম দিনেও যে ব্যর্থতা দেখিয়েছেন, সেই ব্যর্থতার ইতিহাস তাঁদের ১৯৬৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেড়েই গিয়েছে। কর্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাবের প্রতিফলন ব্যাপকভাবে হয়েছে. সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের (মুসলমান-দের) জনতার মধ্যে। স্বাধীনতার প্রথম দিনে আমার প্রতি জনতার যে তাচ্ছিল্যভাব দেখেছিলেম, তা' রাজনীতিক নেতাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের —বিশেষ করে, প্রাক্তন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের প্রতিফল মাত্র। আমার অহমিকায় আঘাত লেগেছিল—আমি, অন্তরে ব্যথা বোধ করেছিলাম ঠিকই কিন্তু তবু জনতার সাথেই এগিয়ে চলি। বেলা বাড়তে থাকে। মফস্বলের দূর-দূরান্তর গ্রামগুলো থেকে ট্রেনে ভর্তি লোক আসতে থাকে। ট্রেনের কামরার ভেতরে তো তিল ধারণের স্থান নেই—কামরার ছাদেও লোক ভর্তি। কারো টিকিট কেনার প্রশ্ন নেই—কেউ টিকিটও কাটে নি, কর্তৃপক্ষও বিনা-টিকিটে সেদিন রেল ভ্রমণে বাধা দেন নি। সেদিন আর রেলের কামরার শ্রেণী বিভাগের কোনই মূল্য ছিল না। বেলা যতই বাড়তে থাকে, সারা শহর ততই লোকে লোকারণ্য—জমজমাট হয়ে উঠে। সারা শহর জুড়ে যেন একটা মেলা জমে উঠেছে—সকলের চোখে মুখে কী আনন্দ—সকলের মনেই কী একটা অনির্বচনীয় আনন্দের যেন ঢেউ খেলে যায়! নানাস্থান থেকে গরীব দুঃখী ভিক্ষুকেরাও এসে ভিড় জমিয়েছে। তাঁদের পরিতোষ সহকারে খাইয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই ছিল। দুপুরে তাঁদের খাওয়ানোও হল। তারা সকলেই পরিতৃপ্ত। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোককেই সেদিন যে দেখেছে, সেই বুঝেছে যে তাদের চোখমুখ দিয়ে মনের আনন্দ যেন উপচে পড়ছে—ফেটে পড়ছে। তাদের আনন্দ একটি চূড়ান্ত বিজয়ের আনন্দ—প্রকাণ্ড বড় একটা যুদ্ধে যেন তারা জয়লাভ করেছে। সত্যিই তো তারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে—তাদের আনন্দের, তাই, যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্যই আছে। তাঁদের নেতা—কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেব এই তো সেদিন মাত্র ১৯৪৬ সালের

নির্বাচনের আগে বলেছিলেন যে মুসলমানগণ যদি তাঁর মুসলিম লীগের প্রার্থীদের ভোট দেয়, তাহলে তিনি তাদের মুসলমানের জন্য পৃথক বাসভূমি পাকিস্তান দেবেন। একটা বছর যেতে না যেতেই তিনি 'পাকিস্তান' দিলেন। এটা কি কম গৌরবের—কম গর্বের কথা। মুসলমান আজ, তাই, বিজয়োল্লাসে মত্ত। আর, অপর দিকে অ-মুসলমানদের অবস্থা কী? তাদের নেতারাও বলেছিলেন, দেশ-বিভাগ কিছুতেই তাঁরা মেনে নেবেন না। নেহরুজী বলে-ছিলেন—হাজার বছর চেষ্টা করলেও 'পাকিস্তান' হবে না। গান্ধীজীও মরেন নি, নেহরুজীরও মত বদলাতে হাজার বছর লাগে নি! মাত্র দেড় বছর সময় তার পরে কেটেছে। এর মধ্যেই 'পাকিস্তান' একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখা দিল! তাই, মুসলমানের মধ্যে যেমন বিজয়ের গর্ব, অ-মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি একটা পরাজয়ের গ্লানি। অ-মুসলমানদের মধ্যে সুখ নেই কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সেদিন ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামেনি কিন্তু অ-মুসলমানরা সকলেই রাস্তায় নেমেছেন। নেমেছেন, প্রাণের ভয়ে—দেশদ্রোহী ব'লে ধিকৃত হওয়ার ভয়ে। মুসলমানের মনে সে ভয় নেই। অ-মুসলমান সদাই আতঙ্কিত। রাস্তায় ও বৈকালিক জনসমাবেশে আজ, তাই, অ-মুসলমানের সংখ্যা অজস্র। তাঁদের চোখে পরাজয়ের গ্লানি, মুখে কিন্তু জোর করে আনা কৃত্রিম হাসি!

অনেক দিন পরের কথা। আজ লিখতে বসে মনে পড়ছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর ধিক্কার। ভারতীয় পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের অনেকের দেশ ত্যাগ ক'রে, চলে আসায় নেহরুজী ধিক্কার দিয়ে তা'তে পরাজিতের মনোভাব বলে বলেছিলেন। পরাজিতের মনোভাব তো নিশ্চয়ই কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানির কালিমা ঐ বাস্তুত্যাগীদের মুখে কে মাখিয়ে দিয়ে-ছিলেন? আমি চোদ্দ বছর পাকিস্তানে থেকে অ-মুসলমানদের মধ্যে এই পরাজিতের মনোভাব যে আরও কতভাবে দেখেছি, তার সম্বন্ধে যথাকালে বলবো। আজকে শুধু প্রথম স্বাধীনতা দিনে রাজসাহীতে অ-মুসলমানদের চোখে-মুখে যা' প্রত্যক্ষ করেছিলেম, তা-ই বললেম। বলতে গিয়ে মনের আবেগ কোথাও কোথাও অবান্তর কথারও উল্লেখ করেছি কিন্তু কথা অবান্তর হলেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। আশা করি, পাঠকরা আমাকে সেজন্য ক্ষমা করবেন।

বিকেলে কলেজ মাঠে জনসভা। মাঠের বিরাট চত্বর লোকে লোকে

সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। কেবল মাথা, আর মাথা—যেন মাথার সমুদ্র। এতবড় বিশাল সভা রাজসাহী শহরে আর কোনও দিন দেখি নি। স্বাধীনতার আগেও না, পরেও আর কোনদিন না। সেই সভায় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। করবেন, জেলা মুসলিম লীগের ও জেলা কংগ্রেসের সভাপতিদ্বয় একসাথে মিলে—যৌথভাবে। তখন জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, মৌলভি আব্দুল হামিদ, এম. এল. এ ও কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, শ্রীক্ষিতীন্দ্রমোহন চৌধুরী। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে প্রথম দিকেই আমাকে তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ৯৮ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে একই দিনে বন্দী ক'রে তৎকালীন সরকার জেলে নেন। তারপরে আমি মুক্তি পাই, ১৯৪৫ সালের শেষাশেষি। আমি জেলে যাওয়ার আগে আমার ও আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণের কর্তৃত্বেই জেলা কংগ্রেস কমিটি ছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর ও আমার সহপাঠী বন্ধু—মৌলভি আস্রাফুদ্দিন চৌধুরীর কর্তৃত্বাধীনে। কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি, নিখিল ভারত কমিটির নির্দেশে বাংলার সুভাষ-পন্থী সব কংগ্রেস কমিটিকে বাতিল ক'রে দিয়ে "এড হক" কমিটি সর্বত্র করেন। রাজসাহীতেও তাই হয়। ১৯৪৭ সালে সেই 'এড হক' কংগ্রেস কমিটিই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন কি না জানি না। জেল থেকে ফিরে এসে দেখি, ক্ষিতীনবাবু জেলা কংগ্রেসের সভাপতি।

মৌলভি হামিদ ও ক্ষিতীনবাবু এগিয়ে যান, পতাকা তুলতে। হামিদ সাহেবের বাবা—হাজি লাল মহম্মদ সাহেবকে আমিই কংগ্রেসে নিয়ে আসি। তিনি কংগ্রেসের অনেক জনসভাতেও বক্তৃতা করেছেন এবং পরে, ১৯১৯ খৃস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের দ্বৈত শাসনব্যবস্থার বাংলা কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। হামিদ সাহেবও ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মুসলিম লীগ-প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হন। তাঁর বড় ছেলেও বর্তমান পাকিস্তানের পার্লামেন্টের সদস্য। এঁরা তিন পুরুষের সংসদ-সদস্য। মানুষ হিসাবে বেশ ভালই কিন্তু মুসলিম লীগের আয়োজিত জনসভায় যখন বক্তৃতা দেন, তখন বোঝা যায় না যে এই হামিদই হিন্দুর সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব রক্ষাকারী সেই হামিদ-ই কি না। রাজনীতি এমনই বিচিত্র! হামিদ কিন্তু আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বরাবরই বড় ভাই-এর সম্মান দিয়েছে। হামিদের সাথে এগিয়ে যান ক্ষিতীন চৌধুরী মশায়। ক্ষিতীনবাবুর সাথে রাজনীতিক্ষেত্রে কখনই

আমার মতের ও পথের মিল হয় নি। তাঁর চরিত্র সব সময়ই আমার কাছে প্রহেলিকাময় মনে হয়েছে। তিনি এগিয়ে যান। হামিদ ও তিনি—দু'জনে পতাকার দড়ি ধরে একসাথে টেনে পতাকা তোলেন। সম্ভবত উভয়েই একটা ক'রে ভাষণও দিয়েছিলেন। কী যে ভাষণ তাঁরা—বিশেষ ক'রে ক্ষিতীনবাবু—দিয়েছিলেন তা' আজ আমার এতদিন পরে মনে নেই। আর তখন আমার মনের অবস্থাও এমন ছিল না যে তাঁদের সারগর্ভ (!) বক্তৃতায় মনোনিবেশ করি। পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, যে সব হিন্দুরা খুব আস্ফালন সহকারে পাকিস্তানের গর্বে গর্ব অনুভব ক'রে বক্তৃতায় জনতার হাততালি কুড়িছেন, তাঁরাই কিন্তু সর্বপ্রথমে দেশত্যাগ ক'রে এদিকে অর্থাৎ ভারতে এসেছেন। ক্ষিতীনবাবু সেদিন কী বলেছিলেন, মনে নেই কিন্তু এটুকু জানি যে তাঁকে বহু আগেই সম্ভবত ১৯৫০ সালে বা তার আগেই দেশত্যাগ ক'রে এদিকে আসতে হয়েছে। অল্প কয়েকদিন আগেই তাঁর সাথে আমার কলকাতার একটি হাসপাতালে দেখা হয়। তাঁর কাছে সেদিন শুনি, তিনি এদিকে একখানি কুটির নির্মাণ করতে পেরেছেন। রাজসাহীতে তাঁর অনেকখানি জায়গার ওপরে দালান বাড়ি ছিল। সে সব ফেলেই তাঁকে চলে আসতে হয়েছে। সেখানে সুখের সংসারই ছিল কিন্তু এখানে তাঁকে নানা ধান্দায় অর্থোপার্জন ক'রে সংসার চালাতে হচ্ছে। পাকিস্তানী হিন্দুর—বিশেষ করে, যে সব হিন্দু রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই আজ ক্ষিতীনবাবুর মতই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা।

পতাকা তোলা হ'ল। মুসলিম লীগের ও কংগ্রেসের সভাপতিদ্বয় মিলিত-ভাবে পতাকা তুললেন। বাংলার অন্যান্য জেলায়ও এই ব্যবস্থাই হয়েছিল কি না, জানি না। রাজসাহীতে কিন্তু এই ব্যবস্থাই দেখেছি। এই ব্যবস্থার পেছনে কর্তৃপক্ষের মনে সেদিন যে মতলবই থেকে থাকুক না কেন—তা' ভালও হতে পারে। আবার মন্দও হতে পারে—আমার মনে কিন্তু এর পেছনের উদ্দেশ্য কু-মতলব বলেই মনে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, কংগ্রেস-সেবীদের গালে যেন চড় মেরে বুঝিয়ে দেওয়া হল—"তোমরা বলেছিলে, পাকিস্তান কিছুতেই হ'তে দেবে না কিন্তু আজ দেখ, তোমাদেরই জেলা-প্রধান আজ পাকিস্তানী পতাকা তুলতে বাধ্য হলেন!" আমি ও আমার কয়েকটি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক বন্ধু একসাথে আমরা পতাকাদণ্ড থেকে দূরে—বহুদূরে সভার এক প্রান্তদেশে বিমর্ষচিত্তে বসেছিলেম। ঐ সব সংগ্রামী বন্ধুদের

মধ্যে সেদিন সেখানে ছিল, শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী, (আমার ছোট ভাই, যাকে প্রায় ১৮ বছরকাল জেলে কাটাতে হয়েছে) শ্রীবীরেশ চক্রবর্তী, ওরফে বীরু মামা (গত বছর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ক্যান্সার রোগে মারা গিয়েছে), শ্রীসুধাংশুমোহন চৌধুরী ওরফে চেরু, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার (বর্তমানে রাজসাহীর প্রসিদ্ধ এডভোকেট), শ্রীকৃষ্ণগোপাল লাহিড়ী (কলকাতায় বর্তমানে এডভোকেট), শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, ওরফে বাগু (পরলোকগত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের ছোট ভাই) প্রমুখ আরও কয়েকজন বন্ধু। একমাত্র শেষোক্ত বন্ধুটি বৃটিশের কারাগারে যান নি কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু রসদই তিনি পেছন থেকে জুগিয়েছেন। তাঁর দানও যে-কোনও সৈনিকের দানের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। তাঁর বাড়িটাই ছিল, আমাদের একটি ঘাটি। বাগুর ভাইপো—শ্রীমান গোরা, (বর্তমানে পরলোকগত) সাধন ও সমর ওরফে ছোট খোকা আমাদের দলেরই সহকর্মী ছিল। আর ঐ সব বন্ধুদের সকলেরই কপালে বহু বছর জেল-বাসের ছাপ আঁকা ছিল। আমরা বসেছিলেম, জন-সমাবেশের এক প্রান্তে অত্যন্ত বিরসবদনে—চিন্তান্বিত মনে। মুখে কারুরই কথা নেই। সকলেই আপন আপন চিন্তায় বিভোর। আমি, আমার নিজের জীবনের অতীত চিন্তায় মগ্ন। মনে হচ্ছিল, অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেমেছিলেম, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ ক'রে। তখন যে বাংলাকে ভাগ করা হয়েছিল, তা'তে তো ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে কোন নতুন রাষ্ট্র হয়েছিল না—ভারতের মধ্যেই হিন্দু-বাংলা ও মুসলমান-বাংলা—এই দুই ভাগে দুইটি পৃথক প্রদেশ হয়েছিল মাত্র। সেই বিভাগের পরিণাম কি হতে পারে সেই চিন্তা করেই নেতারা গড়ে তুলেছিলেন, প্রবল আন্দোলন, আর সব রকমের বৈধ আন্দোলন যখন সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ ও বিধ্বস্ত হয়েছিল, তখন বাংলার তরুণের মুষ্টিমেয় কয়েকজন একহাতে বোমা ও অপর হাতে রিভলভার নিয়ে সংগ্রামের পথে পা বাড়িয়েছিলেন; বঙ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ করেই আমিও ঐরূপ একটি সংগ্রামী গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের—অনুশীলন সমিতির—সদস্য হই। তার পর থেকে দুই দশকের বেশি বছর জেলে কাটিয়েছি, পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধে রাইফেলের গুলীতে আহত হয়েছি, তবু সংগ্রামের পথ ছাড়ি নি। আর, আজ? দেশ ভাগ হ'য়ে ভারত থেকে একটা পৃথক দেশ হ'য়ে গেল—আমি ছিলেম, ভারতের একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী,—ভারতবাসী ব'লে মনে মনে একটা গর্ব আমার ছিল

সেই আমিই আজও থাক্‌লেম কিন্তু আমি আর ভারতবাসী নই—আমার পরিচয় হ'ল, আমি একজন পাকিস্তানী! এই কলঙ্কের—এই কালিমার পসরা মাথা পেতে নিলেম! একটা বোমা কোথাও ফাটলো না—একটা রিভলভারের আওয়াজও কোথাও হল না! মনে মনে প্রশ্ন ওঠে কেন—কেন, এমন হ'ল ? বঙ্গ-ভঙ্গের দিনে নেতারা আন্দোলন গড়েছিলেন—আর, আজকে সর্বভারতীয় অহিংস নেতারা দেশ-বিভাগ—আপোষে মেনে নিয়েছেন এবং দেশকে বলেছেন, মেনে নিতে ; তাই, আজ কোথাও আন্দোলন নেই—সহিংস বিপ্লবীরাও আজ নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় আমি কিন্তু মন তো আমার ঘোরতর অশান্ত। স্বাধীনতার সংগ্রামী আমরা কিন্তু আজ যখন স্বাধীনতা এল, তখন আমাদের মন এত অশান্ত কেন? আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলেম—স্বাধীনতাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেছিলেম ঠিকই, কিন্তু এই স্বাধীনতা—স্বাধীনতার এই রূপ—খণ্ডিত ভারতের এই স্বাধীনতা তো আমরা চেয়েছিলেম না, আমার ও আমার সহকর্মী সংগ্রামী বন্ধু সকলেরই মন, তাই, আজ ভারাক্রান্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট। সভায় সমবেত অ-মুসলমান সম্প্রদায়েরও কারো মনেই শান্তি নেই—সকলেরই মন চিন্তাক্লিষ্ট। তাঁদের সকলের মুখেই একটি প্রশ্নের সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। প্রশ্নটি হচ্ছে :—"আমরা ইসলামিক এই রাষ্ট্রে স-সম্মানে বাস করতে পারবো তো?" সভা শেষ হল। বন্ধুগণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজ নিজ বাসায় গেলেন। আমি একাকী পদ্মা-সৈকতের দিকে চিন্তাক্লিষ্ট মন নিয়ে গিয়ে বসি। কত কথাই মনে আসে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম থেকে একটি চিত্র ও তার নায়ক-নায়িকারা তাঁদের জলন্ত ও জীবন্ত রূপ নিয়ে যেন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠেন—

দেশ বিভাগের পটভূমি

পদ্মা নদীর তীর। আজ নির্জন। প্রতিদিন এখানে লোকে ভর্তি থাকে। কেউ বা করেন পায়চারী, কেউ বা দল-বল সহ এক জায়গায় বসে গুলতানি করেন—আসর জমান আজ এখানে কেউ নেই। সারাদিনের উৎসব-ক্লান্ত মানুষ, জন-সভার শেষে নিজ নিজ গৃহের দিকে ছুটেছেন। এখানে আজ কেউ আসেন নি। আমি একা। অত্যন্ত একা। অন্তরে-বাইরে একা। নদী-সৈকতে গিয়ে বসি। পায়ের পাশে নদী কলতান তুলে বয়ে চলেছে। মৃদু-মন্দ বায়ু-হিল্লোলে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে ও পড়ছে। আমার মনের আজকের প্রতিচ্ছায়া-ই যেন এই নদী! আমার সারা অন্তর জুড়ে আজ কলতান উঠেছে। আনন্দের নয়। সারা অন্তর যেন হাহাকার করে গুমরিয়ে কাঁদছে। অন্তর জুড়ে ভাব-তরঙ্গের ঢেউ উঠছে, পড়ছে ও দূরে সরে যাচ্ছে। ভাবের অন্ত নেই—বিরাম নেই—বিচ্ছেদ নেই। একের পর একটি আসে—আবার পরেরটির জন্য স্থান ছেড়ে দিয়ে সরে যায়। মনের ভাব রূপ নিয়ে আমার চোখের পরদায় ভেসে ওঠে।

প্রথমেই দেখি, বিদেশ থেকে এক একবার আক্রমণকারীর দল আসেন। আসেন আর্যরা, আসেন মোগল, আসেন পাঠান। তাঁরা দেশ জয়ও করেন কিন্তু পরে বহিরাগত আক্রমণকারী আর থাকেন না। এই দেশেরই মানুষের সাথে মিশে যান—হয়ে যান এই দেশেরই একজন। পরস্পরের মধ্যে যে মিলন ঘটে, সেই মিলনের ফলে গড়ে ওঠে এক নতুন সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতি আর্য-অনার্যের, হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত সংস্কৃতি। প্রথমে যে আর্য-অনার্যের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার মূল কথাই ছিল—গ্রহণ, বর্জন নয়। তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য পরস্পর পরস্পরের সাথে লড়াই করেছেন ঠিক কিন্তু যুদ্ধ-শেষে, বিজেতা, জেতাকে সমাজ-দেহে গ্রহণও করেছেন। জেতা, ধনরত্ন লুট-পাট করে চলে যায় নি। সমাজ-দেহে মিশে গিয়েছেন; ফলে, গড়ে উঠেছে তাঁদের নতুন জীবন-দর্শন। সে দর্শন, গ্রহণের দর্শন—বর্জনের নয়। তাই হিন্দু-

দর্শনে আছে আস্তিক্যবাদ, আছে তাতে নাস্তিক্যবাদও। আছেন সেখানে শক্তির উপাসক শাক্ত, আবার, দীনতম সেবকের গৌরব নিয়ে সেখানে আছেন বৈষ্ণবও। সকলেই একই সমাজ-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর্যরা এদেশে আসার আগে যখন এখানে শুধু অনার্যরাই ছিলেন. তখন তাঁদেরও একটা গৌরবোজ্জল শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছিল। সে সভ্যতার ইতিহাস যে কত পুরনো, তা আজও পুরোপুরি নির্ণীত হয় নি তার বহু নিদর্শন বেদ-পুরাণে ও ভূ-গর্ভস্থ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারে ধরা পড়েছে। যতটা ধরা পড়েছে তাতেই পাওয়া যায় তার বয়স খৃষ্টের জন্মের অন্তত তিন হাজার বছর আগে। অনার্য ও আর্যের মিলিত চেষ্টার ফলে, যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তার মূল কথাই হল— 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' (Live and let live) এই সংস্কৃতির সাথে এসে আবার যুক্ত হল, মুসলমানের সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। মোগল-পাঠান এলেন —দেশ জয়ও করলেন, কিন্তু লুণ্ঠন করে তাঁরা চলে গেলেন না। ভারত-দেহেই তাঁরাও বিলীন হয়ে গেলেন। আর্য-অনার্যের গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি আবার নতুন রূপ নিল। গড়ে উঠলো আবার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই হল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এটা শুধু অনার্যের বা আর্যের নয়—এটা শুধু হিন্দুর বা মুসলমানের নয়—এটা হ'ল, একান্তভাবে ভারতের-ই জীবনদর্শনে গড়া নিজস্ব এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি (Synthesis of all cultures of the victors and the vanquished). এই নতুন জীবন-দর্শনে গড়া সংস্কৃতির ছাপ সমাজ দেহের সর্বাঙ্গে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কেউ কাউকে শোষণ করে না—কেউ কাউকে হত্যা ক'রে নিজে বড় হ'তে চায় না; শিক্ষা-সভ্যতাও যেমন, জাতীয় ধন-সম্পদও তেমনই অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে যায়—সমাজ-দেহে একটা গণতান্ত্রিক চেতনাবোধও জেগে ওঠে। শাসনব্যবস্থায়ও গ্রামে ও শহরে দেখা যায় বহু গণতান্ত্রিক সমাজের নিদর্শন। এ সবই মুসলমান সভ্যতা এসে মিলিত হওয়ার আগেকার অবস্থা। মুসলমান শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য যে অত্যাচারী একনায়ক ছিলেন না, তা নয়; তবু, তাঁরা গ্রাম্য ও পৌর সমাজব্যবস্থায় যে স্বায়ত্তশাসন চালু হয়েছিল, তার বিশেষ কোন পরিবর্তন করে নি, তাঁরা বিদেশী শাসকের মত দেশের ধনসম্পদ লুট-পাট ক'রে বিদেশেও পাড়ি দেন নি। তাই, দেশের সম্পদ— ভারতের সম্পদ—পৃথিবীর কাছে বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে উঠেছিল। এই সম্পদের আকর্ষণই ইউরোপ থেকে ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজগণকে

ভারতের দিকে আকর্ষণ করে। তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল; ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা। ব্যবসার অজুহাতে তাঁরা এলেন এদেশে। কেউ বা ব্যবসা সুরু করলেন। ভারত থেকে কাঁচা মাল কম দামে নিয়ে যেতে লাগলেন এবং নিজ নিজ দেশ থেকে সৌখিন দ্রব্যসম্ভার এনে ভারতীয় জনগণের চোখ ঝলসিয়ে দিতে লাগলেন। কেউ বা আবার ব্যবসার সাথে সাথে জল-দস্যুতা ক'রে লুণ্ঠনও সুরু করেন—বিশেষ ক'রে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা। ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজরা ব্যবসায়ের কুঠী-নির্মাণের জন্য আবেদনপত্র নিয়ে নবাব-দরবারে ধর্ণাও দিতে লাগলেন।

আমার চোখে ভেসে ওঠে ইংরেজের সেই দৃশ্য। দেখি, ইংরেজ কুঠীয়াল সাহেব (তখনও তাঁরা কুঠীয়াল) নতজানু হয়ে নবাব-দরবারে গিয়ে জোড়হাতে কলকাতার ভাগীরথীতীরের বন্দরে কুঠী নির্মাণের জন্য একটু স্থান, স্বাধীন ব্যবসায়ের জন্য একটা ছাড়পত্র ভিক্ষা করছেন। ইংরাজের সেই এক অবস্থা। তার পরের অবস্থা দেখি, ইংরেজ কুঠী তৈরী করে সেখানে সৈন্যের তালিম দিচ্ছে—দেশীয় পদস্থ কর্মচারীদের সাথে ষড়যন্ত্র করছে। এ সবই ঘটেছে, বাংলা দেশে। ফরাসীরা দক্ষিণ ভারতে ঘাঁটী করেছেন কিন্তু কূট-কৌশলে ইংরেজের মত জঘন্য নিচতা ও শঠতা দেখাতে পারেন নি। ইংরেজের শঠতা কিন্তু ধরে ফেললেন, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার তৎকালীন নবাব—নবাব সিরাজদ্দৌলা। নবাব বয়সে তরুণ—মাত্র ২২।২৩ বছর বয়স, তাঁর দেশপ্রেম যথেষ্ট ছিল কিন্তু ইংরেজের মত কূট-কৌশলে পারদর্শী ছিলেন না। ইংরেজ লোভের টোপ ফেললেন, নবাব সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে। সিপাহসালার মীরজাফরকে দেখালেন নবাবের গদির লোভ। মীরজাফর জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ মহা মহা রথীরা সেই টোপও গিললেন। ষড়যন্ত্র চললো। ইংরেজ পক্ষে ষড়যন্ত্রের নায়ক হলেন ক্লাইভ—ওয়াটসন প্রমুখ। অবশেষে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর মাঠে নবাব-ফৌজের যুদ্ধের একটা অভিনয় হয়। এখানে শঠতার ও ষড়যন্ত্রের-ই জয় হ'ল—মোহনলাল, মীরমদন প্রমুখের শৌর্যের ও দেশপ্রেমের পরাজয় হ'ল! এই হ'ল ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা।

পরবর্তীকালে আমরা যখন ভারত থেকে বিদেশী ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের চেষ্টা করেছি, তখন ইংরেজ শাসকগণ আমাদের বন্দী ক'রে আইনের বিচারে যে অভিনয় করেছেন, তা' দেখে আমরা মনে মনে হেসেছি। ইংরেজ শাসকগণ

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, আমরা আইনের দ্বারা অর্জিত প্রতিষ্ঠিত সরকারকে অস্ত্রের সাহায্যে উচ্ছেদ করার জন্য 'ষড়যন্ত্র' করেছি। যে বিদেশীরা গদির লোভে দেশের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ক'রে ক্ষমতা-দখল করলেন, তাঁরাই কি না অভিযোগ আনছেন ষড়যন্ত্রের (!), দেশের দেশপ্রেমিক সন্তানদের বিরুদ্ধে যাঁরা পরদেশী শাসন থেকে, দেশকে মুক্ত করতে চান। এও অদৃষ্টের এক নিষ্ঠুর পরিহাস। যা'ক, আজ এই সব কথাই একের পর এক ক'রে চোখের সামনে খেলে যায়। আমি ভাবি, আর ভাবি—আর দেখে যাই।

এখানে ইংরেজের কথাই কেবল বল্‌ছি। অন্যান্য বিদেশীদের কথা পূর্ণাঙ্গভাবে বল্‌তে গেলে, প্রবন্ধের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে তাই, শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত থাক্‌লেম যে, ইংরেজের শঠতার সাথে পাল্লা দিয়ে ফরাসী, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজগণ—কেউই বেশিদূর এগুতে পারেন নি।

পলাশীর মাঠের যুদ্ধ-জয়ের পর থেকেই ক্রমশ ইংরেজের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ এবং তার মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থা করায়ত্ত ক'রে ভারত-জয়ের ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়। ব্যবসায়ীর 'মানদণ্ড'-কে শাসকের 'রাজদণ্ডে' রূপান্তরের কল্পনা ও ষড়যন্ত্র, ভারতে বৃটিশ ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়। ইংরেজ শাসক হ'য়ে ইতিহাসকে নিজ সুবিধামত বিকৃত করেছেন। ইংরেজ ভারত-জয়ের যে কল্পনা করেছেন, তার সার্থক রূপায়ণের জন্য তাঁকে ষড়যন্ত্রের বিস্তীর্ণ জাল সারা ভারতে ফেল্‌তে হয়েছে। ইংরেজের রাজ্য-জয়ের ষড়যন্ত্রের একটা প্রধান অংশই ছেন, ইংরেজ ধর্ম-যাজকগণ। এই ধর্মযাজকদের মাধ্যমেই দেশীয় লোককে ধর্মান্তরিত ক'রে তাদের এতদিনের কৃষ্টি ও সভ্যতা সমূলে ধ্বংস করা এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে বি-জাতীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশ ক'রে, এক সঙ্কর জাতি সৃষ্টি করা ঐ ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য। ইংরেজ ক্রমশ শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপরেও প্রভাব বিস্তার ক'রে সামাজিক স্বায়ত্ত-শাসন, যা এতকাল ধরে গড়ে উঠেছিল, তা'কেও বিকৃত ক'রে তুল্‌তে থাকেন। একদিকে যেমন শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর নিঃশব্দে আঘাত চল্‌লো, অপর দিকে আবার শাসন-ক্ষমতা হাতে পেয়ে শাসনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আইনের নামে লুণ্ঠন সুরু করে দেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের কথা ইতিহাস বিখ্যাত হ'য়ে আছে। খাস ইংলণ্ডেও কিছু সংখ্যক লোক এইসব অরাজক ব্যবস্থার অনেকই সমালোচনা করেছেন।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইভকেও নিজ দেশে এমন সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয় যে লজ্জাহীনেরও লজ্জা হয়—ক্লাইভ ঘৃণা ও লজ্জায় বারংবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

ভারতে যখন ইংরেজ প্রথম ব্যবসায়ীর ভূমিকা নিয়ে আসেন, তখন ভারতীয়েরা তাঁদের জীবন-দর্শনের নীতি অনুসরণ ক'রে ইংরেজকে গ্রহণই করেছিলেন। অতীতেও ভারতীয়রা আরও অনেক বিদেশী-ই দেখেছেন—তাঁরা এসেছেন, দেশ জয়ও করেছেন কিন্তু অবশেষে সেই সব বিদেশীয়রাও তাঁদের মত দেশের মানুষই হ'য়েছেন। ইংরেজ সম্পর্কেও ভারতীয়রা প্রথমত তা-ই ধারণা করেছিলেন। কেউই তাই তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখেন নি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগ্‌লো—ইংরেজ রাজত্ব যতই বেড়ে ও পাকা-পোক্ত হ'য়ে চল্‌লো এবং ইংরেজের দুর্নিবার লোভের লুণ্ঠন যতই বেড়ে চল্‌লো এবং সর্বোপরি, ধর্মযাজকগণের মাধ্যমে ইংরেজ যতই এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হান্‌তে সুরু করলেন, ততই দেশের মানুষ, ইংরেজ আসায় বিপদ কোন্ পর্যায়ে চল্‌তে সুরু করেছে, তা' ক্রমশ বুঝতে আরম্ভ করলেন। ইংরেজ এদেশে বাস করেও এদেশের মানুষ হলেন না—তা'ও তাঁরা দেখ্‌তে ও বুঝতে লাগলেন। ফলে দেখা দিল, লোকের মনে অসন্তোষ। এর ফলেই নানাস্থানে দেখা দেয়, আঞ্চলিক ও স্থানিক বিদ্রোহ। হিন্দুসন্ন্যাসীরা মোহন গিরির ও পরে, ভবানী পাঠকের এবং মুসলমান ফকিরেরা শেখ মজমুর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইংরেজের অরাজক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মুসলমান সম্প্রদায়ের এক উপ-সম্প্রদায় ওয়াহাবিরাও আমীর খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন; উনবিংশ শতাব্দীতেই পাঞ্জাবে গুরু রাম সিং-এর নেতৃত্বে নামধারী শিখ্‌রা বিদ্রোহ ক'রে একটি সমান্তরাল স্বাধীন সরকার চালিয়ে যান। এগুলো সবই ছিল স্থানিক বিদ্রোহ; তবে, এইসব বিদ্রোহের মূলে ছিল কিন্তু গণ-অসন্তোষ। এই বিদ্রোহগুলো সম্পর্কে "পূর্বাভাষে"ই কিছুটা লিখেছি, এখানে তাই, আর তার পুনরুক্তি করলেম না।

এই গণ-অসন্তোষের পটভূমিতেই ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান হয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে বিকৃত ক'রে এ'কে "সিপাহী-বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়ে ঐ গণ-অভ্যুত্থানের গুরুত্বকে খাটো ক'রে দেখাতে চেয়েছেন। আসলে কিন্তু সেটা ছিল ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান,—সেটা ছিল, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম।

সেই সংগ্রামে শুধু সিপাহীরাই ছিলেন না—তা'তে ভারতের নানা স্থানের দেশীয় প্রধান প্রধান হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও অনেক তৎকালীন রাজন্যবর্গও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধে পরাস্ত হন। ইংরেজের উন্নত ধরণের শস্ত্রবলের ও কুট-কৌশলের নিকট প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পরাজয় ঘটে। এই যে সংগ্রাম সুরু হয়েছিল, তা' ঘটেছিল হিন্দু-মুসলমানের সমবেত মিসিত চেষ্টায় এবং দিল্লীর মসনদের এক মুসলমান নবাব বাহাদুরকেই কেন্দ্র ক'রে। সেদিন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিন্তু দেখা দেয় নি। পরবর্তী কালে আমরা দেখেছি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার জন্য গড়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমান শিখ-মাদ্রাজী প্রভৃতি নিয়ে এক সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী—"আজাদ-হিন্দ-ফৌজ"। তাঁরা উজাড় ক'রে বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন। ইতিহাসে সে সংগ্রামের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সেদিন কিন্তু প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে বা নেতাজীর আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি দেখা দেয় নি। আসল কথা, ইংরেজ শাসকগণ যেখানে কল-কাঠি নাড়তে পারেন নি, সেখানে—সাম্প্রদায়িকতা বা আঞ্চলিকতাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে ভারতের অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি।

সিপাহী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের শক্তি ও ব্যাপকতা দেখেই ইংরেজ শাসককুলের টনক নড়ে। তার পরেই তাঁরা ভারতবাসীকে ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র করেন এবং যেহেতু বাংলাই ছিল সব বিদ্রোহগুলোর মূল কর্মস্থল সেহেতু বাঙালীকে ইংরেজ শাসকগণ অ-সামরিক জাতি বলে ঘোষণা করেন। এত সব ব্যবস্থা করেও কিন্তু তাঁরা একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সেই দিন থেকেই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁরা ভেদ-নীতি প্রয়োগের এবং কিভাবে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে সেই চিন্তাই করতে থাকেন। এই চিন্তাই অবশেষে পৃথক নির্বাচন প্রথার উদ্ভাবনে রূপ নেয়। এই প্রথার রূপায়ণের আগেই ভারতের তৎকালীন রাজ-প্রতিনিধি ও গভর্নর-জেনারেল লর্ড কার্জন, বাংলাকে দুর্বল করার জন্যই হিন্দু-বাংলা ও মুসলমান-বাংলা পৃথকভাবে গড়ার জন্য বাংলা বিভাগ করেন কিন্তু বাংলার প্রবীণ নেতারা শাসকের এই বিভাগের পেছনের অভিসন্ধি ধরে ফেলেন। আরম্ভ হয় এর বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বৈধ আন্দোলন। এই বৈধ আন্দোলনকেও নানারূপ আইনের নামে বে-আইনী আইনের মাধ্যমে বন্ধ করেন। এমন কি

দেশ-মাতার বন্দনার মন্ত্র—"বন্দেমাতরম্" ধ্বনিও—বে-আইনী না হলেও জুলুমবাজীতে বন্ধ করেন। এই ব্যবস্থার পটভূমিকাতেই বাংলা দেশে গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠে। বাংলার একদল বে-পরোয়া তরুণ এক হাতে বোমা ও অপর হাতে 'রিভলভার' নিয়ে মরণ-মারণের যজ্ঞে হোতা হয়ে এগিয়ে আসেন। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠেন—প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, সত্যেন বোস, কানাইলাল থেকে এ যুগের শহীদ্ দীনেশ, রামকৃষ্ণ, প্রদ্যোৎ প্রমুখ কত বীরের সৌম্য শান্ত নির্ভীক মূর্তি। প্রদ্যোৎকে দেখেছিলেম, মেদিনীপুর জেলে। যেদিন সে প্রথমে জেলে আসে, সেদিনও দেখেছিলেম ; আবার যেদিন তার ফাঁসী হয় তার পূর্বদিন সন্ধ্যাতেও তাকে দেখেছিলেম। জেলে আসার দিন তার দেহের ওজন ছিল, ১০৭ পাঃ এবং ফাঁসীর আগের দিন তার ওজন হয়, ১৪২ পাউণ্ড, ফাঁসির হুকুমের পরও যে আসামির ওজন বাড়ে, তা' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেখিয়েছেন। জীবনে তাঁরা এমনই বে-পরোয়া ছিলেন—তাঁদের কাছে জীবনটা ছিল—"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা হীন।" এই 'ভাবনাহীন' দামাল ছেলেদের নিয়ে কি করা যায়, সে চিন্তা ইংরেজ শাসকের রাতের ঘুমেও বাধা সৃষ্টি করে। আইনের নিগড়ের পরে নিগড় তৈরী হয়ে চলে কিন্তু বিপ্লববাদ বন্ধ হয় না—তার প্রসারতা বেড়েই চলে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ক'রে চট্টগ্রামকে বৃটিশ কবল-মুক্ত করায় বিপ্লবের নতুন এক জয়যাত্রা সুরু হয়। একদিকে বিপ্লবীরা শাসকের জীবন দুর্বিসহ ও অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। অন্যদিকেও তাঁদের মনে শান্তি নেই। যে ভেদনীতিকে সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান অবলম্বন হিসাবে নিয়ে ভারতের রাজনীতিতে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রচলন তাঁরা করেছিলেন, তারও ফল পুরোপুরি তাঁরা পান নি। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এক আপোষ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সংসদে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দল একযোগে সরকারবিরোধী প্রস্তাব সমর্থন করে চলেন। বাংলায়ও 'দেশবন্ধু'র নেতৃত্বে বাংলার তদানীন্তন সরকার পর্যুদস্ত হ'য়ে পড়েন তার পরে ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের নতুন শাসন সংস্কার ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে প্রদেশে প্রদেশে রূপ নেয়। তখন দেখা যায় কংগ্রেস, ৮ টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে—এমন কি মুসলমান-প্রধান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন। ইংরেজের তূণে যত অস্ত্র ছিল, সব অস্ত্র প্রয়োগ

করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না! এই অবস্থার মধ্যে আসে ইংরেজের জীবন-মরণ সংগ্রাম—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২ সালে নেতাজী, তাঁর আজাদ-হিন্দ-ফৌজ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে ভারত-আক্রমণ করেন; আর ভারতে কংগ্রেস ইংরেজ সরকারকে বলেন—"ভারত ছাড়—ছাড় ভারত।" চতুর্দিকের আক্রমণে ইংরেজ মার খেয়ে ধুঁকছে, এমন সময়ে মিত্রশক্তির আমেরিকা জাপানের হিরোসিমায় ফেল্‌লেন, "এটম বোমা"—শহরকে শহর বিধ্বস্ত হয়ে গেল। জার্মানীও ভেঙে পড়লো। মিত্রপক্ষের জয়ে ইংরেজের জয় হ'ল। এই জয়ের মধ্যেই ইংরেজের পরাজয়ের গ্লানি ফুটে বের হয়—যুদ্ধে জিতেও তাকে ভারত সাম্রাজ্য ছাড়তেই হয়। ভারত সাম্রাজ্য যে ইংরেজকে যুদ্ধ-শেষে হারাতে হবে ইংরেজ তা' আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি দেখে তাঁরা বহু পূর্বেই এটা অনুমান করতে পেরেই ভারতের জাতীয় জীবন-ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচনের বিষবৃক্ষের চারা রোপণ করেছিলেন। এটাই ছিল, ভারতকে শক্তিহীন ও দুর্বল করার প্রথম সোপান মাত্র—শেষ নয়। এখন তাঁরা তাঁদের ঝুলির মধ্যে থেকে শেষ ভেল্কি বের করলেন! পৃথক নির্বাচন-প্রথা চালু করেও যখন দুটি সম্প্রদায়কে পৃথক 'জাতি' (nation)-তে পুরোপুরি রূপান্তরিত করা গেল না। তখন শেষ ভেল্কি হিসাবে ভারতবর্ষকে ভাগ ক'রে দুটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ক'রে দিয়ে দুই অংশে দুটি পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি গড়ার খেল দেখালেন। এই খেল দেখানোর ব্যাপারে জনাব মহম্মদ আলি জিন্নাকে দোসর হিসাবে আগেই ইংরেজ শাসকেরা বেছে নিয়েছিলেন।

কয়েক বছর আগে বিলেতে থাকা থাকাকালে রহমত আলি নামক এক তরুণ ছাত্র প্রথমে 'পাকিস্তান' পরিকল্পনা করেন। তাঁর পরিকল্পনা তিনি জিন্নাহ সাহেবকে বলায় সেদিন কিন্তু জিন্নাহ সাহেব বিদ্রূপের হাসি হেসে পরিকল্পনাটিকে "অবাস্তব" বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই জিন্নাহ সাহেব-ই 'পাকিস্তান' আন্দোলনের পুরোধায় এসে দেশকে ইংরেজ কুট-কৌশলের এক ক্রীড়াভূমি ক'রে রেখে গেলেন। এও এক বিচিত্র ব্যাপার! কিন্তু অতিরিক্ত দাম্ভিক ও আত্মাভিমানী জিন্নাহ-চরিত্র যাঁরা জানেন তাঁরা এর মধ্যে বৈচিত্র্য কিছুই দেখবেন না।

এই সব চিন্তা আমার মনে সেদিন একের পর এক উঠেছিল। সেদিনে ঘটনার নায়করা আমার চোখের সামনে জীবন্ত রূপ নিয়েই যেন দেখা

দিয়েছিল। পদ্মার ধারে বসে এইসব চিন্তাস্রোতে একদম ভেসে চলেছিলেম। পদ্মাতীরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় যে শীত ধরে গিয়েছিল, সে খেয়ালও তখন আমার ছিল না। যখন খেয়াল হল, তখন দেখি রাত ১২টা বেজে গিয়েছে। শহরের রাস্তা-ঘাটও যেন নীরব ও নির্জন হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শহর নিদ্রিত। জেগে আছি শুধু আমি—ঘুম নেই আমার চোখে। আরও হয়তো স্বাধীনতা-সংগ্রামী বন্ধুদের অনেকেই সে রাতে আমার মতই জেগে বসেছিলেন। তাঁদের জীবনের চরম ও পরম ঈপ্সিত স্বাধীনতা আজ এসেছে; তবু তাঁদের চোখে আজ ঘুম নেই! এ যে কতবড় দুঃখ—এ যে কতবড় দুর্ভাগ্য তা' কে বুঝবে? তিনি একমাত্র বুঝবেন, যিনি সমব্যথার ব্যথী—একমাত্র ভুক্তভোগী।

কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশিবিষে দংশেনি যারে?

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল। পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা-দিবসের উদ্‌যাপন বিশেষ জাঁকজমকের মধ্যে হয়ে গেল। রাজসাহীতে থেকে নিজের চোখে যা দেখেছি, পূর্ববঙ্গে (তখনও 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামকরণ হয় নি) বিভিন্ন জেলার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের কাছে শুনেছি, সর্বত্রই রাজসাহীর মতই আড়ম্বরপূর্ণ জাঁমজমকের সাথেই প্রথম স্বাধীনতা দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। ভারতের নেতৃবৃন্দদের কাছে তখনও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিদেশী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রক্তের বিনিময়ে সংগ্রাম করলেন, জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ, ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে রক্ত ও অশ্রুর অর্ঘ্যে স্বাধীনতা-দেবীর যে পূজো সুরু হয়, সে পুজো বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে চলতেই থাকে। তার ছেদ নেই—বিরাম নেই—কত যে তরুণ শহীদ তাঁদের কাঁচা মাথা উপহার দিলেন—কতজন যে তাঁদের বুকের তপ্ত তাজা রক্ত উজাড় করে ঢেলে দিলেন, স্বাধীনতা-দেবীর চরণতলে, তার সম্পূর্ণ পরিমাপ আজও হয় নি; তাই, কোনও কোনও নেতা নিজেদের দুর্বল ও দুর্নীতিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের চরম দুঃখ-দুর্দশার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলেন যে, দেশ উচিত দাম না দিয়েই স্বাধীনতা পেয়েছে এ-জন্যই সেই দাম এখন দিতে হবে। কিন্তু, হিসাব-নিকাশ একদিন অবশ্যই হবে—স্বাধীন ভারতের পূর্ণ ইতিহাসও একদিন লেখা হবে এবং সেই ইতিহাসে, সংগ্রামের ও সংগ্রামীদের বীরত্ব ও ত্যাগের ইতিহাস রক্তের অক্ষরেই লেখা হবে। সেই সত্যিকারের

ইতিহাসে আমাদের লজ্জার কিছু থাকবে না—গৌরবের কথাই তাতে জ্বল জ্বল করবে। আমাদের সেই গৌরবময় ইতিহাসের নায়ক-নায়িকারা সকলেই ছিলেন জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড এক দেশ; এ দেশের অধিবাসী সকলেই সম্মিলিতভাবে এক জাতি (নেশন), এবং স্বাধীন ভারতে সেই দেশের হবে একই জাতীয় পতাকা; সেই সংকল্প নিয়েই তাঁরা সংগ্রাম করেছেন, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু স্বাধীনতা যখন এল তখন দেখা গেল, এক দেশ বিভক্ত হয়ে দুইটি 'দেশ' হল, দুই দেশে দুইটি জাতীয় (নেশন) কৃত্রিমভাবে গড়া হল এবং দুই দেশের দুইটি জাতীয় পতাকাও হল। দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রবক্তা 'মুসলিম লীগ' স্বাধীনতা-হরণকারী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও সংগ্রাম করলেন না; তবু—তবু, কিন্তু, তাঁরা স্বাধীন হলেন, একদিন আগেই—১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালে! এরও পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

বৃটিশের রাজপ্রতিনিধি ও ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টবেটনের ভারতবর্ষ-বিভাগের প্রস্তাব অবশেষে 'কংগ্রেস' ও 'মুসলিম লীগ'-এর নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে রাজী হলেন! নেহরুর 'হাজার বছরের চেষ্টাতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান হবে না' ঘোষণাটি ভারত মহাসাগরের অতল জলে ডুবে গেল! জিন্নাহ সাহেবেরও 'কীটদষ্ট পাকিস্তান তিনি গ্রহণ করবেন না' ঘোষণাটিও আরব সাগরের জলে ভেসে গেল। উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতারাই অবশেষে দেশ-বিভাগ করে খণ্ডিত অংশই গ্রহণ করলেন। তাঁরা একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, দুই দেশেরই সংখ্যালঘুরা; সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথেই সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবেন—উভয় সরকারই, সংখ্যালঘুদের 'জান ও মাল'-এর পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই তাঁদের রক্ষা করবেন। এই চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরদাতা হিসাবে ভারতের পক্ষ থেকে নেহরু-প্যাটেল ও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে, জিন্নাহ ও লিয়াকত আলি সাহেব ছিলেন। একমাত্র গান্ধীজী, দেশ-বিভাগ মেনে নিতে রাজী নন। লর্ড মাউন্টবেটন, গান্ধীজীকে আহ্বান করে তাঁকে দেশ-বিভাগের প্রস্তাব জানান। গান্ধীজী মেনে নিতে রাজী হন না। বড়লাট ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টবেটন, তাঁকে বলেন যে, "কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি (ওয়ার্কিং কমিটি) তো আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। তাঁরা এখন আমার সাথেই আছেন।" গান্ধীজী উত্তরে জানান—"দেশ কিন্তু আমার (গান্ধীজীর) সাথেই আছেন।" গান্ধীজী ঐ

কথা বলেন বটে, কিন্তু দেশ যখন বিভক্ত হতে চলেছে, তখন তিনি তার মোটেই কোনওরূপ বিরোধিতাই করেন নি। দেশকেও ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সংগ্রাম করার জন্য কোনও আহ্বানও করেন নি। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কর্মবীর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর এ এক অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তা! দেশের চেয়ে সেদিন কী তাঁর কাছে ব্যক্তিই বড় হয়েছিল? যে গান্ধীজী তাঁর নীতির জন্য তাঁর জীবনসঙ্গিনী, মাতা কস্তুরবাকেও আশ্রম ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে গান্ধী নীতির জন্য তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও ত্যাগ করেছিলেন, সেই গান্ধীজীই তাঁর রাজনীতিক শিষ্য জহরলাল নেহরুর ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি মোহ-বশেই কী দেশের এত বড় সর্বনাশের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন না? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? হয়তো নব ভারতের ঐতিহাসিকরাই একদিন এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

দেশ বিভাগের প্রস্তাব তো পাকা হয়ে গেল। দুই দেশের নেতাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'জান-মাল' রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ঘোষণার পরও কিন্তু লর্ড মাউন্টবেটন ও তাঁর সরকার মনে করলেন যে, ক্ষুব্ধ জনসাধারণ নিজ নিজ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হয়তো একটা অমানুষিক বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে; তাই, তার প্রতিরোধের জন্য বিভক্ত দেশের দুই সীমান্তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্য পঞ্চাশ হাজার ফৌজের এক বাহিনী গড়ে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে রাখলেন। এই ফৌজের সর্বাধিনায়ক হলেন, মেজর জেনারেল রিজ (Rees) এবং তাঁর সহ অধিনায়ক হিসাবে থাকলেন, ভারতের সীমান্তে ভারতীয় ফৌজের ব্রিগেডিয়র দিগম্বর সিং এবং পাকিস্তান সীমান্তের ভার নিলেন কর্নেল (বর্তমানের ফিল্ড মার্শাল ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট) আয়ুব খাঁ। এই রক্ষকরাই সেদিন ভক্ষক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। প্রাণ ভয়ে পলায়মান ভীত-সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগী জনতা নৃশংসভাবে সেদিন নিহত হয়েছিলেন, উভয় সীমান্তেই। কত লোক যে মরেছেন, তার কোনও হিসাব নেই। লিওনার্ড মোজলের (Leonard Mosley) লিখিত 'The last days of the British Raj' (বৃটিশ রাজত্বের শেষ কয়েকদিন) নামক বইয়ে দেখতে পাই যে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকে নয় মাসের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ হিন্দু শিখ ও মুসলমানকে দেশত্যাগ করতে এবং তাঁদের মধ্যে ছয় লক্ষ লোককে নৃশংসভাবে নিহত হতে হয়েছিল! আর সে কী শুধুই হত্যা! অত্যন্ত জঘন্য

নৃশংসভাবে হত্যা। শিশুদের পা ধরে দেওয়ালে আছড়িয়ে মাথা ভেঙে দেওয়া হয়েছে; স্ত্রীলোক হলে তাঁদের উপর বলাৎকার করে তাঁদের সতীত্ব নাশ করা হয়েছে, তাঁরা বালিকা হলে তাঁদের উপরও বলাৎকার করে তাঁদের স্তন কেটে দেওয়া হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক হলে তাঁদের পেট চিরে দেওয়া হয়েছে! সেদিনের হত্যাকারী ঐ নর-পশুদের বীভৎসতার কাছে পশুত্বও বোধ হয় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এঁরাও কি স্বাধীনতার বলি নয়? ঐ সমস্ত লোক কোনও রাজনীতি করেন নি—কোনও সংগ্রামও করেন নি; তবু, তাঁদের অতি নৃশংসভাবেই নিহত হতে হল। কেন? খণ্ডিত ভারতের আপোষে স্বাধীনতা লাভের জন্য নয় কি? স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করলেও বোধহয় এত লোককে ঐভাবে মরতে হত না; এত লোককে বাস্তত্যাগ করেও পথের ভিখারী হতে হত না! তবু—তবু আজও নেতারা জোর গলায়ই বলেন যে, বিনা রক্তপাতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি! কেউ কেউ আবার বলেন যে, আমরা স্বাধীনতার জন্য উচিত মূল্য দিই নি। এইরূপ উক্তি ধৃষ্টতার চরম নিদর্শন নয় কি? সুধী-সমাজই সে বিচার করে দেখবেন। আমি আমার কথা থেকে দূরে সরে গিয়েছি; যা বলছিলাম, তাতেই আবার ফিরে যাই।

এদিকে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে লর্ড মাউণ্ট-বেটনের ভারত ও পাকিস্তানকে ক্ষমতা হস্তান্তরের তথা স্বাধীনতা দেওয়ার দিনটি ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। প্রথমে ভারত ও পাকিস্তান—উভয় রাষ্ট্রই ঠিক করেছিলেন যে, ১৫ই আগস্ট তারিখেই (১৯৪৭ সালের) উভয় রাষ্ট্রেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। সকালে রাজপ্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টবেটন দিল্লী থেকে করাচীতে গিয়ে পাকিস্তানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেই বিকেলে দিল্লীতে ফিরে এসে ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং তারপর থেকে লর্ড মাউণ্টবেটন উভয় রাষ্ট্রেরই যৌথ বড়লাট (Governor General) হিসাবে অন্তর্বর্তীকাল কাজ চালিয়ে যাবেন। এই ব্যবস্থা কিন্তু শেষে বানচাল হয়ে যায়, জিন্নাহ সাহেবের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে। জিন্নাহ সাহেব মত পাল্টালেন। তিনি দাবি করলেন, পাকিস্তানের বড়লাট হবেন তিনিই। আর কেউ নয়, লর্ড মাউণ্টবেটন তো নয়ই। জিন্নাহ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এখানে ফুটে ওঠে। আচারে-ব্যবহারে পোষাকে-পরিচ্ছদে চেহারায়ও বটে, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি অভিজাত সম্প্রদায়ের ইংরেজের মতই অত্যন্ত দাম্ভিক,

অতিশয় ক্ষমতাপ্রিয় আত্মবিশ্বাসীও বটেন। বিনয় বলে কোন গুণ তাঁর চরিত্রে মোটেই ছিল না। তাঁর নিজের সম্বন্ধে এতই উচ্চ ধারণা এবং নিজের শক্তিতে এতই বিশ্বাস ছিল যে তিনি কখনও কারো কাছে নতী স্বীকার করেন নি। তিনি নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই মনে করতেন তাঁর তুলনায় আর সকলেই ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র। এই আত্মম্ভরিতা—এই অহমিকাবোধই এবং ক্ষমতা-প্রিয়তাই রাজনীতি ক্ষেত্রেও অনেক সময় তাঁকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। মনে পড়ে, ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের নাগপুর কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা। কংগ্রেস নেতা হিসাবে জিন্নাহ সাহেবও সেখানে গিয়েছেন। মঞ্চে বক্তৃতা দিতে উঠে, কথা প্রসঙ্গে তিনি "মৌলানা" মহম্মদ আলি সাহেব সম্বন্ধে বললেন—"মিস্টার মহম্মদ আলি!" আর যায় কোথায়—চতুর্দিকে হৈ হৈ। দাবি উঠলো—"বলুন মৌলানা মহম্মদ আলি!" তিনি কিছুতেই বললেন না—ফলে তাঁর ভাষণও শেষ হতে পারলো না—সেই থেকে তিনি কংগ্রেসই ছাড়লেন। শুধু কংগ্রেসই ছাড়লেন না—দেশও ছেড়ে বিলেতে চলে গেলেন ব্যারিস্টারী করতে। সেখানেও থাকতে পারলেন না, আবারও দেশে ফিরে এসে জাতীয়তাবাদী থেকে একেবারে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হলেন! যে জিন্নাহ সাহেব কোনও দিনই ধর্মের ধারকাছ দিয়ে যান নি, তিনিই হলেন ইসলামের একমাত্র প্রবক্তা! তাঁর যেমন ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ বাগ্মিতা, তেমনি ছিল অনমনীয় ব্যক্তিত্ব—যে ব্যক্তিত্বের কাছে, তাঁর দলের (মুসলিম লীগের) অন্য কেউ-ই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতেন না। এমন কি যে ধন-কুবের পার্শীর একমাত্র দুহিতা মহিলাকে তিনি ভালবেসে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর সাথেও তিনি বনিবনাও রেখে শেষ পর্যন্ত চলতে পারেন নি। তাঁর বুদ্ধি ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে অতি সচেতনাই তাঁকে তাঁর আশে-পাশের লোককে অত্যন্ত ছোট করেই দেখতে সর্বদা সজাগ রেখেছে। এর ফলে, আমার মনে হয় তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রেও সময়ে সময়ে ভুল পথে পদক্ষেপ করেছেন। এই রকম একটি ভুল পথেই তিনি পা দিয়েছিলেন, লর্ড মাউন্ট বেটনকে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে রাখায় সিদ্ধান্তের মত পালটিয়ে। লর্ড মাউন্টবেটন যদি ভারত-পাকিস্তানের যৌথ বড়লাট থাকতেন, তা হলে পাকিস্তানেরই লাভ বেশি হত। ইংরেজের নীতিই ছিল, ভারতবর্ষের বিভাগ করে, 'হিন্দু ভারত' ও 'মুসলমান ভারত'

সৃষ্টি করা। লর্ড মাউণ্টবেটনও সেই নীতিরই ধারক ও বাহকই ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও লর্ড মাউণ্টবেটন পরিবারের প্রতি বিশেষ একটা দুর্বলতা ছিল, যে দুর্বলতার ফলেই কাশ্মীর প্রশ্নকে তিনি ইউ, এন, ও-র (U. N. O) দরবারে, পেশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, লর্ড মাউণ্টবেটনকে যৌথ বড়লাট রাখলে পাকিস্তানের পক্ষে হয়তো কাশ্মীর সম্পর্কে মোটেই কোন ঝামেলা হত না—কাশ্মীর পাকিস্তানেরই হত। কিন্তু তা হল না। জিন্নাহ্ সাহেব নিজেই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উভয় রাষ্ট্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়-সূচী (time table) বানচাল হয়ে গেল। ১৪ই আগস্ট বিকেলে রাজপ্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টবেটনকে করাচীতে গিয়ে জিন্নাহ্ সাহেবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হল এবং সেখানকার উৎসব আয়োজন শেষ করে, লর্ড মাউণ্টবেটন দিল্লীতে ফিরতে পারলেন গভীর রাত্রিতে। ভারতে, তাই ক্ষমতা হস্তান্তর হল, রাত ১টার পরে। দেশীয় মতে সেদিনও ১৪ই আগস্টই হয়, কিন্তু ইংরাজী মতে রাত ১২টার পরেই নতুন দিন সুরু হয়, তাই ইংরাজী মতে সেদিনটা হয়, ১৫ই আগস্ট। এইকারণেই পাকিস্তানের স্বাধীনতার একদিন পরে অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পড়ে।

আগস্ট মাসের সুরু থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হয়। উভয় পাঞ্জাবেই গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড সাথে সাথেই চলতে থাকে। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা থমথমে ভাব সর্বত্রই দেখা দেয়। দেশ বিভাগের এটাই পরিণতি। ভারতবর্ষের একপ্রান্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিহত হলে অপর প্রান্তের বাংলা দেশের মুসলমানও আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের ওপরেও ঐ হত্যার বদলা নেওয়া হতে পারে বলে! পাক-ভারত উভয় রাষ্ট্রেরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেন একে অন্যের পরস্পরের—প্রতিভূ-প্রতিনিধি (hostage)! এক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন বিপন্ন হলে, অপর রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জনগণের দরবারে সেই অপরাধের দায়িত্ব নিতে হয়! প্রাণ দিয়ে সেই অপরাধের (!) প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়! পূর্ব পাঞ্জাব থেকে ট্রেনের মুসলমান যাত্রীদিগকে হত্যা করে কামরার গায়ে লিখে দেওয়া হয়—"পাকিস্তানকে উপহার", পরাদনই পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে অনুরূপই

উপহার (!) আসে ভারতে। এই অবস্থার পরিবেশে লর্ড মাউন্টবেটনের সরকারও যেমন চিন্তিত হয়ে পড়েন, তেমনি চিন্তিত হন—মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির হিন্দুদের কথা চিন্তা করে নোয়াখালির পথে কলকাতায় আসেন। লর্ড মাউন্টবেটন, কলকাতায় অবস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল টুকেরকে পূর্বাঞ্চলে শান্তিরক্ষার জন্ত পশ্চিমাঞ্চলের মত পঞ্চাশ হাজার ফৌজের একটি বাহিনী দিতে চান কিন্তু জেনারেল টুকের তা নিতে রাজী হন না। তিনি মনে মনে ঐ পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র ফৌজি বাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী একজনের একটি বাহিনীর সাহায্য নেওয়ার কল্পনা করেন। সেই একজনের বাহিনীর অধিনায়ক হলেন, মহাত্মা গান্ধী।

এদিকে, প্রতিদিনই পশ্চিমাঞ্চল থেকে হত্যা, আর হত্যা, বীভৎস হত্যার, গৃহ-দাহের নারীহরণের ও লুণ্ঠনের সংবাদ, সংবাদপত্রের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে; আর কলকাতার মুসলমান অধিবাসীদের হৃৎকম্পও ততই বাড়তে থাকে। ১৯৪৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব যে সব মুসলমান সিপাহী দিয়ে কলকাতার পুলিশ বাহিনী ভরে ফেলেছিলেন, তাঁরাও অধিকাংশই পাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রে গিয়েছেন। পদস্থ মুসলমান সরকারী কর্মচারীরাও চলে গিয়েছেন। এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করে কে? তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। সম্ভবত এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল টুকে সাহেবের পরামর্শে বাংলার তদানীন্তন লাট সাহেব (ফ্রেডারিক বারোজ) এক মুসলমান প্রতিনিধিদল নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সাথে দেখা করে তাঁকে স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত কলকাতাতেই থাকতে অনুরোধ করেন। মহাত্মা গান্ধীর কাছে কিন্তু ঐ দেশ বিভাগে অর্জিত স্বাধীনতা দিন মোটেই সুখের দিনরূপে দেখা দেয় নি। তিনি ঐ দিনটিকে শোকের দিনই মনে করেন, কারণ, তিনি সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে সারা জীবনব্যাপী সাধনায় যে নয়া এক বিশ্বসমাজে—যে সমাজে থাকবে না শোষিত ও শোষণকারী, মানুষে মানুষে গড়ে উঠবে একটা প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক—গড়তে চেয়েছিলেন, দেশ বিভাগের ফলে তাঁর সেই সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল! ভারতবর্ষ এক বিরাট দেশ, বহু ভাষার বহু সংস্কৃতির বহু ধর্মের বহু জাতির মহান তীর্থ ও মিলনভূমি এই ভারতবর্ষকেই গান্ধীজী বিশ্বের একটি ছোট সংস্করণ ধরে নিয়ে এখানেই তাঁর সাধনার পরীক্ষাক্ষেত্র হিসাবে নিয়েছিলেন

কিন্তু দেখা গেল, এখানে হিন্দু-মুসলমান এক সাথে বাস করতে পারলেন না—মুসলমানের জন্য আলাদা বাসভূমির দরকার হ'ল! আর, তাঁর রাজনীতিক শিষ্যরা সেই দেশ-বিভাগই মেনে নিলেন! তাঁর সারা জীবনের সাধনা, তাঁর জীবদ্দশাতেই ব্যর্থ হয়ে গেল! তাই, এই দিনটি তাঁর কাছে সুখের দিনরূপে দেখা না দিয়ে, দেখা দিল একটা শোকের দিন হিসাবে। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্মরণ করলেন, ১৯৪৬ সালের নোয়াখালির অত্যাচারপীড়িত দুস্থ হিন্দুদের কথা—তাঁদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি নোয়াখালিতে যাওয়াই স্থির করেছেন কিন্তু গভর্নর বারোজ সাহেব ও মুসলমান প্রতিনিধিদলও নাছোড়বান্দা—তাঁদের সকলেরই বিশেষ অনুরোধ, গান্ধীজীকে কলকাতাতেই থাকতে হবে। গান্ধীজী মুসলমান প্রতিনিধিদের বলেন, এক সর্তে তিনি কলকাতায় থাকতে রাজী আছেন—সেই সর্তটি হচ্ছে নোয়াখালির হিন্দুদের উপর কোনরূপ অত্যাচার হবে না, সেই দায়িত্ব তাঁদের নিতে হবে। প্রতিনিধিদল রাজী হ'য়ে নোয়াখালিতে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে সেখানে শান্তি বজায় রাখার নির্দেশ দেন। নোয়াখালিতে কোনও অশান্তি ঘটে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেন, তার মূল উৎস কোথায় তা' এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। ১৯৪২ সালে ঢাকা জেলে থাকার সময় দেখেছি সেখানে প্রায়ই হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ'ত। দাঙ্গার পরেই, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যখন মহল্লার সর্দারদের ডাকিয়ে দাঙ্গা বন্ধ করতে বল্‌তেন, তখনই দাঙ্গা বন্ধ হ'য়ে যেত। পরবর্তীকালে, ১৯৫০ সালে যখন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু-নিধন চল্‌ছিল তখন, বন্ধু ব্রজমাধব দাস 'এম্‌ এল্‌ এ'র কাছে শুনেছি, সেখানে কিছুই হয় নি, সেখানকার তৎকালীন পুলিশ সাহেব আবদুল্লা সাহেবের জন্য। আবদুল্লা সাহেব না কি জেলার সর্বত্র মুসলমান নেতাদের জানিয়ে দেন যে যদি জেলার কোন স্থানে একটি হিন্দুও নিপীড়িত, নিগৃহীত বা নিহত হয়, তাহলে তার ফল ভোগ করতে হবে মুসলমান নেতাদের। ফলে, সেখানে কোনই অশান্তি হয় নি। স্বাধীন দেশের শাসকেরা এই মূল সূত্রটি মনে রেখে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে, আমার মনে হয়, অনেক অশান্তির হাত থেকেই দেশ রক্ষা পেতে পারে।

গভর্নর বারোজ সাহেবের সাথে মুসলমান প্রতিনিধিদল যখন গান্ধীজীর

সাথে দেখা করেন, তখন জাঁদরেল (!) সুরাবর্দী সাহেব কলকাতায় ছিলেন না। তিনি গিয়েছিলেন করাচীতে জিন্নাহ্ সাহেবের সাথে দেখা ক'রে পূর্ববঙ্গের শাসনক্ষমতার প্রধান অধিকারী হওয়ার তদ্বির করতে। জিন্নাহ্ সাহেব, সুরাবর্দী সাহেবের সাথে দেখাও করেন নি। একনায়ক নেতা ও শাসকরা চিরদিন তা-ই ক'রে থাকেন। শক্তিশালী পরবর্তী নেতাকে আমল দেন না। জিন্নাহ্ সাহেবও ছিলেন রাজনীতিক্ষেত্রে একনায়ক (ডিক্টেটার); আর সুরাবর্দী সাহেবও ছিলেন প্রবল শক্তিশালী নেতা; সুতরাং জিন্নাহ্ সাহেব, সুরাবর্দী সাহেবকে কোন পাত্তাই দেন নি। লিয়াকত আলি সাহেবের কাছে, সুরাবর্দী সাহেব জানেন যে পূর্ববঙ্গের শাসনক্ষমতার অধিকারী হওয়ার তাঁর কোন সম্ভাবনা নেই। সুরাবর্দী সাহেব অদৃষ্টে করাঘাত ক'রে ফিরে আসেন কলকাতায়, গান্ধীজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং গান্ধীজীর সর্তমত তিনি গান্ধীজীর সাথে বেলেঘাটার এক ভাঙা 'প্রাসাদে' আস্তানা নেন। সুরাবর্দী সাহেবের এও এক রূপ। একেবারে সাধু ফকির! বরাবরই তিনি দুর্ধর্ষ সাহসী। এবারে এখানেও তিনি যথেষ্ট সাহসেরই পরিচয় দেন। জনতা তাঁকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এসেছেন—তিনি সাহসের সাথে গান্ধীজীর পক্ষপুটে আচ্ছাদিত হ'য়ে তাঁদের সম্মুখীন হয়েছেন—গান্ধীজী, সুরাবর্দী সাহেবকে আড়াল ক'রে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে জনতার সামনে দাঁড়িয়েছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—ছায়াছবির দৃশ্যের চেয়েও রোমাঞ্চকর। সেই রাতেই, অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব রাত্রিতেই যেন যাদুদণ্ডের স্পর্শে কলকাতার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে গেল—থমথমে ভাব সম্পূর্ণ কেটে গেল। হিন্দু-মুসলমান রাস্তায় রাস্তায় মিলিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, পরস্পর পরস্পরকে আতর মাথালেন, পরস্পর পরস্পরের গায়ে গোলাপজল ছিটালেন। পরদিন উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস কলকাতায় ও সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিপালিত হল।

স্বাধীনতার পরে

বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা দিবস আড়ম্বরপূর্ণ জাঁক-জমকের মধ্যে এল এবং গেল। উৎসবেরও শেষ হল রেখে গেল শুধু অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, আর উত্তেজনা। শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা—জনসাধারণের মনেও বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা! কেন যে এমন হল, সে কথা একটু পরেই বলছি। স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানের ও ভারতের শাসন-ক্ষমতায় যাঁরা এলেন এবং এসে কী বললেন এবং কী করলেন, সেই কথাটাই আগে বলে নিই।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হলেন, কায়েদ-ই-আজম (শ্রেষ্ঠ নেতা। এই উপাধিটি মহাত্মা গান্ধীরই দেওয়া) জনাব মহম্মদ আলি জিন্নাহ। নতুন সংবিধান প্রণেতা বিধানসভার (Constitnent Assembly) ও পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টও তিনিই হলেন। কেন্দ্রীয় বিধানসভার বা সংসদের প্রেসিডেন্টরূপে সর্বসম্মতি নির্বাচিত হওয়ার পরেই তিনি যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন—"আজ থেকে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দুও আর হিন্দু, মুসলমানও আর মুসলমান থাকবেন না—সকলেরই একমাত্র পরিচয় হবে, সকলেই পাকিস্তানী। শাসন-ব্যবস্থায় শাসকের কাছে শাসিতের মধ্যে ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতিগত কোন বৈষম্যই আর থাকবে না।..." এমনি ভাল ভাল কথাই তিনি সেদিন শুনিয়েছিলেন। আমরা যাঁরা পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত, এবং জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেম, তাঁরাও খুবই খুশি হয়েছিলেম। ভেবেছিলেম, এই তো জাতীয়বাদীর কথা। আরও ভেবেছিলেম দেশ-বিভাগের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে একটা আশঙ্কা করেছিলেম, তা বোধহয় সম্পূর্ণ অমূলক! রাষ্ট্র আলাদা হলেও আমরাও হয়তো সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে সমান অধিকার নিয়েই, স্বাধীন দেশের মানুষের মত এক ও অভিন্ন মর্যাদা নিয়েই পাকিস্তানে বাস করতে পারবো! আমাদের ঐ ধারণা যে কতবড় ভুল ছিল, তা আমি পরবর্তীকালে চোদ্দ বছর পাকিস্তানে থেকে প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব

করেছি। এই বিষয় নিয়ে—জিন্নাহ সাহেবের ঐ ঘোষণা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে পরবর্তীকালে অনেক আলোচনা করেছি। পাকিস্তান পার্লামেন্টের ও কনষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বলীর জনৈক প্রবীণ বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে, জিন্নাহ সাহেবের রাজনীতিক জীবন সুরু হয় জাতীয়তাবাদী হিসাবেই এবং পরবর্তীকালে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী রাজনীতিক মতবাদের একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক হলেও তাঁর ভেতরের জাতীয়তাবাদ একেবারে মরে যায় নি—সময়ে সময়ে সেটা বিদ্যুৎ ঝলকের মত এক একবার চমক দিয়ে ওঠে। যেদিন জিন্নাহ সাহেব, ঐ ভাষণ দেন, সেদিন জাতীয়তাবাদের এমনি একটা চমক তাঁর মনে খেলে গিয়েছিল কিন্তু সেটা স্থির থাকতে পারে নি। স্থির থাকতে যে পারে নি, বন্ধুটির মতে, তারও পেছনে নাকি একটি কারণ আছে। মৌলানা সাব্বির হোসেন ছিলেন এক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সাম্প্রদায়িক নেতা। জিন্নাহ সাহেবের ঐ ভাষণের পরে নাকি তিনি ঘোষণা করেন যে জিন্নাহ সাহেব যদি তাঁর ঘোষণা মত কাজ করতে চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি করাচী শহরের রাস্তায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন। তিনি নাকি জিন্নাহ সাহেবের মুসলমানত্বের সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করে প্রচার চালাতে থাকেন, ফলে যে জিন্নাহ সাহেব আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে খাঁটি একজন বিলাতী সাহেবের মতই বরাবর চলতেন তিনি আত্মরক্ষার জন্য—তাঁর প্রভাব যাতে মুসলমান সমাজের মধ্যে ক্ষুণ্ণ না হয় সে জন্য মুসলমানী পোষাক পায়জামা-সেরওয়ানি পরতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাঁকে মসজিদে গিয়ে নামাজও আদায় করতে হয়েছিল! আর একবারও পরে দেখেছি, জিন্নাহ সাহেবের মুসলমানত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে চাপা গুঞ্জন চলতে! সেটা হয়েছিল জিন্নাহ সাহেবের একমাত্র মেয়ে যখন একজন খৃষ্টানকে বিয়ে করেন। এটাই তো স্বাভাবিক। আগুন নিয়ে যাঁরা খেলা করেন, সেই আগুনে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে যে খেলোয়াড়েরও হাত পুড়তে পারে, তা তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের মত অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বাস্তব রাজনীতিক যে কেন সেটা বোঝেন নি, সেইটাই আশ্চর্য। ধর্মকে হাতিয়ার স্বরূপ নিয়ে জিন্নাহ সাহেব সারা ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জেলেছিলেন, সেই আগুনে তাঁরও হাত পোড়াটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। আমার সেই প্রবীণ রাজনীতিক বন্ধুটির উক্তিই যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে কার্যকারণ সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণতিই বলতে

হয়। কিন্তু আমি আমার বন্ধুটির উক্তি পুরোপুরি মেনে নিতে পারি নি। তা মানতে হলে জিন্নাহ সাহেবের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে খাটো করতে হয়। আমি তাঁকে যেমনটি দেখেছি এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে যা জেনেছি তাতে জিন্নাহ সাহেবের বুদ্ধিকে কখনই ছোট ভাবতে পারি নি। আমার মতে, কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেব সেদিন যে ভাষণ সংবিধান-রচয়িতা সংসদে দিয়েছিলেন, সেটার মধ্যে তার আন্তরিকতা ছিল না, ছিল বহির্বিশ্বে প্রচারণা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ঘুম পাড়ান। পাকিস্তানে চৌদ্দ বছর থেকে সেখানে মুসলিম লীগের রাজনীতিকে গভীরভাবে নিরীক্ষা করে যা দেখেছি ও বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যেগুণ্ডা-হাতীর যেমন দুই রকমের দাঁত থাকে—এক ধরণের দাঁত লম্বা হয়ে বাইরে বের হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে স্রেফ শোভাবর্ধনের ও আত্মরক্ষার জন্য; আর দ্বিতীয় ধরণের দাঁত থাকে, মুখের মধ্যে—সেই দাঁত দিয়েই চিবানোর কাজ হয়—পাকিস্তানে মুসলিম লীগের রাজনীতিতেও ঐরূপ দুই রকমের দাঁত আছে। প্রকাশ্য সভায় যে সব ভাল ভাল কথায় ভাষণ দেওয়া হয় সেটা তার শোভাবর্ধনের দাঁত; আর চিবানোর দাঁত থাকে, তার মুখের মধ্যে। সে দাঁতকে পরখ করা যায়, শাসন কর্তৃপক্ষের গোপন নির্দেশের (সারকুলারের) মধ্যে। বাইরের লোকে তাকে দেখতে পান না—কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই তার কাঠিন্য ও কঠোরতা বুঝতে পারেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমার মনে হয়েছে, জনাব জিন্নাহ সাহেবের সংসদের সেই বক্তৃতাও ছিল তাঁর শোভাবর্ধনের দাঁত। আমার দৃষ্টিতে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল, তথা সংবিধান-সংসদের প্রেসিডেণ্ট কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেবের এটাই ছিল আসল স্বরূপ; এই স্বরূপের সুস্পষ্ট ছাপই তিনি রেখে গিয়েছেন মুসলিম লীগের রাজনীতিতে। আজও কিন্তু মার্শাল আয়ুব খানের পরিচালনায় পরিচালিত মুসলিম লীগ সেই নীতিই আরও গভীর হিংস্র ভাবেই চালাচ্ছেন। সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে করবো।

পাকিস্তান সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন, নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক। ইংরেজ আমলে বহুকাল যাবৎ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সংসদের (সেণ্ট্রাল এসেম্বলির) মুসলিম লীগের সদস্য হিসাবে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জিন্নাহ সাহেব মুসলিম লীগের প্রাণস্বরূপ হলে, লিয়াকত আলি সাহেব ছিলেন, তার দেহ। শুনেছি,

লিয়াকত আলি সাহেব যখন বিলেতে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন সেই সময়ই না কি জিন্নাহ্ সাহেব, ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব মানতে না পেরে বিলেতে চলে যান সেখানে থেকে আইনব্যবসা করার জন্য। সেই সময় জনাব লিয়াকত আলি সাহেব যে জিন্না সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁকে বিশেষ অনুরোধে ভারতীয় রাজনীতিতে ফিরে এসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে রাজী করান—এটাই আমি লিয়াকত আলি সাহেবের কাছ থেকেই শুনেছিলেম। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী রূপে রাজসাহীতে এসে আমার সাথে একান্তে আলাপে তিনি এই কথাটি আমাকে বলেছিলেন। আরও তিনি বলেছিলেন যে, জিন্নাহ্ সাহেবের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক হচ্ছে, পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্কের মত। তাই, জিন্নাহ্ রাজনীতির সার্থক রূপায়ণই দেখেছি। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে। লিয়াকত আলি সাহেব ছিলেন কথাবার্তায় অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। জিন্নাহ্ চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু জিন্নাহ্ নীতির তিনি একজন পরিপূর্ণ রূপকার। জিন্নাহ্ নীতিই মুসলিম লীগের রাজনীতি ; আর সে নীতির মূল কেন্দ্রই হল, ভারত বিদ্বেষ। সম্পূর্ণ নাৎসিনীতি। লিয়াকত আলি সাহেব, এই নীতিকে রূপ দেন। এই নীতিরই ফল আজও চলছে কাশ্মীরকে অবলম্বন করে। কাশ্মীরের জন্য তিনি পাকিস্তানের প্রতীক হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন—উদ্যত হস্তের বজ্রমুষ্টি। পাকিস্তানের সর্বত্র রাস্তায় রাস্তায় বাড়িতে দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পেয়েছিল বজ্রমুষ্টির ছবি! আমি দেখেছি, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে জনাব ফিরোজ খান নুন এসেছেন রাজসাহী শহরে। জিন্নাহ্ হলে জনসভা হল। খান সহেব তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণ শেষ করলেন। উদ্যত হস্তের মুষ্টি দেখিয়ে—একেবারে নাৎসী কায়দায়। সেই থেকেই পাকিস্তানে ঐ একই নীতি চলছে। যিনি যখনই গদিতে বসছেন, তিনি তখনই নিজেদের গলদ থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর জন্য কাশ্মীর নিয়ে জিগির তুলছেন। কাশ্মীর সমস্যা যদি কোনও কালে কোন ভাবে মিটেও যায়, আবার আর একটা সমস্যা অবশ্যই সৃষ্টি করতেই হবে। সেটা ত্রিপুরা রাজ্যও হওয়া অসম্ভব নয়। ভারত-বিদ্বেষকে ভিত্তি করেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে এবং সেই পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, ভারত-বিদ্বেষকে আশ্রয় করেই চলতে হবে। জিন্নাহ্ সাহেব পাকিস্তান রাজনীতির জন্ম দেন এই নীতিকেই ভিত্তি করে, এবং লিয়াকত আলি সাহেব, একজন একান্ত বাধ্য ও অনুগত পুত্রের মতই পিতার সেই

নীতিকে রূপ দেন। তবে একথা অবিসম্বাদিতভাবে সকলেই স্বীকার করবেন যে, লিয়াকত আলি খান ছিলেন, পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ রূপকার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী। পাকিস্তানকে তিনি এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরেই গড়তে চেয়েছিলেন। এই গড়ার জন্যই তিনিই পূর্ববঙ্গকে, তথা পূর্ব পাকিস্তানকে সব সময়েই উপনিবেশ হিসেবেই দেখেছিলেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে সেই নীতিই যে একমাত্র সুষ্ঠু নীতি তা তিনি মনে করতেন, ভারত-বিদ্বেষ যে নীতির মূল কথা, সেই নীতির জন্যই ভারতের সাথে পাকিস্তানকে সংঘর্ষের জন্যও সর্বদা প্রস্তুত করে রাখতেই হবে, আর তিনি এটা জানতেন যে, ভারতের সাথে সংঘর্ষ বাধলে, পূর্ববঙ্গকে তথা পূর্ব পাকিস্তানকে কোনও সামরিক কৌশলেই রক্ষা করা সম্ভবপর নয়; তাই তিনি পূর্ববঙ্গকে উপনিবেশ হিসেবেই দেখেছেন এবং পূর্ববঙ্গের অধিবাসীকে তিনি সব সময়েই সন্দেহের চোখেই দেখেছেন এবং তাঁদের মন থেকে তাঁরা যে বাংলার অধিবাসী 'বাঙালী' সে কথাটা যাতে চিরদিনের জন্য মুছে যায় তার জন্য সংবিধান তৈরী হলে তাতে দেখা যায়, 'পূর্ববঙ্গের' পরিবর্তে প্রদেশের নাম হল, 'পূর্ব পাকিস্তান'। এটাও লিয়াকত আলি সাহেবেরই চিন্তাশীল মনের অভিব্যক্তিমাত্র। বিশিষ্ট রাজনীতিকের মতই তাঁর চিন্তাধারা ছিল সুদূর-প্রসারী। এই সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার ফলেই তিনি ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময়ে নিজের জীবনও বিপন্ন করে দিল্লীতে গিয়ে ৮ই এপ্রিল—নেহরু-লিয়াকত চুক্তি সম্পাদন করে আসেন। পাকিস্তানের মন্ত্রী ডাঃ আব্দুল মোতালেক মালিক সাহেব রাজসাহীতে গিয়ে এক জনসভায় নেহরু-লিয়াকত চুক্তির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা এখানে সংক্ষেপে বলছি। রাজসাহীর মুসলিম লীগের জনৈক নেতা নেহরু-লিয়াকত চুক্তিকে একখানি চোথা কাগজ বলে বর্ণনা করলে, ডাঃ মালিক তাঁকে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে বলেন যে, ঐ চোথা কাগজখানি যদি সেদিনে না হত, তাহলে আজ আর পাকিস্তান থাকতো না। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় নেহরু ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রয়োজনবোধে "অন্য পন্থা" অবলম্বন করবেন। সেই অন্য পন্থাটিই হচ্ছে সামরিক আক্রমণ। ভারতের সৈন্যরা সীমান্তে প্রস্তুত হয়ে কেবল আদেশের অপেক্ষা করছেন, এই খবর পেয়েই লিয়াকত আলি সাহেব স্থির করেন যে, তিনি স্বয়ং দিল্লীতে গিয়ে নেহরুকে ধরবেন। লিয়াকত আলি সাহেবের মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক বসে। তিনি তাঁর প্রস্তাব দেন

কিন্তু অপর মন্ত্রীরা সকলেই অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে আপত্তি জানান। দিল্লীতেও তখন পুরোদমে মুসলমান-নিধন চলছিল। সকলেই মনে করেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি সাহেব দিল্লী গেলে তিনিও নিহত হবেন। এসব জেনে শুনেও লিয়াকত আলি সাহেব, তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তিনি নাকি সেদিন বলেছিলেন—"এক দিকে পাকিস্তানের অস্তিত্ব, আর অপর দিকে আমার জীবন! আমার জীবন দিয়েও যদি আমি পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারি, সেই চেষ্টাই আমাকে সর্বাগ্রে করতে হবে।"

তিনি সেদিন কারো কথা শোনেন নি—তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন। যখন তিনি রওনা হন, তখন নাকি এরোড্রামে লিয়াকত আলি সাহেবের স্ত্রী-পুত্ররা কান্না-কাটি করেন—তবু তিনি গেলেন এবং ঐ চুক্তি সম্পাদন করে বিজয়ী বীরের মত আবার করাচীতে ফিরলেন। এই সব কথাগুলো আমার নিজের নয়,—পাকিস্তানেরই তৎকালের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরই। সত্যিই, এমন গভীরভাবে আর কোন প্রধানমন্ত্রীই পাকিস্তানকে নিজের জীবনের চেয়ে বড় করে ভালবাসতে পেরেছিলেন কিনা আমি জানি না! লিয়াকত আলি সাহেবের রাজনীতিক মতবাদের সাথে আমরা কোনও দিনই একমত ছিলেম না, বরং সে মতের বিরোধীই ছিলেম। তাঁর রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীও আমরা সমর্থন করি নি কিন্তু একথা আমি অন্তত অকপটে স্বীকার করি যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের প্রতি তাঁর প্রেম, তাঁর ভালবাসা ছিল সকলের সব সন্দেহের ওপরে। এই দেশপ্রেমের জন্য আমি তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। তিনি আজ সকলের সব শ্রদ্ধা নিন্দার পরপারে; তবু তাঁর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা জানাই। আশা করেছিলেম, তাঁর খণ্ডিত ভারতবর্ষের একাংশের প্রতি এই প্রেমই হয়তো আবার একদিন সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর দ্বারা তা হতে পারলো না। কিন্তু আমি সারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, আবার যদি কোনও নেতা পাকিস্তানে দেখা দেন যাঁর, দেশের প্রতি লিয়াকত আলি সাহেবের মতই প্রেম ও ভালবাসা অফুরন্ত থাকবে, তাহলে তাঁর দেশের স্বার্থেই তিনি ভারত-বিদ্বেষ ত্যাগ করবেন এবং পাক-ভারত উপ-মহাদেশকে এক মহান শক্তিশালী দেশ হিসাবে গড়ে তুলতেই সাহায্য করবেন! এটা আমার সারা অন্তরের শুধু বিশ্বাসই নয়—এটাই আমার অন্তরের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—এটাই ভবিতব্য—এটা হতেই হবে। ব্যতিক্রম নেই; নচেৎ

পাক ভারত উপ-মহাদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তা কখনই হতে পারে না—হবে না।

যাক, কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের হাল লিয়াকত আলি সাহেব শক্ত হাতেই ধরলেন। এদিকে, পূর্ববঙ্গেও অঘটন ঘটে গেল। সুরাবর্দী সাহেবের সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় নাজিমুদ্দিন সাহেব দেশের মধ্যে ছিলেন না। সুরাবর্দী সাহেবই বাংলার মুসলিম লীগের একমাত্র কর্তাব্যক্তি। তিনি নিজের পছন্দ মত তাঁর সমর্থকদের নির্বাচনের প্রার্থী দাঁড় করালেন। তাঁরাই নির্বাচিতও হল। বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবই হলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর ভগবান করেন আর এক। সুরাবর্দী সাহেবের বেলায়ও তাই হল। তিনি জনাব নুরুল আমীন সাহেবকে তাঁর মন্ত্রিসভায় নিলেন না। তাঁকে করে রাখলেন এসেম্বলির স্পীকার। ভগবান ভাবলেন, 'তোমাকে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' স্পীকারের পদে থেকেই নুরুল আমীন সাহেব বাড়তে থাকলেন—তিনি দলের মধ্যেই গোষ্ঠী গড়তে থাকলেন। শক্তিশালী নেতা নুরুল আমীন সাহেবের তৎপরতায় গোষ্ঠীর শক্তি অলক্ষ্যে বাড়তে থাকলো। দেশ-বিভাগের পরে এই শক্তির সাথে এসে যোগ দিলেন, সিলেটের মুসলিম লীগের সদস্যগণ। দেশ-বিভাগের ফলে সিলেট, আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। সিলেটের হিন্দু-মুসলমান বাঙালীরা অসমিয়া অধিবাসীদের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব অদূরদর্শী অসমিয়া নেতাদের চিরকালই চক্ষুশূল ছিল, তাই, তাঁরা দেশ-বিভাগের আগেও সিলেটকে বাংলার মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি উত্থাপন করেন। দাবিতে যখন ফল হয় না, তখন তাঁরা "বাঙ্গাল খেদা" আন্দোলন গড়ে তোলেন। এরই পরিণতি হল, সিলেটের পূর্ববঙ্গভুক্তি। দেশ-বিভাগের সময় সাব্যস্ত হয়েছিল যে সিলেটের অধিবাসীদের গণ-ভোটে ঠিক হবে, সিলেট ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী তখন শ্রীগোপীনাথ বরদলই, আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, শ্রদ্ধেয় শ্রীবসন্তকুমার দাস (বর্তমানে, পরলোকগত)। কথায় আছে, 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা।' সত্যিই কেউ নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করেছেন কি না, কেউ দেখেন নি কিন্তু অসমিয়া নেতা বরদলুই সাহেবের বেলায় দেশবাসী সেই

দৃশ্যই দেখলেন! তিনি সিলেটকে পাকিস্তানে ঢেলে দেওয়ার চক্রান্তেই মেতে উঠলেন। এই সম্বন্ধে আমি একদিন শ্রীবসন্ত দাস মহাশয়কে ঢাকায় বলেছিলেম যে, 'আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকতে সারা ভারত থেকে মুসলিম লীগের জেহাদী ফৌজ-কে প্রচারণার নামে গুণ্ডামি করতে সিলেটে ঢুকতে দিয়েছিলেন কেন? শ্রদ্ধেয় শ্রীকিরণশঙ্কর রায় যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকতেন, তাহলে কিন্তু তিনি কিছুতেই তা দিতেন না এবং গণ-ভোটের ফলও উল্টোই হত।' উত্তরে শ্রীদাশ বলেছিলেন—"আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবরদলুই আমাকে আমার নিজ দায়িত্বে ইচ্ছামত কাজ করতে দেন নি। সেই সময় আমার উচিত ছিল, পদত্যাগ করা কিন্তু তা না করে আমি যে পাপ করেছিলেম, তারই প্রায়শ্চিত্ত আজ করছি, পাকিস্তানে থেকে!" শ্রীদাস চরম মূল্য দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন। সিলেটে যাঁর ৫০ বিঘারও বেশি জমির উপর বিরাট বাড়ি ছিল, তিনি তাঁর পৈত্রিক সেই ভিটাতে দেহত্যাগ করতে পারেন নি। আয়ুবী শাসনের আমলে তাঁকে কলকাতায় এসে জামাই-এর ভাড়াটে বাড়িতে দেহত্যাগ করতে হয়েছে। এর মধ্যে কত বড় যে অন্তর্বেদনা লুকিয়ে আছে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্ত কেউ বুঝবেন না।

আসামের সঙ্কীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক (এটাও এক প্রকারের গণ্ডীবদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া কিছু নয়) নেতাদের দুষ্কর্মের ফলেই সিলেট পাকিস্তানে গিয়েছে। আবার, নাগা-মিজো প্রভৃতি অঞ্চলও ভারতের হাতের বাইরে যাওয়ার উপক্রম করেছে। আজও আসামে বাঙালীদের দুর্ভোগের শেষ হয় নি। জানি না কবে অসমিয়া নেতাদের, তথা, ভারতের উচ্চস্তরের কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে।

যাক, নুরুল আমীন সাহেবের দলের সাথে সিলেটের সদস্যরা মিলিত হওয়ায় তিনিই নেতা নির্বাচিত হলেন এবং পূর্ববঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন। নুরুল আমীন সাহেব ও পূর্ব দিনাজপুরের জনাব হাসান আলি সাহেবও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন। সুরাবর্দী সাহেব তখন, রাজনীতিক দরবেশ হয়ে মহাত্মার পার্শ্বচর রূপে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষা করার কাজে আত্মনিয়োগ করে চললেন।

এইরূপেই পাকিস্তানে ও পূর্ববঙ্গে, স্বাধীনতার পরে প্রথম পর্বের কাজ সুরু হল কিন্তু অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, আর উত্তেজনা পূর্ববঙ্গের প্রতি গ্রামে

গ্রামে ব্যাপকভাবে দেখা দিল। দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা, দেশভিত্তিক সার্বজনীন স্বাধীনতারূপে দেখা দিতে পারলো না। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় মনে করলেন, তাঁরা এক মহৎ বিজয়ের অধিকারী হয়েছেন ; আর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভাবতে লাগলেন, তাঁদের অতি ঘৃণ্য এক পরাজয় হয়েছে! শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিক নেতারাও তাঁদের কথাবর্তার মধ্য দিয়ে এই মনোভাবেরই প্রশ্রয় দিয়ে চললেন। তাঁদের ভাষণের মূল বক্তব্যই হল—শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের শক্তিতেই মুসলমানদের জন্ম বাসভূমি 'পাকিস্তান' অর্জন করেছেন। অ-মুসলমানরা এখানে 'জিম্মি' অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে পবিত্র আমানত! এই 'জিম্মি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যত ভালই হোক না কেন, সাধারণ মুসলমানগণ কিন্তু বুঝলেন যে অ-মুসলমানগণ তাঁদের কাছে 'জীয়ানো' মাছের মতই আমানত! জীয়ানো মাছকে যেমন অমানত রেখে প্রয়োজনবোধে জল থেকে তুলতে, কাটতে ও খেতে পারা যায়, অ-মুসলমান সম্প্রদায়কেও তাই করা চলবে! এটা বিকৃত অর্থ নিশ্চয়ই কিন্তু এই ধারণাই স্বাধীনতার প্রথম পর্বে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মেছিল। আজও যে তা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে তা বলা যায় না ; তবে, সেই ব্যাপকতা আজ আর নেই। সেদিনের এই ব্যাপকতার জন্যই ; প্রত্যেকেই মনে করতেন, আইন-শৃঙ্খলার মালিক তাঁরা নিজেই। কেউ কারো কথাই শোনেন না। দারোগাবাবু, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সাহেবের কথা শোনেন না, দারোগার কথা কনেস্টবল শোনেন না, আবার জনসাধারণের মধ্যে একশ্রেণীর লোক, থানা-পুলিশ-ম্যাজিস্টেট, পুলিশ সাহেব—কাউকেই, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না ; ফলে, সর্বত্রই দেখা দেয়,—অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, আর এর জন্যই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা দেয় ; একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা। অ-মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনা এই ভেবে যে, তাঁরা কি আর এদেশে ধন-প্রাণ নিয়ে নিরাপদে থাকতে পারবেন? উচ্চস্তরের কিছু কিছু লোক, এবং তাঁদের দেখাদেখি, নিম্নস্তরেরও কিছু লোক দেশত্যাগ করতে সুরু করেন। মুসলমানদের মধ্যেও উত্তেজনা ; কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরাই তো এখন দেশের মালিক—হিন্দুরা তো তাঁদের প্রজা! হিন্দু মালিকের সাথে প্রজার যে সম্পর্ক এতদিন তাঁরা ভোগ করে এসেছেন, এবারে তা সুদে-আসলে শোধ করবেন! মুসলমানদের মধ্যে যে ভাল সৎলোক ছিলেন না, তা নয়, বরং ভাল লোকের সংখ্যাই বেশি ছিল কিন্তু

তাঁরাও নিজেদের অক্ষম মনে করতেন; কারণ, গুণ্ডা-শাহীর কাছে সরকারী ওপর ওয়ালারাও—বিশেষ করে, থানা কর্তৃপক্ষ—নতি স্বীকার করে চলেন বা গুণ্ডা দলকেই সাহায্য করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যেখানে শৃঙ্খলা বজায় রেখে ন্যায় বিচার করতে চান, সেখানে তাঁর আদেশও তার অধস্তন কর্মচারীরা শোনেন না।

পূর্বেই বলেছি, ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগের দিন রাতে মহাত্মাজী, তাঁর মানব-প্রেমের যাদুস্পর্শ সাম্প্রদায়িক হিংসা-দ্বেষে জর্জরিত কলকাতার থমথমে বিষাক্ত আবহাওয়া কীভাবে সম্পূর্ণরূপে শূন্যে মিলিয়ে দেন। শুধু মিলিয়েই দেন না, তার জায়গায় পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-সৌহার্দ্য-শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছার এক নতুন ভাবধারার জোয়ারে সারা কলকাতাকে, তথা পশ্চিমবঙ্গকে ভাসিয়ে দেন। আমি তখন পাকিস্তানের রাজসাহী শহরে কলকাতার সে দৃশ্য চোখে দেখি নি; তবে শুনেছি যে, সে দৃশ্য অভিনব ও অবিস্মরণীয়। তাই তো ছিল স্বাভাবিক কিন্তু সেই স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক করে তুলেছিল, মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হিংসা ও জাতিবিদ্বেষ। বাঙালী চিরদিনই স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাধীনতার পূজারী। স্বাধীনতাদেবীর পূজায় তাঁরাই সব চেয়ে বেশি অর্ঘ,বেশি বলি দিয়েছেন, আর স্বাধীনতা যখন তাঁদের দ্বার-প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে তখন কি সেই বাঙালীরা উৎসব-মুখর না হয়ে পারেন? উৎসব-মুখর হওয়াটাই ছিল তাঁদের পক্ষে অতি-স্বাভাবিক কিন্তু মুসলিম লীগের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার আগুন ও যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা সুরাবর্দী সাহেবের অ-মুসলমানের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং ১৯৪৬ সালের হত্যার তাণ্ডব, যার ফলে সোনার বাংলা বাঙালীর প্রাণের দেবতা জননী-জন্মভূমি—বিভক্ত হচ্ছে, তাঁদের মনকে বজ্রকঠিন করে তুলেছিল—তাঁরা প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিলেন, সব অপরাধের এবারে শেষ করে দেওয়া হবে—সুদে-আসলে রক্তের বিনিময়ে। সুরাবর্দী সাহেবও খতম হবেন—সাথে সাথে খতম হবেন, শত শত নিরীহ-নিষ্পাপ মুসলমান জনতাও। কিন্তু তা হল না—বাংলার ও বাঙালীর সৌভাগ্য যে তাঁদের হাত রক্তে কলুষিত হল না। কলুষিত তো হলই না—তার জায়গায় দেখা দিল প্রেমের মিলন—হৃদয়ে হৃদয়ে আন্তরিক কোলাকুলি। এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য মহাত্মা গান্ধীর দান তো আছেই—সেটা সর্বত্রন স্বীকৃত। আমি মনে করি, সুরাবর্দী সাহেবের দানও কম নয়। তিনি যদি সেদিন তাঁর নিজের

মৃত্যু ভয় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে ক্রুদ্ধ জনতার সামনে হাত-জোড় করে না দাঁড়াতেন, তাহলে হয়তো অবস্থার ঐরূপ বৈদ্যুতিক পরিবর্তন সম্ভব হত না মহাত্মাজীর একক প্রচেষ্টায়। সুরাবর্দী সাহেবই ছিলেন, অ-মুসলমান জনতার পয়লা নম্বর শত্রু। সেই শত্রুই আজ তাঁদের সম্মুখে—ইচ্ছা করলেই তাঁরা আজ তাঁকে শেষ করে দিতে পারেন কিন্তু শত্রু আজ আর হিংস্র নয়—পরাজিত ও নতজানু—লোহা পরশমণির সংস্পর্শে সোনা হয়ে গিয়েছে! সুরাবর্দী সাহেবের সেদিনের ভূমিকা আওরঙ্গজেবের অভিনয়কেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুরাবর্দী সাহেব সেদিন যদি অভিনয়ও করে থাকেন (পরবর্তী-কালে তাঁর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে ভারত-বিদ্বেষী জিগির শুনে, আমার মনে হয়, সেদিনের সেটা তাঁর অভিনয়ই ছিল) তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর অভিনয় অতি নিখুঁত ও মনোরমই হয়েছিল। ক্রুদ্ধ জনতা সেদিন শুধু শান্ত হয়েই ক্ষান্ত হন নি, সেদিনে তাঁরা প্রেমের বন্যায় ভেসে গিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, কলকাতার তথা পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজ সেদিনের সেই অঘটন ঘটনের জন্য যেমন মহাত্মাজীকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন, সুরাবর্দী সাহেবকেও তাঁরা তাই করেন। সুরাবর্দী সাহেব দেশ-বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যদি হতে পারতেন, তাহলে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আগেই চলে যেতেন; কিন্তু অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াতো। সুরাবর্দী সাহেব যে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্ব পান নি, সেটা পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদরূপেই দেখা দিয়েছিল।

কলকাতার আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। স্বাধীনতার দিনে সবাই খুশি। মুসলমান খুশি, অ-মুসলমান খুশি, জনতা খুশি, রাজনীতিক নেতারাও খুশি, সরকারের কর্তৃপক্ষ মন্ত্রীরাও খুশি। খুশির বন্যায় কলকাতা "ডুবু ডুবু", বাংলা "ভেসে যায়"। গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অন্তর্বর্তীকালীন ছায়া-মন্ত্রীসভা (Shadow Cabinet) শেষ হয়েছে। তিনি আবার স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গড়েছেন। ছায়া-মন্ত্রীসভাতে থাকা কালেই তিনি তাঁর চরিত্রের সততা ও দৃঢ়তার জন্য বাংলার জন-মনে একটা বিশিষ্ট ছাপ কাটতে পেরেছিলেন। ডঃ ঘোষ, মহান ত্যাগী, নিরলস কর্মী এবং চরিত্রে অত্যন্ত সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠ ও নীতিপরায়ণ। তিনি অকৃতদার; সুতরাং তাঁর অর্থের প্রয়োজন খুব কম।

তাই অর্থের প্রতি তাঁর লোভ বা আকাঙ্ক্ষা নেই। ইংরেজ আমলে তিনি ট্যাকশালে যে চাকুরী পেয়েছিলেন, তাঁর আগে আর কোনও ভারতবাসীই তা পান নি; তবু তিনি দেশের ডাকে—মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সে চাকুরী ছেড়ে নেমে পড়েন। এহেন ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লেগে তাঁর কর্মশক্তি যেন চতুর্গুণ বেড়ে গিয়েছে। দিবা-রাত্রি তিনিও তাঁর মন্ত্রীসভার সকল সদস্যই, খেটে চলেন দেশ থেকে ইংরেজ-আমলের সকল দুর্নীতি সমূলে উচ্ছেদ করবেন। গান্ধীজীর স্পর্শে কলকাতার রাজনীতিক আবহাওয়া বদলে যাওয়ায় তিনি খুশি মনেই তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শের পথে এগিয়ে চলেন। অতিরিক্ত উৎসাহ ভরে এই এগিয়ে যাওয়াই কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়। সে কথা পরে যথাসময়ে বলবো। এখন শুধু এইটুকু বললেই বোধ হয় তাঁর চারিত্রিক রূপরেখা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হবে যে তিনি তাঁর নীতিকেই করেছিলেন তাঁর জীবন-বেদ। তার ফলে, তাঁকে কিছু কিছু লোকের কাছে অপ্রিয় হতে হয়েছে। এই অপ্রিয় হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আমার শোনা একটা গল্প বলি। তাতেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে। গল্পটি শোনা আমার আর একজন শ্রেষ্ঠ মহাশয়ের কাছে। ডঃ ঘোষ, তখন 'অভয় আশ্রম' ছেড়ে 'খাদি প্রতিষ্ঠানে' এসেছেন। সতীশবাবু ও প্রফুল্লবাবু গিয়েছেন পাবনায় খদ্দর ফিরি করে বিক্রি করতে। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে তাঁদের সাথে দেখা হয় পাবনার উকিলসভার এক সদস্যের সাথে। ঐ সদস্যটি ছিলেন, প্রফুল্লবাবুর ছাত্র-জীবনের সহপাঠী বন্ধু। বহুকাল পরে দু' বন্ধুর মিলন। বন্ধুটি দুই নেতাকেই তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। সতীশবাবু তো নিরামিশাষী—কিন্তু প্রফুল্লবাবু তা তো নন-ই বরং বড় বড় কই মাছের প্রতি—বিশেষ করে সেই কই মাছের সরিষাবাটা দিয়ে পাতুরির প্রতি তাঁর একটা আসক্তি বরাবরই ছিল। ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রফুল্লবাবুর জন্যে সেই কই মাছই সেইভাবে রাঁধা হয়েছে। উকিলবাবুর স্ত্রী পরিবেশন করছেন। প্রফুল্লবাবু মাছটি খেয়ে খুব প্রশংসায় মুখর হয়েছেন। মেয়েরা তাঁদের মাতৃজনোচিত স্বভাবের জন্যই সম্ভবত যে জিনিষটার প্রশংসা হয়, সেই জিনিষটাই আবারও দিয়ে থাকেন। মহিলাটি ত' মাছের প্রশংসা শুনে আবার মাছ নিয়ে এসে দিতে উদ্যতা হয়েছেন। প্রফুল্লবাবু নিষেধ করা সত্ত্বেও মহিলাটি আবারও যখন আর একটা মাছ প্রফুল্লবাবুর পাতে দিয়েছেন তখনই

না কি প্রফুল্লবাবু একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তড়াক করে আসনের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। সতীশবাবু তো কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক, উকিলবাবু অবাক ও লজ্জিত, আর মহিলাটি তো সমধিক লজ্জিতা! প্রফুল্লবাবুকে আমি বহুদিন হতে বিশেষ-ভাবে জানি বলেই, ঘটনার গল্পটি আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। প্রফুল্লবাবুর চরিত্রের বহু গুণের মধ্যে এ-ও একটা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য! সমস্ত মহৎ লোকেরই না কি কিছু কিছু খেয়ালও থাকে। প্রফুল্লবাবুরও আছে। তিনি ঘোরতর নীতিনিষ্ঠ। তাঁর জীবন-নীতির একটুও ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। হলেই তিনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে তীক্ষ্ণতাও যথেষ্টই আছে। প্রফুল্লবাবুর চরিত্রে এই তীক্ষ্ণতা কী করে এসেছিল, তা আমি জানি না; তবে, চরিত্রের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে আর একজন শ্রদ্ধেয় নেতার একটি উক্তি এখানে নিবেদন করছি। ১৯৩২ সালে। আমি মেদিনীপুর জেলের ২০ ডিগ্রির একটি 'সেলে' আছি। কুমিল্লার তৎকালীন নেতা শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার মহাশয় এসে আমার পাশের 'সেলেই' জায়গা নেন। দু'জনের মধ্যে রোজ নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও হয়। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বসন্তদা বলেন,—"বিয়ে করলে মানুষের কর্মশক্তিও বাড়ে এবং মেজাজের তীক্ষ্ণতাও কমে যায়। সুভাষবাবু যদি বিয়ে করতেন, তাহলে তাঁর কর্মশক্তি আরও বেড়ে যেত এবং এখন তাঁর মেজাজে যে তীক্ষ্ণতা দেখা যায় তা-ও কমে যেত।" এটা অবশ্য আমার কথা নয়—বসন্তদার অভিমত। আর একজন বাংলার প্রসিদ্ধ নেতা—বগুড়ার শ্রদ্ধেয় শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় (যতীনদা) ১৯৩৫ সালে দমদম জেলে আসন্ন মুক্তিমুখী কয়েকটি তরুণ বন্ধুর বিদায়-অভিনন্দন সভায় বলেছিলেন যে—"ভাই সব, তোমরা স্বদেশী কর, আর যাই কর, আমার কথা আগে বিয়ে করো। তারপরে কাজ…। আমি বিয়ে না করে আজ অভাব বোধ করছি। কিন্তু সময় আর নেই—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।…" তিনিই বা এই যুক্তি কেন দিয়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। প্রফুল্লবাবুর মেজাজের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে কথা-প্রসঙ্গে এই অভিমত দু'টি এখানে তুলে ধরেছি দেখে কেউ যেন মনে না করেন যে, শ্রদ্ধেয় নেতা প্রফুল্লবাবুকে লোকচক্ষে ছোট করার জন্য আমি এই কথাগুলো বলছি। মোটেই তা সত্য নয়; বরং প্রফুল্লবাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা তাঁর অতি-অনুরাগী কোন বন্ধুর চেয়েই কম নয়, যদিও আমি রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর সব কাজ সব সময়ে সমর্থন করতে পারি নি। এক সঙ্গে আমরা—

আমি ও প্রফুল্লবাবু বেশ কিছুকাল খাদি প্রতিষ্ঠানে ছিলেম। ১৯২১ সাল থেকে একসাথে প্রাদেশিক কংগ্রেসেও ছিলেম। পরস্পরকে পরস্পর বেশ ভালভাবেই জানি। এই জানার ফলেই দেখেছি সময়ে সময়ে তাঁর মেজাজের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণতা। এই তীক্ষ্ণতা আরও একবার দেখেছিলেম। রাজসাহী শহরে। আচার্য পি সি রায় মহাশয়কে নিয়ে প্রফুল্লবাবু ও আমি গিয়েছি রাজসাহীতে। রাজসাহীর তৎকালীন নেতা শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মৈত্র (বর্তমানে পরলোকগত) মহাশয়ের বাড়িতে আমরা উঠেছি। কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা অনেকেই এসেছেন, আচার্যদেবকে একবার ছাত্রদের 'কমন-রুমে' নিয়ে গিয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্র মৈত্র মহাশয় আসেন নি। ডঃ ঘোষ তাতে আচার্য রায় মহাশয়ের প্রতি অসম্মান করা হয়েছে বোধ করে মনে মনে অত্যন্ত আহত বোধ করেছেন এবং তাঁর সমস্ত রাগের তীক্ষ্ণতা তিনি ছাত্রদের ওপর ঝেড়ে দেন। ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্র তীব্র ভর্ৎসনায় কেঁদে ফেলে। এবং আচার্য পি সি রায় মহাশয়-ই পরে ছেলেটিকে কোলের মধ্যে নিয়ে শান্ত করেন এবং কলেজের 'কমন-রুমে' যান ও ভাষণ দেন। এক অকৃতদার নেতা ছেলেটিকে কাঁদালেন, আর এক অকৃতদার মহান নেতা ক্রন্দনরত ছেলেটিকে শান্ত করলেন। এই দেখে স্বভাবতই মনে হবে যে বিয়ে না-করা সম্পর্কে দুই নেতার যে অভিমত ওপরে তুলে ধরেছি, তা তাহলে ঠিক নয়। ঐ অভিমত ঠিক, কি বে-ঠিক সে সম্বন্ধে আমার কোন নিজস্ব মতামত দিতে চাই না; তবে একটা কথা শুধু এখানে জানিয়ে রাখতে চাই যে আচার্য পি সি রায়েরও বহু খেয়ালই ছিল এবং তাঁর মেজাজ কখন কেমন তা বোঝাও শক্ত ছিল।

যাক, আমার দৃষ্টিতে প্রফুল্লবাবুকে আমি যেমন দেখেছি, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক কথাই বলে ফেলেছি। জানি না, কথাগুলো অবান্তর হয়েছে কি না, অথবা তা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর কারণ হয়েছে কি না। হয়ে থাকলে পাঠকদের কাছে মার্জনা চাই।

এখানে আরও একটি কথা বলতে চাই। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের নব রূপায়ণে যে সব কংগ্রেসী রাজনীতিতে প্রথম দীক্ষা নেন, অর্থাৎ যাঁরা তার আগে কোনও দিন সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন নি, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই দেখেছি এমন একটা অহমিকা বোধ আছে যাকে ইংরাজিতে

বলা হয় Superioirity Complex যাতে তারা মনে করেন যে তাঁরাই একমাত্র লোক যাঁরা এবং তাঁদেরই প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠানের যা দেশের স্বাধীনতা এনেছেন আর সকলে অথবা কংগ্রেসের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠানভুক্ত যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউ কিছু নন—স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদের যে বিশেষ দান আছে, তা ঐসব গান্ধী-সেবক কংগ্রেসীরা ভাবতে যেন একটু কুণ্ঠা বোধ করেন। পাকিস্তানে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যেও এই একই মনোভাব দেখেছি। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় অবশ্য এই শ্রেণীর মধ্যে পড়েন না, বা তাঁর পড়া উচিত নয়; কারণ ছাত্র-জীবনেই তিনি রাজনীতিক দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তবু কিন্তু গান্ধীবাদে দীক্ষা নেওয়ার ফলে তাঁর পরিপূর্ণভাবে মগজ ধোলাই-এর (brain wash) পরে তাঁর মধ্যেও অল্প-বিস্তর ঐ ভাবটা এসে গিয়েছে। তার ফলে; তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, কট্টর নীতিনিষ্ঠতা সততা প্রভৃতি বহু গুণ সত্বেও রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি কিছু শত্রুও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সততার অভিযান সৃষ্টি করে, বড় ব্যবসায়ী মহলে প্রবল শত্রু; আর ঐ শত্রুদের সাথে হাত মেলায় তাঁর রাজনীতিক ক্ষেত্রের শত্রুরা, যার ফলে তিনি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কিঞ্চিদধিক ছয় মাসের মধ্যেই। প্রফুল্ল-বাবুর পরাজয়ে সেদিন সততারই পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু যতদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, স্বাধীনতার প্রথমদিন থেকে—ততদিন তিনি অত্যন্ত খুশি মনেই অক্লান্তভাবে কাজ করে গিয়েছেন। গান্ধীজীর যাদুস্পর্শ স্বাধীনতার প্রথম উৎসবে যে প্রেমের—যে মিলনের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে নিয়েছিল—সেই বন্যার জোয়ার সেই দেশের মুখ্যমন্ত্রীর ও তাঁর মন্ত্রীসভার গায়েও যে লাগবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী? লেগেছিলও। সবাই সেদিন খুশিতে ভরপুর।

কলকাতা, তথা পশ্চিমবঙ্গ সেদিন খুশিতে ভরপুর হলেও কিন্তু ভারতের রাজধানী দিল্লীতে তা হয় নি। সেখানে বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। লিওনার্ড মোস্‌লে (Leonard Mosley) তাঁর বিখ্যাত 'ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ কয়দিন' The last days of the British Raj পুস্তকে ঐদিনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তারই ভাবটা এখানে তুলে ধরেছি। দিল্লী-সংসদের সদস্যগণ ইস্তিরি করা ধুতি বা পায়জামা পরে মাথায় গান্ধী টুপি দিয়ে সন্ধ্যা হতে না হতেই সকলে সেজে একত্রিত

হয়েছেন। তাঁরা মধ্যরাত্রির অপেক্ষায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। মধ্যরাত্রি এলেই এতদিনের ব্রিটিশ-পতাকা নেমে পড়বে, সেখানে স-গৌরবে উঠবে স্বাধীন-ভারতের জাতীয় পতাকা। ওঃ, সে কী মধুর ক্ষণ! এতদিনে তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হতে চলেছে। অবশেষে, সেই স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতার জন্য কত লোক প্রাণ দিয়েছেন, কত লোক জেলে গিয়েছেন, কত লোক সর্বস্বহারা হয়েছেন, সেই স্বাধীনতা আসছে! খুশিতে আজ তাঁদের মন ভরপুর। কিন্তু নেতাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। কেউ বা খুশি, কেউ বা বিষাদক্লিষ্ট। নেহরুর দুধে-আলতা গোলা রং-এর মুখখানি যেন শুকিয়ে ঝুলে পড়েছে, তাঁর চোখের কোণে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে, তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। প্যাটেল, যেন রোমের বাদশাহের মত বিজয়-পতাকা উড়িয়ে স-গৌরবে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন। রাজাগোপালাচারীর মন যেন খুশিতে একেবারে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়েছেন। রাজকুমারী অমৃত কাউর তো কাঁদছেনই। একমাত্র অতি বিষাদখিন্ন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল জনতার মুখের মধ্যে দেখা যায় না। একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত পাহাড়ের মত অথবা একটা বাজ-পড়া প্রকাণ্ড মহীরূহের মত তিনি সর্ব সৌন্দর্যহারা হয়ে যেন জনতা থেকে দূরে ছিটকে পড়েছেন! তাঁর কাছে আজকের এই দিনটি জীবনের সবচেয়ে বড় শোকের দিন রূপে দেখা দিয়েছে।

নেতাদের মধ্যে এই বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া কেন হল, সেই প্রশ্নটার-ই একটু বিশ্লেষণ দরকার আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, বিচার করে আমি যা বুঝেছি, তা-ই এখানে নিবেদন করছি।

যে নেহরুকে আমরা দেখেছি যে তিনি সারাজীবন দৌড়-ঝাঁপ করে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন, কখনও তাতে পরিশ্রান্ত হন নি, যে নেহরু সম্পর্কে তদানীন্তনকালের ইংরেজ পরিচালিত 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল যে ১৯৩৭ সালের নতুন সংবিধান অনুসারে সাধারণ নির্বাচনে নেহরু তিন মাসকাল সারা ভারতবর্ষময় চরকির মত ঘুরে বক্তৃতা করেছেন—কখনও ট্রেনে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও বা পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছেন—ঐ তিন মাসকালের প্রতিদিন গড়ে তিনি তেরটি (১৩) সভায় বক্তৃতা করেছেন, তবু তাঁর শরীরে ক্লান্তি আসে নি,

সেই নেহরুরই আজ এত ক্লান্তি কেন? ১৯৩৭ থেকে আজ ১৯৪৭ সাল। মাত্র এই দশ বছরের মধ্যে নেহরুজী কি বুড়ো হয়ে গেলেন, এত শ্রম-কাতর হয়ে পড়লেন? না,—তিনি বুড়োও হন নি, তিনি শ্রম-কাতরও হন নি। তবে? কারণ অনুসন্ধান করতে হলে নেহরু-চরিত্রের বিশ্লেষণ দরকার (আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমার বিচার এখানে তুলে ধরছি)। নেহরু অত্যন্ত সাহসী, স্বাধীনতার সংগ্রামী জনতার বীর সেনাপতি, শত যুদ্ধের অক্লান্ত সৈনিক, অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে বলীয়ান নেতা, আজ স্বাধীনতা যখন দ্বারপ্রান্তে তখন তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত! এ ক্লান্তি তো পরিশ্রমের ক্লান্তি নয়—এ অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসাদ, ক্লান্তি। নেহরুর মধ্যে দুইটি মানুষ অনবরত সংগ্রাম করে চলেন। একটি মানুষ হলেন—কবি, দার্শনিক, সু-পণ্ডিত, সু-লেখক, অক্লান্ত কর্মী, বীর সেনাপতি! তাঁর মধ্যে আছে দার্শনিকের সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যদ্দৃষ্টি; আর, অপর মানুষটি হলেন—অত্যন্ত ভাব-প্রবণ। তাঁর ভেতরের এই কবি-সুলভ ভাব-প্রবণতাই তাঁকে সময় সময় অস্থির ও চপলমতি করে তোলে। এই শেষের মানুষটিই তাঁকে প্রতি পদে বাস্তবধর্মী হতে বাধা দেয়—কাল যা বলেছেন, আজই তার বিপরীত কথা বলতে বাধ্য করে। তিনি তাঁর বিচারবুদ্ধিতে সমাজতন্ত্রবাদকেই ভারতের সব সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু ভাব প্রবণ মানুষটি সামনে এসে তাঁর চলার পথ রোধ করে দাঁড়ায়! তিনি বাস্তবধর্মী আপোষহীন সংগ্রামী রাজনীতিক নেতা সুভাষচন্দ্রের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ পিতার বিরুদ্ধেও যুক্তির শাণিত অস্ত্র ধারণ করেন, আবার পর-মুহূর্তেই আপোষকামী মহাত্মা গান্ধীর কাছে মাথা নত করেন, সুভাষচন্দ্র যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তৎকালীন ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারত-আক্রমণ করেন, তখন আমরা দেখেছি, জহরলাল নেহরু কলকাতায় এসে দৃপ্তকণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি, আবার সেই নেহরুকে দেখেছি 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতেও! তাঁর জীবনে চিন্তায় এই দ্বৈরথ-সংগ্রাম আমরা বহুবারই লক্ষ্য করেছি। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-নিধন ও হিন্দুদের প্রাণভয়ে দলে দলে বাস্তুত্যাগ ক'রে ভারতে আসতে দেখে তিনি পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রোষে ফেটে পড়েন এবং দৃপ্তকণ্ঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অন্য পন্থা' (other method) গ্রহণের হুমকি দেন কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার দেখেছি, রাণাঘাট স্টেশনে এসে বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে উপস্থিত হ'য়ে একটি

বাস্তুত্যাগী মহিলার অক্ষত কানে একটি সোনার 'দুল' ঝুলতে দেখে, মুহূর্ত-মধ্যে পূর্ববঙ্গে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের ওপর অনুষ্ঠিত সব অত্যাচার-উৎপীড়ন নস্যাৎ ক'রে দিয়েছেন। নেহরুজীর মধ্যে এইরূপ অসামঞ্জস্য কথা, কথা ও কাজ আরও বহু—বহুবার দেখেছি। ক্রমশ সেসব কথাও 'পাক-ভারতের রূপরেখা'য় এসে পড়বে। সে সব ক্রমশ বলবো। এখন শুধু এই টুকুই বলছি যে নেহরুজীর ভেতরে আজ যে ক্লান্তি দেখা যাচ্ছে, তা ঐ দ্বৈরথ-সংগ্রামের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফল। ১৯৪৬ সালেই লক্ষ্ণৌ শহরে এক জনসভায় নেহরুজী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে মুসলিম লীগ হাজার বছর চেষ্টা করলেও 'পাকিস্তান' কায়েম কিছুতেই হবে না কিন্তু আজ, মাত্র ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট! এর মধ্যেই সেই নেহরুজীই 'পাকিস্তান' মেনে নিয়ে ভারতবর্ষ ভাগ করলেন! নেহরুজীর বুকে চিন্তার এই তীক্ষ্ণ কাঁটা না-বেঁধার তো কথা নয়! তিনি যে ভাব-প্রবণ। তাঁর প্রাণে দেশ-বিভাগের আঘাত বিশেষভাবে লাগাই তো সম্ভব। লেগেও ছিল; তাই স্বাধীন ভারতের প্রথম পতাকা উত্তোলনের পর তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আমাদের যেসব স্বাধীনতা-সংগ্রামী সহযোদ্ধা ও জনতার যাঁরা আজ ভারত থেকে পৃথক এক রাষ্ট্র—পাকিস্তানে পড়লেন, তাঁদের আমরা কখনই ভুলবো না, তাঁরাও যে আমাদেরই রক্ত-মাংসের সমতুল (flesh of flesh and blood of blood) তাঁদের জন্য আমাদের হৃদয়ের ও রাষ্ট্রের দরজা সর্বদাই খোলা থাকবে। কিন্তু সত্যিই কি পাকিস্তানী হিন্দুদের জন্য—বিশেষ ক'রে স্বাধীনতার সহযোদ্ধা বন্ধুদের জন্য নেহরুজীর হৃদয়ের ও রাষ্ট্রের দরজা আজও খোলা আছে? হৃদয়ের দরজার কথা নেহরুজীই বলতে পারতেন কিন্তু রাষ্ট্রের দরজা যে খোলা নেই তা তো সকলেই দেখছেন। নেহরুজীর হৃদয়ের দরজাও বোধহয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা না-হলে, পাঠান-বীর সীমান্তগান্ধী নামে খ্যাত খান আবদুল গফুর খানকে আজ কাবুলে বসে কাঁদতে হ'ত না। সীমান্তগান্ধী ১৯৫৫ সালে রাজসাহীতে যখন গিয়েছিলেন, আমি তাঁকে হিন্দু নরনারীকে দর্শন দেওয়ার জন্য ৺সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র মহাশয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেম। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—শ্রীমান সত্যেন্দ্রমোহন মৈত্র, ঐ ঘটনাটিকে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করে ৫।৮.৭১ তারিখে আমাকে পত্র লিখেছিল, সেই পত্রটিই এখানে আমি হুবহু উদ্ধৃত করছি। ঐ পত্রে লিখিত প্রতিটি কথাই আমার সামনেই সেদিন

হয়েছিল ; আমি জানি, এর একটি কথাও বাহুল্য, অতিরঞ্জিত বা অসত্য নয়।

"সীমান্ত প্রদেশের খুদাই-খিদ্‌মৎগার অধিনায়ক অখণ্ড ভারতবর্ষের মুক্তিকামী বীর সৈনিক খাঁন আবদুল গফুর খাঁন (বাদশা খাঁ) যে বলেছেন—(প্যারী-লালজীকে) 'You are enjoying the fruits of freedom and have thrown us to the wolves.·· I am sorry, you have forgotten us.' এই কথাগুলি অপ্রিয় হলেও অতি সত্য। ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কি এই সত্য কথার মর্যাদা দেবেন ? তাঁরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। তা না হলে বাস্তুচ্যুত যারা এদিকে তাদের জন্মস্থান ত্যাগ করে চলে এসেছে, তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে 'fugitive' (পলাতক) ব'লে অভিহিত করতেন না। ওরা 'fugitive' কিজন্য হবে ? ওরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছে, ভারতবর্ষ ওদের জন্মভূমি। 'পাকিস্তান' বলে একটি পৃথক দেশ ক'রে দিয়েছে কে ? ঐ নেতৃবর্গ। বাদশা খাঁর তিক্ত সমালোচনা বর্তমান ভারত ভূখণ্ডের নেতৃবর্গকে হজম করতেই হবে। আপনার উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর বাদশা খাঁ রাজসাহীতে আমার গৃহে পদার্পণ করে হিন্দু নরনারীকে দর্শন দিয়েছিলেন। আমার গৃহ ধন্য হয়েছিল, আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে ছিলাম সেদিন। বাদশা খাঁকে শ্রীমান বীরেন জিজ্ঞাসা করেছিল,—'Khan Saheb, what will be the condition of the Hindus in Islamic State?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'খোদা রসুলের যে ইসলাম, তা'তে তোমাদের ডর নাই, তবে এই আদমীদের ইসলামে তোমাদের অবশ্যই 'ডর' আছে। তোমরা এতবড় শক্তিশালী ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছ, প্রয়োজন হ'লে তোমাদের সেইরূপ এদের সাথেও লড়াই করতে হবে। এদের 'ইন্‌সানিয়েৎ' নেই—ইংরেজের কিছুটা ছিল। দেখ. এরা জেলে নিয়ে মেরে পাঁজরার তিনখানা হাড় ভেঙে দিয়েছে, আমাকে 'পয়জন' করেছিল, আমার ১০৭ ডিগ্রি টেম্পাচার হয়েছিল, ইত্যাদি। তারপর অল্প একটু চুপ ক'রে থেকে এই সৌম্য শান্ত সমাহিত ব্যক্তি অতি ক্ষোভে বলেছিলেন—গান্ধীজী আমাদের let down করেছেন। (উর্দু ইংরেজী মিশিয়ে তিনি বলেছিলেন) আমি তাঁর পেছনেই বসেছিলাম। এখনও আমার কানে তাঁর কথাগুলি বাজছে। আপনার এসব নিশ্চয়ই মনে আছে। গান্ধীজী সম্পর্কে এরূপ

মন্তব্য অন্য কেউ করতে পারে নি। কিন্তু গফুর খাঁন সত্যকার সত্যাশ্রয়ী, সত্যকে প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন। তিনি কাবুলে বলেছেন—'There can be Peace in the sub-continent only if India and Pakistan one.' এতে বোঝা যায়, Pakistan become one. এতে বোঝা যায় তিনি দেশ বিভাগের একান্ত বিরোধী ছিলেন। 'You have forgotten me'—একথা বলে তিনি নেতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মাত্র—তিনি আমাদের মনের দুঃখের কথাই বলেছেন। তিনি ভগ্নশৃঙ্গ। পাকিস্তানে আমার গৃহে বসেই যখন পাকিস্তানের বিবেক ব'লে কিছু নেই বলতে পারেন, তখন কাবুলে তাদের wolves বলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি ?

ওপরে উদ্ধৃত এই চিঠিখানির ওপর কোনও মন্তব্য আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। চিঠিখানিতে ভুক্তভোগীর মনের ব্যথা সম্যক প্রকাশিত হয়েছে ; তাই চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করলেম। সাথে সাথে ভাব-প্রবণ প্রধানমন্ত্রী নেহরুরও বুকে কাঁটা কোথায় বিঁধছে, তারও সন্ধান পাওয়া যাবে। জহর-লালজীর ক্লান্তির মূল নিহিত তাঁর মনের এই দ্বন্দ্বের—এই ভাব-সংগ্রামের মধ্যেই।

প্যাটেল যে রোমের বাদশাহের মত বিজয় পতাকা উড়িয়ে সগৌরবে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছিলেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তিনি বোধহয় ভাবছিলেন, ইংরেজ তো চলে যাচ্ছে, এইবার দেখা যাবে। রাজনীতিতে একান্ত বাস্তববাদী প্যাটেল ছিলেন, নিজের শক্তির ওপর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। যেভাবে পরবর্তী কালে দেশীয় রাজাগুলিকে ভারতভুক্তিতে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন, যেভাবে তিনি জুনাগড়বাসীদের দিয়েই জুনাগড় দখল করিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, কে জানে তাঁর হয়তো তেমনই কোন মতলব ছিল কি না ? আমি কিছুটা জানি বলেই বিশ্বাস করি যে তাঁর একটা পরিকল্পনা ছিল কিন্তু আততায়ীর হাতে গান্ধীজীর নিহত হওয়ায় সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। তা যদি না হত, তাহলে সীমান্তগান্ধী আবদুল গফুর খাঁন সাহেবকেও আজ কাবুলে ব'সে অশ্রু বিসর্জন করতে হ'ত না, আর পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টানকে আজ বাস্তত্যাগ ক'রে ভারতে এসে 'না-ঘরকা, না-ঘাটকা' হয়ে পথে পথে ভিখিরির মত ঘুরে বেড়াতে হয়তো হ'ত না। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বের গদি থেকে অপসারণ ও শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

পদলাভও সর্দার প্যাটেলের পরিকল্পনারই একটি অঙ্গ ছিল। সব কথা আজও খুলে বলার সময় আসে নি, তাই আজ সেকথা অনুল্লেখই থাকলো, যেমন অপ্রকাশিত আছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'India wins Freebom' পুস্তকের একটি অংশ।

বর্ষীয়ান নেতা রাজাগোপালাচারীর মন খুশিতে মাতোয়ারা—একেবারে ডগমগ। তা তো হওয়ারই কথা, কারণ তাঁর ভারতবর্ষকে বিভাগ করে 'পাকিস্তান' সৃষ্টির পরিকল্পনা সফল হয়েছে, সার্থক হয়েছে—কংগ্রেসের নেতারা তা অবশেষে মেনে নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান রাজনীতিক নেতা বলে সর্বজন স্বীকৃত। বুদ্ধিমান তো বটেই। বুদ্ধিমান বলেই ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেস ছাড়লেন; ফলে ইংরেজও তাঁর 'তারিফ' করেলেন, কংগ্রেসেও তিনি অ-পাংক্তেয় হলেন না। সেই সময়েই তিনি দেশ বিভাগের তাঁর পরিকল্পনা প্রচার করলেন। সেই পরিকল্পনাই কিছু রদবদল করে এতদিনে গৃহীত হয়েছে। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারত বিভাগের কথা প্রকাশ্যে বলেন। আজ সেই পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে ভারত স্বাধীন হতে চলেছে। তিনিও আবার ঠিক সময় কালেই এসে কংগ্রেসমহলে ভিড়েছেন! বুদ্ধিমানের লক্ষণই তো তা-ই। আমি বিপ্লবী দলের দুইটি প্রবীণ বন্ধুকে জানি। তার মধ্যে একটি বন্ধু বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর সম্বন্ধে অপর বন্ধুটি একদিন বলেছিলেন—"আপনারা সকলেই তো—বাবুকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেন কিন্তু তাঁর বুদ্ধির দৌড় তো আমি দেখতে পাই না। তাঁর বাবা মৃত্যুকালে লাখ টাকার ওপর রেখে গিয়েছিলেন। তিনি সেই টাকা ভেঙেই সারা জীবন খাচ্ছেন। সে টাকা নিজে কিছুই রোজগার করতে পারেন নি। এই তো গেল তাঁর সংসারের দিক দিয়ে বুদ্ধির দৌড়। আর দলে? দলেও তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে দলকেও ভেঙেছেন। তবুও তিনি বুদ্ধিমান।" রাজাজী সম্পর্কে ঐরূপ কথা বলার ধৃষ্টতা অবশ্য আমার নেই। তবু দেশের নেতাদের কাছে বিষয়টিকে তুলে ধরছি। তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন। বর্তমানে তিনি কাশ্মীর পাকিস্তানকে দিয়ে তার সাথে মিট-মাট করার ওকালতি আবার শুরু করেছেন। কংগ্রেস নেতারা আজ সেটা না মানলেও কবে যে আবার মেনে নেন, সে বিষয়ে আমার মনে আশঙ্কা জেগেছে। সম্প্রতি শেখ অবদুল্লাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্ত তিনি অপর

কয়েকজনের সাথে পাকিস্তানের কণ্ঠস্বরের সাথে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। তিনি যে সব কথা এক এক সময়ে বলছেন, অন্য কোন দলের কোন নেতা সেইরূপ কথা বললে, দেশ-নেতাদের কাছে তিনি দেশদ্রোহী আখ্যা পেতেন এবং তাঁর স্থান হ'ত—জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে। কিন্তু রাজাজী যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি—তাঁর সবকিছুই ভাল। তিনি দেশবিভাগের পরিকল্পনা করে স্বাধীন ভারতে প্রথম ভারতীয় 'গভর্নর জেনারেল' হয়েছিলেনও সুতরাং তিনি যদি খুশি না হবেন, তবে আর কে খুশি হবে? তাই, তিনি খুশিতে মাতোয়ারা—ডগমগ।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ কাঁদ কাঁদ হয়েছেন। 'India divided' (ভারত বিভাগ) গ্রন্থের প্রণেতা বহু পরিশ্রমে জেলে বসে বইখানি লিখে দেখিয়েছিলেন যে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা কত অ-বাস্তব। তাঁর সেই অ-বাস্তব বলে বর্ণিত জিনিসই আজ বাস্তব রূপ নিচ্ছে। তা দেখে তিনি অ-সুখী হবেন না তো আর কে হবে? তাই তিনি কাঁদ কাঁদ।

রাজকুমারী অমৃত কাউর কাঁদছেন। তিনি যে মায়ের জাত। লক্ষ লক্ষ সন্তানের ক্রন্দন এবং ভাবীকালের আরও—আরও ক্রন্দন তাঁর বুক তোলপাড় করে তুলেছে—সন্তানের কান্না তাঁর মধ্যে রূপ নিয়েছে।

আর বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন একমাত্র রাজনীতিক নেতা—মৌলানা আজাদ দেশ বিভাগে কংগ্রেসের সম্মতি দেখে এবং সৈন্যদলের ও সরকারী কর্মচারীদের ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়ার পরিকল্পনা দেখে, দেশের ও দেশবাসীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি আকুল হয়েছিলেন। তাই তিনি বাজ-পড়া একটা প্রকাণ্ড মহীরূহের মত—একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত পাহড়ের মত সব সৌন্দর্য হারিয়ে সবার থেকে আলাদা হয়ে দূরে ছিটকে পড়েছেন। তিনি দেশের ও দেশবাসীর ভবিষ্যৎ ভেবে বিষাদ-ক্লিষ্ট। ভাবি বিপর্যয় রোধ করার ক্ষমতা আজ আর তাঁর নেই। 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠান দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসের একজন নৈষ্ঠীক সৈনিক।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের উৎসব হয়ে গেল। রাজধানীতে নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বা হাসলেন, কেউ বা কাঁদলেন, কেউ বা হাসি-কান্নার মাঝামাঝি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত-ভাবেই উৎসবে অংশ নিলেন। জনতা তখনও দেশ বিভাগের ফলাফল ততটা

কিছুই বুঝলেন না—তাঁরা উৎসবের আনন্দই উপভোগ করতে এসেছিলেন—ভোগ করে গেলেন। ভারতবর্ষ বিভাগ হয়ে গেল, স্বাধীনতার সাথে সাথে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হল কি? হিন্দু-মুসলমানের মিলন হল কি? ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠীত হল কি?

পাকিস্তানের রাজনীতি

পাকিস্তানের রাজনীতির কিছুটা আভাস পূর্বেই দিয়েছি। সেটা ছিল কেবলমাত্র আভাস। সে সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি। সেই আলোচনা পড়লেই পাঠক-পাঠিকারা পরবর্তী অধ্যায়গুলোর আমার বক্তব্যের মর্ম ও তার কার্য-কারণ সম্পর্ক ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন।

পূর্বে পাকিস্তানের রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে তাকে বলেছি মুসলিম-লীগের নীতি। সেই সময়ে অবশ্য সেই নীতিকে পাকিস্তানের নীতিই বলা যেত; কারণ, তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে যাঁরা রাজনীতি করতেন, তঁাদের মধ্যে অন্য আর কোনও উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক দল ছিল না। সকলেই হয়েছিলেন মুসলিম-লীগ-নীতিরই সমর্থক; সুতরাং সে অবস্থায় ঐ নীতিকে পাকিস্তানের নীতি বললেও ভুল হত না; তবু আমি তাকে মুসলিম-লীগের রাজনীতি আখ্যা দিয়েছিলেম; কারণ, পরবর্তীকালে ঐ নীতি থেকে পৃথক মতবাদ নিয়ে আরও কয়েকটি সর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিক দল গড়ে ওঠে। তখন পূর্বেকার অনুসৃত নীতি, মুসলিম-লীগেরই নিজস্ব নীতি হ'য়ে দাঁড়ায়। সেইজন্যই আমি প্রথম থেকে ঐ অনুসৃত নীতিকে মুসলিম-লীগের রাজনীতি বলেই এর আগে থেকেই ব'লে এসেছি।

১৯০৬ খৃস্টাব্দে ঢাকায় যে মুসলিম-লীগ দল প্রথমে সৃষ্টি হয়, তার ভিত্তিই ছিল হিন্দু-বিদ্বেষ। এই হিন্দু-বিদ্বেষ, ক্রমে ভারত-বিদ্বেষের রূপ নেয়। ১৯৩৭ সালে নতুন শাসনতন্ত্রে (১৯৩৫ সালের) সাধারণ নির্বাচনের পর উত্তর প্রদেশে (ইউপি'তে) মন্ত্রীত্বের 'মসনদ' নিয়েই প্রথম মনোমালিন্য দেখা দেয়। নির্বাচনে 'কংগ্রেস' সেখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে নির্বাচিত হয়। মুসলিম-লীগ দাবি করে যে তার সাথে মিলিত হ'য়ে কংগ্রেসের যৌথ-সরকার গড়তে হবে। কংগ্রেস রাজী নয়। তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতিই ছিল, কোথাও সম্মিলিত যৌথ-সরকার (Co-alition) না-গড়া; সেইজন্য কংগ্রেস

উত্তর প্রদেশে যৌথ-সরকার গড়তে রাজী হয় না। বাংলাদেশেও জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে গড়া 'কৃষক-প্রজা' দলের সাথেও মিলিত হ'য়ে যৌথ-সরকার গড়ে না। কৃষক-প্রজা পার্টি ছিল, জিন্নাহ্-নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম-লীগের সম্পূর্ণ বিরোধী—তাঁরা মুসলিম-লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এই দলের প্রায় অধিকাংশ সদস্য ছিলেন, জাতীয়তাবাদী ; কেউ কেউ একেবারে খাস কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন ; যথা, গাইবান্ধার জনাব আবু হোসেন সরকার, কুষ্টিয়ার মৌলভি সামসুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। তাঁরা কংগ্রেস-আন্দোলনেও বারে বারে 'জেলে' গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কংগ্রেসেরই একটি শাখা ছিলেন। জনাব ফজলুল হক সাহেবও একসময়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জনাব হকসাহেব ছিলেন মনে-প্রাণে একজন জনদরদী খাঁটি বাঙালী। তাঁর মতই আর একজন জনদরদী খাঁটি বাঙালী রাজনীতিক নেতাকে দেখেছি। তিনি ছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। এঁরা উভয়েই ছিলেন সর্বভারতীয় রাজনীতিক নেতা, আর একজন বৈজ্ঞানিককেও দেখেছি খাঁটি বাঙালীরূপেই। তিনি ছিলেন, আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়। এঁরা সকলেই বাংলার ও বাঙালীর কথা বলতে আত্মহারা হয়ে পড়তেন। দেশবন্ধুর প্রতিটি বক্তৃতায়—"আমার বাংলা"—কথাটা ধ্বনিত হ'য়ে উঠতো। সে ধ্বনি আজও আমার কানে লেগে আছে। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত জনাব হক সাহেবকে দেখেছি, বাংলার ও বাঙালীর কথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলতেন—দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে তাঁর গণ্ডদেশ ভাসিয়ে দিত। স্বাধীনতার ফলে, বাংলা-বিভাগের ব্যথা তিনি সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করতেন। তাঁর ঐ মনোভাবের মধ্যে কোনও ফাঁক বা ফাঁকি ছিল ব'লে আমি মনে করি না। এহেন লোকের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিক দল—কৃষক-প্রজা পার্টির সাথেও সর্বভারতীয় 'কংগ্রেস' ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বাংলার কংগ্রেস দলকে যৌথ-সরকার (Co-aliation) গড়তে দিলেন না। জনাব ফজলুল হক সাহেব বাংলাদেশে কংগ্রেসের সাথে যৌথ মন্ত্রীসভা গড়তে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। সে সময় যদি কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা দলের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলার যৌথ মন্ত্রীসভার পরিচালনায় 'সরকার' গড়তেন, তাহলে শুধু বাংলারই নয়, সারা ভারতের ইতিহাসই অন্য রূপ নিত। মুসলিম-লীগও শক্তিশালী হ'ত না ; সুতরাং দেশ-বিভাগও হ'ত না। কিন্তু ভারতের ভবিতব্য তা' ছিল না।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কিছুতেই যৌথ-সরকার গঠনে মত দিলেন না। বাংলায় কংগ্রেসদলও নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতে পারে নি ; তাই, তাঁরা বিধানসভায় বিরোধী দল হ'য়েই থাকলেন ; আর জনাব হক সাহেব মুসলিম লীগ দলের সাথেই অগত্যা হাত মিলিয়ে বাংলায় যৌথ-সরকার গঠন করলেন। হক সাহেবকে একরূপ জোর করেই মুসলিম-লীগের কোলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হল। মানুষ মাত্রেই ভুল করতে পারেন এবং করেনও সে ভুলের মাশুল তাঁকেই দিতে হয়। কিন্তু দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা নেতারা যখন ভুল করেন, তখন সে ভুলের মাশুল তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—সারা দেশকেই সেই ভুলের মাশুল গুণতে হয়। সারা ভারতবর্ষ বিশেষ ক'রে, বাংলাদেশ—সেই ভুলের মাশুল আজ পর্যন্ত—সুদে-আসলে গুণে দিচ্ছে। আসামকেও দিতে হ'ত, যদি পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতারূপে নিজ দায়িত্বে সেখানে সম্মিলিত যৌথ-সরকার (Co-alition) না-গড়তেন। এটা ঘটে ১৯৩৮ সালে। সুভাষবাবু তখন কংগ্রেস-সভাপতি। বাংলায় কৃষক-প্রজা দলের ও মুসলিম-লীগ দলের যৌথ সরকার গঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন জওহরলাল নেহরু। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের তৎকালে নীতিই ছিল, কংগ্রেস দল যে প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না-পেরেছেন সেখানে তাঁরা বিরোধী দলের ভূমিকা নেবেন—কিছুতেই অপর কোন রাজনীতিক দলের—সে দল মুসলিম-লীগ বিরোধী হলেও—সাথে হাত মিলিয়ে যৌথ-সরকার গড়বেন না। এই নীতির ফলেই বাংলায় কংগ্রেস দল কৃষক-প্রজা দলের সাথে হাত মেলালেন না উত্তর প্রদেশেও না। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসই ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ; আর সেখানে যৌথ-সরকার গড়লে, গড়তে হ'ত মুসলিম লীগ দলের সাথে। জনাব খালিকুজ্জমান সাহেবের আব্দার সত্বেও সে আব্দারে 'কংগ্রেস' কান দিল না। ক্ষমতালোভী মুসলিম-লীগ দল ক্ষমতা হাতে না পেয়ে একেবারে বে-পরোয়া মরিয়া হয়ে উঠলো। তাঁরা কংগ্রেস-শাসনে মুসলমান-নিপীড়নের ফিরিস্তি তৈরি করার জন্য পীরপুরের নবাব সাহেবকে চেয়ারম্যান ক'রে একটা তদন্ত কমিটি গড়লেন। এই পীরপুর-রিপোর্ট সারা ভারতময় একটা চরম উত্তেজনা মুসলমান সমাজের মধ্যে গড়ে তোলে। মুসলিম-লীগের দলীয় প্রচারযন্ত্র অবাধ গতিতে ভারতবর্ষের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে চলে। একেবারে নাৎসি জার্মানির গোয়েবলসীয় কায়দায় মুসলিম-লীগের সাম্প্র-

দায়িক প্রচার চলতে থাকে। যেসব প্রদেশে কংগ্রেস-সরকার গড়ে উঠেছে, সেখানেও সরকার কোন বাধা দেন না! কংগ্রেস-নেতারা চিরদিনই প্রচারে অপটু, বা অ-মনোযোগী। আগেও যে অবস্থা দেখেছি, স্বাধীনতার পরেও সেই একই অবস্থা দেখছি। কাশ্মীর নিয়েই ধরা যাক না কেন—বিশ্ব রাজনীতিতে পাকিস্তান, আজ ভারতের চেয়ে অনেক বেশি রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট হয়েছেন। বিভিন্ন দেশে ভারতের রাষ্ট্র-দূতরা নির্বিকার! তাঁদের কোনও নির্দেশও দেওয়া হয় না। কিছুকাল আগে ভারত-সরকার, পূর্ব পাকিস্তান থেকে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস্তত্যাগ ক'রে ভারতে আসার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাপুর-কমিশন বসিয়েছিলেন। ঐ 'কমিশন' বিভিন্ন স্থান ঘুরে বহু বাস্তত্যাগীর সাক্ষ্যও নিলেন—তাঁদের অনেকেরই দেহে বীভৎস অত্যাচারের চিহ্নও চাক্ষুষ করলেন—বাস্তত্যাগীদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিও সাক্ষ্য দিলেন—ভারত-সরকার ঐ কমিশনের পেছনে 'গৌরী সেনের' টাকা খরচও কম করলেন না—'কমিশন'ও তাঁদের দায়িত্ব যথারীতিই পালন করলেন—তাঁরা তাঁদের রিপোর্টও যথাসময়ে সরকারের কাছে দাখিল করলেন। সম্প্রতি খুব উচ্চশিক্ষিত ডক্টরেট উপাধিধারী জনৈক অবাঙালী বন্ধু হরিয়ানা রাজ্য থেকে আমাকে যে পত্র লিখেছেন, তা থেকে একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। তাতে সকলেই বুঝবেন যে, রিপোর্টটি কি বিরাট! তিনি লিখেছেন:

"From a friend of mine I have learnt that many months back Kapur Commission had submitted its report in three exhaustive volumes covering about two thousand pages. I wish if it could be published, it would serve as an eye-opener." (অর্থাৎ, আমি আমার জনৈক বন্ধুর কাছে শুনেছি যে কয়েক মাস আগে 'কাপুর-কমিশন' তাঁদের তৈরি ২,০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করেছেন। ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হ'লে সকলেরই চোখ খুলে যাবে।)

কিন্তু কথা হচ্ছে, চোখ খোলাবে কে? ভারত-সরকার? দুরাশা! তাঁরা কপালে 'সত্যমেব জয়তে'-এর 'লেবেল' এঁটে রেখেছেন—তা'তেই সব হবে! সত্যও যে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে, তা তাঁরা বোঝেন না—বুঝতেও চান না!

পকিস্তানের প্রচারদপ্তর যে গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রচারে কত দক্ষ ও সক্রিয় তার একটা 'নজির' এখানে তুলে ধরছি। ১৯৬২ সাল। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আজম খাঁন সাহেব ঢাকা থেকে হাওয়াই 'প্লেনে' হঠাৎ উড়ে আসেন রাজসাহী শহরে। তিনি একা আসেন না। সাথে ক'রে নিয়ে আসেন, একজন বিদেশী সাংবাদিককেও, উদ্দেশ্য, ঘোরতর দুরভিসন্ধি! দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দুর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি ক'রে তাঁদের ভারতে তাড়াতে হবে; কারণ চীনের আক্রমণের আগেই ভারতের ওপর অর্থনীতিক ও আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে দেওয়ার একটা পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে চাপ সৃষ্টি করা। পরিকল্পনা সব পাকাপাকিভাবে ঠিক করেই তিনি সাংবাদিকদের নিয়ে এলেন। রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে ব্যবধান—পদ্মা নদীর। এই ব্যবধানের মধ্যে কতকগুলো বড় বড় চর আছে; আর সেইসব চরের অধিবাসী বেশির ভাগই মুসলমান। চরের অধিবাসীদের কথার টান, মুর্শিদাবাদ জেলার কথার মত। দেশ বিভাগের ফলে তারা পড়েছে রাজসাহী জেলার মধ্যে, যদিও মুর্শিদাবাদ জেলা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে, তথা ভারতে। এই সব চরের স্ত্রী-পুরুষ মুসলমানগণকে আগে থেকেই 'তালিম' দিয়ে রাখা হয়েছে। সাংবাদিকগণসহ আজম খাঁ সাহেবের বৈঠক বসে এবং ঐ সব মুসলমান নারী-পুরুষ আকুলি-বিকুলি হ'য়ে কেঁদে খাঁ সাহেবকে বলেন—"হুজুর! আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দুরা, আমাদের বাড়ি-ঘর সব লুট ক'রে পুড়িয়ে দিয়েছে, মেয়েদের বে-ইজ্জত করেছে, বহু নর-নারীকে হত্যা করেছে! আমরা যে কয়জন বেঁচে ছিলেম, প্রাণের ভয়ে সকলে পালিয়ে এসেছি। 'হিন্দুস্থানের' সরকার ও পুলিশ আমাদের রক্ষা করে নি। এখন পাকিস্তান-সরকার আমাদের না বাঁচালে আর আমাদের বাঁচার কোনও উপায় নাই।..." ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর সে কী কান্না—একেবারে মর্মভেদী হাহাকার! চমৎকার অভিনয়—অতি চমৎকার! নটশ্রেষ্ঠ শিশির ভাদুড়ী মহাশয় যদি বেঁচে থেকে সেই দিনের সেই অভিনয় দেখার সুযোগ পেতেন, তাহলে দেখতেন যে তাঁর অভিনয়ও সেই দিনের অভিনয়ের কাছে অত্যন্ত ম্লান। সেদিনের সব কিছুই অভিনয় হলেও, বিদেশী সাংবাদিকদের প্রচারণার ফলে বিশ্বের দরবারে অভিনয়ই সত্য ঘটনা বলে প্রচারিত হ'ল। ঢাকার অনেকগুলো সংবাদপত্রই বেশ 'ফলাও' ক'রেই মুর্শিদাবাদে মুসলমান নির্যাতনের কাহিনী সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। শুধু প্রকাশ করলেন না ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' ও

আরও দুই একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র। 'পাকিস্তান অবজার্ভার' তাঁদের এক সংবাদদাতাকে পাঠালেন, মুর্শিদাবাদের ঘটনার তদন্ত ক'রে রিপোর্ট দিতে। তিনি এলেন, তদন্ত করলেন এবং রিপোর্টও দিলেন। তাঁর রিপোর্টে দেখা গেল যে মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোটেই হয় নি। সেই রিপোর্টে আরও প্রকাশ পেল যে, মুর্শিদাবাদের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই নাকি, তাঁকে বলেছেন যে, "এই জেলায় এখনও আমরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। আমাদের ওপর ব্যাপক কোন অত্যাচার-উৎপীড়ন করা এখন পর্যন্ত অপর সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভবপর নয়।" এই সবই 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার সৌজন্যে প্রকাশ পেল কিন্তু পেলে কি হবে? যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেল। বিদেশেও সকলে জানলেন যে ভারতের হিন্দুরা মুসলমান-নিপীড়নকারী। রাজসাহী জেলাতেও দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রাজসাহী শহরের উপকণ্ঠে হিন্দুপ্রধান দারুশা গ্রামে ব্যাপকভাবে অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরের দিনই হয়ে গেল। ঐ গ্রামে একদিনেই কমপক্ষে ১,৮০০ থেকে ২,০০০ হাজারের মত বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ নিহত হ'ল। সে যে কী নৃশংসভাবে তারা নিহত হ'ল তা বর্ণনাতীত। রাজসাহী শহরের প্রত্যেকেই—শুধু রাজসাহীরই বা কেন, মুর্শিদাবাদ জেলার ও পদ্মাতীরের গ্রামের অনেকেই—দেখেছেন যে, রাজসাহী শহরের আশে-পাশে তিন দিন ধ'রে সমানে আগুন জ্বলেছে কিন্তু ডি সি (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট) জনাব পি এ নাজির, সি এস পি (P. A. Nazir, C, S, P,) নির্বিকার, অবিচলিত। তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে এই সবই ঘটেছে। ১৯৬২ সালের হত্যাকাণ্ডের আগে রাজসাহী জেলা থেকে ব্যাপক কোন বাস্তুত্যাগ হয় নি। এইবার বাঁধ ভাঙলো। পদ্মা নদী পার হ'য়ে প্রতিদিন একবস্ত্রে ২০০।৩০০ ক'রে লোক মুর্শিদাবাদ জেলাতেই আসতে সুরু করে। ঐ ঘটনার পরে আজ পর্যন্ত এক মুর্শিদাবাদ জেলাতেই কমপক্ষে ৩০।৪০ হাজার লোক এসেছে। এদিকে তার ফলে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার খুবই আশঙ্কা ছিল। রাজসাহী জেলার লোকের এই প্রবন্ধ লেখকের ওপর গভীর আস্থা বরাবরই ছিল। তিনি তখন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে এবং তাঁরই চেষ্টায় জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে ঐসব নবাগত বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের জন্য সক্রিয় হন। তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীদিলীপ গুহ, আই-এ-এস মহাশয়ও খুব সহানুভূতির সাথেই তাঁর ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে থেকেই যতটা সম্ভব সাহায্য এই প্রবন্ধের লেখককে

তৎকালে দিয়েছেন। বহু চেষ্টায় বাস্তুত্যাগীরা কোনওরকমে পুনর্বাসিত হয়েছে এবং লেখকের আপ্রাণ চেষ্টায় কোনও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এখানে হ'তে পারে নি। শুধু তাই নয়—১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা এইবারই বোধহয় সর্বপ্রথমে—বাস্তুত্যাগীদের ভোটও পেয়েছেন। এইসব বাস্তুত্যাগীরা যখন এই জেলায় দলে দলে প্রতিদিন ভিখারীর বেশে আসতে থাকে, তখন তাদের বিষয় নিয়ে আমি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর ও কংগ্রেস-নেতা অতুল্যবাবুর সাথে আলোচনা করেছি। অতুল্যবাবুর সাথে প্রাদেশিক কংগ্রেসভবনে যে আলোচনা হয়েছিল, তার সামান্য কিছু অংশ এখানে নিবেদন করছি। অতুল্যবাবু আমাকে বলেন—

অঃ—"রাজেশ্বর দয়াল (তৎকালীন, পাকিস্তানে ভারতের হাই কমিশনার) আমাকে সবই বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে, আমরা যে এইসব বাস্তুত্যাগীদের সাহায্য করবো, তারা তো আমাদের সাহায্য নিয়ে পরে বামপন্থীদের সাথে ভিড়ে যাবে! সে অবস্থায় আমরা সাহায্য করবো কেন?

আমি:—কেন, এইসব বাস্তুত্যাগীরা বামপন্থীদের দলে ভিড়ে যায়, সে সম্বন্ধে কিছু চিন্তা ক'রে দেখেছেন কি?

অঃ—তারা অনেক কিছুই আশা ক'রে আমাদের কাছে আসে কিন্তু আমরা তাদের সব আশা পূর্ণ করতে পারি না; তাই তা'রা বামপন্থীদের কাছে যায়।

আঃ—আপনারা তো শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আপনারা যাই হোক কিছু তো সাহায্য করেন কিন্তু বামপন্থীদের তো কানাকড়ি দিয়েও সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। তবু, তারা তাদেরই কাছে যায় কেন?

অঃ—আপনিই বলুন, কি জন্য যায়।

আঃ—আমার ধারণা, আপনাদের কাছে যে সহানুভূতি পাওয়ার আশা তারা করে সেই সহানুভূতিটুকুও তারা পায় না। বামপন্থীরা আর্থিক কোন সাহায্য দিতে না পারলেও মৌখিক সহানুভূতি অন্তত তাদের প্রতি দেখায়, যা আপনারা দেখান না।"

এরপরে আমি এ-ও বলি যে—"আমি একবার পরীক্ষা ক'রে আমার মত ঠিক কি না দেখবো। আমি দেখেছি, পাকিস্তানে থাকতে, আজকের বাস্তুত্যাগী এই হিন্দুরাই, কংগ্রেসকে পুরোমাত্রায় সমর্থন করেছে। ১৯৪৬

সালে আমার নির্বাচনে দ্বিতীয় কোন হিন্দুই আমার বিরুদ্ধ প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ায় নি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও আমার কোন টাকা-পয়সাও ছিল না—আমি খরচও করতে পারি নি। আর আমার নির্বাচনক্ষেত্র ছিল, রাজসাহী জেলার তিনটি মহকুমা জুড়ে। ভোটদাতারা সকলেই আমাকে কংগ্রেসের একজন কর্মী এবং দেশের একজন একনিষ্ঠ সেবক হিসাবেই জানতো; তাই, তারা গ্রামে গ্রামে নিজেরাই চাঁদা ক'রে টাকা তুলেছে, ভোটের দিন নৌকা বা গাড়ি ক'রে নিজেরাই—ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে এবং ভোট দিয়েছে। ফলে, আমার বিরুদ্ধে যে দুইজন দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁদের জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে। যারা পাকিস্তানে থাকতে এতবড় কংগ্রেসভক্ত ছিল, তাঁরা এদিকে এসেই কেন এতবড় কংগ্রেস-বিরোধী হল, সেই কারণই আমি অনুসন্ধান করে দেখবো।" সেদিন আমি এ-ও অতুল্যবাবুকে বলেছিলেম যে—"আমি যদি এখানে থাকি, তাহলে আমি দেখাব যে বাস্তত্যাগীরাও কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করছে এবং কংগ্রেসকে সমর্থন করছে।"

আমার কথা ফলেছেও—নেতারাও তা দেখেছেন কিন্তু তাতে তাঁদের মনের ভাবের কি কোনও পরিবর্তন হয়েছে? আমার মনে হয়—হয়নি। তাই আজ আমি রাজনীতি থেকে প্রায় অবসর নিয়েছি—আমি কংগ্রেস ছেড়েছি। অন্য কোন দলেও যোগ দিই নি।

১৯৬২ সালের রাজসাহীর হত্যাকাণ্ডের বিষয় নিয়ে আমি তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে ও অন্যান্য আরও ২।৪ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনেক চিঠিপত্রও লিখেছি কিন্তু পাষাণ গলাতে পারি নি! আমার যতদূর মনে পড়ে, তাতে মনে হয় সম্ভবত শ্রীনির্মল চ্যাটার্জি, এম-পি মহাশয় যখন পার্লামেণ্টে রাজসাহীর ঐ হত্যাকাণ্ডের কথা তুলে ধরেছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী কেবল একটিমাত্র কথায় অর্থাৎ 'বাঙলার ঘটনা বেদনাদায়ক' (tragic) বলেই তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন। কিসে যে বেদনাদায়ক এবং বেদনার কারণ ও পরিমাণই কত, তা কিছুই বলেন নি। পাকিস্তানের কোন সংবাদপত্রেই ঐ ঘটনা প্রকাশ হতে পারল না—ভারতের সংসদেও প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে তার কোনই বিবরণ প্রকাশ করা হল না। এটাই হল নেহরু-পরিচালিত ভারত-সরকারের নীতি। ভারত ও পাকিস্তানের নীতির মধ্যে তফাৎই এখানে। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের

ওপর তিল পরিমাণ কিছু হলেও, তাকে তাল-প্রমাণ করে পাকিস্তান সরকার ঘরে-বাইরে প্রচার করেন, আর পাকিস্তানের সংখ্যালঘুর ওপর পর্বত প্রমাণ কিছু হলেও ভারত-সরকার তাকে সর্বপ্রযত্নে আড়াল করে ঢেকে রাখতেই প্রথমত চেষ্টা করেন—নেহাৎ যখন না পারেন, তখন তিনবার ঢোক গিলে যেটুকু না বললেই নয়, নেহাৎ সেটুকুমাত্রই বলেন! এটাই হল কংগ্রেস-পরিচালিত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নেহরু-নীতি। আজ অবশ্য নেহরুজী নেই কিন্তু কংগ্রেস আছে এবং নেহরু-নীতিও অব্যাহতই আছে। তাই আমার আশঙ্কা হয় কাপুর কমিশনের রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হবে না। পাকিস্তানও ভারতের দেখাদেখি ভারতীয় বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের কারণ নির্ণয়ের জন্য একটা কমিশন বসিয়েছেন। সেই 'কমিশনের' গোয়েবল্‌সীয় রিপোর্ট যখন বিশ্বের দরবারে প্রকাশিত হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে, তখন হয়তো ভারত সরকার কাপুর কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। তখন তার যথার্থতার মূল্য অনেকাংশে কমে যাবে। কাপুর কমিশনের সদস্য বিচারপতি রেণুপদ মুখার্জি মহাশয় এখানে (বহরমপুরে) এসে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষ্য নিয়েছেন এবং দারুশা গ্রাম থেকে যে সামান্য লোক কাটা-পোড়া বিকৃতদেহ নিয়ে এখানে এসেছে, তাঁদের স্বচক্ষে দেখে গিয়েছেন। তাঁদের রিপোর্টে সেই সব ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ থাকাই খুব সম্ভব, কিন্তু তা প্রকাশিত আজ পর্যন্তও হয় নি। কবে হবে ভারত-সরকারই জানেন! অবস্থা দেখে আমার মনে হয়, ভারতের রাষ্ট্র পরিচালক কংগ্রেস নেতারা পাকিস্তানে নিক্ষিপ্ত তাঁদের স্বাধীনতার সংগ্রামী সহকর্মিগণকেও স্বাধীনতার বলি হিসাবেই ধরে নিয়ে ভারত শাসন করছেন। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী জননেতা সীমান্তগান্ধী নামে খ্যাত খাঁন আব্দুল গফুর খাঁন সাহেব বড় ক্ষোভে ও দুঃখেই গান্ধীজীর এককালের সেক্রেটারী প্যারিলালজীকে বলেছিলেন—"আমাদের নেকড়ের মুখে ফেলে দিয়ে তোমরা স্বাধীনতা ভোগ করেছো! আজ তোমরা আমাদের ভুলেই গিয়েছ।" খাঁন সাহেবের কথা তাঁর একারই কথা নয়। পাকিস্তানে অতীতের যেসব সংগ্রামী নেতা ছিলেন ও আজও আছেন, তাঁদের সকলেরই কথা তিনিই সর্বপ্রথমে ভাষায় রূপ দিয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রচারের নমুনা তুলে ধরতে গিয়ে এত কথা বলতে হল। সেদিনের পীরপুর রিপোর্টেও সারা ভারতময় প্রচারণার উদ্দেশ্যেই কতক

সত্য, অধিকাংশই অর্ধ-সত্য ও অবশিষ্ট একদমই অসত্য তথ্যে পরিপূর্ণ ছিল। সারা ভারতময় সেই রিপোর্ট নিয়ে মুসলিম-লীগের নেতারা পূর্ণ বেগে প্রচারকার্য চালিয়ে গেলেন! যে মুসলীম-লীগের ১৯০৬ সালে সৃষ্টি হয়েছিল; হিন্দু-বিদ্বেষের ওপর ভিত্তি করে, সেই মুসলিম-লীগ এখন পীরপুর রিপোর্টের প্রচার চালাতে গিয়ে ক্রমশঃ ভারত-বিরোধী হয়ে উঠলেন। এইবার তাঁরা ঘোষণা করতে শুরু করলেন যে হিন্দু-অধ্যুষিত ভারতে মুসলমানদের 'জান-মান-সম্মান' কিছুই নিরাপদ নয়। রাজনীতিক ক্ষমতাও তাঁদের হাতে কোনদিনই আসার সম্ভাবনা নেই; তাই হিন্দু-ভারতে মুসলমানরা থাকলে তাঁদের চিরকালই হিন্দুদের দাস হয়েই থাকতে হবে। সুতরাং চাই তাঁদের একটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, যার নাম হবে—'পাকিস্তান'। এই প্রচারণার ফলেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও তার পাশাপাশি ২।১ টি প্রদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই পাকিস্তানের দাবিতে মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁদের দাবি হল, মুসলমানের জন্য পৃথক বাসভূমি দিতেই হবে, নচেৎ স্বাধীনতা নেই-নেই-নেই! বাসভূমি মুসলমানদের চাই-ই চাই। এটাই মুসলিম-লীগের—তথা তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতির একমাত্র মূলসূত্র। এই মূলসূত্রের ভিত্তিতেই আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোন নেতা বা কোন সংবাদপত্রই বর্তমান ভারতকে, 'ভারত' বা 'ইণ্ডিয়া'—কোন নামেই অভিহিত করেন না। তাঁরা ভারতকে বলেন —'হিন্দুস্থান'। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, বিশ্ববাসীকে তাঁরা জানাতে চান যে, ভারতে হিন্দু-রাজত্ব চলছে—মুসলমানের তা'তে কোনই অধিকার নেই। যে সব মুসলমান সেখানে আছেন, তাঁরা হয় ব্যক্তিত্বহীন পুতুল, (show boy) অথবা 'দাস! পাকিস্তানের নেতারা তাঁদের দেশের জনগণের মনকে এই নীতির ভিত্তিতেই গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। ভারতের কংগ্রেস নেতারাও এই নীতির কাছেই পরাজয় স্বীকার ক'রে দেশ-বিভাগ করেছেন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির সুযোগ মুসলিম-লীগকে দিয়েছেন। ভারত-বিদ্বেষের ওপরই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে এবং এটাই তাঁর একমাত্র উপজীব্য হ'য়ে আছে। শেখ আবদুল্লা যতদিন ভারতের সমর্থক হিসাবে কাশ্মীরের 'প্রধানমন্ত্রী' ছিলেন, ততদিন তিনি ছিলেন ভারতের 'শো-বয়' (পুতুল); আর, যখন তিনি ভারত-বিরোধী হয়েছেন, তখন তিনি পাকিস্তানের কাছে হয়েছেন—শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিক? দেশ-বিভাগের মুখে যে মাস্টার তারা

সিং ছিলেন ঘোরতর নারকীয় দস্যু—মুসলমান নিধনকারী, আজ যখন তিনি ভারতকে খণ্ডিত করতে চেষ্টা করলেন, বা তার ধুয়া ধরলেন, তখনই তিনি হয়ে গেলেন দেশপ্রেমিক! ভারতের অখণ্ডতা-বিরোধী যে কোন ভারতীয় গোষ্ঠী মাথা তুলে ওঠেন, তারই, পাকিস্তান-সরকার, প্রশংসায় শুধু মুখর হয়েই ওঠেন না, তাকে সব রকমে সক্রিয় সাহায্যও করেন। ভারত-বিরোধী নাগা-মিজো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহীরা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সব কিছুই কিন্তু সেই একই নীতির শাখ'-প্রশাখা মাত্র। সেই নীতিটাই হচ্ছে হিন্দু-বিদ্বেষে আরম্ভ হয়ে এখন পুরোমাত্রায় ভারত-বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়েছে। কায়েদ-ই-আজম মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পরিচালিত মুসলিম-লীগের এই নীতির ফলেই ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে ভেঙে মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির—পাকিস্তানের—দাবি তারা করেছিলেন এবং কার্যত তা' সফলও করেছিলেন—এই নীতির ফলেই, কংগ্রেস-নেতারা দেশ-বিভাগে রাজী হওয়ার পরে জিন্নাহ্ সাহেব লোক-বিনিময়েরও, অর্থাৎ মুসলমান সবই যাবেন পাকিস্তানে এবং পাকিস্তানের অ-মুসলমানরা আসবেন ভারতে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস-নেতারা সেই প্রস্তাবে রাজী হন নি। অবশ্য যে নীতি মেনে নিয়ে 'কংগ্রেস' দেশ-বিভাগে রাজী হন, যুক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে এই লোক-বিনিময়ের প্রস্তাব ও তার সমর্থন করতেই রাজী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক কিন্তু 'কংগ্রেস' রাজী হন নি। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করি না ; কারণ, প্রথমত আমি মনে করি যে, দেশ-বিভাগে রাজী হওয়াটাই হয়েছে একটা প্রকাণ্ড বড় রাজনীতিক ভুল—ভুলই বা বলি কেন, এটা ছিল পাপ—মহাপাপ, একেবারে আত্মহত্যার সামিল। দ্বিতীয়ত জিন্নাহ্ সাহেবের লোক-বিনিময়ের প্রস্তাবে রাজী হ'লে ভারতকে আরও জায়গা ছেড়ে অবশ্যই দিতে হ'ত। ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমান যদি পাকিস্তানে যান, তবে তাঁদের বাসের ও বাঁচার জন্য আরও স্থান অবশ্যই ছাড়তে হ'ত ; ফলে, হয়তো সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাব—দুই-ই সম্ভবত সেজন্য ভারতকে ছাড়তে হ'ত! দেশ-বিভাগ ক'রে নেতারা একবার যে ভুল করেছেন, সেই ভুলেরই পুনরভিনয় যে দ্বিতীয়বার হয় নি, তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। আবারও যদি ভুল করা হ'ত, তাহলে তার জন্য আরও অনেক বেশি 'মাশুল' দিতে হ'ত।

জিন্নাহ্ সাহেবের প্রস্তাব 'কংগ্রেস' গ্রহণ করলেন না—অতি- বুদ্ধিমান

ধুরন্ধর রাজনীতিক জিন্নাহ্ সাহেব মনে মনে হাসলেন মাত্র; কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা তিনি ত্যাগ করলেন না। তাঁর পরিকল্পনা ছিল—তাঁর সাধের পাকিস্তান এক রাষ্ট্রীয় জাতির (এক 'নেশনের') লোকেরই কেবল বাসভূমি হবে। এই পরিকল্পনাকে সফল ক'রে তোলার জন্যই তিনি দেশ-বিভাগের আগে থেকেই প্রচার করতে সুরু করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান—দুইটি পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি ('নেশন')। বহু রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে—ব্যক্তিপূজাই রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড রাজনীতিক হাতিয়াররূপে দেখা দেয়। একনায়কশাসিত রাষ্ট্রের তো কথাই নেই; ধর্মপ্রধান ভারতবর্ষও তা থেকে বাদ পড়ে নি। জিন্নাহ্ সাহেব তো মুসলমানদের মধ্যে প্রায় 'পয়গম্বর'-এর কাছাকাছিই হয়ে গিয়েছিলেন, ভারতে নেহরুও কম যান নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই, তাই তাঁরা যে ভারতবর্ষের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরাও একটা সম্প্রদায় মাত্র, সে বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাস ক্রমশ হারিয়ে বিশ্বাস করতে সুরু করেন যে, তাঁরা একটা পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি (নেশন) এবং এক দেশে—এক রাষ্ট্রে এই দুইটি পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি একসাথে বাস করতে পারেন না। জিন্নাহ্ সাহেব একথাটা মুখ ফুটে প্রকাশ না করলেও তাঁর অন্তরের ইচ্ছা তাই ছিল। তার প্রমাণ মেলে ১৯৪৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের পশ্চিম পাঞ্জাবের ইংরেজ গভর্নর—স্যার ফ্রান্সিস মুডী (Sir Francis Mudie) সাহেবের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ্ সাহেবের চিঠির মধ্যে। তিনি লিখেছিলেন :

"I am telling every one that I don't care how the Sikhs get across the border ; the great thing is to get rid of them as soon as possible." (অর্থাৎ আমি প্রত্যেককেই বলছি যে, কী ভাবে শিখদের সীমান্তের পরপারে পার করবেন, তার পদ্ধতি নিয়ে আমি মোটেই কিছু গ্রাহ্য করি না; মোদ্দা কথা হচ্ছে যে যত শীঘ্র সম্ভব তাদের পরপারে (!) পাঠাতেই হবে।) জিন্নাহ্ সাহেবের মনের কথা যদি পশ্চিম পাঞ্জাবের লাট সাহেব বেশ ভালভাবে না জানতেন, তা হলে কি তাদের হত্যার বা জোর-জুলুমের উস্কানি দিয়ে পাকিস্তানের বড়লাট জিন্নাহ্ সাহেবের কাছে ঐরূপ একটা চিঠি লিখতে কখনও সাহস পেতেন? কখনই না। জিন্নাহ্ সাহেব বুদ্ধিমান রাজনীতিক নেতা; তাই তিনি মনের ভাব মুখে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন নি। কিন্তু বর্তমানকালের সামরিক যোদ্ধা রাজনীতিক পাকিস্তানের

প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁন আর অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মত মনের ভাব চেপে রাখতে পারেন নি—অল্প কিছুদিন আগেই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, হিন্দু-মুসলমান একসাথে একই দেশে—একই রাষ্ট্রে বাস করতে পারে না। আয়ুব খাঁন সাহেব যোদ্ধা—যোদ্ধার মধ্যে ঘোর-প্যাচ খুব কমই থাকে; তাই রাজনীতিক নেতা জিন্নাহ সাহেব যা মুখ ফুটে কখনও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন নি, যোদ্ধা-রাজনীতিক আয়ুব খাঁন সাহেব সেই কথাই—মুসলিম-লীগের নীতির গোপন কথাটাই প্রকাশ করে ফেললেন!

প্রথম পর্ব

মুসলিম লীগের শাসন

১৪ই আগস্ট—১৯৪৭ সাল। ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে "পাকিস্তান" নামে একটি নতুন রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠলো। পূর্বেই বলেছি, এই নতুন রাষ্ট্র দুই অংশে বিভক্ত—পূর্ব ও পশ্চিম। দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান, ১,১০০ মাইলের মত "ভারত"-রাষ্ট্র। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার কথাও পূর্বেই বলেছি। জাতীয় পতাকায় "চাঁদ-তারা" চিহ্ন, মুসলিম সংস্কৃতির-ই নাকি প্রতীক। এখানে জাতীয় পতাকার তারকা-চিহ্নের সম্পর্কেই শুধু একটি কথা বলছি। তারকা চিহ্নটি পাঁচ কোণ বিশিষ্ট। এই পাঁচটি কোণ, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে শুনেছিলেম। তাৎপর্যটা হচ্ছে—পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের পবিত্র ঘোষণার দ্যোতক। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ—(১) বেলুচিস্তান, (২) সিন্ধু, (৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, (৪) পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্বাংশের (৫) পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। এখন কিন্তু ঐ পবিত্র ঘোষণার পবিত্রতা, আর নেই! পশ্চিমাংশের ৪টি প্রদেশকে, সেদিকের জনগণের মতের বিরুদ্ধেই, এক সাথে মিলিয়ে একটিতে (One unit) পরিণত করা হয়েছে; তবুও, পাঁচ কোণ বিশিষ্ট তারকা-চিহ্নটি আজও জাতীয় পতাকায় শোভা পাচ্ছে! যাঁরা প্রদেশগুলোকে পূর্বের মত আবার পৃথক করার জন্য আন্দোলন করেছেন, তাঁদের স্থান হয়েছিল, বাইরে নয় কারাগারে! উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত গান্ধী খাঁন আবদুল গফুর খাঁন, বালুচ-গান্ধী নামে খ্যাত খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন, সিন্ধু-প্রদেশের নেতা জনাব জি, এম্, সাঈদ, ও জনাব আব্দুল মজিদ প্রমুখকে সেই আন্দোলন করার অপরাধে বহু বছরকাল কারার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিন কাটাতে হয়েছে। সীমান্ত গান্ধী খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনের স্থান তাঁর স্বদেশে হয় নি—তিনি আজ দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়ে—আফগানিস্তানের এক নিভৃত পল্লীতে নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছেন। আর বালুচ-গান্ধী খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন তো আজও জেলেই কয়েদীর জীবন যাপন করছেন! জনাব আয়ুব খাঁন, সামরিক শক্তিতে ক্ষমতা দখলের পর

বালুচ-গান্ধী খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁনকে তাঁর দলবলসহ গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এক অত্যন্ত অবিশ্বাস্য অভিযোগ আনেন যে খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন, তাঁর দলবল নিয়ে এক সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজন করেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের না কি ছিল, ক্ষমতা দখলের! আমি যতটা খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন সাহেবকে জেনেছি ও বুঝেছি, তা'তে আমার মনে হয়, তাঁর মত লোকের কাছে এর চেয়ে ঘৃণিত আর কোনও অভিযোগ হ'তে পারে না। এ কথা আমি বিশেষ জোরের সাথেই বল্‌তে পারি; কারণ, আমি উভয় সীমান্ত গান্ধীকেই বেশ ভাল ভাবে জানি। ঐ সব নেতাদের সাথে আমার ঢাকায়ও কয়েকবার দেখা এবং কথাবার্তা হয়েছে। "আওয়ামী লীগ" থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যখন "ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি" প্রথম ঢাকায় গঠিত হয়, জনাব আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানীর নেতৃত্বে, তখন ঐ সব নেতাই ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের সভায় ঐ দল-গঠনের প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরে তাঁরা ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় যান। খাঁন আব্দুল গফুর খাঁন বক্তৃতা করতে মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালে আওয়ামী লীগের প্ররোচনায় ঐ সভা ভেঙে দেওয়ার সব রকম চেষ্টাই হয়—ঢিল-পাটকেল পড়তে সুরু হয়, লাঠিবাজিও চলে। সকলেই মনে করেন, খাঁন গফুর খাঁনের জীবন হয়তো বিপন্ন হ'তে পারে। জনাব আব্দুল্লা সাহেব তখন অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (Acting I. G. of Police)। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে পুলিশকে শান্তিস্থাপনে নিয়োগ করেন। সেই সময় আওয়ামী লীগের মন্ত্রীত্বেই 'সরকার' চল্‌ছিল। চারদিক থেকে ইট-বৃষ্টি হচ্ছে। সভায় সমবেত লোক ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ছেন। বীর পাঠান-নেতা তখনও নির্ভীকভাবে মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন! তাঁর সাথে যোগ দিয়েছেন, আর একজন পাঠান-নেতা। তিনি হলেন, বালুচ-গান্ধী—খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন। আই, জি জনাব আব্দুল্লা সাহেব খাঁন। গফুর খাঁনের ও খাঁন সামাদ খাঁনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের বলেন—"আপনারা আমার 'জীপ' গাড়িতে উঠুন। আমি আপনাদের বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি।" কিন্তু উভয় নেতাই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা বলেন, তাঁরা হেঁটেই যাবেন। জনতার কোন অংশ যদি তাঁদের মারতে চান, তাহলে তাঁরা অনায়াসে তাঁদের মারতে পারে। তাঁরা প্রাণভয়ে কদাচ পালিয়ে যাবেন না। তাঁরা হেঁটেই চলেন। সভার স্থান থেকে তাঁদের বাসা এক মাইলের কম

হবে না। বুড়ীগঙ্গার ধারে সদরঘাট অঞ্চলে এক তরুণ ব্যারিস্টার শ্রীমান বদরুল ইসলামের বাড়িতে তাঁরা উঠেছেন। নেতারা চললেন পায়ে হেঁটে। নির্ভীক নেতাদের শান্ত ও সমাহিতচিত্তে চল্‌তে দেখে জনতা স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং অবশেষে শান্ত। বাসায় ফেরার পর, দলের কর্মীরা নেতাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। বালুচ-গান্ধী খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন কর্মীদের তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন। তিনি বলেন—"তোমরাও তো হিংসার পথ নেওয়ার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলে! মঞ্চের নিচে তোমাদেরও 'লাঠি-সোটা' মজুত ক'রে রেখেছিলে! কেন, ঐ অপকর্ম করার জন্য মনস্থ করেছিলে?......।" এহেন সামাদ খাঁনের বিরুদ্ধে আয়ুব খাঁনের অভিযোগ তিনি গোপনভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করার প্রস্তুতি করেছিলেন! তাঁর বিচারের একটা প্রহসন করা হ'ল। অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'ল। ক্ষমার অবতার (!) জঙ্গী আয়ুব খাঁন মহত্বের (!) পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বললেন—"তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর যদি দোষী (!) ব্যক্তি দোষ স্বীকার ক'রে সদ্ভাবে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন, তা'হলে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।" আয়ুব খাঁন সাহেব নিজে পাঠান হয়েও জানেন না যে ঐ পাঠান বীর নেতারা গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে তাঁদের জীবনের গতি কিভাবে বদ্‌লিয়ে ফেলেছেন—তাঁরা জীবন দেবেন, তবু নীতি বিসর্জন কিছুতেই দেবেন না। যা'কে একবার তাঁরা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাকে তাঁরা জীবনের বিনিময়েও রক্ষা ক'রেই চলেন! তাই, পাঠান-বীর আব্দুস সামাদ খাঁনও তাঁর সত্যাশ্রয়ীর নীতি বিসর্জন দেন নি। জেলে তাঁর তিন বছর কেটে যাওয়ার পরেও আজও তিনি তাঁর তথাকথিত দোষ স্বীকার করেন নি; তাই, আজও তিনি জেলেই দিন কাটাচ্ছেন।

পরবর্তীকালে জেনেছি যে খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও 'আজাদ-পাকিস্তান'-এর জেলে যে ১৬।১৭ বছর কাটাতে বাধ্য হলেন, তা-ও ঐ নীতিকে আঁকড়িয়ে থাকার জন্যই। দেশ-বিভাগের প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহিকা কমিটি (Congress Working Committee) পাশ করার পরে, কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব, খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন দেশ-বিভাগের পরে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন! ধন্য-ধন্য;

আজাদ সাহেব—কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। গফুর খাঁন, কংগ্রেসের একজন সত্যাশ্রয়ী অহিংস সৈনিক হিসাবে তাঁর সভাপতির ঐ মূল্যবান (!) উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন নি—যদি পারতেন, তাহলে তাঁর জীবনও সুখ-সম্ভোগের মধ্যেই অবশ্যই কাটতো। তা' তিনি পারলেন না, শুধু একবার গৃহীত নীতিকে জীবন-ভর আঁকড়িয়ে ধরে থাকার জন্য। কোন ক্ষমতার বা অর্থের প্রলোভনই তাঁকে নীতি-ভ্রষ্ট করতে পারে নি। খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনের কাছ থেকে তাঁর-নিজ-মুখেই আমি শুনেছি যে তিনি যখন পাকিস্তান 'ন্যাশনাল এসেম্বলির' (পার্লামেণ্টের) সদস্য ছিলেন তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি খাঁন তাঁকে ডেকে বলেছিলেন —"খাঁন সাহেব, আপনি মুসলিম লীগে যোগ দেন, আপনাকে আমি মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করতে চাই। 'পাকিস্তান' তো 'কংগ্রেসের' বিরোধিতা সত্ত্বেও হ'য়ে গিয়েছে; আর কংগ্রেসের সেই বিরোধিতার নীতি, যে নীতি কংগ্রেস-নেতারাও ত্যাগ করেছেন, সেই নীতি আঁকড়িয়ে ধরে থেকে আর তো লাভ নেই। আসুন, আপনি আমাদের সাথে যোগ দেন—আমরা সবাই মিলে পাকিস্তানকে গ'ড়ে তুলি।" খাঁন সাহেব কিন্তু লিয়াকত আলি সাহেবের সেই আবেদনেও সাড়া দিতে পারেন নি, মৌলানা আজাদ সাহেবের উপদেশ গ্রহণ করলে তিনি অনায়াসেই লিয়াকত আলি সাহেবের আবেদনেও সাড়া দিয়ে তাঁর জীবনের গতি পাল্টাতে পারতেন। কিন্তু তা' তিনি পারেন নি। গান্ধীজী এক সময়ে বলেছিলেন যে তাঁর নীতিই তাঁর জীবন। গফুর খাঁনেরও তা-ই। আরও একবার গফুর খাঁনের সামনে অর্থের এক বিরাট প্রলোভন উপস্থিত হয়েছিল। জনাব ইস্কান্দার মীর্জা তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট। তিনি, খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনকে তাঁর বাসায় আহ্বান ক'রে তাঁকে বলেন,—"খাঁন সাহেব, আপনি তো গান্ধীজীর মতে গ্রাম-সংগঠনে বিশ্বাসী—গ্রামে গ্রামে চরকা-খাদি প্রভৃতিও চালান। আমি আপনার হাতে এক কোটি টাকার একটি তহবিল দিতে চাই, আপনার ঐ সব কাজ পরিচালনার জন্য। ঐ টাকার জন্য আপনাকে কারো কাছেই কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আপনি নিজের ইচ্ছামত কাজ ক'রে যেতে পারবেন। আপনি রাজী হ'লে আমি এখনই ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।" সত্যাশ্রয়ী খাঁন সাহেব মীর্জা সাহেবের মনের আসল কথাটি বুঝে নিলেন—বুঝলেন, টাকা দিয়ে মীর্জা সাহেব তাঁকে কিনতে চান। গফুর খাঁন সাহেব

তাই, প্রস্তাবটি বিনীতভাবে প্রত্যাখান করলেন। মীর্জা সাহেব না কি শেষে তাঁর কোনও বন্ধুর কাছে গফুর খাঁন সম্বন্ধে বলেছিলেন যে,—"ক্যায় সে বেকুফ আদ্মি। রূপেয়া দেনেসে ভি লেনে নেহি মাংতা।" অর্থ ও সম্মানের পূজারী মীর্জা সাহেবের মত সাধারণ শ্রেণীর লোকের কাছে গফুর খাঁন সাহেবের ব্যবহারটা খুবই অস্বাভাবিকই মনে হ'তে পারে, কারণ তাঁরা তো জানেন না যে খাঁন সাহেব অস্বাভাবিক—অতি-অস্বাভাবিক ব্যক্তি। জীবনটাই তাঁর কাছে বড় নয়—নীতিই তাঁর কাছে অতি বড়—জীবনের চেয়েও, জীবনের সুখ-সম্ভোগের চেয়েও বড়—অতি বড়। সীমান্তের দুই পাঠান নেতাকে দেখে আমি যতটা বুঝেছি, তা'তে আমার মনে হয়েছে, উভয়েই একই ধাতুতে গড়া; তাই, খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন আজও জেলেই —সৎ (!) ভাবে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেল থেকে মুক্তি নেন নি—নিতে পারেন নি। ভারতের কংগ্রেসী নেতারা আজ তাঁদের অতীতের এই সব বীর সহ-যোদ্ধাদের কথা, বোধহয়, ভুলেই গিয়েছেন। দেশ-বিভাগের, তথা স্বাধীনতার প্রাক্কালে তবু, খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনকে একটা সময়োচিত উপদেশ দিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করেছিলেন! মৌলানা আজাদ ছিলেন, একজন সুচতুর রাজনীতিক। সময়ের তালে পা মিলিয়ে চলাও রাজনীতির একটা অঙ্গ। সময়ের তালে পা মিলিয়ে চলাকে সুবিধাবাদের পর্যায়েও ফেলা চলে। অনেক রাজনীতিকই এই পন্থা-ই অনুসরণ করে চলেন, যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভারতে। একদিনের অতি কট্টরপন্থী 'জেহাদী' মুসলিম লীগের নেতাও আজ দেশ-বিভাগের সাথে সাথে অতি কট্টরপন্থী কংগ্রেসী হ'য়ে গিয়েছেন। এটাও রাজনীতি, কিন্তু দুই সীমান্ত গান্ধী—খাঁন আব্দুল গফুর খাঁন ও আব্দুস্ সামাদ খাঁন—এই শ্রেণীর রাজনীতিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলেন না—আজও হ'তে পারেন নি। এই দুই নেতার চেয়ে বড় বা তাঁদের সমকক্ষ আর কোন নেতাই গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সত্যাশ্রয়ী অহিংস যোদ্ধা আছেন কি না, আমার জানা নেই। ভারতে একমাত্র বিনোবাজী হয়তো কিছুটা আছেন! বিনোবাজী সম্পর্কে "কিছুটা" কথাটা ব্যবহার করছি এই জন্য যে তাঁর এখনও খাঁন আব্দুল গফুর খাঁন ও খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁনের মত অগ্নিপরীক্ষার সাম্‌নে উপস্থিত হ'তে হয় নি। তিনি সকলের শ্রদ্ধাই পেয়ে আসছেন। নেহরুজী, লালবাহাদুরজী ও ইন্দিরাজী প্রমুখ ভারতের রাষ্ট্রীয় তরণীর কাণ্ডারীরা—সকলেই—বিনো-

বাজীর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য দিল্লীর মসনদ থেকে ছুটে গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন বিনোবাজীর কুটিরে। কিন্তু সীমান্তের ঐ দুই নেতা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের কাছ থেকে কোন সম্মান তো পানই নি, উপরন্তু তাঁদের কাছ থেকে অনবরত লাঞ্ছনাই ভোগ করেছেন ; তবু, তাঁরা তাঁদের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হন নি। এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তাঁরা আজও অগ্রসর হয়েই চলেছেন। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়েছে, গান্ধীজীর এই দুই সত্যাশ্রয়ী অহিংস শিষ্য কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো গুরুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

এই দুই পাকিস্তানী নেতার জীবন নিয়ে এতখানি আলোচনা করেছি, শুধু এইটুকু দেখানোর জন্যে যে পবিত্র পাকিস্তানের (পাক = পবিত্র, স্তান = জমি বা জায়গা) পবিত্র ঘোষণার স্বরূপটা কিরূপ ! জাতীয় পতাকায় তারকা-চিহ্নটি যে পাঁচটি পৃথক প্রদেশের অস্তিত্বের কথা আজও সগৌরবে দুনিয়ার সাম্‌নে ঘোষণা ক'রে চলেছেন, তার মর্যাদা কিভাবে দেওয়া হচ্ছে, যাঁরা প্রদেশগুলোকে আবার পৃথক করার দাবি তুলেছেন, তাঁদের প্রতি কি নিদারুণ নির্যাতন চলেছে !

পাকিস্তানের পবিত্র ঘোষণার আরও নমুনা আছে। ১৯৪০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে—"পাকিস্তান"—প্রস্তাবটি সর্বপ্রথম পাশ করা হয়। ঐ প্রস্তাবে ছিল প্রদেশগুলোকে, অর্থাৎ পাঁচটি প্রদেশকে নিয়ে পাকিস্তান হবে, এক যুক্তরাষ্ট্র (federation), যে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি প্রদেশেরই থাকবে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য—প্রদেশের শাসন-পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ অধিকার ; প্রদেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ এবং একই রাষ্ট্রীয় নীতি বজায় রাখার জন্য মাত্র কয়েকটি বিষয় থাকবে কেন্দ্রের হাতে কিন্তু আজ আর সে অধিকার প্রদেশের নেই। এই অধিকারের দাবি তোলায়, পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ অবিসম্বাদী নেতা—শেখ্ মুজিবর রহমান আজ কারাগারে বন্দী—দণ্ডিত কয়েদী ! আরও শত শত তরুণ কর্মী ও প্রবীণ নেতা ঐ একই কারণে কারান্তরালে বিনা বিচারে আটক বন্দী ! এই তো সেদিন কয়েক মাস আগে দিনাজপুরের প্রবীণ নেতা—হাজী দানেশ সাহেবকে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে। হাজী সাহেব ছিলেন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহ-সভাপতি। আমি তাঁকে খুব ভালভাবেই চিনি ও জানি। তাঁর রাজনীতিক মতবাদ সম্পর্কে নানা জনেই নানা কথা বলেন—কেউ বলেন, তিনি 'কম্যুনিস্ট'—কেউ বা বলেন, তিনি একজন সমাজবাদী ! তাঁর মতবাদ

যাই হোক, আমি জানি তিনি একজন নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী—দরিদ্রের ও বিপন্নের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি একজন এম-এ, বি-এল উকিল কিন্তু তিনি তাঁর পরিবার প্রতিপালনের জন্য দৈনিক মাত্র দু'টাকা তাঁর ব্যবসায়ের মাধ্যমে রোজগার করতেন। দৈনিক রোজগার তাঁর দু'টাকা হয়ে গেলেই আর যত মামলাই তিনি করতেন, তার জন্য কোন "ফী" তিনি নিতেন না। এই নীতির ফলে তাঁর সংসারে দারিদ্র্য লেগেই থাকতো, অর্থাভাবে তিনি তাঁর মেয়ের বিয়েও দিতে পারছিলেন না! অবশেষে তাঁর ত্যাগ-মুগ্ধ ও গুণ-মুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবরা সাহায্য ক'রে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। পুলিশ বিভাগের লোকের কাছেই আরও শুনেছি যে তিনি যখন জেলে বন্দী, তখন তাঁর পুত্র অভাবের তাড়নায় অস্থির হয়ে তাঁকে জেলখানায় পত্র দিয়েছিল যে, যে ব্যক্তি পরিবার পালন করতে পারে না, সে বিয়ে করেছিল কেন? আমি পূর্ব-পাকিস্তানে থাকা-কালেই এই ঘটনাগুলোর কথা জেনেছিলাম। হাজী সাহেবের ছেলের চিঠির কথা, জেলের চিঠি যে পুলিশরা 'সেন্সর' করেন, এমন কোন পদস্থ পুলিশ অফিসারের কাছ থেকেই শুনেছিলেম। আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেম, তখন আমি দিনাজপুর সফরে গিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই হাজী সাহেবের দরিদ্র সংসারের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তাঁর বাসায়ও গিয়েছিলেম, যদিও হাজী সাহেব আমাদের মন্ত্রীসভার বিরোধী দলেরই একজন নেতা ছিলেন। আমি স্বচক্ষে তাঁর সংসারের অবস্থা দেখেছিলেম সেজন্যই আজ তাঁর দারিদ্র্য সম্পর্কে এত সব কথা অত্যন্ত জোরের সাথেই বলতে পারছি। এহেন ব্যক্তিও আয়ুব-মার্কা দ্বিতীয় পর্যায়ের মুসলিম লীগের তথাকথিত গণতান্ত্রিক (!) শাসনে আজ জেলে বন্দী! তাঁর মতবাদের জন্যই কি তিনি আজ জেলে? না, তা নয়। আয়ুব খাঁ সাহেবের তো এখন কম্যুনিস্টদের সাথে 'দহরম-মহরম'-ই চলছে! তবে কেন? আমার মনে হয়, হাজী সাহেবের অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা ও জনগণের সামনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলে ধরাই তাঁর বন্দিত্বের আসল কারণ। আয়ুব খাঁ সাহেব শাসনের নামে পীড়নের মাধ্যমে জনগণের স্বায়ত্তশাসনের সোচ্চার দাবীকে স্তব্ধ করে দিতে চান; তাই আজ সারা পূর্ব পাকিস্তানই এক বিরাট জেলখানায় পরিণত হয়েছে। 'পাকিস্তান' সৃষ্টির পর থেকে যতই দিন যাচ্ছে, ততই পাকিস্তানের নব নব রূপ দেখা দিচ্ছে—সে রূপ, পূর্বের মুসলিম লীগ শাসনের রূপের চেয়ে আরও কঠোর আরও দমনমূলক রূপ। তবু, কিন্তু

'পাকিস্তান' পবিত্রভূমি! আর, এই 'জিগির' তুলছেন কে? আয়ুব খাঁ সাহেব স্বয়ং এবং তাঁর পরিষদবর্গ! এটাই কি ঐসলামিক আদর্শের নমুনা? মুখে ইসলামের আদর্শের কথা অহরহ প্রচার করে কাজের রূপায়ণ যেভাবে করা হচ্ছে, তাতে 'ইসলাম'কে লোকচক্ষে হেয় করা হচ্ছে কি না, সে কথা আজ বিশ্বের মুসলমানসমাজের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে বলে পাকিস্তানের অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন ভূতপূর্ব নেতা হিসাবে আমি একথা আজ বিশ্ব-মুসলমানসমাজের কাছে তুলে ধরছি।

এ সব যাই হোক, ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে 'পাকিস্তান'ও হয়েছে এবং আজও তা চলছেই। প্রথম যেদিন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিন পাকিস্তানের শাসনভার মুসলিম লীগের হাতেই এসেছিল। কেন্দ্রে জনাব লিয়াকত আলি সাহেব প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা গড়েন; আর, পূর্ববঙ্গে, প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন, খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন সাহেব।

পূর্বেই বলেছি, যুক্ত বাংলার 'এসেম্বলির স্পীকার' থাকা-কালেই জনাব নুরুল আমিন সাহেব, সুরাবর্দী-বিরোধী একটি দল গড়েন। নাজিমুদ্দিন সাহেবকে দেশ-বিভাগের পর তবু দলের নেতা, তথা পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করা একা জনাব নুরুল আমিন সাহেবের এবং তাঁর দলের পক্ষে সম্ভব হত না। এদিক দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন সেদিনে, 'আজাদ' পত্রিকার বৃদ্ধ সম্পাদক—মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব, নোয়াখালীর জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, কুমিল্লার জনাব মফিজুদ্দিন সাহেব, দিনাজপুরের হাসেম আলি সাহেব ও আরও অনেকে। এঁদের সমবেত চেষ্টায় জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেব বিধানসভার সদস্যদের মুসলিম লীগ দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

নাজিমুদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিসভায় তাঁকে সাহায্যকারী সকলের মধ্যে মৌলানা আক্রাম খাঁ ছাড়া সকলেরই স্থান হল। মৌলানা সাহেব মন্ত্রিত্ব নিলেন না। জনাব নুরুল আমিন সাহেব হলেন খাদ্যমন্ত্রী, জনাব হামিদুল হক সাহেব অর্থমন্ত্রী, জনাব মফিজুদ্দিন সাহেব কারামন্ত্রী ও জনাব হাসেম আলি সাহেব কৃষি ও সেচমন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় আরও কয়েকজন থাকলেন। সকলের নাম আজ আর মনে নেই; তবে, সম্ভবত বরিশালের জনাব আফজল সাহেবও ঐ মন্ত্রিসভায় প্রথম থেকেই ছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই

সব মন্ত্রীদের আরও দেখা মিলবে, তাই অনেকের মধ্যে থেকে এই নাম কয়টিই এখানে উল্লেখ করলেম।

নাজিমুদ্দিন সাহেব ছিলেন ব্রিটিশের হাতে গড়া—শুধু, হাতে গড়াই নয়, ব্রিটিশ-ছাঁচে ঢালা—রাজনীতিক নেতা। ১৯১৯ সালের মন-ফোর্ড (মণ্টেগু-চেমস-ফোর্ড) ভারত-শাসন-সংস্কারের দ্বৈত শাসনের (ডায়াকি) যখন ১৯২১ সালে রূপায়ণ হয়, তখন ঐ শাসনকালে তিনি মন্ত্রী ও এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলরও (Executive Councillor) হয়েছিলেন এবং তাঁর সেবার পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে 'স্যার' খেতাব পেয়েছিলেন। তাঁর শাসন-সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা, তা-ই আগে থেকেই ছিল।

নাজিমুদ্দিন সাহেব 'ইসলামের' আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি সবই খুব নিষ্ঠার সাথেই মেনে চলতেন। রোজা, নামাজ প্রভৃতি কখনও তাঁর বাদ যেত না—তিনি হজ করে 'হাজী'ও হয়েছিলেন। এই সব কারণেই বোধ হয়, নাজিমুদ্দিন সাহেব, সুরাবর্দী সাহেবের মত দুর্ধর্ষ নেতা ছিলেন না। পূর্বেই আমি বলেছি, ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগ প্রবর্তিত "ডাইরেক্ট এ্যাকশানের" কালে বাংলার শাসনভার যদি নাজিমুদ্দিন সাহেবের হাতে থাকতো, তাহলে হয়তো তিনি, কলকাতার ও নোয়াখালির পথে-প্রান্তরে সুরাবর্দী সাহেব যেরূপ নর-রক্তের স্রোত বইয়েছিলেন, তা হয়তো তিনি পারতেন না; সুতরাং, পাকিস্তানও হত না। এইটে, অবশ্য, আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমার যতদূর মনে পড়ে, তাতে মনে হয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন সাহেব, দেশ বিভাগ তথা 'আজাদ' পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশের বিধানসভায় (এসেম্বলির) মুসলিম লীগ সদস্যদের নেতা, সুতরাং পূর্ববঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন। ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীন থাকাকালে ইংরেজ কর্তৃক দেশ শাসনে সহযোগীতা করেও তিনিই আবার স্বাধীন দেশের মন্ত্রী হলেন! যে সব দেশ সংগ্রাম ক'রে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন ক'রে নিজেদের শক্তিতে দেশকে স্বাধীন করেছেন, সে সব দেশে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে ব'লে আমার জানা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ! বাংলার সুসন্তান কবি ও নাট্যকার স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল, তাই, তাঁর এক নাটকের নটের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন—'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!' সত্যিই, ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। যা' নাজিমুদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিত্বের বেলায় হয়েছে, তা-ই সংগ্রামী কংগ্রেসের অর্জিত স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও হয়েছে। নাজিমুদ্দিন

সাহেবই একমাত্র ব্যতিক্রম নন, পশ্চিমবঙ্গেও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের মন্ত্রিত্বের অপসারণের পরে যখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মশায় কংগ্রেসী দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গে গড়েন, তখন তাঁর মন্ত্রিসভাতেও অর্থমন্ত্রী হিসাবে স্থান পান শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার (বর্তমানে, পরলোকগত)। ইনি অতীতে কংগ্রেসের একজন প্রথম সারিরই নেতা ছিলেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে তিনি মুখ্য সচেতক (চীফ হুইপ) হয়েছিলেন। কংগ্রেস থেকেই তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের 'মেয়রও'-ও হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ শাসনকালে তিনি বাংলা দেশের অর্থমন্ত্রী এবং পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই ইংরেজ বড়লাট ও রাজ প্রতিনিধি (Vice-Roy & Governor-General)-এর একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যও হয়েছিলেন। তাঁর এই সমস্ত কাজ সেকালের সুভাষচন্দ্র পরিচালিত সংগ্রামী বাংলা কংগ্রেস সমর্থন তো করেনই নি, তাঁকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত ক'রে বিশ বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন, অর্থাৎ বিশ বছরের মধ্যে আর তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে আসতে পারবেন না—এই দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু দণ্ডাদেশের বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই আবার তিনি কংগ্রেসে এসে কংগ্রেস-পরিচালিত মন্ত্রিসভাতে অর্থমন্ত্রী রূপে দেখা দেন!

স্বাধীনতার পূর্বে সংগ্রামকালে আমিও আমার জেলায় (রাজসাহীতে) একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীই ছিলাম। সেদিনে কংগ্রেসের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলেও একবার ছাড়া মন কখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি। একবার মাত্র করেছিল, যখন কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেস-নেতারা অত্যন্ত লজ্জাজনক হীন আচরণ ক'রে তাঁকে 'কংগ্রেস' ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন। তার পর ১৯৪৬ সালে আবারও বাংলার কংগ্রেস নেতারা আবার আমাকে ডেকে কংগ্রেসে নিয়ে কংগ্রেস থেকেই সাধারণ নির্বাচনে আমাকে "বেঙ্গল এসেম্বলীর" সদস্য করেছিলেন। আজ স্বাধীনতার বিশ বছর পরে "পাক-ভারতের রূপরেখা" লিখতে গিয়ে পুরনো দিনের অতীত কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে সময়ে সময়ে মনে হচ্ছে, স্বাধীনোত্তর যুগে সংগ্রামী কংগ্রেস এবং ইংরেজের সাহায্যপুষ্ট মুসলিম লীগ দল—সব বিষয়ে না-হলেও—অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই প্রায় এক পর্যায়ে নেমে এসেছে—সময়ে সময়ে মনে হচ্ছে, স্বাধীনোত্তর যুগের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দল যেন একই মুদ্রার এ-পিঠ, আর ও-পিঠ! আজ অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথেই এ কথা স্বীকার করতে

বাধ্য হচ্ছি, আমি দেখেছি পাকিস্তান সরকারকে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মন থেকে তাঁরা যে অতীতের বাংলা দেশেরই একটি অংশ মাত্র, সে কথাটা চিরতরে ভোলানর জন্য পূর্ববঙ্গের নাম পাল্টিয়ে তাকে 'পূর্বপাকিস্তান' নামে অভিহিত করতে। এদিকে ভারতে এসেও দেখলেম, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাও চেষ্টা করছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নাম পাল্টিয়ে তা'কে 'বাংলা' নামে অভিহিত করতে। উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ বংশধররা যেন কোনও দিন মনে না-করেন যে বাংলা দেশকে আপোষে স্বাধীনতা পাওয়ার দুর্নিবার লোভে; একদিন কংগ্রেস-নেতারা বিভাগ করার অপকীর্তি করেছিলেন! কিন্তু জাগ্রত জনমতের জন্য মন্ত্রিসভার দুষ্ট পরিকল্পনা ফলবতী হ'তে পারে নি। আরও অনেক ব্যাপারেই আমি কংগ্রেস ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা অশুভ আঁতাতের মত মিল দেখছি। সে সব সম্পর্কে ক্রমশ বলবো।

এখন শুধু এইটুকুই ব'লে রাখছি যে, পূর্ববঙ্গে নাজিমুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বেই প্রথম পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল।

জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের প্রথম মন্ত্রিসভা হয়েছে। মন্ত্রীরা কাজও আরম্ভ করেছেন কিন্তু চলতে গিয়ে দেখেন, বাধা বিস্তর। পূর্বে ঢাকা ছিল একটি জেলার প্রধান শহর ও জেলার 'হেড কোয়ার্টার' মাত্র; এখন সেই ঢাকা হ'ল সমস্ত প্রদেশের রাজধানী—শহর। গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে প্রাদেশিক রাজধানীর অনেক কিছুই ক্রিয়া-কাণ্ড করণীয় আছে এবং তা পরিচালনার জন্য চাই উপযুক্ত স্থান ও তদুপযোগী গৃহ। সচিবালয় (সেক্রেটারিয়েট ভবন),—বিধানসভার গৃহ (এসেম্বলি হাউস), হাইকোর্ট প্রভৃতির জন্যও যেমন দরকার উপযুক্ত বাড়ির, তেমনই দরকার আবার, ঐ সব অফিসে কাজ করার কর্মচারীদের ও প্রধান কর্মকর্তাদেরও এবং মন্ত্রীদেরও বাসের জন্য উপযুক্ত বাড়ির, কিন্তু এই সব বিষয়েই সমস্যা

দেখা দেয়। না-আছে তার জন্য উপযুক্ত বাড়ি-ঘর, না-আছে অর্থ-সম্পদ। সদ্য-সৃষ্ট পাকিস্তানের ধনভাণ্ডার তখন গড়ে ওঠে নি ; প্রাদেশিক ধনভাণ্ডারও শূন্য ! জেলায় জেলায়, জেলার কাজ চালানোর উপযোগী কিছু অর্থ মাত্র জেলার তোষাখানা (ট্রেজারী)-গুলোয় আছে, একমাত্র ভরসা, দেশ-বিভাগের সাথে সাথে ভারত সরকারের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মজুত অর্থের বিভাজিত অংশে পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ (পঞ্চান্ন) কোটি টাকা মাত্র। তা-ও আবার তখনও পাওয়া যায় নি ; তবে আশা আছে, পাওয়া যাবে ! আর, সেই অর্থ যদি পাওয়াও যায়, তা দিয়ে তো তখনই কোন গৃহ নির্মাণ সম্ভবপর নয়। এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়, সেই চিন্তাই মন্ত্রীদের মাথায় 'কিলবিল' করতে থাকে। সব সমস্যারই সমাধানও আছে। এ ক্ষেত্রেও সমাধানের পথ পাওয়া গেল। পথ দেখালেন পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব (চীফ সেক্রেটারী) জনাব আজিজ আহমেদ সাহেব। এই ভদ্রলোককে আমি বেশ ভালভাবেই জানি। তিনি ১৯৩৯ সাল থেকে কয়েক বছর রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অ-বাঙালী, অত্যন্ত সুন্দর সু-পুরুষ চেহারা। তখন তরুণ যুবক মাত্র। রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালেই তিনি বিয়ে করে আসেন। তারুণ্যের অনেক দোষ ও গুণও তাঁর মধ্যে ছিল। দোষের মধ্যে প্রধান ছিল, তিনি অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী। মুসলিম লীগের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। পাকিস্তান আন্দোলন জোর চলছে। জনাব আহমেদ সাহেবকে দেখেছি, তখনই তিনি একজন পুরোদস্তর পাকিস্তানী শাসক। তিনি রাজসাহীতে থাকা কালেই, রাজসাহীর তৎকালীন কংগ্রেসী নেতা শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, এম, এল, এ মহাশয়কে এক অশিষ্ট ভাষায় পত্র লেখেন। কথায় আছে, জলের ছিটা দিলেই চ'ড়ের গুঁতা খেতে হয়। ঐ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। সুরেন্দ্রমোহনও তার যোগ্য উত্তরই দিয়েছিলেন। ঐ ঘটনা নিয়ে তখন রাজসাহীতে ভদ্রস্থানীয় শিক্ষিত সকল লোকের মধ্যেই খুব মুখরোচক আলোচনা হয়। আহমেদ সাহেব আমার উপরেও খুব কুপিত হয়েছিলেন ; কারণ, আমি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী এবং আমি আমার গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সহযোগীতায় গ্রামগঠনের কাজ আরম্ভ করছি। ইউনিয়নের লোক হচ্ছে, শতকরা আশী (৮০) জনের উপরে মুসলমান। তাঁরা সকলেই আমার ও আমার মাধ্যমে কংগ্রেস-ভক্ত হয়ে উঠেছে। এটা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি

মাত্র সাত-আট মাস প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেম। ঐ সময়ের মধ্যেই ইউনিয়নে ১৬১৭ মাইল নতুন রাস্তা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্যে তৈরী করা হয়। পাড়ায়-পাড়ায় নৈশ বিদ্যালয় করে প্রায় ৭৫০ (সাড়ে সাত শত) ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, গ্রামে উমেশ স্মৃতি লাইব্রেরী নামে একটি পাঠাগার ও একটি স্থায়িভাবে 'থিয়েটার হল' প্রভৃতি অনেক কাজই আরম্ভ করা হয়, এই সব কাজে ইউনিয়ন বোর্ডের নিজ তহবিল থেকে এক পয়সাও খরচ হয় নি। এই সবই হয়েছে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং তাঁদেরই অর্থানুকূল্যে। তৎকালীন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান—জনাব মণিরুদ্দিন আখন্দ, বি, এল ও সদর এস, ডি, ও—জনাব সিরাজুল করিম সাহেব গিয়ে সবই দেখেছেন, এবং কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জনাব সিরাজুল করিম সাহেবের কাছেই তৎকালে আমি শুনেছিলেম যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আহমেদ সাহেব না কি ঐ সব কাজ সত্ত্বেও আমার উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। বিরূপ না-হবেনই বা কেন? ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকেই আমাকে বন্দী করার জন্য শহর থেকে যেদিন আই, বি পুলিশ আমার গ্রামের বাড়িতে দেখা দিলেন, সেই খবর বিদ্যুদ্বেগে সারা ইউনিয়নে মুহূর্ত মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার মুসলমান ও হিন্দু জনতা সব রকমের গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র—ঢাক, ঢোল, কাঁশি—প্রভৃতি নিয়ে আমাকে বিদায় দিতে আসেন। একজন হিন্দুর—সেই হিন্দু আবার কংগ্রেসী হিন্দু, তার মুসলমানদের মধ্যে এই প্রভাব দেখে জনাব আজিজ আহমেদের মত একজন পুরো হিন্দু-বিদ্বেষী এবং পাকিস্তানপন্থী জেলা-শাসক বিরূপ না হয়ে পারেন? তাঁর এই বিরূপ মনোভাব আমার জীবনে চরম আঘাতই হেনেছে। মাতৃহারা আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে আমার ছোট ভাই—শ্রীমান জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী (সম্প্রতি, পরলোকগত) আমার বন্দীকালেই দেয়। সেই বিয়ে উপলক্ষে জিতেশ বহু চেষ্টাই করেছিল, আমাকে অন্তত ৭ দিনের জন্যও 'প্যারোলে' ছেড়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু তা হয় নি। পরে আমার বন্দীদশাতেই সেই মেয়ে তার বিয়ের এক বছরের মধ্যে তার শ্বশুরবাড়ি—দিনাজপুর শহরে মারা গিয়েছে। আমি যখন হিজলি বন্দীশালায় বন্দী, তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এক চিঠিতে জানতে পারি যে গ্রাম-সংগঠনের কাজে আমার ইউনিয়ন জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় বোর্ডকে দেওয়া হচ্ছে "শিল্ড" এবং আমাকে দেওয়া হবে, ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন ও সার্টিফিকেট। আমি তার উত্তরে জেলা

ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানিয়েছিলেম যে "সেই সরকার জনগণের সরকার নয়—যে জনগণের সেবা করে, তাকে গণ্য করা হয় সরকারবিরোধী বলে। আমি জনগণেরই সেবা করেছি—সরকারের নয়, সুতরাং তার জন্য যে পুরস্কার আমার পাওনা, তা আমি সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি, আমার বন্দিত্বের মধ্যে। এখন যে সব পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, তা আমার জন্য নয়।" এই পত্রখানি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিশ্চয়ই মুখরোচক হয় নি। সেইরূপই আমি ১৯৩৫ সালের শেষে মুক্তির পরে শুনেছি এবং আমি পূর্ববঙ্গ বিধানসভার সদস্য থাকা কালেও আহমেদ সাহেবের আমার প্রতি বিরূপ মনোভাবের বহু 'নজির' দেখেছি।

এই সবই গেল তাঁর দোষের কথা। গুণও তাঁর ছিল। তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী হলেও একজন দক্ষ পাকিস্তানী প্রশাসক ছিলেন এবং তাঁর এই গুণের জন্যই তিনি প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি সাহেবেরও খুব সু-নজরেই ছিলেন। আজিজ আহমেদ সাহেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য জন-সমক্ষে তুলে ধরার জন্যই এত কথা বলতে হ'ল, কারণ, এই ভদ্রলোকের অনেক কীর্তির সাথেই আমাদের পরবর্তীকালে পরিচয় ঘটবে।

এহেন করিৎকর্মা মুখ্যসচিব—আজিজ আহমেদ সাহেব—এখন আজাদ পূর্ববঙ্গের প্রথম মুসলিম-লীগ মন্ত্রিসভার সাহায্যে এগিয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব একজন ধর্মভীরু মুসলমান হলেও, পূর্বেই বলেছি যে তিনি ছিলেন ইংরেজের হাতে ও ছাঁচে গড়া একজন রাজনীতিক নেতা; তাই তাঁর মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবই অত্যন্ত প্রবল ছিল। কোরাণ ও সুন্নার পবিত্র বাণীর পরেই, বোধহয় তাঁর কাছে পবিত্র ছিল আমলাদের বাণী! আজিজ আহমেদ সাহেব পূর্বোক্ত সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায়, নাজিমুদ্দিন সাহেবের ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছে "মুস্কিল আসান" হ'য়ে দেখা দিলেন। আহমেদ সাহেব যুক্তি দেন—"হিন্দুদের বড় বড় অনেক বাড়িই তো ঢাকা শহরে আছে; সেই বাড়িগুলো সব হুকুম-দখল (রিকুইজিশন) করে নিলেই বাসস্থান বাড়ির সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে; আর ইডেন গার্লস কলেজের সুবৃহৎ অঙ্গন সহ বাড়িটি নিয়ে, সেখানে সচিবালয় (সেক্রেটারিয়েট) এবং জগন্নাথ হলের ছাত্রাবাসটিকে নিয়ে সেখানে বিধানসভা ভবন করলেই সমস্যার সমাধান হয়। হাইকোর্টের জন্য তো কার্জনী আমলের ঘোষিত পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশের হাইকোর্টের জন্য তৈরী বাড়িটিই আছে। সেখানেই

'হাইকোর্ট' ভবন করা যেতে পারে।" এই প্রস্তাব মন্ত্রীদের কাছে মুস্কিল আসান স্বরূপ দেখা দেয়। কয়েক শো, হিন্দুবাড়ির হুকুম-দখলের নোটিশ তখনই বের হয়ে গেল। আরম্ভ হল, বড় বড় কর্মকর্তাদের ও মন্ত্রীদের বাসস্থান ছাড়াও কেরানীকুলের বাসের জন্ম বাড়ির হুকুম-দখল! হিন্দুদেরও তখন আর এই মনোবল নেই যে তাঁরা ঐসব বে-আইনী হুকুম-দখলের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে আইনের আশ্রয় নেন; সুতরাং, সব কিছুই নির্বিবাদেই চলতে থাকে।

শুনেছি, পশ্চিমবঙ্গেরও শহরে শহরে সরকারী কর্মচারীদেরও বাসগৃহের সমস্যা পূর্ববঙ্গের মত অতটা উৎকটরূপে দেখা না দিলেও কিছু কিছু দেখা দিয়েছিল। তাঁরা কিন্তু আফিসের জন্ম বাড়ির হুকুম-দখল ছাড়া কর্মচারীদের বাসের জন্ম বে-আইনীভাবে কারো বাড়ি, খুব বেশি হুকুম-দখল করেন নি। দুই একটা যা করেছিলেন, তাও বাড়ির মালিক আইনের আশ্রয় নেওয়ায় বিচারে হুকুম-দখলের আদেশ বাতিল হয়ে যাওয়ায় ছেড়ে দিতে হয়েছে। কর্মচারীদের নিজেদেরকেই খুঁজে-পেতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁদের বাসস্থান ঠিক করতে হয়েছে।

আইন, পূর্ববঙ্গেও একইরূপই ছিল। সেখানেও তা-ই হতে পারতো। তা হ'লে বাড়ির মালিকদের সম্মতিতেই হ'ত এবং তাঁরা হুকুম-দখল করা বাড়ির চেয়ে ভাড়াও কিছু বেশি পেতেন। কিন্তু তা হয় কি করে? তা হ'লে তো পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়? হিন্দুর সাংস্কৃতিক ও আর্থিক প্রভাবের প্রতি ঈর্ষাবশেই তো পাকিস্তান-আন্দোলনের সৃষ্টি। সেই প্রভাবই যদি ক্ষুন্ন করা না গেল তবে আর 'পাকিস্তান' কিসের? সুতরাং আজিজ আহমেদী নীতিরই জয় হয়!

পূর্বেই মুসলিম লীগের, তথা তৎকালীন পাকিস্তান-রাজনীতির স্বরূপ ও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছি। পাকিস্তান-রাজনীতির লক্ষ্যই ছিল, শুধু মুসলমানের জন্যই একটি মুসলিম রাষ্ট্র গড়া। সেই উদ্দেশ্যেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রচার। তাঁদের মতে মুসলমানগণ, অ-মুসলমানগণ থেকে একটা সম্পূর্ণ পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি (নেশন) এবং এই এক রাষ্ট্রীয় জাতি (নেশন) দ্বারাই পাকিস্তান গড়াই ছিল, মুসলিম লীগ নেতাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। এই আদর্শ সু-সম্পন্ন করার জন্তই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো থেকে অ-মুসলমান বিতাড়নের কাজ পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করার সাথে সাথেই আরম্ভ হ'য়ে যায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর তো আর কথাই নেই! আন্দোলন কাজে রূপ নেয় এবং অত্যন্ত জোরদার হ'য়ে উঠে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট; আর ১৯৪৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিম পাঞ্জাবের ইংরেজ লাট সাহেব—স্যার ফ্র্যান্সিস মুডী সাহেব—পাকিস্তানের জনক, গভর্নর জেনারেল জনাব জিন্নাহ সাহেবের কাছে যে চিঠি দেন তা'তেই শিখদের বিতাড়নের পরিকল্পনার কথা জানা গিয়েছে। ঐ পরিকল্পনার ফলেই পাকিস্তান-সৃষ্টির নয় মাসের মধ্যেই রক্ত ও অশ্রুর বন্যায় অ-মুসলমানগণ ভেসে খণ্ডিত ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নয় মাসের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশগুলোই অ-মুসলমান-শূন্য হয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে দেশ-বিভাগের সময় এক কোটি ত্রিশ লক্ষেরও কিছু বেশি হিন্দু ছিল। তাঁদেরও তাড়ানোর ব্যবস্থা তো করা চাই। তাই, মুসলিম লীগের নেতারা তাঁদের সংস্থার 'ন্যাশনাল গার্ড' নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে গ্রামে গ্রামে বের ক'রে দেন, দ্বি-জাতিতত্ত্বকে ভালভাবে প্রচার করতে এবং অ-মুসলমানরা যে পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এ কথা সকলকে ভালভাবে জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিতে। গ্রামে গ্রামে হিন্দু জনসাধারণ আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েন। নানা ধরণের অত্যাচার ও জোর-জুলুমও তাঁদের উপর চলতে থাকে। এ অবস্থায় তাঁদের রেখে কে? পুলিশ কিছুই করে না; উপরন্তু অভিযোগ করলে আরও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। সেই অবস্থায় তাঁরা যান কোথায়? কার কাছে তাঁদের দুঃখের কথা জানাবেন? স্বভাবতই তাঁদের দৃষ্টি পড়ে তাঁদেরই ভোটে নির্বাচিত বিধানসভার প্রতিনিধির দিকে। আমার জেলায়—রাজসাহীতে ১৯৪৬ সাল থেকে আমিই ছিলাম, সেই একমাত্র প্রতিনিধি। রাজসাহী জেলায় ১৯৩৫ সালের আইনে এসেম্বলির সদস্যরূপে নির্বাচিত হতেন মাত্র পাঁচজন সদস্য। তার মধ্যে চারজন হলেন মুসলমান, আর একজন মাত্র হলেন অ-মুসলমান সদস্য। আমিই ছিলাম সেই অ-মুসলমান সদস্য। আমার নির্বাচনে দ্বিতীয় কোন প্রার্থীই আমার বিরুদ্ধে 'নমিনেশন'পত্রও দাখিল করেন নি। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলা দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার নামই নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়, নির্বাচনপত্র বাছাই করার (Scrutiny) দিনেই। এতখানি বিশ্বাস ও ভালবাসা যে জনসাধারণের ছিল আমার উপর, সেই জনসাধারণই আজ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দিশেহারা হ'য়ে আমার কাছে ছুটে আসছেন, তখন আমি তাঁদের এই বিপদে—এই দুর্দিনে দূরে সরে থাকি কেমন করে?

খণ্ডিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বরূপ দেখে মনে যত অবসাদই আসুক না কেন, তা'কে কাটিয়ে উঠে বিপন্ন জনসাধারণের সামনে আমাকে দাঁড়াতেই হয়। প্রতিদিন গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক আসেন নানা অভিযোগ নিয়ে কেউ বা বলেন, তাঁর পুকুরের মাছ জোর ক'রে জাল দিয়ে মেরে নিয়েছেন মুসলমানরা,—কেউ বা বলেন; তাঁর জমি বেদখল করে নিয়েছে, কারো বাড়ি জবর-দখল হয়েছে, কারো ঝাড়ের বাঁশ, কারো বা জমির ফসল জোর ক'রে কেটে নিয়ে গিয়েছে। কেউ বা বলেন, তাঁরা রাস্তা দিয়ে খোল বাজিয়ে সন্ধ্যার পর কীর্তন ক'রে বরাবরের মতই যাচ্ছিলেন কিন্তু একদল লোক হঠাৎ তাঁদের উপর আক্রমণ ক'রে মার-ধর করেছে ও তাঁদের খোলও ভেঙে দিয়েছে। এম্‌নি নানা ধরণের নানা অভিযোগই প্রতিদিন আস্‌তে থাকে। অভিযোগের গুরুত্ব অনুসারে কোনও কোনও অভিযোগ নিয়ে আমিও প্রয়োজনবোধে তখনই ছুটি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে। তখন রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে এসেছেন, খন্দকার আলি তায়েব সাহেব। তার আগে দেশবিভাগের আগে ছিলেন, লেঃ কর্নেল ম্যাক্ নীল (Lt. Col. Mc Neil) সাহেব। খন্দকার আলি তায়েব ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার সালারের এক বিশিষ্ট ঘরের সন্তান। এঁর ছোটভাই, খন্দকার আলি আফ্‌জল সাহেবকে ১৯৪৬ সালে দেখেছি বেঙ্গল এসেম্বলির সেক্রেটারী হিসাবে। খন্দকার আলি তায়েব সাহেব মাত্র বছরখানেক রাজসাহীতে ম্যাজিস্ট্রেটরূপে ছিলেন; তাঁর মধ্যে আমি সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও কখনও দেখি নি; বরং দেখেছি, দেশে যাতে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকের পারস্পরিক সাহচর্যে একটা সম্মিলিত পাকিস্তানী জাতি (নেশন) গ'ড়ে ওঠে, সেই চেষ্টাই করতে। সেই চেষ্টাকে কার্যকরী করতে হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন থেকে আতঙ্ক ও আতঙ্কের কারণ দূর করা দরকার, আর তা' করতে গেলেই ন্যায়ের ভিত্তিতে সু-বিচারের প্রতিষ্ঠা করা সর্বপ্রথমে দরকার। তিনি তা-ই করতে লাগলেন কিন্তু ফল হ'ল কি? ফল হ'ল—মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর নাম পড়ে গেল—কালী তায়েব)। অর্থাৎ তিনি মুসলমান নন—তিনি একজন প্রচ্ছন্ন হিন্দু! রাজসাহীর মুসলমান এম্‌, এল্‌, এ-দের মধ্যেও কেউ কেউ মন্ত্রীদের কাছে দরবারও করলেন. ঐ ম্যাজিস্ট্রেটকে রাজসাহী থেকে অন্যত্র বদ্‌লি করার জন্য। একদিন আমাদের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী বন্ধু, জনাব ফজলুল হক্ সাহেবের

কৃষক-শ্রমিক দলের নেতা কুষ্টিয়ার জনাব সামসুদ্দিন সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেলেন, রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নাকি আমার কথা ছাড়া আর কোনও মুসলমান এম. এল্. এ-দের কথা শোনেন না ? তদুত্তরে তাঁকে সেদিন আমি বলেছিলেম—"আমি তো তা' জানি না; আর, আমি তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে কখনও ব্যক্তিগত কোন কাজের জন্য অনুরোধ করি না। আমি তাঁর কাছে জনস্বার্থের আবেদন নিয়েই ন্যায়বিচারের আবেদনই কেবল করে থাকি। তিনি করেনও। তা'তে কি তিনি অন্যায় করেন?" সাম্‌সুদ্দিন সাহেব আর কোনও উত্তর দেন না; তবে আমি বুঝি যে আমার জেলার মুসলমান 'এম্, এল্, এ'-দের অভিযোগই তাঁর মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে মাত্র। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিধানসভার সদস্যদের চাপ; বড় ভীষণ চাপ মন্ত্রীরা যদি মন্ত্রিত্বের গদি আঁকড়িয়ে থাকৃতে চান, তাহলে সদস্যদের চাপের কাছে তাঁদের নতি স্বীকার করতেই হয়, নচেৎ মন্ত্রিত্বে সমাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলও সংখ্যালঘু দল হ'য়ে যেতে বেশি দেরি লাগে না। পশ্চিম বাংলায় এসেও দেখেছি, এখানেও সময়ে সময়ে জেলা পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা বা শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিক দলের নেতারা দলীয় স্বার্থের নামে মন্ত্রীদের কাছে পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের কোনও কোনও লোককে বদলি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন। কোন কোনও মন্ত্রী মহাশয়কে অবশ্য দেখেছি যে তাঁরা ঐ চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন; আবার কোন কোনও ক্ষেত্রে নতি স্বীকার না করতেও দেখেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব ও পূর্ণ দায়িত্ববোধ জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির এইরূপ বিপদ থেকেই যায়। এইরূপ বিপদের মাত্রা পূর্ববঙ্গে, তথা পূর্ব পাকিস্তানে বেশ একটু বেশি পরিমাণেই দেখেছি। সেইজন্যই সেখানে ঘন ঘন মন্ত্রিত্ব বদল হয়েছে—সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

আলি তায়েব সাহেবের ব্যাপারেও দেখেছি, পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীরা রাজসাহীর মুসলমান সদস্যদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করেছেন। কিঞ্চিদধিক এক বছরের মধ্যেই তাঁকে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের গদি থেকে সরিয়ে নিয়ে ঢাকায় সচিবালয়ে সম্মানিত (dignified) কেরানীর পদে অপসারণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যতদিন রাজসাহীতে জেলাশাসকের পদে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁর কাছে অভিযোক্তা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সুবিচারই পেয়েছেন; ফলে,

রাজসাহী জেলা থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপক কোনও বাস্তুত্যাগ হয় নি। আলি তায়েব সাহেবের আমলের দুই একটি ঘটনা মাত্র এখানে উল্লেখ করছি।

পূর্বেই বলেছি, প্রতিদিন গ্রাম গ্রামান্তর থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে আমার কাছে তাঁদের নানা অভিযোগ জানাতে থাকেন এবং আমিও, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে তখনই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোতে গিয়ে তাঁর কাছে অভিযোগপত্র দিই। তিনিও সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট থানা-অফিসারের কাছে তদন্ত করে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ ঐ দরখাস্তের উপরেই লিখে দেন। এইভাবেই কাজ চলছিল। এমন সময়ে একদিন খবর পেলাম, গোদাগাড়ী থানায়, থানার অতি নিকটেই—এক ক্যাম্পং-এর মধ্যে—হিন্দু সম্প্রদায়ের এক কালোয়ার শ্রেণীর ভদ্রলোকের (বর্তমানে, তাঁর নাম মনে নেই) বাড়ি বেলা প্রায় ১০।১১টার সময়ে সকলের সামনেই এক মুসলমান জনতা এসে লুঠ করেছে। সেখানে হিন্দুরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। থানা থেকে তখন পর্যন্ত কোন লোককেই ঐ অপকর্মের জন্য ধরা হয় নি বা দোষী ব্যক্তিদের ঘটনার পর তিনদিন হয়ে গেলেও খুঁজে বের করারও বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হয় নি। খবর পেয়েই আমি ছুটলেম গোদাগাড়ীর দিকে। আমি সাথে নিলেম আমার সহকর্মী একদল হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিক কর্মীকে। সকলের নাম আজ আমার মনে নেই; তবে, যাঁরা যাঁরা সেদিন আমার সাথে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীসুধাংশুমোহন চৌধুরী (চক্র), শ্রীবীরেন সরকার, (উভয়েই স্বাধীনতার সংগ্রামে বহু বছর জেলে কাটিয়েছেন) ও মিঃ একরামুল হক, শ্রীদ্বিজেন্দ্রমোহন মৈত্র (গোরা—বর্তমানে পরলোকগত) প্রমুখ যে ছিলেন তা' আমার মনে আছে। আমরা গোদাগাড়ীতে পৌছাই সন্ধ্যার পরে এবং পর দিন সকালে প্রথমেই থানায় গিয়ে ঘটনার বিবরণ এবং তাঁরা কতদূর কী করেছেন তা জানতে চেষ্টা করি। শুধু এইটুকু তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারি যে তাঁরা যথাশক্তি চেষ্টা করেও দোষী ব্যক্তিদের তখন পর্যন্ত সন্ধান করতে পারেন নি।

এর পরে আমি আমার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যাই ঐ লুণ্ঠিত বাড়িতে। গিয়ে দেখি, বাড়ির দালানের ভিতের সাথে এক লোহার আলমারি গাঁথা ছিল, সেটাকেও দেওয়াল ভেঙে নিয়ে গিয়েছে এবং বাড়িতে একটি সূঁচ

পর্যন্তও নেই—সবই যেন ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গেছে। এতেই বোঝা যায় যেন লুণ্ঠন কাজ সম্পূর্ণ করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় অন্তত লেগেছে। তার মধ্যেও থানা থেকে কোন সাহায্যই আসে নি। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সব দেখে, আশেপাশের গ্রামের মুসলমান নেতাগণকে ও ২১১টি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণকে ডেকে পাঠাই। এক্ষেত্রে আমার একটু সুবিধা এই ছিল যে, বহু বছরের স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে আমার জেলার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেই আমি একাধিকবার গিয়েছি এবং তার ফলেই, জনসাধারণের ও তাঁদের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যেও আগে থেকেই আমার বেশ একটা পরিচিতি ছিল। মুসলিম লীগ আমলে যে রাজনীতিক মতবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়েছে, তাতে মুসলমান নেতারা সকলেই যে আমার জাতীয়তাবাদী নীতি সমর্থন করতেন না, সেটা তো সকলেরই—আমারও জানা কথা ; তবু, আমি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি যে আমার মতবাদ মুসলমান নেতারা সমর্থন না করলেও, ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যথেষ্টই ছিল। তাই, তাঁরা সেদিন আমার ডাকে সাড়া দিয়ে সকলেই এসেছিলেন। সেদিন আমি তাঁদের কাছে কী মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন করেছিলেম তা—আজ কেন, তখনও আমার পক্ষে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভবপর ছিল না, তবে এইটুকু বলতে পারি যে সেদিন যেন আমার মধ্যে এক ঐশ্বরিক শক্তির খেলা শুরু হয়েছিল এবং ঐ শক্তিই সেদিন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানবতার কাছেই আবেদন করেছিল! আমি যেন সেদিন আবিষ্ট (inspired) হয়েই সারা অন্তর থেকে তাঁদের সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে নিবেদন করেছিলেম যে তাঁরা যেন সকলেই সহযোগিতা করে দোষী ব্যক্তিদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মালপত্র ফেরৎ দেওয়ার পক্ষে সাহায্য করেন এবং আমি তাঁদের কথা দিয়েছিলেম যে, যদি সব মালপত্র দোষী ব্যক্তিরা তাঁদের অপরাধ স্বীকার করে ফেরৎ দেন, তাহলে আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবো যে কারো যেন তার জন্ত কোনও শাস্তি না হয়। আবেদনের ফল, আশ্চর্যজনকভাবে ফললো। মুসলমান নেতারাই লুণ্ঠনকারী প্রত্যেকটি লোককে ডেকে সব জিনিস ফেরৎ দিতে বা যে জিনিস তাঁরা নিজেরা ব্যবহার করে ফেলেছেন (চাল-ডাল-আটা-চিনি-গুড় প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যও লুণ্ঠিত মালের মধ্যে ছিল), তার বর্তমান বাজার দর অনুসারে দাম দিতে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই যে জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে তার মূল্য বাবদ আদায় হল ১১,০০ শত টাকা এবং অন্যান্য সব

জিনিসই ফেরৎ এল। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি দোষী ব্যক্তি অপরাধের স্বীকৃতিতে লিখে (সাক্ষীসহ নিজের নাম সহি বা আঙ্গুলির টিপ ছাপ দিয়ে) দিলেন যে কি কি জিনিস তাঁরা ফেরৎ দিলেন।

পুলিশ তিন দিনের মধ্যেও যা করতে পারেন নি বা করেন নি, তা তিন ঘণ্টার মধ্যেই নেতারাই করলেন।

এখানে এই ঘটনাটির এত বিস্তৃত বিবরণ দিলাম, শুধু এই জন্যই যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের রীতি ও প্রকৃতি জানানোর উদ্দেশ্যে। তাঁরা স্বভাব-দুর্বৃত্ত বা সমাজ-বিরোধী নন ; ঘটনাচক্র ও রাজনীতিক নেতাদের অভিসন্ধিমূলক কারসাজিই নেতাদের রূপকে সময়ে সময়ে হিংস্র ও সমাজ-বিরোধী রূপে প্রকাশ করে। ব্যাপকভাবে যখন এই অবস্থা সমাজের মধ্যে দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার পেছনে নেতৃস্থানীয় লোকের চক্রান্তকারী মস্তিষ্কের খেলা আছে। আমার ধারণা, সরকার (গভর্নমেণ্ট) একটু সচেতন হয়ে নেতৃস্থানীয় নেতাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলেই অনেকক্ষেত্রেই ঐরূপ ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে পারেন। পূর্বেই বলেছি যে ১৯১০ সালের পূর্ববঙ্গের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় রংপুর জেলার আরক্ষাধ্যক্ষ (পুলিশ সাহেব) হিসাবে এই পন্থা অনুসরণ করেই, ঐ জেলায় কোনও হাঙ্গামাই হতে দেন নি।

যাক, গোদাগাড়ীতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং হিন্দুদের মনের আতঙ্ক কিছুটা পরিণামে দূর করে অপরাধী ব্যক্তিদের স্বীকৃতিপত্রের দলিলগুলো নিয়ে আমি রাজসাহীতে ফিরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—আলি তায়েব সাহেবকে সব দেখাই এবং ঘটনার সব কথাই তাঁকে বলি। সব শুনে, প্রথমে তো তিনি রাগে ফেটে পড়েন এবং বলেন যে, তিনি সকলকেই ধরে জেলে নিয়ে আসবেন। তাঁর সেই কথা শুনে আমি তো চরম বিপদ গণি এবং তাঁকে বিনীতভাবে জানাই যে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই আমি যে সেখানে সকলের সামনে কথা দিয়ে এসেছি যে, অপরাধীরা দোষ স্বীকার করে সব লুণ্ঠিত মালপত্র ফেরৎ দিলে অপরাধী ব্যক্তিদের কারো কোনও শাস্তি যাতে না হয়, তার জন্যই আমি চেষ্টা করবো এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আমার অনুরোধ জানাব। সাহেব সবই শুনলেন—কিছুক্ষণ স্থির নিশ্চলভাবে বসে চিন্তা করলেন এবং পরে বললেন—"আপনি কংগ্রেসের নেতা—আপনি জনসমক্ষে যে কথা দিয়ে এসেছেন, তার একটা মর্যাদা নিশ্চয়ই আছে, সে

মর্যাদা রক্ষা করাই উচিত। আমি সে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। আমি ঐ ব্যাপার নিয়ে আর অগ্রসর হব না।" আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আজ এই ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে—সেই দিন আর এই দিন! সেই 'কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মী' আর আজকের কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মী? আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেদিনের কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মী সম্পর্কে দেশীয় ও বিদেশীয় পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও একটা শ্রদ্ধার—একটা সন্ত্রাসের ভাব দেখেছি। তাঁরা আমাদের কাজ সমর্থন করেন নি বটে আমাদের রাজনীতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য 'জেল'-ও দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আমাদের সম্পর্কে তাঁরা শ্রদ্ধা হারান নি। এটা যে শুধু খন্দকার আলি তায়েব সাহেবের মত একজন দেশীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেখেছি, তা নয়। খাস ইংরেজ আই সি এস জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও দেখেছি। ১৯৩১ সালে গান্ধী আরউইন চুক্তির বলে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এসেই আমি রাজসাহী জেলার বাগমারা থানার অধীন বৃকুৎসার জমিদারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আন্দোলন শুরু করি। তখন রাজসাহীতে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এল জি পিনেল (Mr. L. G. Pinnel, I. C. S.)। সাথে বৃকুৎসার ঐ আন্দোলন নিয়ে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা হয়। সে বাক্-বিতণ্ডা ঝগড়ার পর্যায়েই যায়। বৃকুৎসার জমিদারীর এলাকায় প্রজার শতকরা ৯২ শতাংশই হচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক; আর, জমিদার হচ্ছেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। এই জমিদারের এলাকায় প্রজা-পীড়ন এমন বীভৎসভাবে বহুদিন যাবৎ চলছিল, যেমনটি জমিদার প্রধান রাজসাহী জেলায় এক মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর সাহেব জমিদারদের অধীন বিলমাড়িয়া কনসারণ ছাড়া আর কোথায়ও আমি দেখি নি। এই জমিদারের এলাকায় আন্দোলন করার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বলেন যে, কংগ্রেস থেকে ঐ আন্দোলন চালানোর উদ্দেশ্যেই নাকি মুসলমানগণকে কংগ্রেস-মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা। তা যে ছিল না, তা আমি বলি না। তার সাথে সাথে এটাও ছিল যে, কংগ্রেস নীতির তখন মূল কথাই ছিল, আর্ত ও বিপন্ন জনগণের সাহায্যে নিজেদের সব বিপদ তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়া। আমরাও তাই গিয়েছিলেম কিন্তু সাহেব দেখলেন, ব্রিটিশ-শাসন-নীতির সাম্প্রদায়িক ভেদ-সৃষ্টির নীতি ব্যর্থ হতে চলেছে। তাই, তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হন এবং দিন কয়েক পরেই আমাকে ১০৭ ধারায় জেলে নিয়ে যান। বিচারের একটা

প্রহসনও হয়। আমি তাতে কংগ্রেস সেবক হিসাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিনে। বিচারে আমার এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। ঐ ধারায় জামিন-মুচলেকা দিলে অবশ্য মুক্তি পাওয়া যায়। তখন রাজসাহী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (বড় সাহেব) ছিলেন, লিউক সাহেব (Mr. Luke)। তিনি আমাকে জামিন দিয়ে জেল থেকে মুক্তি নেওয়ার উপদেশ দেন! উদ্দেশ্য, আমার সম্পর্কে জনমনে যে শ্রদ্ধা ছিল, তা শেষ করে দেওয়া এবং আমার রাজনীতিক জীবনকে পঙ্গু করে দেওয়া। আমি তাঁকে যখন জানাই যে কংগ্রেসসেবী হিসাবে আমি তা করেতে পারি না, তখন তিনি আমাকে বলেন যে, পিনেল সাহেব না কি তাঁকে বলেছেন আমার সাথে ভাল ব্যবহার করতে। খবরটা আমার কাছে অদ্ভুত শোনায়। যে পিনেল সাহেব আমাকে জেলে পাঠালেন, সেই পিনেল সাহেবই আবার আমার সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য জেলের বড় সাহেবকে নির্দেশ দিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসের কর্মীর সম্পর্কে এমনই একটা শ্রদ্ধার আসন ছিল, সেকালের সরকারী পদস্থ কর্মচারীদেরও মনে। আলি তায়েব সাহেবের ও পিনেল সাহেবের মধ্যে তারই অভিব্যক্তি দেখেছি। জনসাধারণের মনে যে কংগ্রেস ও কংগ্রেস কর্মীদের সম্পর্কে কতখানি শ্রদ্ধার আসন ছিল, তা দেশবাসী সকলেই জানেন। সে সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ২৫।২৬ বছরের গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কর্মীগণ তাঁদের জনসেবা, ত্যাগ ও দুঃখকষ্ট বরণের মধ্য দিয়ে যে একটা শ্রদ্ধার আসন দেশে ও বিদেশে গড়ে তুলেছিলেন, তার কীভাবে কংগ্রেসী দুঃশাসনে পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তার একটা 'নজির' এখানে তুলে ধরছি। শ্রীবীরেশ চক্রবর্তী, বি এল, আমার একজন অত্যন্ত স্নেহের পুরনো সহকর্মী ছিল। সে দেশের স্বাধীনতার জন্য বহু বছর জেলেও খেটেছিল। দেশ বিভাগ হয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সে কলকাতায় চলে আসে। এদিকে এসেও সে প্রথম কিছুদিন কংগ্রেসরই কাজ করে কিন্তু নৈষ্ঠিক ত্যাগী কর্মী হিসাবে আর শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে থাকতে পারে না। সে কংগ্রেস ছাড়ে কিন্তু কংগ্রেসের নীতি ও 'খদ্দর' ছাড়ে না। একদিন সে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রাম গাড়িতে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরে আর এক ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে বীরুর পাশে এসে বসেন। তিনি বীরুর পোষাকের দিকে বেশ লক্ষ্য করে দেখে তাকে বলেন—"দাদা! মনে হচ্ছে আপনি একজন কংগ্রেসী। আপনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে চলেছেন!

এখনও কিছু যোগাড় করে উঠতে পারেন নি ?" তাই বলছিলেম—সেই দিন, আর এই দিন ! জনমনে কী আকাশ-পাতাল পরিবর্তন !

যাক, আলি তায়েব সাহেবের কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মী সম্পর্কে উক্তিটি বলতে গিয়ে এত কথা বললেম। আমি মহাত্মা গান্ধীর বা খান আব্দুল গফুর খাঁনের মত সত্যাশ্রয়ী শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেম না—আমি ছিলেম, একটি মফস্বল জেলার একজন সামান্য কংগ্রেস-সেবক ; তবু, কংগ্রেস যে সেবা, ত্যাগ ও সত্যসন্ধিতা দিয়ে সেকালে যে একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন, সেই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েই আলি তায়েব সাহেব জনসমক্ষে আমার কথা-দেওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছিলেন—কারো বিরুদ্ধেই আর তিনি কোন শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে আবার যথারীতি আমার কাজে মন দিই।

এই ঘটনার পরে মাত্র কয়েকদিন কেটেছে। এর মধ্যেই আর একটি দুঃসংবাদ এসে আমার কাছে পৌঁছয়। এবারের দুর্ঘটনার অকুস্থলটি আমারই গ্রাম—আড়ানী। এই গ্রামটি চারঘাট থানার মধ্যে এবং থানা থেকে ৬।৭ মাইল দূরে। সরদহ ও চারঘাটের মধ্য দিয়ে পদ্মা থেকে বড়াল নদী বের হ'য়ে গিয়েছে। এই বড়াল নদীরই ধারে আড়ানী গ্রামটি : বেশ বড় একটি বন্দর। বাজারে অনেকগুলো বড় বড় স্থায়ী দোকান ও কারবারী গুদাম ও দোকানও সেখানে আছে। সেই সব মহাজনেরা প্রতি বছর তাঁদের ব্যবসায়ের উপর ঈশ্বর-বৃত্তি ব'লে একটা চাঁদা আদায় করেন এবং তা' দিয়ে বেশ ধুমধামের সাথেই দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি ক'রে থাকেন। বাজারের উপর টিনের পূজামণ্ডপ ও টিনেরই প্রকাণ্ড এক বারচালা ঘর তাঁরা তৈরী করে রেখেছেন। ঐ বারচালা ঘরে পূজো উপলক্ষে বড় বড় যাত্রার দলও তাঁরা নিয়ে আসতেন। দেশ-বিভাগের পরেই সম্মুখে দুর্গাপূজা। ঐ পূজারও তাঁরা আয়োজন করেছেন। প্রতিমা গড়া হয়েছে। একদিন সকালে দেখা গেল, কে বা কা'রা ঐ প্রতিমা ভেঙেছে এবং অপবিত্র করেছে। হিন্দুরা, ঐ ঘটনায় অত্যন্ত মন-মরা হ'য়ে পড়েছেন। তাঁরা স্থির করেছেন, আর পূজো করবেন না—পাকিস্তানে হিন্দুর পূজো আর বোধ হয় চলবে না ! তাঁরা পূজো না করবার সিদ্ধান্ত করেছেন কিন্তু ঘটনাটির বিষয়ে থানাতে কোনও এজাহার দেন নি, তাঁদের আশঙ্কা 'এজাহার' দিলে আবারও হয়তো, আরও বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। লোকের মুখে মুখে কিন্তু থানায় খবরটি গিয়ে

পৌঁচেছে, যেমন ভাবে পৌঁচেছে আমার কাছে। খবরটি শুনেই আমি ছুটে যাই, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলি তায়েব সাহেবের কাছে। তিনি সব শুনে, তখনই সদরের এস, ডি, ও সাহেবকে ডেকে আদেশ দেন যে আমাকে সাথে নিয়ে তিনি যেন 'জীপে' অবিলম্বে ঘটনাস্থলে রওনা হ'য়ে যান। আমরা সাহেবের কুঠি থেকেই রওনা হ'য়ে যাই। যখন আমরা আড়ানীতে পৌঁছলেম, তখন দেখি চারঘাট থানার বড় দারোগা আমাদের একদিন আগেই খবর শোনামাত্র ঘটনাস্থলে এসে পৌঁচেছেন এবং হিন্দু-মুসলমান সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডেকে একটা আপোষের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। কোন কোন মুসলমান নেতাই টাকা দিয়ে আবার প্রতিমা গড়ার কাজ সুরু করে দিয়েছেন এবং হিন্দুকেও রাজী করিয়েছেন, তাঁদের পূজো যথারীতি ক'রে যেতে।

সব শুনে খুশিই হলেম। গোদাগাড়ীতে থানার দারোগাদের একরূপ দেখেছি, আর এখানে এসে দেখছি, আর এক রূপ! গোদাগাড়ী থানাতে খবর দেওয়া সত্বেও তাঁরা কিছু করেন নি, আর এখানে থানায় কোন 'এজাহার' করা না হলেও দারোগা ছুটে গিয়েছেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা শান্তি স্থাপনও করেছেন। আমি সেদিন ঐ গ্রামে প্রকাশ্য জনসভায় দারোগার প্রশংসাই করেছিলাম এবং পরে জেনেছি, আমার প্রশংসার ফলে দারোগা সাহেব পুলিশ সাহেবের কাছ থেকে তিনশো টাকা পুরস্কার পেয়েছেন এবং আমি রাজসাহীতে থাকতে থাকতেই তিনি ইন্সপেক্টরের পদেও উন্নীত হয়েছিলেন।

এমনটি কেমন ক'রে হ'ল, তা নিয়ে অনেক ভেবেছি; দেখেছি, বিভিন্ন কারণেই হ'য়ে থাকতে পারে। দারোগাটি ছিলেন একেবারে তরুণ আন্‌কোরা। ঝানু দারোগার মত তখনও মুসলিম লীগের নীতি তাঁর মনে বাসা বাঁধতে হয়তো পারে নি; তাই, তিনি সেদিন সদিচ্ছাই দেখিয়েছিলেন। আরও একটি কারণ এর পিছনে থাকতে পারে। সেটি হ'ল তাঁর পেছনে কোন সদিচ্ছার প্রেরণা ছিল না—তাঁর পেছনে ছিল রাজনীতিক কারণ। সেই কারণটি হচ্ছে, মুসলিম লীগের একটা নীতি দেখেছি যে তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মকাজে যে-কোন বাধাই পাকিস্তানে দেওয়া হয় না, বরং তাঁরা যে পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার মধ্যেই তাঁদের ধর্মকার্য করেন, সেইটা প্রচারের দিকেই অত্যন্ত উৎসাহ দেখান। হয়তো বিশ্ব-জনমতকে ধোঁকা দেওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যই মুসলিম লীগ সরকার

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম-না-জানা অখ্যাত তথাকথিত নেতাদের দিয়ে সময়ে সময়েই ঐরূপ বিবৃতি লিখিয়ে নিয়ে তা' 'রেডিও' ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন! এইরূপ প্রচার আমি পাকিস্তানে থাকতেও চলতে দেখেছি এবং এখনও শুনছি, সেই প্রচারনাই চলছে! এই তো ২০।৫।৬৭ তারিখেই পাকিস্তান 'রেডিও'-তে বলতে শুনলেম যে পাকিস্তানের কোন এক বৌদ্ধ নেতা বলেছেন যে পাকিস্তানে বৌদ্ধরা এবং সংখ্যালঘুরা সম্পুর্ণ স্বাধীনভাবেই তাঁদের ধর্মকর্ম্মাদি করতে পারছেন ও তাঁরা নাকি সংখ্যাগুরু (মুসলমান) সম্প্রদায়ের মত সব বিষয়েই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হ'ল যে. ভারতে নাকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সে সুযোগ পান না এবং ভারত সরকারের এই অপকর্ম্মকে লোকচক্ষু থেকে ঢেকে রাখার জন্যই নাকি ভারত সরকার অহেতুক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক কুৎসার কথা প্রচার করেন! এই ধরণের বিবৃতি যে কিভাবে নেওয়া হয়, তা আমি পাকিস্তানে থেকে বিশেষ ভালভাবেই জানি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ডহীন লোকদের ডেকে নিয়ে পদস্থ কর্ম্মচারিরা যেমন বলেন, তেমনিই তাঁদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়।

আড়ানী গ্রামের প্রতিমা ভাঙার ব্যাপারে যে দারোগা সাহেব স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে গিয়েছিলেন, তার পেছনের কারণ এ-ও হ'তে পারে যে আমার চোখে ধূলো দিয়ে ঘটনাটিকে আড়াল করে রাখা। ঘটনাটি আমার গ্রামের—স্বভাবতই তা' নিয়ে হৈ-চৈ করা আমার পক্ষে সম্ভব; তাই আমার মুখ বন্ধ করা আগে দরকার। এ সবই অবশ্য পরবর্ত্তীকালের ঘটনাসমূহের গতি ও প্রকৃতি দেখে আমি অনুমান করছি। পেছনের কারণ যা-ই হোক, সেদিন আমি সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার জন্য নিজেও যেমন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেম, তখনই যে ব্যক্তিই শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন, তাঁরই আমি প্রশংসাও করেছিলেম। দারোগাটির কাজও আমি সেই হিসাবেই প্রশংসা করেছিলেম।

আড়ানী গ্রামে আসন্ন দুর্গাপূজার প্রতিমা-ভাঙার ব্যাপার নিয়ে হিন্দুদের মনে যে আতঙ্কের ও অবসাদের সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটা সুরাহা হওয়ায় হিন্দুদের মনে আবার কিছুটা উৎসাহ ফিরে আসে এবং হিন্দু-মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবার একটা সৌহার্দ্যের ভাব দেখা দেয়। ১৯৩৯ সালের শেষভাগে আমি আড়ানী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট

নির্বাচিত হওয়ার পরে যে অল্প কয়েক মাস মাত্র জেলের বাইরে মুক্ত অবস্থায় থেকে গ্রাম সংগঠনের কাজ করতে পেরেছিলেম, তাতে ঐ ইউনিয়নেই শুধু নয়—ঐ অঞ্চলেই সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। তারই জের তখনও আড়ানী ইউনিয়নে অন্তত কিছুটা ছিল। দুষ্ট প্রকৃতির লোকও যে ছিল না, তা নয়। সব সমাজেই ভাল লোকও যেমন থাকেন, দুষ্ট প্রকৃতির লোকও কিছু কিছু থাকেই। হিন্দুর মধ্যেও আছে; মুসলমানের মধ্যেও আছে। হয়তো, মুসলমানের মধ্যে তাদের সংখ্যা কিছু বেশিই থাকতে পারে। সেটাকে আমি অস্বাভাবিক মনে করি না। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে, অর্থনীতিক কারণই দেখা যায় তার মূলে রয়েছে। হিন্দুর চেয়ে মুসলমানরা আর্থিক দিক দিয়ে দরিদ্র; সুতরাং, শিক্ষায়ও পশ্চাদপদ। জমিদার-মহাজন প্রভৃতি বেশির ভাগই হিন্দু। তাঁদের অত্যাচার ও জুলুমও যে কিছু ছিল না, তা নয়; কিন্তু প্রজা বা খাতক মুসলমান বলেই যে তাঁদের উপরেই শুধু নিপীড়ন ছিল, তা নয়। হিন্দু-মুসলমান সকলের উপরেই সমভাবে ছিল। মুসলমানের সংখ্যা দেশে বেশি বলেই তাঁদের উপরে নিপীড়নটাই শুধু সকলের চোখে পড়তো। এইটারই সুযোগ নিয়ে মুসলিম লীগের নেতারা সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলে দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমান সমাজকে তাতিয়ে তোলেন। আড়ানী গ্রামও তা থেকে বাদ পড়ে নি, কিন্তু কয়েক মাস কাল ইউনিয়ন বোর্ডে যে গ্রাম গঠনের কাজ হয় ১৯৩৯-৪০ সালে, তাতে মুসলমান পাড়াও বহুভাবেই উপকৃত হয় এবং এ পল্লী সংস্কারের কাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনই তারতম্য করা হয় নি। হিন্দুপ্রধানদের জমির বাঁশঝাড় গভীর জঙ্গল ও বাগান প্রভৃতি যেখানে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে তাঁদের মধ্যে মৃত্যুহার বৃদ্ধি করেই এতকাল চলছিল, তা নির্মূল করে পরিষ্কার করা হয়; আর ঐ কাজে হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র জনসাধারণই গভীর আগ্রহ দেখান এবং ঐ সব কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেন; ফলে দরিদ্র জনসাধারণের সংখ্যাই বেশি হওয়ায় এবং তার মধ্যে আবার মুসলমানের সংখ্যাই জনসংখ্যার অনুপাতে বেশি হওয়ায় বহু মুসলমানই ঐসব কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন এবং এইভাবেই একটা অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি গ্রামে গড়ে ওঠে। তারই জের তখনও থাকায় দারোগা সাহেবের পক্ষে ব্যাপারটার অত সহজে নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হয়। মুসলমান নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে অনেকেই ঐ

ঘটনার জন্য সর্বসমক্ষে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে নিজেদের মধ্যে থেকেই চাঁদা উঠিয়ে প্রতিমা পুনরায় গড়ার ব্যবস্থা করেন। দারোগা সাহেব অবশ্য দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন নি—মুসলমান নেতাদের সহযোগে চেষ্টা করলেই হয়তো তাও পারতেন কিন্তু করেন নি; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যই তিনি সেদিক দিয়ে যান নি। যাই হোক, আমি ও সদর 'এস, ডি, ও' সাহেব গ্রামে পৌঁছে দেখলেম, শান্তি স্থাপিত হয়েছে, হিন্দুরা আবার পূজো যথারীতি করতেই রাজী হয়েছেন। কোন্ এক সুদূর অতীত কাল থেকে যে আড়ানী গ্রামের বাজারের উপর প্রতি বছর পূজো হয়ে আসতো তা আমার সঠিক জানা নেই কিন্তু আমার বাল্যকালেও ওখানে পূজো হতে দেখেছি। কোনও দিনই হিন্দুর প্রতিমা-ভাঙার কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে তো শুনি নি। আজ হঠাৎ প্রতিমা-ভাঙার ব্যাপার ঘটলো কেন,—এই প্রশ্নই সেদিন আমার মনে জেগেছিল। তার একটা সমাধানও আমি নিজেই মনে মনে করেছিলেম। আমি যে কারণ ঠিক করেছিলেম, পরবর্তীকালের আরও অনেক ঘটনাতেই তারই সমর্থন পেয়েছি। আমার মনে হয়েছে, কয়েক বছর পর্যন্ত মুসলিম লীগ দলের অনবরত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের প্রভাব, মুসলমান সমাজের এক অংশের উপর বিশেষভাবেই দানা বেঁধে ওঠে। তাঁরা মনে করেন, মুসলমান সমাজ অন্য কোনও সমাজের চেয়ে কোন মতেই হীন নয়—শুধু দরকার, তাঁদের মনে আত্মবিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলা। এটা সমাজ-সচেতনতার এক নবজাগরণ (muslim revivalism), ১৯২১ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিক আন্দোলনের সাথে বিশ্ব-মুসলমান সমাজের ধর্মীয় 'খিলাফৎ' আন্দোলন যুক্ত করে নেন, এবং হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেস নেতারা ও কর্মীরা যখন গ্রামে গ্রামে মুসলমানের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন, তখন থেকে মুসলমানের এক অংশের এই সমাজ-সচেতনতার যুগের সূত্রপাত হয়। এর মধ্যে দোষের বা অন্যায়ের কিছু নেই। ভারতীয় সমাজ গড়ে উঠেছে, বহু সমাজের—বহু জাতির বহু রকমের কৃষ্টির ও সভ্যতার এক মিলনক্ষেত্ররূপে। এখানে কোন সমাজই অপর সমাজকে ধ্বংস বা বিপর্যস্ত করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হলেও তাতে সমাজ বা দেশ বড় হয় না। বিদ্বেষ-ভিত্তিক তথাকথিত সমাজ-সচেতনতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক লাভজনক হতে

পারে কিন্তু তা কখনই দেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধ হতে পারে না—হয়ও নি। মুসলিম লীগ কিন্তু এই পথই বেছে নেন। এই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যই তাঁরা বলেন, হিন্দু ও মুসলমান এক দেশে সেই দেশেরই নাগরিক হয়ে এক সাথে বাস করতে পারেন না। তাই তাঁদের দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রচারণা ও দেশ বিভাগের দাবি উত্থাপন! লীগের নেতারা এই প্রচারই করেন যে, হিন্দু যে যে বিষয়ে মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বড় আছেন, তাঁদের সেই সব জায়গাতেই আঘাত করতে হবে এবং তাঁদের মুসলমান সমাজের নিচে টেনে নামাতে হবে। এই পথ যে আত্মহত্যার পথ তা তাঁরা তখনও বোঝেন নি —আজ পর্যন্তও তাঁরা তা বুঝতে চেষ্টা করছেন না। স্বাধীনতার পূর্বে তাঁরা এই মতবাদই প্রচার করেছেন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসক হয়ে শাসনক্ষমতায় সহজ পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অতি আগ্রহে কংগ্রেস নেতারাও মুসলিম লীগের এই দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। দেশে স্বাধীনতা এসেছে বটে কিন্তু ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছে। মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার দাবি পূরণ হয়েছে এবং যে মুসলিম লীগ নেতারা মুসলমান সমাজের কাছে তাঁদের ঐ পূর্বোক্ত আত্মঘাতী মতবাদ প্রচার করেছেন, তাঁরাই পাকিস্তান রাষ্ট্রে ক্ষমতায় এসেছেন; সুতরাং, মুসলমান সমাজের যে অংশ হিন্দুকে ধ্বংস করার—হিন্দুর শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তার অগ্রসরতা প্রভৃতি ধ্বংস বা খর্ব করার মতবাদে এ যাবৎ বিশ্বাস করে এসেছেন, তাঁরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে সমাজে দেখা দিয়েছেন। তাঁদের লক্ষ্যই হল, হয় হিন্দুকে সম্পূর্ণভাবে সবদিক দিয়েই মুসলমানের পদানত করতে হবে, অথবা তাঁদের ধর্মান্তরিত করে মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অথবা তাঁদের চিরতরে পাকিস্তান তথা দেশত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। দেশ বিভাগের পরে এই মতবাদই মুসলমান সমাজের এক অংশের মধ্যে অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা দেয়, আর তার ফলেই, পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় হিন্দুদের উপর একই ধরণের সমাজ-বিরোধী আক্রমণ শুরু হয়। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে এই মতবাদ আরও উগ্রভাবে দেখা দেয়, যার ফলে স্বাধীনতার পর নয় মাসের মধ্যেই ঐ অংশ সম্পূর্ণভাবে অ-মুসলমান শূন্য হয়ে যায় কিন্তু পূর্বাংশে তা আজও সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর হতে পারে নি—হিন্দু প্রভাব খর্ব হয়েছে বটে, হিন্দু অনেক লক্ষ লক্ষ দেশত্যাগ করে চলে এসেছেনও ঠিকই, কিন্তু আজও হিন্দু সেখান থেকে

নির্মূল হয় নি। বর্তমানে মুসলিম লীগের সেই পুরাতন নীতি কার্যকরী করার পক্ষে অনেক বাধাও এসে দাঁড়িয়েছে। আজ পূর্ব পাকিস্তানে অতীতের মুসলিম লীগও দ্বিধাবিভক্ত—(১) কনভেনশনপন্থী আয়ুবী "লীগ" এবং কাউন্সিলপন্থী মরহুম নাজিমুদ্দিন পরিচালিত "লীগ"। 'আয়ুবী লীগ' শেষের দলের চেয়ে অতি উগ্র বটে এবং ক্ষমতায়ও তাঁরাই অধিষ্ঠিত ঠিকই কিন্তু মুসলমানের মধ্যে আরও অ-সাম্প্রদায়িক প্রগতিপন্থী রাজনীতিক দল, যথা (১) আওয়ামী লীগ, ও (২) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। দেশ বিভাগের পর থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত এ অবস্থা ছিল না, তাই, কোথায়ও হিন্দুর প্রতিমা ভেঙেছে, কীর্তনের দলের বাদ্যযন্ত্র খোল এবং খোলের সাথে সাথে কীর্তনীয়ার মাথাও ভেঙেছে, হিন্দুর পুকুরের মাছ, জমির ফসল, বাগানের ফল ও গাছ, ঝাড়ের বাঁশ জোর করে নিয়ে গিয়েছে, বাড়ি ও জমি প্রভৃতিও জবর দখল হয়েছে। প্রতিকার কোথাও হয়েছে, কোথায়ও আবার হয়ও নি। প্রতিকার, অ-প্রতিকার নির্ভর করেছে, স্থানীয় কর্মচারীর মর্জির উপরে !

যাক, আড়ানী গ্রাম থেকে রাজসাহী শহরে ফিরেই আবার সেই অভিযোগ শোনা ও তার প্রতিকারের চেষ্টাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হয় ! প্রতিদিন সেই একই ধরণের কথা শোনা এবং একই ধরণের কাজ করে যাওয়া। অভিযোগ শুনি, অভিযোক্তার দরখাস্ত নিই এবং প্রয়োজনবোধে আবার সেই দরখাস্ত নিয়ে ছুট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোতে। জনাব আলি তায়েব সাহেবই তখনও রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সব অভিযোগই অত্যন্ত মনোযোগের সাথেই শোনেন এবং দরখাস্তের উপরেই বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর আদেশ লিখে কোন কোনও দরখাস্ত দরখাস্তকারীর হাতেই দিয়ে তাঁকে থানায় গিয়ে দারোগা সাহেবকে দিতে বলেন এবং কোন কোনও দরখাস্তে বা আদেশ লিখে নিজেই জেলার পুলিশ সাহেবের কাছে পঠিয়ে দেওয়ার জন্য রেখে দেন। কোনও ক্ষেত্রে প্রতিকার হয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বা দিনের পর দিন যায় কিন্তু কোনই প্রতিকার হয় না ! সংশ্লিষ্ট দারোগার মর্জির উপরে সেটা নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারোগারা মুসলিম লীগ মনোভাবাপন্ন ! এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেও আমার একটা শোনা কথা এখানে বলছি। আমার বন্ধু শ্রীমোহিনী বর্মণ (পরলোকগত—তাঁরই দেহরক্ষী পুলিশের গুলিতে

নিহত) যখন পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন, তখন তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন,—"দাদা, এখানে 'সিভিল সাপ্লাই' বিভাগ কম্যুনিষ্টে ভর্তি, আর পুলিশ বিভাগ হিন্দু মহাসভার মনোভাবাপন্ন!" জানি না তাঁর কথা কতদূর ঠিক। তবে, এইরূপ হওয়া আমি দেশ বিভাগের আগে ১৯৪৬ সালেই আশঙ্কা করে জনাব সুরাবর্দী-পরিচালিত বাংলার বিধানসভায় একবার বলেছিলেম—"মুসলিম লীগের এই নীতির ফলে, বাংলার সরকারী কর্মচারীবৃন্দ ও জনসাধারণও ক্রমশ সাম্প্রদায়িক হতে চলেছেন। এই অবস্থা চললে, শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।"

এদিকের সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তখন ছিল না কিন্তু দেশবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গে আমি থেকে দেখেছি, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সকলে না-হলেও অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন—বিশেষ ক'রে থানার পুলিশ কর্মচারীদের অনেকেই—হয়েছিলেন; অনেক ক্ষেত্রে, তাই, তাঁদের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশও অমান্য করেই চলতে দেখেছি; ফলে, শাসনব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এইরূপ অবস্থার ফলেই, বিধানসভার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাজের প্রকৃতিও অনেক বদলে গিয়েছিল। স্বাধীনতার আগে দেখেছি, বিধানসভার সদস্যরা যথারীতি নিজ নিজ ব্যবসা, অর্থাৎ ডাক্তার-কবিরাজ, উকিল-মোক্তার, জমিদার-মহাজন প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ব্যবসা ঠিক মতই করতেন এবং বিধানসভার বৈঠকে যখন যোগ দিতেন তখন সেখানে গিয়ে আইন-প্রণয়নে বা সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ে যুক্তিতর্কে অংশ গ্রহণ করতেন কিন্তু স্বাধীনতার পরে পূর্ববঙ্গে অন্তত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিধানসভার সদস্যদের পক্ষে তা সম্ভবপর ছিল না। তাঁদের ভীত সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উপরে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কাহিনী শুনতে হত—তার প্রতিকারের আশায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশ সাহেব প্রভৃতির কাছে ছুটোছুটি করতে হত। এটা যে শুধু আমার বেলায়ই ছিল, তা নয়। সব জেলাতেই তো একই অবস্থা চলছিল; সুতরাং, আমার সহকর্মী বিভিন্ন জেলার সহকর্মী সকল বন্ধুদেরই ঐ একই অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। এই ভাবেই যখন আমিও চলছি, তখন ঢাকা থেকে আমাদের বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের (এখন পরলোকগত) একটি তারে (টেলিগ্রামে) খবর পাই যে, তিনি আমাকে অবিলম্বে ঢাকায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আহ্বান করেছেন।

ঢাকায় পৌঁছে দেখি, বিভিন্ন জেলার আরও কয়েকজন সহকর্মী বন্ধুও উপস্থিত হয়েছেন। আমার যতদূর মনে আছে তাতে মনে হয় ঢাকার শ্রীমুনীন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীগণেন্দ্র ভট্টাচার্য (বর্তমানে যাদবপুর অঞ্চলে ২নং পোদ্দারনগর 'কলোনী'তে আছেন), চাটগাঁর শ্রীবিনোদ চৌধুরী, ময়মনসিংহের শ্রীবিনোদ চক্রবর্তী নোয়াখালির শ্রীহারাণ ঘোষচৌধুরী প্রভৃতি 'এম, এল, এ' বন্ধুগণ এসেছেন। কিরণবাবু আমাদের সকলের কাছ থেকে আমাদের নিজ নিজ জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থার কথা শোনেন এবং বলেন যে তিনি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁকে সব অবস্থা জানানোর জন্য সেই দিনই বেলা দশটায় তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করার ব্যবস্থা করেছেন; সুতরাং সকলকেই যেতে হবে। আমরা যথানির্দিষ্ট সময়ে যাই এবং নাজিমুদ্দিন সাহেবকে আমাদের নিজ নিজ জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে বলি। মুখ্যমন্ত্রী সাহেবও মনোযোগের সাথেই আমাদের সব কথা শোনেন এবং বলেন যে—"এই অবস্থার জন্য দায়ী সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাকৃত বিনিময় ব্যবস্থা (সরকারী কর্মচারীরা ভারত বা পাকিস্তানে কাজ করতে চান, তাঁদের তা ঠিক করার "অপশান" দেওয়ার ব্যবস্থা) প্রবর্তন করা। পুলিশের দারোগা, ইন্সপেক্টার প্রভৃতি অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু; তাঁরা 'অপশান' দিয়ে ভারতে যাওয়ায় যিনি ছিলেন, রাইটার কনস্টেবল, তিনি হয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা (অফিসার-ইনচার্জ); সুতরাং কিছুকাল তো এই অবস্থা চলবেই—কোনও উপায় দেখি না। তবে, আপনাদের আমি এই ভরসা দিতে পারি যে, কিছুকাল যদি হিন্দুরা কিছু কিছু অবিচার অত্যাচার সত্ত্বেও ধৈর্য ধরে থাকেন, তা হলে এই অবস্থার পরিবর্তন করে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবোই। আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই—আপনারা আমার সহায় হোন।" আরও তিনি বলেন, "শোনা যাচ্ছে যে দুর্গাপূজার পরই নাকি পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করবেন। এই দিক থেকে আমি আপনাদের সাহায্য চাই। আপনারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গে পূজোর আগেই 'সফর' করে হিন্দুদের মনোবল ফিরিয়ে আনুন—তাঁদের দেশত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করতে বলুন।"

আমরা মুখ্যমন্ত্রী সাহেবকে জানাই—"হিন্দুদের ধনপ্রাণ ও সম্মানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি সরকার না করতে পারেন, তাহলে আমরা বললেও তো

হিন্দুরা দেশে থাকতে ভরসা পাবেন না। তবু আমরা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 'সফর' করে সকলের সাথে কথা বলে চেষ্টা করে দেখবো কতদূর কী করা যায়।"

সেখান থেকে কথাবার্তা শেষ করে গিয়ে আমাদের সফরের জন্ম দল ও সময় ঠিক করেন আমাদের কংগ্রেস দলের নেতা শ্রদ্ধেয় কিরণশঙ্কর রায়মহাশয়ই স্বয়ং। অমি যে দলে পড়েছিলাম, সেই দলে বোধ হয় বরিশালের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বগুড়ার শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত (বর্তমানে পরলোকগত), ও আরও দু-একজন 'এম, এল, এ' ছিলেন। তা ছাড়াও ছিলেম ময়মনসিংহ জেলার কাপাসাটিয়া গ্রামের অধিবাসী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নায়ক শ্রীত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী, যিনি 'মহারাজ' নামে সারা ভারতে পরিচিত। তিনি তখনও অবশ্য বিধানসভার সদস্য ছিলেন না (১৯৫৪ সালে হয়েছিলেন); তবু তিনি একজন দলনায়ক হিসাবেই দলভুক্ত হয়েছিলেন। আমাদের সফর তালিকায় ছিল,—পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজসাহী, নওগাঁ (রাজসাহীর মহকুমা শহর), বগুড়া, রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান। আমরা যেখানেই গিয়েছি, সব জায়গাতেই স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছি—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কি করে প্রীতির সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা যায়, সে সম্বন্ধে পরস্পরের মতবিনিময় করেছি। সে সব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছু না বলে, এখানে শুধু একটি স্থানের একজন নেতার মত সম্পর্কেই বলতে চাই। সেই স্থানটি হচ্ছে সিরাগঞ্জ শহর; নেতাটি হলেন, জনাব আলমামুদ সাহেব। আলমামুদ সাহেবের নাম পশ্চিমবঙ্গেও অনেকের জানা সম্ভব। তিনি পরবর্তীকালে পাকিস্তানের 'ডেপুটি হাই কমিশনার' হিসাবে কিছুকাল কলকাতাতে ছিলেন। আলমামুদ সাহেবের বাড়িতে বসেই কথাবার্তা হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের একটি সহজ (!) সূত্রের কথা বলেন—সেটি হল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। আজ একথা অকপটে স্বীকার করছি যে সেদিনে একজন মুসলমান নেতার মুখে ঐ কথা শুনে আমার মনের মধ্যে একটা কাঁটাবেঁধার মত 'খচখচে' ব্যথা অনুভব করেছিলেম। মনে হয়েছিল, নেতাদের এইরূপ মনোভাবেরই কি প্রতিফলন দেখতে পাই সাধারণ মুসলমানের কারো কারো মধ্যে। হিন্দু যখন স্বাভাবিক পথে সাম্প্রদায়িক প্রীতির সম্পর্ক স্বেচ্ছায়

করতে রাজী নন, তখন কি জোর করেই প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্তই তাঁরা উৎসাহ দেখান? মামুদ সাহেবের কথাটা সেদিন আমার কাছে মোটেই প্রীতিপ্রদ হয় নি। পরে ঐ কথা নিয়ে নিজের মনের সাথেই অনেক যুক্তিতর্ক করেছি। আমার মনের চিন্তাধারাই এখানে তুলে ধরছি। এই সম্পর্কে সমাজসেবী চিন্তাবিদ্‌রা কি মনে করেন, তাই জানার ইচ্ছাতেই।

আমার রাজনীতিক জীবন শুরু হয় একটি বিপ্লবী সংস্থার শিক্ষায়। সেখানে তো কোন জাতের ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ বা শূদ্র, বা কোন ধর্মের—হিন্দু না মুসলমান—পরিচয় ছিল না, কেউ নিতেনও না, নিতে পারতেন না। জাতি ও ধর্মের মধ্যে বড়-ছোটর শিক্ষা কোনও দিনই আমার হয় নি। তবে আজ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার কথা শুনে মনের মধ্যে এত 'খচখচ' করে কেন? এই প্রশ্নই সেদিন আমার মনে উঠেছিল এবং আমি তার যে উত্তর খুঁজে পেয়েছি, তাই এখানে তুলে ধরছি:

আমার মনে হয়েছিল আমার মনের এই ব্যাথার পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে—(১) মুসলমানকে হিন্দুদের চেয়ে জাতি ও ধর্ম হিসাবে নিকৃষ্ট মনে করা; আর (২) মুসলমান সমাজের ধর্মের নামে অন্ধ গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া। পূর্বেই বলেছি আমার রাজনীতিক শিক্ষার মধ্যে আনুষ্ঠানিক বা সামাজিক ধর্মের স্থান ছিল না। ধর্ম ছিল আমাদের কাছে একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার ছোট ভাই শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ীরও একই বিপ্লবী সংস্থায় ঐ একই শিক্ষা হয়েছিল; তাই, আমাদের পরিবারের কোন ছেলেমেয়েকে আজ পর্যন্ত মুসলমান বলেই ছোট বা নিকৃষ্ট ভাবতে দেখি নি। মৌলভী রেজাউল করিম সাহেব আমাদের বাসায় যখনই এসেছেন তখনই দেখেছি, আমার ভাই-এর ছেলেমেয়েরা তাঁর পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করেছেন, যেমন তারা আমাদের করে থাকে। এই তো গেল আমার নিজের ও আমাদের পরিবারের সকলের কথা কিন্তু অন্যান্য হিন্দুরা কি ধর্মে মুসলমান বলেই মুসলমানকে ঘৃণা করেন? হয়তো কোনও সুদূর অতীতের এক কালে কিছু কিছু হিন্দুর মধ্যেও ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামি ছিল কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপক গণ-আন্দোলনে বাংলা দেশে অন্তত এমনই একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে তাতে মনের ঐ সঙ্কীর্ণতা হিন্দুর মধ্যে থেকে বহুলাংশে কেটে গেছে। এই তো দেশ-বিভাগের পরেও খান আব্দুল গফুর খান যখন রাজসাহীতে গিয়েছিলেন তখন দেখেছি, সম্ভ্রান্ত ঘরের উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু মেয়েরা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বরণ-

ডালা সাজিয়ে নিয়ে গুরু-বরণের মত অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে তুললেন। বহু হিন্দু স্ত্রী পুরুষকেও দেখলেম তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে। খান সাহেবও ধর্মে মুসলমানই ছিলেন কিন্তু কেউ তো তাঁকে মুসলমান বলে ঘৃণা করলেন না। হিন্দুর মনের এই যে পরিবর্তন তা' দেশ-বিভাগের পরে হঠাৎ আজ হয় নি—দেশ-বিভাগের তথা স্বাধীনতালাভের আগে থেকেই এই মানসিক পরিবর্তন হিন্দুর মধ্যে আসতে সুরু করেছে কিন্তু মুসলমান সমাজের মধ্যে সামাজিক এই পরিবর্তন, আজও দেখা দেয় নি। সেই কথা নিয়ে আলোচনা এখনই করছি।

এইভাবে আমি, আল্ মামুদ সাহেবের হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ—বাৎলানোর দিন থেকে নিজ মনে বহু বিচার করেছি এবং বিচারে বুঝেছি যে, পূর্ব বর্ণিত প্রথম কারণটি, আমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার, সেদিনও করেছিল না—আজও করে নি। এখন দেখা যাক, দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে বিচার ক'রে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও আমি রাজসাহীতেই দেখেছি যে কোনও হিন্দু-বালিকা অপহৃতা হলে, সেই অপহৃতা বালিকাটির উদ্ধারের পরে যখন অপহরণকারীর বিরুদ্ধে আদালতে মাম্‌লা হয়েছে, তখন সেই মাম্‌লার মুসলমান উকিল-মোক্তারগণ মুসলমান আসামীর জন্য অত্যুৎসাহ দেখিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন তার মুক্তির জন্য এবং যখন আসামী মুক্তি পেয়েছে, তখন শত শত মুসলমান একত্রিত হ'য়ে তা'কে নিয়ে বিজয়ী বীরের মত শোভাযাত্রা করেছেন। সেই শোভাযাত্রাকারীদের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্র, উকিল-মোক্তার প্রভৃতিও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। আসামীটি যেন একটি রাজ্য জয় করেছে! একটি হিন্দুমেয়েকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে—সে তো রাজ্য-জয়েরই সামিল; ভাবখানা এই। রাজসাহী জেলারই একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। নাটোর মহকুমার বাসুদেবপুর রেলস্টেশন থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামে এক হিন্দু বড় জোতদার ছিলেন। তাঁর বাড়িতে এক মুসলমান মহিলা থাকতেন এবং হিন্দু ভদ্রলোকও তাঁকে স্ত্রীর সম্মান দিয়েই উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করতেন। তাঁদের কয়েকটি ছেলে-মেয়েও হয়েছিল। ছেলে-মেয়েদের নামও হিন্দু-নামই এবং পদবীও বাপের পদবী-ই ছিল। কিন্তু পরে একদিন দেখা গেল, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে হাজার-হাজার মুসলমান এসে তাঁর বাড়ি ঘেরাও ক'রে তাঁকে জোর করেই

মুসলমান করলেন এবং ঐ উৎসবে গো-হত্যা ক'রে সমবেত সকলের সাথে মুসলমান ধর্মে নব-দীক্ষিত বাড়ির মালিককেও সেই মাংস খাওয়ান হল। ভদ্রলোকটি যাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েই বাড়িতে রেখেছিলেন, তাঁকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিতা করে স্ত্রী-হিসাবেই আর রাখ্‌তে পারলেন না। তাঁর সে প্রস্তাব জনমতের কাছে বাতিল হ'য়ে গেল।

সাম্প্রতিককালের আর একটি ঘটনা সম্পর্কেও আমি বর্তমানে চিন্তা ক'রে দেখেছি এবং ঘটনাটাকে জনসমক্ষে তুলে ধরছি। পতৌদির বর্তমান নবাব মনসুর আলি সাহেব বিলাতে শিক্ষিত একজন উচ্চ-শিক্ষিত আধুনিক কালের তরুণ যুবক। শ্রীমতী শর্মিলা ঠাকুরও উচ্চশিক্ষিতা এবং অভিজাত পরিবারের একটি তরুণী। উভয়েই পরস্পরের প্রতি না কি প্রেমে পড়েন এবং বিয়ে করতে মনস্থ করেন কিন্তু সেই বিয়ে সম্ভব করে তুল্‌তে শর্মিলা ঠাকুরকে হ'তে হয়েছে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে "আয়েষা সুলতানা।" শর্মিলা ঠাকুর 'শর্মিলা ঠাকুর' থেকে নবাব মনসুর আলিকে বিয়ে করতে পারেন না। এটাই সামাজিক অন্ধ শাসন। সমাজের অন্ধ শাসন যতদিন ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার অক্ষুণ্ণ রেখে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে গণ্য করতে বাধা সৃষ্টি করবে, ততদিন স্বভাবতই অন্য ধর্মকে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের ধর্মের চেয়ে হীন বলেই মনে করতে সমাজের কাছে থেকে প্রেরণা পাবেন। এটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে কতটা সহায়ক হবে, তা আজ আমি স্বাধীন দেশের প্রগতিশীল পরিবেশে সকলকে ভেবে দেখ্‌তে অনুরোধ করি। দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হলেই যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, তার আরও একটা 'নজির' এখানে তুলে ধরছি। সম্প্রতি আমি রাজসাহী থেকে খবর পেয়েছি যে, রাজসাহীতে ১৯৬২ সালে জনাব পি, এ, নাজির, সি এস পি (P. A. Nazir, C. S. P.) যিনি সেখানে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন এবং যাঁর অঙ্গুলীহেলনেই দারুণা গ্রামে ব্যাপক হিন্দুনিধন হয়েছিল, তিনি না কি রাজসাহী জেলার নবাবগঞ্জ শহরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের তরুণীকে (ডাক নাম—বুলা গোস্বামী) মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা করিয়ে বিয়ে করেছেন ; ফলে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তো দূরে থাকুক, সংশ্লিষ্ট দুইটি পরিবারের মধ্যেও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। মেয়েটির বাবা-মা ও তাঁদের পরিবারবর্গ দেশ ত্যাগ ক'রে ভারতে চলে এসেছেন !

জনাব আলমামুদ সাহেবের কাছে ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পরই তাঁর

অভিমত শোনার পর থেকে আজ পর্যন্ত ঐ বিষয় নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করে বুঝেছি যে সেদিনে কেন তাঁর কথায় আমার মনে একটা 'খচখচানি' ব্যথা অনুভব করেছিলেম।

মুসলমানের মধ্যেও আমার বহু বন্ধু-বান্ধব আছে অতীতে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী বিপ্লবী মরহুম আসফাকুল্লা সাহেব যাঁর ধরা পড়ার পরে ফাঁসী হয়, ফেরারী অবস্থায় রাজসাহী জেলায় এসে অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ বাড়িতেই কাটিয়েছেন—কেউ জানতে বা বুঝতেও পারেন নি যে, তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক—এক সাথেই আমরা, ভাই যেমন ভাই-এর সাথে চলাফেরা করে, সেইভাবেই মিশেছি। তাতে কখনও সম্প্রীতির অভাবও দেখা দেয় নি। ধর্মীয় গোঁড়ামির দাপটে একে অপরকে ধর্মান্তরিত করে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলেই যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে না—তার নজির আগেই তুলে ধরেছি। আমার সুচিন্তিত অভিমত হল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে গণ্য করার মনোভাব সমাজের মধ্যে গড়ে তোলা, অথবা একই রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জন-সেবায়, তথা দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পথ। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেই এই সম্পর্কে এত কথা বললেম এবং জনসমক্ষে তুলে ধরলেম। পূর্বে এই বিষয়টির গুরুত্ব যত ছিল, আজ স্বাধীন দেশে দেশের সংহতি বজায় রাখার জন্য তার গুরুত্ব আরও অনেক বেড়ে গেছে।

আমরা উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করে প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যাই। দুর্গাপূজাও এসে গেল এবং আমার জেলায় অন্তত নির্বিঘ্নেই শেষও হয়ে গেল। অন্য কোনও জেলাতে কোন গণ্ডগোল হয়েছে বলে শুনি নি।

পূজার পর মন্ত্রী জনাব হাসেম আলি সাহেব রাজসাহীতে এলেন। রাজসাহীর ভুবনমোহন পার্কে বৈকালে এক জনসভাও তিনি করলেন। সভায় মন্ত্রী মহোদয় ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রট জনাব আলি তায়েব সাহেব উভয়েই উপস্থিত। এই সভায় একটি তরুণ মুসলমান যুবক (সম্ভবত মুসলিম লীগের 'ন্যাশনাল গার্ড' বাহিনীর একজন স্বেচ্ছাসেবক) বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতায় তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে "কাফের বাঁদীর বাচ্চা" প্রভৃতি ভাষায় গালাগালি দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব 'ফ্যালফ্যাল' করে মন্ত্রীর দিকে তাকালেন; আর, মন্ত্রী মহোদয় মাথা নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে থাকলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বা মন্ত্রী—কারোরই ক্ষমতা হল না তার প্রতিকার করার! যেখানে

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজই নিজেকে অপমানের, লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন না, সেখানে তাঁর সদিচ্ছা যতই থাকুক তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের লাঞ্ছনার হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করবেন? জনাব আলি তায়েব সাহেবেরও সদিচ্ছা থাকা সত্বেও তিনি সব ক্ষেত্রে পারেন নি। অপরাধীর শাস্তি দিতে তো ম্যাজিস্ট্রেট বা মন্ত্রী সাহেব—কেউই পারলেন না, উপরন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, আলি তায়েব সাহেবের ঢাকার সচিবালয়ে বদলির আদেশ হয়েছে। তিনি জেলা শাসকের কার্যকরী ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ঢাকায় গেলেন ডেপুটি সেক্রেটারী হিসাবে সম্মানিত কেরানীর (dignified clerk) কাজ করতে।

এর পরে রাজসাহীতে এলেন, একজন অবাঙালী তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব আব্দুল মজিদ, সি, এস, পি সাহেব।

আমরা ঢাকায় গিয়ে নাজিমুদ্দিন সাহেবকে যখন প্রতি জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনের আতঙ্কের এবং তার কারণ সম্পর্কে জানিয়েছিলেম, তখন সরকারী কর্মচারীদের দুই রাষ্ট্রের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত বিনিময়ের (option) উপর দোষ দিয়েছিলেন। সে কথা পূর্বেই বলেছি। তার মধ্যে সত্য যে কিছুটা না ছিল, তা নয়; তবে তার মধ্যে যে সত্য ছিল সেইটাই সব সত্য নয়। মুসলিম লীগের রাজ্য শাসনের তৎকালীন নীতিটাই ছিল সব চেয়ে বড় সত্য। আলি তায়েব সাহেবের ও মজিদ সাহেবের শাসনকালের তুলনামূলক বিচার করলেই সেই সত্যটা ধরা পড়বে।

জনাব আলি তায়েব সাহেব, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে রাজসাহীতে এক বছরের বেশি থাকতে পারেন নি, যদিও সরকারী নিয়মে পদস্থ কর্মচারিগণ একই স্থানে ও পদে সাধারণত তিন বছর পর্যন্ত থাকেন কিন্তু তিনি পারেন নি। তিনি রাজসাহীতে এসেছিলেন, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আবার রাজসাহী ছেড়ে যানও সম্ভবত (রাজসাহীতে থাকতে আমার কাছে সব

ঘটনারই নথিপত্র ছিল কিন্তু এখানে আমার কাছে সে সব কিছু নেই—সমস্তই আমাকে লিখতে হচ্ছে স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে ; তাই, কোথায়ও কোথায়ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কারো কারো নামের ও ঘটনার সময়ের কিছু কিছু ভুল হলেও হতে পারে, তবে, ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনও ভুল যে নেই, তা আমি বিশেষ জোরের সাথেই বলতে পারি।) ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই। তিনি জেলায় প্রধান শাসক থাকেন কি করে? তিনি অ-সাম্প্রদায়িক নীতিতে শাসন চালিয়ে সকল সম্প্রদায়ের মিলিত এক পাকিস্তানী জাতি (নেশন) গড়তে চান। তিনি মুসলিম লীগের তথাকথিত সেবক বাহিনী 'ন্যাশনাল গার্ডদের'—উচ্ছৃঙ্খলতা, এবং গুণ্ডা শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক সমাজ-বিরোধীদের কার্যকলাপ বন্ধ করে হিন্দুর মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে চান! তাঁর ঐ নীতি 'ন্যাশনাল গার্ডরা' বা সমাজ-বিরোধী গুণ্ডারা কেউই সমর্থন তো করেই না, উপরন্তু তারা ঐ নীতির ঘোরতর বিরোধী, জেলার মুসলিম লীগ নেতারাও সমর্থন করেন না, বরং তাঁরা জেলা-শাসককে বদলি করানোর জন্যই উচ্চ-মহলে তদ্বির করেন। আর উচ্চ-মহলের মুসলিম লীগ শাসকেরা, অর্থাৎ মন্ত্রীরাও ঐ নীতি সমর্থন করেন না—করতেও পারেন না। জেলা-শাসকের নীতি, মুসলিম লীগ নীতির যে সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুসলিম লীগের নীতি হচ্ছে, কোনরূপ বড় রকমের বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে পাকিস্তান থেকে নিঃশব্দে হিন্দু বিতাড়ন। এই কথা লিখতে গিয়ে আমার ছোটকালের অনুসৃত নীতির কথা মনে পড়ে। আমাদের গ্রামের বাজারের উপরে যে এক কালীবাড়ি ছিল এবং সেখানে পূজোর সময় যে বড় বড় যাত্রার দল এসে গান করত, সে কথা পূর্বেই বলেছি। সেই গানের আসরে কোন কোনও প্রবীণ ভদ্রলোক ছেলেদের পেছনে ফেলে আগে গিয়ে বসতেন—বিনীতভাবে বললেও তাঁরা জায়গা ছাড়তে চাইতেন না। তখন আমাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বুদ্ধিমান, অথচ ভাল ছেলে বলে গ্রামে যাদের যথেষ্ট সুনাম ছিল, যথা আমার ছোট ভাই শ্রীমান জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী (সম্প্রতি পরলোকগত) তার সমবয়সী বন্ধুবাহিনী নিয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের পশ্চাদ্দেশে বেশ জোরে নিঃশব্দে এমন 'চিমটি' কাটতো যে ভদ্রলোকরা চেঁচামেচি করতেন এবং অবশেষে স্থানত্যাগ করে অন্যত্র বসতে বাধ্য হতেন। মুসলিম লীগের নীতিও ছিল, ঐ একই ধরণের। তাঁরা, পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন ব্যাপক হত্যার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেদিকে অ-মুসলমান শূন্য করেছেন, তা আর পূর্ববঙ্গে করতে চান না; তাতে,

দেশ ও বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়—সকল দেশের দৃষ্টি সেখানে গিয়ে পড়ে। তাঁরা তাই, চান নিঃশব্দে—হিন্দু বিতাড়ন ; আর, তাঁদের ঐ নীতির রূপকারই ছিল,—পূর্বোক্ত (১) মুসলিম লীগের ও (২) গুণ্ডারাজের তথাকথিত সেবক-বাহিনীদ্বয়। সুতরাং, আলি তায়েব সাহেবের হাত থেকে জেলা-শাসনের দায়িত্বভার কেড়ে নেওয়া ছাড়া মন্ত্রীদের আর কী উপায় ছিল ? তাই তাঁরা নিয়েছিলেনও এবং ঐ নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করতে তখনও যে কয়েক মাস দেরি ছিল, সে সময়কার মধ্যেকার আরও দুই-একটি ঘটনার কথা এখানে বলছি।

১৯৪৮ সালের ১লা, কি ২রা জানুয়ারীতে আমি যাই কলকাতাতে। রাজসাহীতে ন্যাশনাল গার্ড ও গুণ্ডাবাহিনী গ্রামে গ্রামে যে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও যা রোধ করার সবিশেষ চেষ্টা করেও সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল হতে পারছেন না, সেই সব বিষয় সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মশায়কে জানিয়ে সেই সম্পর্কে আমার করণীয় কাজ সম্পর্কে তাঁর উপদেশ নিতেই আমি যাই কলকাতায়। কিরণবাবু তখনও পূর্ববঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য, তথা বিরোধী দলের নেতা ; সুতরাং, আমারও নেতা। তাঁকে সব অবস্থা জানিয়ে তাঁর মত নেওয়া, তাই দরকার মনে করি। সকাল বেলায় গিয়েছি, কিরণবাবুর 'ইউরোপীয়ান এসাইলামে'র বাসায়। গিয়ে দেখি, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—মন্ত্রিসভার সদস্য বন্ধু শ্রীকালীপদ মুখার্জি (পরলোকগত) মশায় কিরণবাবুর সাথে আলোচনায় রত। তাঁদের কথাবার্তায় বুঝি কিরণবাবু, ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার স্থানে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে এক নতুন মন্ত্রিসভা গড়তে চান। আলোচনা প্রসঙ্গে কিরণবাবু কালীপদবাবুকে বলেন—"আপনার আপত্তি কেন ? আপনি ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা হলে তাতেও আপনি মন্ত্রীই থাকবেন।" কথাবার্তা শেষ করে কালীপদবাবু চলে গেলেন। আমার মনে হল, অবশেষে তিনি কিরণবাবুর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েই গেলেন। কালীপদবাবু যাওয়ার পরে, কিরণবাবু আমাকে বলেন—"ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের স্থলে ডাঃ বিধান রায়কে এনে নতুন এক মন্ত্রিসভা গড়তে চেষ্টা করছি।" বুঝতে পারি, ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্য এক উচ্চ পর্যায়ের ষড়যন্ত্র চলছে। তখনকার সব অবস্থা ভালভাবে বিবেচনা করে দেখে আমার মনে হয়েছে, ষড়যন্ত্রের পেছনে দুইটি কারণ ছিল—(১)

সমাজবিরোধী, মুনাফাশিকারী, অতিরিক্ত লোভাতুর, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীমহলের বিরুদ্ধে দুরন্ত অভিযান এবং (২) কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনে পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে অ-প্রকৃত কথার উল্লেখ।

ব্যবসায়ীমহলের কাছে, তাঁরা বোধ হয় মনে করেছিলেন যে স্বাধীনতা এসেছে, তাঁদের অর্থাগমের একটা সুলভ সহায়ক হিসাবে! ইংরেজ শাসক চলে গিয়েছে। তার জায়গায় এসেছেন দেশীয় মন্ত্রীরা। তাঁদের যোগ্যতা ও নৈতিক বোধ সম্পর্কেও বোধহয়, ব্যবসায়ীমহল যথেষ্ট সংশয় পোষণ করতেন। ডঃ ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীরা ব্যবসায়িকদের ঐ বিশ্বাসের মূলেই প্রথম আঘাত হেনেছেন। তাঁরা নিজেরা ঘুরে ঘুরে কে কী পরিমাণ এবং কীভাবে মুনাফা করছেন, তাই পরীক্ষা করে দেখতে আরম্ভ করেছেন। ধরেছেন তাঁরা, আটা-ময়দার মিলে বস্তা বস্তা তেঁতুল-বীজ ও তেঁতুল-বীজ চূর্ণ। এমনি আরও কত জায়গায় কত কী! ব্যবসায়ীমহলে একটি সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। তারাও শুনতে পাই, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভাকে তাড়ানোর জন্য টাকার বস্তার মুখ খুলে দিয়েছে—যত টাকা লাগে তাই দিয়েই ঐ মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত করতেই হবে। টাকার অসাধ্য কাজ নেই! পুরাণে দেখেছি, রিপুর কাছে তপস্যারত মুনি-ঋষিরও তপস্যাভঙ্গ হয়েছে, লোভও একটা রিপু। বর্তমান যুগে অর্থ ও কাম—এই দুইটিই বোধহয় সব চেয়ে বড় রিপু! অনেক ত্যাগী কর্মীরও পদস্খলন হয়, এই দুইটি রিপুর প্রভাবে। তখনকার দিনের কংগ্রেস ও অতীতের ত্যাগী কংগ্রেসকর্মীরাও ঐ রিপুর প্রলোভনে পড়েছিলেন কি না, আমি সে সম্বন্ধে সঠিক না জানলেও লোকমুখে শুনেছি এবং জোর গুজবই শুনেছি যে, তাঁদেরও অনেকেই ঐ রিপুর প্রলোভনে হার মেনেছিলেন! যে সব নৈষ্ঠিক ত্যাগী কর্মী ঐ রিপুর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না, তাঁদেরও অনেকেই—বিশেষ করে, যে সব কংগ্রেসকর্মীর ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের অন্তত এককালে পূর্ববঙ্গে বাসস্থান ছিল, তাঁরাও যখন শুনলেন যে, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেছেন—'তাঁর রাজ্যে কোনও বাস্তুত্যাগী সমস্যা নেই!' তখন তারাও ডঃ ঘোষের উপর অত্যন্ত বিরক্ত বা বিরূপ না হয়ে পারেন নি। কিরণবাবুও ছিলেন, পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার তেঁওতার জমিদার পরিবারের লোক। স্বভাবতই তাঁর পক্ষে ডঃ ঘোষের উপর বিরূপ হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। আমি নিজে যদিও পূর্ববঙ্গেই থাকতেম এবং

পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যাপারের সাথে তখন আমার কোনই যোগাযোগ ছিল না, তবু কিন্তু ডঃ ঘোষের ঐরূপ বিবৃতি সংবাদপত্রে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেম; কারণ, ঐ বিবৃতিটি তখনকার দিনের প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৯৪৭ সালের পূজোর পর থেকেই বেশ কিছু সংখ্যক লোক বাস্তুত্যাগ করে আসতে থাকেন। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবও এই আশঙ্কা করেই আমাদের বিভিন্ন জেলাগুলোয় সফর করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমরাও সফর করেছিলেমও ঠিক কিন্তু আমাদের সফরের ফল যে পরিপূর্ণভাবে সুফল দিয়েছিল তা নয়। ব্যাপকভাবে যুগপৎ বাস্তুত্যাগ করে আসতে থাকেন। কলকাতায় এসে অনেকেই আশ্রয় হীন অবস্থায় 'ফুটপাথে' আশ্রয়ও নিতে বাধ্য হন, সকলেই সেকথা জানেন। জানেন না কেবল, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ। তাঁর বিবৃতি তাই, আমার মত আরও অনেকের মনেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়, ব্যবসায়ীমহলের অর্থ ও নৈষ্ঠিক কর্মীর মনের বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সেদিনে মিলিত হয়ে ডঃ ঘোষকে আইনসভার কংগ্রেস দলের কাছে তাঁর দলীয় নেতৃত্বের পদত্যাগে বাধ্য করে। আমি কলকাতা থেকে রাজসাহীতে ফিরে যাওয়ার পরে একদিন সংবাদপত্রে দেখি, ডঃ ঘোষ নেতৃত্বের পদে 'ইস্তফা' দিয়েছেন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নতুন নেতারূপে আইনসভার কংগ্রেস দলের সদস্যগণ কর্তৃক বৃত হয়েছেন। আজ এতদিন পরে অতীত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আমার মনে হচ্ছে, সেদিন যাঁরা ডঃ ঘোষকে দলের নেতৃত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন, তাঁরা ভুলই করেছিলেন। অবশ্য সেই ভুলের আমি একজন 'শরিক' না হলেও সেদিনের আমার মনের অবস্থা বিবেচনা করে সহজ সরলভাবেই স্বীকার করি যে আমি যদি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য তখন থাকতেম, তাহলে আমিও ঐ ভুলই করতেম। আজকে বিবেচনা করে দেখছি যে, সেদিনে ডঃ ঘোষ যে সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন, তা যদি তাঁকে চালিয়ে যেতে দেওয়া হত, তা হলে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীমহলের স্পর্ধা এতখানি বাড়তে পারত না— আজ তারা মনে করে যে, অর্থ দিয়ে যদি কংগ্রেসের মত একটা জনসেবক প্রতিষ্ঠানের (অতীতের সংগ্রামী কংগ্রেসের কথা বলছি—আজকের কংগ্রেস নয়) ত্যাগী কর্মীদেরও 'হাত-করা' যায়, তবে 'অন্য পরে কা কথা!' আজকে

দেখছি, গুলজারিলাল নন্দাও দুর্নীতি দমনের অভিযানে বের হয়ে নিজেই দমিত হলেন! স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপের সাথে সাথে যদি একটা আদর্শ সৃষ্টি করা যেত, তাহলে আজকার এই অবস্থা হত না বলেই আমার ধারণা ও বিশ্বাস। আজ এতদিন পরে, কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস শাসনে এখন বিড়লার ব্যবসা সম্পর্কে যতই তদন্ত করার প্রস্তাব সংসদে পাশ হোক না কেন, তাতে যে বিশেষ কোন ফল শেষ পর্যন্ত হবে বলে মনে করতে এখনও মন থেকে আমি খুব ভরসা পাচ্ছি না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে বলতে চাই। স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মশায়, আবার সুদীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর পরে কংগ্রেস-বিরোধী মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রী হয়ে এসেছেন। তাঁর সততার ও কর্মশক্তির উপর দেশের সকলেরই যথেষ্ট আস্থা আছে ঠিকই। তার প্রমাণও দেখা গিয়েছে, সম্প্রতি তিনি বহরমপুর শহরে যে জনসভা করে গিয়েছেন তাতে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর আগমনে যে জনসভা হয়েছিল এবং তাতে যেরূপ লোক সমাগম হয়েছিল, তা নাকি এখানে স্মরণাতীত কালের মধ্যে হয় নি। এ সবই তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচায়ক নিঃসন্দেহে, কিন্তু সাথে সাথে একটি সতর্কবাণীও এই প্রসঙ্গে তুলে ধরতে চাই। তিনি যে বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি কোনও বৈষম্যমূলক নীতি নিয়ে চলছেন না, তা কিন্তু দেশের কিছু কিছু কর্মীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। আশঙ্কা করি, আবারও অতীতের ইতিহাসেরই পুনরাবির্ভাব না হয়! অতীতে যে দুই বিরুদ্ধ শক্তি গড়ে উঠেছিল, আবারও সেই শক্তিই সক্রিয় হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে। ডঃ ঘোষ নিজেই বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক নেতা। তাঁকে উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি তাঁর এক অতীতের সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী হিসাবেই আমার মনের আশঙ্কার কথা এখানে তুলে ধরলেম মাত্র।

যাক, এ তো গেল, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সম্পর্কে। এইবার আমি যে কাজের জন্য রাজসাহী থেকে কিরণবাবুর সাথে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেম, সেই সম্পর্কেই বলছি। কিরণবাবুকে রাজসাহীর সব ঘটনার তদানীন্তন কালের পরিস্থিতি জানাই। কীভাবে মুসলিম লীগ 'ন্যাশনাল গার্ড' ও সমাজবিরোধী গুণ্ডাবাহিনী গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের উপরে

দিনের পর দিন নানাভাবে অত্যাচার করে চলেছে এবং হিন্দুদের মনে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করছে, সবই তাঁকে জানিয়ে তাঁর পরামর্শ চাই। কিরণবাবু সব শুনে বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবকে সব অবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়ে একখানি পত্র দিতে। কলকাতাতে থেকেই সে পত্র লিখি এবং কিরণবাবুর অনুমোদনক্রমে সে পত্র পাঠাই। পত্রে কতকগুলো ঘটনার উল্লেখ করে জানাই যে জেলা-শাসক তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দুদের আতঙ্ক ও নিগ্রহ থেকে রক্ষা করতে পারছেন না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এখানে তিনটি গভর্নমেণ্ট একই সাথে চলছে—(১) নাজিমুদ্দিন সাহেবের গভর্নমেণ্ট, (২) ন্যাশনাল গার্ড গভর্নমেণ্ট ও (৩) গুণ্ডা গভর্নমেণ্ট; এবং এই তিন গভর্নমেণ্টের মধ্যে শেষের দুইটিই প্রবল শক্তিসম্পন্ন। তাদের সংযত করার শক্তি, নাজিমুদ্দিন সাহেবের গভর্নমেণ্টেরও নেই, এই অবস্থার আশু প্রতিকার অবিলম্বে দরকার।···চিঠি পাঠিয়ে রাজসাহীতে ফিরে দেখি, সারা জেলায় একটা নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সে উত্তেজনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আরও বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সে উত্তেজনার কারণ, ভারত সরকার না কি ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী সর্দার পেটেলের নির্দেশে পাকিস্তানকে দেয় পঞ্চাশ কোটি টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। পাকিস্তানের অবস্থা তখন সত্যি সত্যিই 'অশ্বভক্ষ: ধনুর্গুণঃ' গোছের। ভাঁড়ারে অর্থ নেই। সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেওয়ারও সঙ্গতি নেই। সেই অবস্থায় ভারতের কাছ থেকে পাওনার ৫৫ কোটি টাকাই একমাত্র সম্বল। সে টাকাও বন্ধ করেছে; সুতরাং জনমনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং সে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছেন, মুসলিম লীগের নেতারা তাঁদের অগ্নিবর্ষী প্রচারণার মাধ্যমে। প্রচারণা তাঁরা করেছেন ও করছেন কিন্তু ভারত যে টাকা বন্ধ কেন করলেন, সে কারণটা সম্পর্কে কিন্তু কোন কথাই তাঁরা জনগণের কাছে প্রকাশ করেন না—শুধুই বলেন, পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই কেবলমাত্র "হিন্দুস্থান সরকারের" লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মুসলমানের কাছে, তাঁদের দেশে 'পাকিস্তান' নামটি অত্যন্ত প্রিয় তখন তো ছিলই—এখনও আছে। সেই অতিপ্রিয় পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চান ভারত সরকার! সুতরাং, তাঁদের উত্তেজনায় যথেষ্ট কারণ থাকাই স্বাভাবিক। যেটা স্বাভাবিক, সেইটাই দেখা দিয়েছিল।

ভারত সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে ঐ টাকা দেওয়া বন্ধ করার

সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলেন, সেই কথাটা বলা দরকার মনে করি। আসল কারণের কথা বলতে গেলে, কাশ্মীর রাজ্যের কথা এসে পড়ে। বৃটিশ-পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আইন যখন হয়, তখন দেশীয় রাজন্যবর্গের সাথে বৃটিশের যে চুক্তির ফলে তাঁদের বৃটিশ রাজানুগত্য পালন করতে হ'ত, সেই চুক্তিটিও বিলোপ ক'রে দেওয়া হয়। ফলে, রাজন্যবর্গ ইচ্ছা করলে নিজেরাও সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে পারেন, অথবা নিজেদের ইচ্ছায় তাঁরা ভারত বা পাকিস্তানেও যোগ দিতে পারেন, এটাই হয়েছিল আইন। কাশ্মীর রাজ্য ১৯৪৭ সালের ১৪ই/১৫ই আগস্টের অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর কোনও রাষ্ট্রের সাথেই যোগ দেন নি। কিন্তু পাকিস্তানের সাথে স্থিতাবস্থা-চুক্তি করেছেন, যা' ভারতের সাথে করেন নি। কাশ্মীরের মহারাজা পাকিস্তানে যোগ দিতে গড়িমসি করছেন। পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ্ সাহেবের আর 'তর' সইলো না। তিনি স্থিতাবস্থা-চুক্তি সই করার পরেই কাশ্মীরের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ঐ রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে বহির্বিশ্ব থেকে অবরোধ করেন। কাশ্মীরের সাথে পাকিস্তানেরই কেবলমাত্র সড়ক ও রেলপথের যোগাযোগ তৎকালে ছিল। সেই সড়কপথ ও রেলপথ—দুই-ই বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়; ফলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে একটা দারুণ অর্থ-সংকট ও অত্যাবশ্যক জিনিসের সঙ্কট দেখা দেয়। সেই অবস্থাতেও মহারাজা যখন দমলেন না, তখন ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর, অর্থাৎ স্থিতাবস্থা-চুক্তির মাত্র দুই মাসের মধ্যেই পাকিস্তান সরকারই পরিকল্পনা ক'রে খণ্ড উপজাতীয় লোকদের কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণের জন্য সীমান্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে যেতে শুধু রাস্তাই ছেড়ে দেন না, আক্রমণকারীদের অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েও সাহায্য করেন। অবস্থা বে-গতিক দেখে জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা ২৪শে অক্টোবরেই ভারত সরকারের সাথে যোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। ২৭শে অক্টোবরে সামরিকভাবে ভারতের সাথে কাশ্মীরের যোগদানের চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং ভারত সরকার আকাশপথে চূড়ান্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়েই কাশ্মীরে সৈন্য পাঠান। পরে দেখা গিয়েছে যে উপজাতীয় আক্রমণকারীদের পরিচালনাও করেছেন, পাকিস্তানের নিয়মিত সৈন্য ও সেনাপতিরাও। সুতরাং যে যুদ্ধ ছিল প্রথমে উপজাতীয় ও কাশ্মীরীদের যুদ্ধ, এখন সেই যুদ্ধ দেখা দিল, ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধরূপে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই, সর্দার প্যাটেল স্থির করেন যে ভারতের দেওয়া টাকাতেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে তিনি দেবেন না। টাকা বন্ধের ইতিহাস এটাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের সেই সিদ্ধান্ত ঠিক থাকে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দলে দলে অ-মুসলমানরা এসে দিল্লীতে পৌঁছেছেন, সাথে নিয়ে এসেছেন তাঁরা মনে তীব্র জ্বালা ও প্রতিহিংসার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ফলে দিল্লীতে আরম্ভ হয় সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও নিধন। ভারত সরকারের পাকিস্তানকে দেয় টাকা বন্ধের সিদ্ধান্তে বাস্তুত্যাগীদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আরও উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন সুরু করেন। ১৬ই জানুয়ারীতে দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয় ও ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেওয়ার আবার অনুমতি দেন।

কলকাতা থেকে আমি যখন রাজসাহীতে ফিরে যাই, তখন ভারত সরকার যে পাকিস্তানকে দেয় টাকা বন্ধ করেছেন, সেই আন্দোলনই জোর চলছিল, সুতরাং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও গ্রামে গ্রামে আবার বেশ উগ্রভাবেই দেখা দিয়েছিল। অবশেষে এই অবস্থারও সাময়িকভাবে হ'লেও অবসান হ'ল। কিভাবে হ'ল এবং তা'র জন্য ভারতকে—শুধু ভারতকে কেন, সারা বিশ্বকেই কতবড় ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করতে হ'ল, সেই কথাই এখন বলছি।

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। আজ সকাল থেকেই আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে আছে। আমার ছোটভাই—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী (সম্প্রতি পরলোকগত) তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রমুখ সহ পাকিস্তান ত্যাগ ক'রে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের উদ্দেশ্যে নৌকা পথে চলে যায়। সেই বিদায়-দৃশ্য তা'র ও আমার—উভয়ের কাছেই অত্যন্ত করুণ হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। সংসারে আমার আপনার লোক বলতে তারা ছাড়া আর কেউ ছিল না—তারাই আমার খাওয়া-পরার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখতো, আজ তা'রা চলে গেল। জিতেশ কাতরভাবে তাদের সাথে আমাকেও যেতে বার বার অনুরোধ করেছে। আমি তার সে অনুরোধ রাখতে পারি নি। আমি যে স্বেচ্ছায় আমার কাঁধে জোয়াল তুলে নিয়েছিলেম—সে ভার তো আমাকে বইতেই হবে। আমি ১৯৪৬ সালে রাজসাহী জেলার সমগ্র হিন্দু-সমাজের সমর্থনে 'বেঙ্গল এসেম্বলি'র সদস্য হয়েছিলেম।

সেই হিন্দুরাই আজ বিপন্ন। তাঁদের বিপদের মুখে ফেলে আমি চ'লে যাই কেমন ক'রে। আমি পারি না। জিতেশরা চলে গেল। দেশ-বিভাগের, তথা স্বাধীনতার দিনই সে বলেছিল—"আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুদীর্ঘ ১৮ বছরকাল জেলে কাটালেম; আর সেই স্বাধীনতা যখন এল তখন আমি আর আমার পরিচয় 'ভারতীয়' ব'লে দিতে পারবো না—আমাকে আমার পরিচয় দিতে হবে, 'পাকিস্তানী' ব'লে! এই অবস্থা আমি কিছুতেই মেনে নেব না। আমি ভারতবর্ষেই গিয়ে 'ভারতবাসীই থাকবো।' সে গেল। তার মনে এই স্বাধীনতার রূপ দেখে যে কি দারুণ ব্যথা লেগেছিল, তা' সকলে হয়তো বুঝবেন না—বুঝবেন তাঁরাই, যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, অথচ ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হ'ল তখন আর তাঁরা "ভারতবাসী' থাকতে পারলেন না—হলেন পাকিস্তানী! পূর্বের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে তাই আজ অনেকেই পূর্ববঙ্গবাসী হয়েও দেশত্যাগী—ভারতবাসী। জিতেশও তা-ই হল। বাড়ি ছেড়ে চলে গেল—দেশ ছাড়লো। মনটা তাই আমার সকাল থেকেই অত্যন্ত চঞ্চল ও ভার হয়ে ছিল। শূন্য বাড়ি ছেড়ে, তাই বিকেল হ'তে না-হতেই চলে যাই আমাদের একান্ত বন্ধু, সুহৃদ—শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রের বাড়িতে। পূর্বেই বলেছি যে ঐ বাড়ি ছিল আমাদের 'স্বদেশীওয়ালাদের' একটা ঘাঁটি। শ্রীমান সত্যেন্দ্র জিতেশের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। তার কাছেই যাই। সেখানে গিয়ে মনের শান্তির জন্য তার সাথে নানা কথাবার্তা বলছি কিন্তু ভগবান শান্তি দেন নি। আমি শান্তি খুঁজলে কি হবে।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। বেলা প'ড়ে এসেছে। এমন সময় একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, "গান্ধীজী দিল্লীতে তাঁর প্রার্থনা সভায় পিস্তলের গুলিতে নিহত হয়েছেন। রেডিও অনবরত সেকথা ঘোষণা করে চলেছে।" আমি ও সত্যেন ওরফে 'বাগু' (ডাক নাম) সেকথা প্রথমে বিশ্বাসই করিনি—করতে পারিনি কিন্তু মুহূর্তমধ্যে সকলের মুখেই সেই একই কথা শুনি। লোকে চতুর্দিকে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। 'বাগু' উঠে বাড়ির ভেতরে যেতেই চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠে। ওই অবস্থায় আমিও নিরবে কাঁদতে কাঁদতেই আমার বাসায় ফিরে যাই। বাগু ও আমিই শুধু কাঁদি না সারা শহরই যেন কান্নায় ভেঙে পড়ে। হিন্দুই শুধু কাঁদেন না। হিন্দু কাঁদেন, মুসলমান কাঁদেন—সকলেই কাঁদেন। সন্ধ্যা হ'তে হ'তেই আমার বাসায়

মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতাদের কয়েকজন প্রধান এসে তাঁরাই প্রস্তাব দেন যে আগামীকাল তাঁরা এক মৌন শোকমিছিল বের করতে চান এবং সে মিছিল তাঁরা আমাকে পরিচালনা করতে অনুরোধ করেন। তা-ই হয়। পরদিন শহরে বিরাট এক শোক মিছিল বের হয়। হাজার হাজার লোকের মিছিল। মিছিলে মুসলমান জনতাই সর্বাধিক। গান্ধীজী আজ তাঁর জীবন দিয়ে সাময়িকভাবে হলেও মুসলমানের প্রীতি অর্জন করলেন। একজন মহাত্ম (!) ব্যক্তির প্রীতিই কেবল তিনি পেলেন না। তিনি হলেন 'কায়দ-ই-আজম' মহম্মদ আলি জিন্নাহ। জিন্নাহ সাহেব অনেক ভেবে-চিন্তে অনেক ঢোক গিলে পরে বলেছিলেন—'একজন হিন্দু নেতা' মরেছেন এবং সেই হিন্দু নেতার জন্য তিনি কিছু শোকের বাণীও প্রকাশ করেছিলেন। রাজসাহীতে কিন্তু এই দিন আমরা দেখেছিলেম, গান্ধীজী শুধু হিন্দুরই নেতা ছিলেন না—তিনি ছিলেন, জাতিধর্মের উর্দ্ধে। হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আপনজন। সাধারণ মুসলমানও সে কথা জানতেন, বুঝতেন; আবার নেতাদের প্রচারে বিভ্রান্ত হতেন। যখন তাঁরা বিভ্রান্ত হতেন, তখনই হিন্দুর উপরে অত্যাচার চলতো; আবার যখন তাঁরা বুঝতেন, তখন তাঁরা সৎ প্রতিবেশীই হতেন। আজ তাঁরা বুঝলেন—গান্ধীজীর জীবন গেল কার ও কিসের জন্য। তাঁরা সাময়িকভাবে হলেও বুঝলেন—গান্ধীজী জীবন দিলেন পাকিস্তানকেই বাঁচাতে—রক্ষা করতে। মুসলমানদের ভালর জন্যই। তাঁর অনশনের ফলেই দিল্লীর সাম্প্রদায়িক হত্যা বন্ধ হয়ে গেল—পাকিস্তানও ৫৫ কোটি টাকা পেয়ে রক্ষা পেল। গান্ধীজীর জীবনের বিনিময়েই রাজসাহীতেও হিন্দুরা অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে সাময়িকভাবে হলেও নিষ্কৃতি পেলেন। আমারও কাজ কমে গেল। সামনেই ঢাকাতে 'পূর্ববঙ্গ এসেম্বলির বাজেট সেশন' আসছে। তারই প্রস্তুতির জন্য কিছুটা সময় আমি পেলাম।

গান্ধী-হত্যা প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে বলতে চাই। ভারত সরকার এই দিনটিকে অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারীকে গান্ধীজীর মৃত্যুবার্ষিকীরূপে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্য "শহীদ দিবস" হিসাবে ঘোষণা করেছেন। ভারতের সর্বত্র ঐ দিনটি 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালিতও হচ্ছে। এই দিনটিতে একটি কথা আমার মনে প্রতিবারই ওঠে। গান্ধীজী 'শহীদ' হলেন কেন? স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকালে তো তিনি 'শহীদ' হলেন না। 'শহীদ' হলেন, স্বাধীনোত্তরকালে। দেশ-বিভাগই গান্ধীজীর নিহত হওয়ার পেছনের মূল

কারণ নয় কি? তাই যদি হয়, তা'হলে শহীদ দিবসে সেই কারণটির কথাও দেশবাসীর স্মরণ ক'রে কর্তব্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রতি বছরই নতুন ক'রে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত কি না, দেশবাসীর কাছে সেই প্রশ্নটি-ই আজ তুলে ধরছি।

আততায়ীর হাতে গান্ধীজীর নিহত হওয়ার কথা আগেই বলেছি। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারীতে ঐ নৃশংস ও পাশবিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। ঐ নিদারুণ ঘটনা, মুসলিম-লীগের নেতাদের মনেও হয় তো কিছুটা রেখাপাত করেছিল। কিছুটা যে করেছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই, গান্ধীজীর মৃত্যুর দিন রাজসাহীতে মুসলিম-লীগের নেতাদেরই প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে মৌন শোক-মিছিল বের করার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসায় এবং পর-দিনের বিরাট শোক-মিছিলে মুসলমানদের অংশ গ্রহনের মধ্যে। তাঁদের মনে প্রভাব কিছুটা যে পড়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু ঐ প্রভাব স্থায়ী হতে পারে নি। স্থায়ী হবে কি করে? মুসলিম-লীগের শ্রেষ্ঠ নেতা (কায়েদ-ই-আজম) জনাব মহম্মদ আলি জিন্নাহ সাহেবের তো সে ইচ্ছা মোটেই ছিল না। গান্ধীজীর মৃত্যুতে বিশ্বের সমস্ত দেশই—এমন কি, বিশ্ব-সংস্থা "উনো" (UNO) পর্যন্ত—যখন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মহামানবের মহাপ্রয়াণ বলে ভারত সরকারের কাছে শোক-সূচক তারবার্তা পাঠালেন এবং নিজ নিজ রাষ্ট্রে ও বিশ্বসংস্থার প্রধান আফিসে জাতীয় শোকের নিদর্শন স্বরূপ 'পতাকা' অর্ধ-নমিত করার নির্দেশ দিলেন, তখন পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল জনাব জিন্নাহ সাহেব শোক (!) প্রকাশ করলেন, একজন "হিন্দু নেতা" নিহত হয়েছেন বলে। তিনি গান্ধীজীকে বিশ্বের একজন মহান নেতা বলে তো স্বীকার করলেনই না,—তাঁকে ভারতবর্ষের নেতাও বললেন না। তাঁর দৃষ্টিতে গান্ধীজী ছিলেন, একজন "হিন্দু নেতা।" একজন হিন্দুর মৃত্যুতে—সে হিন্দু যত বড়ই হোক না কেন—মুসলমান সমাজের

মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করার শিক্ষা তো মুসলিম-লীগ কখনও দেন নি; উপরন্তু হিন্দুর প্রতি ব্যষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে ঘৃণা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণ করার শিক্ষাই এতকাল মুসলিম-লীগ নেতারা দিয়ে এসেছেন। সেই জাতিগত বিদ্বেষের উপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষকে ভাগ করে "পাকিস্তান" সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই নীতি বদলালে তো—'বৃশ্চিক'-এর হুলই ভেঙে যায়—'বিষ'-ও আর থাকে না। সে অবস্থা যদি হয়, তাহলে তো পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যায়। জাতিগত বিদ্বেষের উপরই পাকিস্তান-রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে এবং তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে ঐ বিদ্বেষও বজায় রাখতেই হবে তাই, জনাব জিন্নাহ সাহেব গান্ধীজীকে অখণ্ড ভারতবর্ষের নেতা বলে স্বীকার করা তো দূরের কথা, তাঁকে খণ্ডিত ভারতেরও নেতা বলে স্বীকার করেন না। করলে যে ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমানেরও নেতা তিনি হয়ে যান। জিন্নাহ সাহেবের দৃষ্টিতে সারা বিশ্বের মুসলমানই এক ও অভিন্ন। গান্ধীজীকে যদি ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমানের নেতা স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে তাঁকে পাকিস্তানের মুসলমানেরও নেতা বলে মেনে নেওয়া হয়; সুতরাং গান্ধীজী ভারতের নেতাও জিন্নাহ সাহেবের দৃষ্টিতে হতে পারেন নি—তিনি হয়েছেন একজন হিন্দু নেতা। তাই হিন্দু নেতার মৃত্যুতে পাকিস্তানের মুসলমানের মনে একটা স্থায়ী শোকের প্রভাব বিস্তার হোক, তা' জিন্নাহ সাহেব চান নি এবং তা' হয়ও নি—হ'তেও পারে নি। তবু, সাময়িক প্রভাব কিছুটা অবশ্যই হয়েছিল। তার প্রমাণ পাই আমরা জেলার গ্রাম-গ্রাম থেকে যে পরিমাণ অভিযোগ নিয়ে হিন্দুরা প্রতিদিনই আগে আসতেন, ততটা আর ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে না-আসায়। এই অবস্থার মধ্যে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা থেকে গভর্নর ফ্রেডারিক বোর্নের (Federick Bourne) ডাক (Summons) আসে, পূর্ববঙ্গ বিধানসভার (Assembly) সর্বপ্রথম অধিবেশনে মার্চ মাসের প্রথম দিকে (সঠিক তারিখটা এখন মনে নেই) যোগ দেওয়ার জন্য। পূর্ববঙ্গ এসেম্বলির অধিবেশনের একদিন আগে ঢাকাতে গিয়ে পৌঁছাই। ঢাকার বন্ধুরা আমাদের গিয়ে থাকার জন্য আগেই একটি বাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন। বাড়িটি প্রকাণ্ড। বুড়িগঙ্গার কাছেই। সেখানে গিয়ে দেখি, বিভিন্ন জেলা থেকে অনেকেই এসে পৌঁছান নি, তাঁরাও ক্রমশ একে একে সেইদিনই এসে উপস্থিত হন। কেবল আসেন না, আমাদের দলের নেতা—শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মহাশয়।

তিনি আর আমাদের নেতা নেই, পূর্ববঙ্গ এসেম্বলির সদস্য নেই। পদত্যাগ করে তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের নব-গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন। সেইদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিজ নিজ জেলার অবস্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। আলাপে জানি, সব জেলারই অবস্থা প্রায় একই রূপ। সেই সাম্প্রদায়িক অশান্তি, আর আইন-শৃঙ্খলার অভাব, হিন্দুদের মনে আতঙ্ক এবং একটিই প্রধান প্রশ্ন—"থাকা যাবে কি?" কোনও কোনও জেলায় একটু বেশি, কোনও জেলায় বা একটু কম। কেবলমাত্র মাত্রায় কিছুটা তারতম্য, নচেৎ অবস্থা সর্বত্রই একইরূপ।

পরদিন, অর্থাৎ অধিবেশনের দিন একটু সকাল সকালই আমরা "এসেম্বলি'-তে গিয়ে পৌছাই। আমাদের মত হিন্দু-মুসলমান অন্যান্য সদস্যদের অনেকেই আগেই গিয়েছেন। আগেই বলেছি যে—জগন্নাথ হলের ছাত্রাবাসটিকে 'এসেম্বলি-হাউস' করা হয়েছে। 'এসেম্বলি-হাউস'টি দেখেই সব সদস্যরই মন বেশ ভার হ'য়ে ওঠে। সিলেটের সদস্যগণ ছাড়া পূর্ববঙ্গের আমরা সব সদস্যই আগে 'বেঙ্গল-এসেম্বলি'-র সদস্য ছিলেম। বেঙ্গল-এসেম্বলির শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত সেই প্রাসাদোপম 'এসেম্বলি-হাউস' থেকে এসে এই ছাত্রবাসের 'হাউসে' পড়ায় কে-ই বা খুশি হ'তে পারেন? মুসলিম লীগের সদস্যরা যাঁরা দেশ-বিভাগ করে 'পাকিস্তান' চেয়েছিলেন, তাঁরাও খুশি হ'তে পারেন নি। তাঁদেরও মন প্রথম ধাক্কাতেই বেশ একটু মুষড়ে পড়েছে! এর পরেও মুষড়ে পড়ার আরও প্রবল ধাক্কা তাঁদের জন্য মজুত হ'য়ে আছে, সে কথা একটু পরেই বলছি। 'এসেম্বলি-চেম্বারে' ঢুকে দেখি, মাথার উপরে বিজলি-পাখা প্রবল শব্দে বন্ বন্ করে ঘুরছে। পাখার গুনগুনানি শব্দ যত জোরে হচ্ছে তার অন্তত দশগুণ জোরে প্রতিধ্বনি হচ্ছে! কথা বলতে গিয়ে দেখা যায়, দুইজন সদস্যও যদি এক সাথে কথা বলেন, তাহলে কেউ কারো কথাই বুঝতে পারেন না। প্রতিধ্বনি দশগুণ বড় হয়ে সারা কক্ষে ঘুরে বেড়ায়! সে এক অদ্ভুত অবস্থা! সে অবস্থা যিনি না-দেখেছেন, তাঁকে ভাষায় বোঝান আমার পক্ষে অন্তত সম্ভবপর নয়, কারণ, আমার ভাষার উপরে সেই দখল নেই যা থাকলে তা' ভাষায় ফুটিয়ে তোলা যায়।

যাক, এই অবস্থার মধ্যেই অধিবেশন সুরু হয়। প্রথমেই 'স্পীকার'

নির্বাচন। জনাব আব্দুল করিম সাহেব 'স্পীকার' নির্বাচিত হন। তার পরেই দেখা দেয় মন্ত্রিত্বের সঙ্কট। নাজিমুদ্দিন সাহেব যে মন্ত্রিসভা গড়েছিলেন, তা' শুধু তাঁর সমর্থকদের নিয়েই। সদস্যদের মধ্যে সুরাবর্দি সাহেবের সমর্থকও তো ছিলেন। তাঁরা হৈ-চৈ সুরু করে দেন। 'এসেম্বলি-চেম্বার' হাট-বাজারের রূপ নেয়। সদস্যরা যত জোরে চিৎকার করেন, তার দশগুণ জোরে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। কেউ কারো কথাই বুঝতে পারেন না—কেবল 'হৈ-হল্লা'-ই শোনা যায়। সেই 'হৈ-হল্লা' মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবকে তিন দিন পর্যন্ত মুখই খুলতে দেয় না। আমরা সকলে বিরোধী দলের সদস্য। বাধাসৃষ্টি করা আমাদের-ই কাজ ছিল কিন্তু আমরাও তিন দিন পর্যন্ত মুখই খুলি নি—খোলার দরকারও হয় নি। বাধা যা কিছু এসেছে, মুসলিম লীগের সদস্যদের কাছ থেকেই তা' এসেছে। অবস্থা বে-গতিক দেখে নাজিমুদ্দিন সাহেব মুসলিম লীগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও পাকিস্তানের গভর্নরজেনারেল জিন্নাহ সাহেবের কাছে অত্যন্ত জরুরী বার্তা (S, O, S,) পাঠিয়েছেন। তিন দিনের দিন জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় আসেন। মুসলিম লীগের বিদ্রোহী সদস্যদের সাথে কথাবার্তা বলেন। অবশেষে একটা আপোষ-রফাও করেন। আপোষের ফলে ডাঃ এ, এম, মালেক; জনাব তফাজ্জল আলি ও জনাব হবিবুল্লা বাহার মন্ত্রী হন এবং জনাব মহম্মদ আলি সাহেব (বগুড়ার) হন বার্মার রাষ্ট্রদূত। বিধানসভায় শান্তি ফিরে আসে। এই আপোষ-রফা হয়ে যাওয়ার পরে আমি একদিন জনাব মহম্মদ আলি সাহেবকে বলি,—"আপনি যে রাষ্ট্রদূত হয়ে যাচ্ছেন, তা'তে তো আপনি দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন এবং আপনার রাজনীতিক ভবিষ্যৎ সীমিত হয়ে যাবে।" মহম্মদ আলি সাহেব তদুত্তরে বলেন,—"তা' তো হবেই। সেই জন্যই আমি প্রথমে রাজী হই নি। কায়েদ-ই-আজম তা'তে চটে গিয়ে আমাকে বলেন যে, তুমি যদি আমার কথায় অবাধ্য হও, তা'হলে তোমার রাজনীতিক জীবন আমি শেষ ক'রে দেব। আপনাদের সাথে আমাদের একটা প্রকাণ্ড তফাৎ এই যে আপনারা আপনাদের ত্যাগ, স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন স্বেচ্ছায় বরণ, জনগণের সবরকম বিপদ-আপদে সেবা দিয়ে জনগণের সাথে একটা যোগসূত্র গড়ে তুলেছেন; আর আমাদের সে সব কিছুই নেই। আমরা এসেম্বলিতে সদস্য হয়েছি, মুসলিম লীগের নামের জোরে; আর, মুসলিম লীগ এখন হচ্ছে কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেব। সেই জিন্নাহ সাহেবের

অবাধ্য হয়ে আমাদের পক্ষে রাজনীতি করা—বর্তমান অবস্থায় মোটেই সম্ভব নয়, তাই শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে যেতেই হবে—না-গিয়ে উপায় নেই।” সুতরাং মহম্মদ আলি সাহেব রাষ্ট্রদূত হয়ে বার্মায় গেলেন, মালেক-তাহার-ভকাজ্জল আলি মন্ত্রীর আসনে গিয়ে বসলেন। এসেম্বলির কাজ আরম্ভ হল। এই অবস্থায় একদিন মাথার উপরে ঘূর্ণায়মান একখানি বিজলিপাখার ব্লেড (blade) খসে গিয়ে দূরে ছিটকে পড়ে। ভাগ্য ভাল যে যেখানে ‘ব্লেড’ গিয়ে পড়ে সেখানে কোন সদস্য ছিলেন না; থাকলে রক্তপাত বা জীবন-হানির মধ্যে দিয়েই এসেম্বলির যাত্রা সুরু হতো!

অর্থমন্ত্রী জনাব হাবিবুল হক সাহেব ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট দাখিল করেন। তাঁর বাজেট-বক্তৃতা কেউ-ই বুঝতে পারেন নি। ‘এসেম্বলি হলে’র নির্মাণের দোষে অর্থমন্ত্রীর মৌখিক ভাষণ বুঝতে না পারলেও অর্থমন্ত্রীর ছাপান বক্তৃতা ও বাজেটের ছাপান বই সব সদস্যই যথারীতিই পেয়েছিলেন; সুতরাং সেদিক দিয়ে কোন বিশেষ অসুবিধা কারো হয় নি। মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিল বাজেটের উপর সদস্যদের বক্তৃতার বেলায়! সদস্যরা যে বক্তৃতা করেন, তা’ কেউই বুঝতে পারেন না। সারা ঘরটিতে (Chamber) কেবল একটা ‘গম-গম’ শব্দ হয়। সেই অবস্থার জন্ত ‘স্পীকার’ সাহেব সদস্যদের মঞ্চের উপর গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে বলেন। স্পীকারের মঞ্চের সামনের দিকের দেওয়াল অনেকটা দূরে থাকায় সেখান থেকে বক্তৃতা দিলে কিছুটা অন্তত বোঝা যায়। সেইভাবে কাজ চলতে থাকে। ‘প্রেস-গ্যালারি’ অর্থাৎ সংবাদপত্রের ও সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিদের স্থান বিরোধী দলের (কংগ্রেস সদস্যদের) একেবারে পেছনের সারিতে দেওয়াল ঘেঁষে। তাঁরা রিপোর্ট করবেন কি? তাঁরা তো কিছু বুঝতেই পারে নি। কলকাতার সংবাদপত্র—অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রীসিতিকণ্ঠবাবু এবং ‘আনন্দবাজার’ ও ‘হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড’এর প্রতিনিধি—উষাবাবু ও সন্তোষ চ্যাটার্জী—প্রতিদিন আমাদের সাথে দেখা করে কে কি বক্তৃতা করলেন, তার ‘নোট’ নিয়ে তাঁরা তাঁদের সংবাদপত্রের আফিসে রিপোর্ট পাঠাতে লাগলেন; তাই তাঁদের পত্রিকাগুলোতে সঠিক রিপোর্টই বের হত, কিন্তু ঢাকার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ‘নোট’ নিতেন এসেম্বলির সরকারী রিপোর্টারদের কাছ থেকে। সরকারী রিপোর্টাররা ইচ্ছা করেই আমাদের বক্তব্যের পুরো রিপোর্ট নিতেন না। পূর্ববঙ্গ সরকারের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং

একদেশদর্শী সাম্প্রদায়িক শাসননীতি যেখানে আমরা বিধানসভার সামনে তুলে ধরতেম সেগুলো স্রেফ বাদ দিয়ে সরকারী রিপোর্টাররা রিপোর্ট নিতেন; সুতরাং ঢাকার বা পাকিস্তানের সংবাদপত্রেও সেগুলো প্রকাশিত হত না। বিরোধী দলের প্রায় সকল সদস্যই তাঁদের নিজ নিজ জেলায় কিরূপ অরাজকতা চলছে তার বর্ণনা দেন। ডাঃ প্রতাপ গুহরায় মশায় (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান) অত্যন্ত জোরালো ভাষায় দেশের তৎকালীন সাম্প্রদায়িক অবস্থা ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন। আমিও পূর্বে কলকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেবের নামে যে পত্র পাঠিয়েছিলেম, সেই কথাগুলোই উদাহরসহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরি, অর্থাৎ আমার জেলায় যে তিন রকমের সরকার চলছে, যথা (১) নাজিমুদ্দিন সাহেবের সরকার, যার প্রতিনিধি হচ্ছেন—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, (২) ন্যাশনাল গার্ড সরকার ও (৩) গুণ্ডাশ্রেণী পরিচালিত সরকার, যারা কোনও আইন-শৃঙ্খলার ধার ধারে না, সেই সম্পর্কে প্রত্যেকটি ঘটনার উদাহরণ সহ উপস্থিত করি। অন্যান্য বন্ধুরাও তাঁদের নিজ নিজ জেলার পরিস্থিতির বর্ণনা দেন এবং প্রায় সব জেলার প্রতিনিধিরাই বলেন যে হিন্দুদের বন্দুকের লাইসেন্স বাতিল করে নাজিমুদিন-সরকার সেগুলো দখল করে নিচ্ছেন। এতে সরকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারী রিপোর্টে কিন্তু ঐ সব উক্তি বে-মালুম বাদ যায়; সুতরাং ঢাকার কোনও সংবাদপত্রেই তা বের হয় না। কলকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সেগুলো তাঁদের আফিসে যথারীতি রিপোর্ট করেন এবং সেখানকার সংবাদপত্রেও সেগুলো বের হয়। "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" সংবাদপত্রে "দর্শক" (On-looker)-এর ছদ্মনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তা'তে ডাঃ গুহরায়ের ও এই প্রবন্ধের লেখকের যুক্তিপূর্ণ ভাষণের প্রশংসাই করা হয়েছিল। আমার বক্তৃতার প্রতিলিপি বিধানসভা থেকে যখন আমাকে সংশোধনের জন্য দেওয়া হয় তখন যে সব অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল, তা' আমি নিজে লিখে সংশোধন করে দিই এবং 'স্পীকার' সাহেবকেও জানাই যে সরকারী রিপোর্টে নিজেদের ইচ্ছামত কিভাবে বক্তৃতার অংশবিশেষ বাদ দেওয়া হচ্ছে! স্পীকার সাহেব আমাকে জানান যে বাংলা ভাষার রিপোর্টারের অভাবের জন্যই ঐরূপ হয়েছে! একে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নিতে মন চায় না; কারণ, দেখা যাচ্ছে সরকারের কাছে অপ্রীতিকর অংশটাই শুধু বাদ যাচ্ছে। যা'ক, এই

অবস্থাই তখন চলছিল। এত কথা বলার দরকার মনে করেছি এই জন্য যে, আজ যে পাকিস্তানের অনেক ঘটনাই যবনিকার অন্তরালে ঢাকা দিয়ে রাখা হচ্ছে, তার সূত্রপাত প্রথম থেকেই যে হয়েছিল সেই কথাটাই বোঝানর জন্য। ইংরেজীতে একটা প্রবাদবাক্য আছে: "Morning shows the day." অর্থাৎ উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়। পাকিস্তানে আজ যে পরিস্থিতি, অর্থাৎ সরকারের কাছে অপ্রীতিকর ঘটনাকে Black out (আঁধারে ঢেকে রাখার) করার দুষ্ট মনোভাব দেখা যায়, তা' একদিনে হঠাৎ হয় নি। প্রথম থেকেই ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে আজকের অবস্থার রূপ নিয়েছে। অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর যত কিছু অবিচার-অত্যাচারই হোক না কেন, তা' প্রকাশ করার পথ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সময় থেকেই ছিল না; তবু, সেদিনে কিছু বিদেশী ও ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ঢাকায় থেকে কিছু কিছু সংবাদ এদিকের সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দিতেন, কিন্তু আজ সে পথও বন্ধ হয়ে গেছে। বিদেশী সাংবাদিকদের বিশেষ করে ভারতীয় সাংবাদিকদের পক্ষে পাকিস্তান হয়েছে নিষিদ্ধ অঞ্চল!

এবার পূর্ববঙ্গের প্রথম বাজেট সম্পর্কে দুই-একটি কথা তুলে ধরছি। আমার যতটা মনে পড়ে, তাতে মনে হয়, প্রথম বাজেটে রাজস্বখাতে আয় দেখান হয়েছিল, মাত্র ষোল কোটি টাকা। অবিভক্ত বাংলায় দুই-তৃতীয়াংশ ও সিলেট জেলা নিয়ে হয়েছে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। সিলেট সহ পূর্ববঙ্গের আয়তন, ৫৪১০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪,১৯,১০,০০০। পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে আয়তনে ও জনসংখ্যায় পূর্ববঙ্গ অনেক বড় কিন্তু রাজস্বের আয় অনেক কম। তার কারণ, অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের অংশ ছিল প্রধানত কৃষিপ্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিল্প-প্রধান অঞ্চল। পূর্ববঙ্গ কাঁচামাল যথা পাট, চামড়া প্রভৃতি উৎপাদন করতো এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্থাগুলোতে দুনিয়ার বাজারে বিক্রির উপযুক্ত জিনিষ তৈরি হত তা' থেকে। পাট পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন হত এবং পাট-জাত দ্রব্যাদি তৈরি হত পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলোতে। পূর্ববঙ্গে একটিও পাটকল ছিল না এবং সেই জন্যই বিদেশের সাথে কারবার করার মত বড় বন্দরও পূর্ববঙ্গে ছিল না। চট্টগ্রামে নামমাত্র একটা ছোট বন্দর ছিল। পূর্ববঙ্গের যা রাজস্ব বাজেটে দেখান হয়েছে, তা' প্রধানত জমির উপর থেকেই এসেছে। সেই জন্যই পূর্ববঙ্গের রাজস্বের পরিমাণ এত কম। ষোল কোটি টাকার এই সামান্য আয় নিয়ে পূর্ববঙ্গের শাসকগণকে দেশকে

গড়ে তোলার কাজে হাত দিতে হয়। ঐ আয়ের অধিকাংশই আবার কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতি বাবদই খরচ করতে হয়। তার উপর আবার নেই উপযুক্ত বাড়িঘর। বিধানসভার (এসেম্বলি হাউসের) নমুনা আগেই তুলে ধরেছি। এই 'এসেম্বলি হাউস'কে সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত করে তুলতে ঢাকা জেল থেকে কয়েক শ' কম্বল এনে দেওয়ালগুলো মুড়ে দিতে হয়েছিল। অভিনব ব্যবস্থা। কী আর করা যাবে? তার উপর আবার কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বিমাতা-সুলভ ব্যবহার পূর্ববঙ্গের প্রতি। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ হিসাবেই দেখেছেন। পূর্ববঙ্গের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হয়; তার ন্যায্য পাওনা পূর্ববঙ্গ সরকার পান না। তার ন্যায্য দাবির কথা সুস্পষ্ট ভাষায় অত্যন্ত জোরের সাথে অর্থমন্ত্রী জনাব হামিদুল হকচৌধুরী সাহেব পরবর্তী ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট বক্তৃতায় তুলে ধরায় তাঁকে তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। বর্তমানের আয়ুবী আমলের এবডো (EBDO—Elective Bodies Disqualification Order, অর্থাৎ নির্বাচনের অযোগ্যতা-আইন) আইনের প্রথম সংস্করণ, 'প্রোডা' (PRODA) নামে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি সাহেব করেন এবং তার আওতায় হামিদুল হক সাহেবকে ফেলেন। সেই মামলায় পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব মিঃ আজিজ আহমেদ সাহেব সাক্ষী দিতে গিয়ে জেরার মুখে বলেন যে, পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক মন্ত্রীর দৈনন্দিন চালচলন, ও কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁকে দৈনিক একটা করে গোপন রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে হত; সেই জন্যই তিনি মন্ত্রীদের সব খবরই রাখতেন। ঐ মামলায় হামিদুল হক সাহেবের এসেম্বলির সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। কেন্দ্রের এইরূপ সন্দিগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে থেকেই পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীদের কাজ করতে হয়। এই অবস্থা দেখে পরবর্তীকালে জনাব নুরুল আমিন সাহেবের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায় একদিন বলেছিলেন: "আমি নুরুল আমিন সাহেবের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বিশেষ সহানুভূতিশীল। তিনি তো কেন্দ্রীয় সরকারের বন্দীর অবস্থায় আছেন। অ-বাঙালী প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ তাঁকে ঘিরে আছেন। এমন কি, রাস্তায় 'ট্রাফিক কণ্ট্রোল' করার পুলিশ পর্যন্ত অ-বাঙালী। বাংলা দেশে বাঙালীর স্থান কোথায়?" মন্ত্রীরা মুখে তাঁদের এই দুর্দশার কথা স্বীকার না করলেও, আমার বিশ্বাস

তাঁরা অন্তরে অন্তরে এটা উপলব্ধি করেছেন। আমরা এই অবস্থা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছি। পূর্ববঙ্গের এই দারিদ্র্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সন্দেহের মধ্য দিয়েই পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের চলতে হয়েছে। এর উপর আবার পাকিস্তানের নীতির ফলেই ভারত-বিদ্বেষ পুরোপুরি বজায় রাখতে হয়েছে। সেই নীতি অনুসরণের ফলে পূর্ববঙ্গের কী নিদারুণ অবস্থায় পড়তে হয়েছিল, তার দুই-একটি নজির এখানে তুলে ধরছি। পূর্ব পাকিস্তানে খনিজ কয়লা ও লৌহ নেই। ভারত থেকেই সেগুলো নেওয়া হত। ভারতের ব্যবসায়ে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই ভারতের কয়লা ও বাড়ি তৈরী করার ঢেউ-টিন (Corrogated tin sheet) নেওয়া পূর্ববঙ্গ সরকার কিছুদিন বন্ধ করেছিলেন। তখন কাঠের গুঁড়ি পুড়িয়ে ইঞ্জিনে বাষ্প উৎপাদন করে 'ট্রেন' (রেলগাড়ি) চালাতে হয়েছে এবং বিদেশ (ভারতের বাইরে) থেকে 'টিন' আমদানী করা হয়েছে এবং সে টিনের বাণ্ডিলের দাম প্রায় তিন শো টাকার মত পড়েছে। সে টিন কেউ কিনতে পারেন নি। পরে, ভারত থেকে আবার 'টাটা'র টিন আমদানী করে দুই রকমের টিন একত্রে মিশিয়ে ১২৫—১৫০ টাকায় বাণ্ডিল বিক্রি করা হয়েছে। এটা আমরা দেখেছি। এর পরেও দেখেছি, ভারতকে ঘায়েল করার—ভারতের পাটকলগুলোকে অচল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বিদেশে রপ্তানি করা পাটের চেয়ে ভারতের জন্য পাটের দাম মণকরা ২॥০ (আড়াই) টাকা বেশি ধার্য করা হয়েছে; ফলে, ভারত নিজেই পাট উৎপন্ন করতে আরম্ভ করেছে, আর সে পাট উৎপন্ন করেছেন কারা? পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত বাস্তুত্যাগী চাষীরাই। তার পরেও, পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীদের সামনে আরও অনেক সমস্যাই দেখা দিয়েছে। একটার কথা এখানে বলছি। পূর্ববঙ্গ নদী-মাতৃক দেশ। সেই নদীগুলোর তলায় পলি পড়ে ক্রমশ ভরাট হয়ে চলেছে; ফলে, বর্ষায় প্রবল বন্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। মন্ত্রীদের কাছে ঐ বিষয় তুলে ধরায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী জনাব হাসান আলি সাহেব নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন যে, ভারত-পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া ঐ সমস্যার সমাধানের পথ নেই। এইরূপ বহু বহু সমস্যার মধ্য দিয়েই পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীদের চলতে হয়।

পূর্ববঙ্গের ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথম বাজেটের আলোচনা থেকে ১৯৫৩-৫৪ সালের মুসলিম লীগ সরকারের শেষ বাজেট পর্যন্ত আমরা কংগ্রেস দলীয়

বিরোধী দলের সদস্তরা প্রতিবার এই সব সমস্তার কথা উত্থাপন করে তা সমাধানের পথ হিসাবে প্রতিবারই বলেছি যে পাকিস্তান, ভারত থেকে একটা নতুন পৃথক রাষ্ট্র রূপে বজায় থেকেও—ভারতের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র হয়ে থাকলে তার অনেক সমস্তারই সমাধান হতে পারে। কিন্তু আমাদের সব কথাই অরণ্যে রোদনই হয়েছে,—আমাদের কথা পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রীরা গ্রহণ করেন নি; উপরন্তু প্রথম প্রথম অনেকেই আমাদের মনে করেছেন—কেউ কেউ বা প্রকাশ্যেই বলেছেন যে আমরা ভারতের চর! মুসলিম লীগ সরকারের ছয় বছরের শাসনের শেষের দিকে দেখেছি কিছু কিছু সদস্তের মনের পরিবর্তন হতে সুরু করেছে। মুসলিম লীগ দলের ২।৪ জন প্রভাবশালী সদস্য কথা প্রসঙ্গে আমার কাছে বলেছেন—"দাদা! আমরা তো পাকিস্তান পাব বলে পাকিস্তান-আন্দোলন করি নি। আমরা আন্দোলন করেছিলেম, একটা দর কষাকষি করে মুসলমানকে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে যোগ্য অংশীদার করে নেওয়ার জন্ত কিন্তু 'কংগ্রেস' দেশ বিভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টিই মেনে নিলেন! কী আর করা যায়, বলুন তো! এখন যদি কাশ্মীর রাজ্য যেমন তার পৃথক সত্তা বজায় রেখেও ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে আছে, সেই রকম ব্যবস্থাই যদি পূর্ববঙ্গের বেলাতেও হয়, তাহলে আমরা খুশিই হই।" এই মনোভাব মুসলিম লীগের সকল সদস্তের নাও হতে পারে। তবু ২।৪ জনেরও হয়েছিল, তা আমি তাঁদের কথাতেই বুঝেছি। মৈমনসিংহের জনৈক সদস্য (তাঁর নাম সম্ভবত হামিমুদ্দিন—ঠিক মনে নেই। পরে তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং মন্ত্রী থাকা কালেই তিনি মারা যান) একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, "সারা জীবনটা কাটিয়ে এলেম কলকাতা শহরে, আজ ঢাকা আর চোখে ধরছেই না!" মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো কলকাতার সুখ-সুবিধা না পেয়ে মনটা কিছু খারাপই হয়ে পড়েছিল। নাজিমুদ্দিন সাহেব তো একবার বলেই ফেলেছিলেন যে তাঁরা করাচি ও ঢাকাকে কলকাতার চেয়েও বড়—ওয়াশিংটন ও নিউ ইয়র্কের সমতুল্য করে গড়ে তুলবেন!

সেই মনোভাবেই হয়তো ঢাকার ধানমুণ্ডি এলাকায় কলকাতার নিউ মার্কেটের মত একটা বাজার ও 'গ্রেট ইস্টার্ন' হোটেলের মত 'শাহবাগ' নামে এক হোটেল তাঁরা গড়লেন। মুসলিম লীগ আমলেই তাঁরা চট্টগ্রাম বন্দরের ও এসেম্বলি হাউসেরও সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। খুলনা জেলার চালনায়ও একটা নতুন বন্দর গড়েন। এ সবের মধ্যে মুসলিম লীগের কিছুটা যে কৃতিত্ব

আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এই কৃতিত্ব দেখাতে গিয়ে তাঁদের মূল্যও কম দিতে হয় নি। একখানি ছোট কাপড় যদি একজন লোককে গা-মাথা ঢেকে পরতে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁর যেমন নিম্নাঙ্গ ঢাকতে উপরাঙ্গ ঢাকা যায় না, আবার ঊর্দ্ধাঙ্গ ঢাকতে গেলে নিম্নাঙ্গ বে-আবরু হয়ে পড়ে, পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগেরও সেই অবস্থা হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের বর্ষাকালে আমি নৌকা নিয়ে নওগাঁ মহকুমার মান্দার বিল অঞ্চলে সফর করতে গিয়ে একটি মুসলমানপ্রধান গ্রামে গেলে স্থানীয় অধিবাসীরা আমার সাথে এসে দেখা করেন। তাঁদের সাথে আলোচনাকালে, একজন চাষী মুসলমান আমাকে বলেন—"বাবু! জিন্নাহ সাহেব ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সময় বলেছিলেন যে, কলাগাছকে তিনি দাঁড় করালে তাতে যেন সকলে ভোট দেন। জিন্নাহ সাহেবের কথায় আমরাও তাই দিয়ে ভেবে ছিলেম, কলাগাছেই ভোট দিলেম। এখন দেখছি, তা দিই নি। কলাগাছে ভোট দিলে তো ছয় মাসে এক কাঁদি কলা পেতেম কিন্তু এখন দেখছি, ছয় বছরেও কিছুই পেলেম না!"

আমি আমার প্রত্যেকটি সফরের পরে আমার রিপোর্ট তৈরী করে বরাবরই আমি তার নকল জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার মুখ্যসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠাতেম। আমার সেই সফরের রিপোর্ট ও মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সাহেবকে এবং অন্যান্য সকলকেই যথারীতি পাঠিয়েছিলেম। মন্ত্রীরা ঐ সব জাঁকজমক করতে গিয়ে জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি; তার ফলেই, জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তখনও ক্ষমতায় আসীন মুসলিম লীগ দল একেবারে ধরাশায়ী হন—৩১০ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগের মাত্র ৯ জন সদস্য নির্বাচিত হন। মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সাহেব, খালেক নেওয়াজ নামক একটি ছাত্রের কাছে পরাজিত হন।

দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগ শাসনের ছয় বছরের মোটামুটি ইতিহাস এটাই। এর শুরু হয় প্রথম বাজেট অধিবেশন থেকেই। সেই প্রথম বাজেট অধিবেশনেই আমরা বাস্তুত্যাগ থেকে আরম্ভ করে সব বিষয়ই এসেম্বলিতে তুলে ধরে আমাদের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেম, কিন্তু ভারত, তথা হিন্দু-বিদ্বেষ শাসকদের এতই অন্ধ করেছিল যে তাঁরা আমাদের সতর্কবাণীতে মোটেই দৃষ্টি দেন নি। বিরোধী দল হিসাবে আমরা আমাদের কাজ করে অধিবেশনের শেষে আবার নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাই।

ঢাকায় বাজেট অধিবেশনেই বিভিন্ন জেলার হিন্দু সদস্যগণের ভাষণেই জানলেম, সরকার হিন্দুদের সব আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিচ্ছেন। আমার জেলায় তখনও সেটা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নি। হয়তো জনাব আলি তায়েব সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট থাকার জন্যই। যা হোক, একবার পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছা আমার মনে আসে। আমি আলি তায়েব সাহেবের বাংলোতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বলি যে আমাকে তিনি একটি বন্দুকের লাইসেন্স দেবেন কি না। সাথে সাথেই তিনি জানান যে, দরখাস্ত করলে নিশ্চয়ই তিনি দেবেন। তাঁকে আরও সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বলি—"আমার অতীত কিন্তু পুলিশের দৃষ্টিতে ভাল না। আমার রাজনীতিক জীবন শুরু হয়, একটি বিপ্লবী সংস্থার মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমার সাথে গৌহাটিতে পুলিশের লড়াই হয়। পুলিশ তাতে মারা যায় এবং আমিও গুলীতে আহত হই। তার পরে, ১৯২১ সাল থেকে কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে বারে বারে জেলে গিয়েছি। এসব জেনেও কি আমাকে বন্দুকের লাইসেন্স দেবেন?" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সবই শুনলেন। অবশেষে বললেন,—"অতীতে আপনি কী করেছেন তা আমি দেখবো না। এখন আপনি কিভাবে চলছেন, সেইটাই আমার বিচার্য। আর অতীত যদি দেখতে যাই, তাহলে তো আপনার আবেদনে সাড়া দেওয়া একান্তই কর্তব্য হয়ে পড়ে। আপনি দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আপনারা ঐ সংগ্রাম না করলে ইংরেজ সরকার এ দেশ ছাড়তেন না, দেশের স্বাধীনতাও হত না এবং ভারতবর্ষই যদি স্বাধীন না হত, তাহলে পাকিস্তানও হতে পারতো না। সুতরাং, আপনি ও আপনারা তো পাকিস্তানেরও বন্ধুই। আপনাকে লাইসেন্স না দেওয়ার কোন কারণ নেই।" আজ মনে পড়ে, সেই সব কথা। এত উদার মনোভাব আমি আর কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যেই দেখি নি। সৎ ও সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত আরও ২।১টি ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখেছি কিন্তু এমন স্বচ্ছ ও উদার মনোভাবসম্পন্ন আর কোন ম্যাজিটেস্ট্রকেই দেখি নি। এর পরে, আমি দরখাস্ত দিই এবং একটি ডি, বি, বি, এল (D. B. B. L.) বন্দুকের লাইসেন্সও আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দেন। আমি অবশ্যি বন্দুক আর কিনি নি। পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তা আমি করলেম। এ হেন একজন উদার লোক কিন্তু এর পরে আর বেশি দিন ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে থাকতে পারলেন না। আগস্ট, কি সেপ্টেম্বর

মাসের মধ্যেই তিনি ঢাকায় সচিবালয়ে বদলি হয়ে গেলেন। তার স্থানে বগুড়া থেকে এলেন, আই, সি, এস, মিঃ আব্দুল মজিদ।

রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলি তায়েব সাহেব বদলি হ'য়ে ঢাকায় গিয়েছেন। তাঁর স্থানে এসেছেন, মিঃ আব্দুল মজিদ, (সি এস পি)। অ-বাঙালী মিঃ মজিদ, রূপবান তরুণ যুবক। তাঁর পটলচেরা ঢুলুঢুলু চোখ। কবি-কবি ভাব। চাল-চলনে একেবারে বে-পরোয়া, যেন কোনও নবাব-বাদশা। এমন সুন্দর চেহারার মধ্যে যে কত বড় একটা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মন তাঁর ছিল, সেইটাই তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে বিলেতে 'আই সি এস' শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষা দেওয়া হ'ত তার প্রথম পাঠই নাকি ছিল 'প্রথমে সন্ত্রাস সৃষ্টি কর, তারপরে শাসন কর' (First terrorise, then administer)।' সত্যিই বিলেতের শিক্ষার এইটেই মূলসূত্র ছিল কিনা জানি না, তবে মজিদ সাহেবের কয়েক বছরের শাসনের মধ্যে যা' দেখেছি তা'তে স্বভাবতই মনে হয়েছে তিনি ঐ নীতিই তাঁর শাসনের মূলনীতি হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন ; আর এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি আইনের শাসনও অনেক সময়েই বে-পরোয়াভাবে পদ-দলিত ক'রে চলেছেন। তিনি তাঁর কোনও উপরিওয়ালারও তোয়াক্কা করেন নি। এই না-করার পেছনে তাঁর হয়তো একটা সুবিধা ছিল। পূর্ববঙ্গের জাঁদরেল মুখ্য সচিব (চীফ সেক্রেটারী) মিঃ আজিজ আহমেদ সাহেব, তাঁর 'ভায়েরা-ভাই' ছিলেন।

যা'ক, এহেন মজিদ সাহেব শাসনভার নেওয়ার পরে তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর বাংলোতেই। প্রথম আলাপ-পরিচয় বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবেই হয়। তিনি আমার সহযোগিতাই কামনা করেন এবং আমিও তাঁর সাথে পূর্ণ সহযোগিতারই প্রতিশ্রুতি দিই। এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর, তাঁর অফিস থেকে বের হ'য়ে বাংলোর বারান্দাতে এসে আমার সঙ্গে দেখা হয় দুইজন প্রবীণ ও

প্রধান মুসলিম লীগ নেতার সাথে। একজন ছিলেন, ডাঃ সফি এবং অপরজন মুসলিম লীগেরই একজন বিশিষ্ট নেতা (বর্তমানে তাঁর নাম মনে নেই। তিনি রাজসাহী জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমা থেকে নির্বাচিত হ'য়ে পূর্ববঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার হয়েছিলেন)। তাঁরা আমাকে ডেকে বলেন—"পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরে—মুসলমানদের উপরে ভয়ানক অত্যাচার সেখানকার হিন্দুরা করেছেন; ফলে কিছুসংখ্যক মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা বাস্তত্যাগ ক'রে রাজসাহীতে এসেছেন। তাঁদের কাছে সব শুনে এখানকার স্থানীয় মুসলমানরা অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়েছেন। গতকাল রাতে আমাদের সভায় ঠিক হয়েছে যে আজ আপনাকে ডেকে কলকাতায় গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সাথে দেখা ক'রে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে বলা হবে।" তাঁদের সভার ঐ নির্দেশনামার প্রস্তাব শুনে আমি তাঁদের বলি—"সেটাই যদি আপনারা সাব্যস্ত ক'রে থাকেন, তাহলে আমার উত্তরও আপনারা এখনই এবং এখানেই শুনুন। পশ্চিমবঙ্গ, তথা ভারত, একটি হিন্দু রাষ্ট্র নয় আর, আমি এখানে আপনাদের প্রকল্পিত সেই হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও প্রতিভূ (hostage) হয়েও নেই। আপনারাও যেমন পাকিস্তানের নাগরিক, আমিও সেইরূপই নাগরিক। যদি এখান থেকে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কোনও প্রতিনিধিদল, (ডেপুটেশন) পশ্চিমবঙ্গে যান, তাহলে আমিও সেই দলে অবশ্যই থাকবো। কিন্তু তা' না-হ'য়ে আপনারা যদি মনে ক'রে থাকেন যে যেহেতু আমি ধর্মে একজন হিন্দু ব'লে পশ্চিমবঙ্গের কাজের জন্য আমাকে আপনারা দায়ী ক'রে প্রতিকারেরর ব্যবস্থা করতে পাঠাতে চান, তাহলে, শুনে রাখুন, আমি কিছুতেই আপনাদের আদেশ মাথা-পেতে স্বীকার ক'রে নেব না।"

আমার উত্তর শুনে বন্ধুরা বলেন—"তা যদি না-যান, তাহলে এখানে শান্তিপুরের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ভয়ানক কাণ্ড হবে।" উত্তরে আমি তাঁদের জানাই—"ও ভয় দেখাবেন না। আপনাদের যা খুশি করতে পারেন, আমি তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।" এর পরে, আমি বাসায় ফিরি এবং শুনি যে, আগামী ঈদের দিনে নামাজের পরেই নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হবে। সারা শহরময় জোর ঐ গুজব ছড়িয়ে পড়েছে এবং আতঙ্কিত হিন্দুরা অনেকেই এসে আমাকে সেই কথা জানান এবং বলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য তাঁদের অবিলম্বে দেশত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ঈদের তখনও ৫।৬ দিন দেরী আছে। আমি তাঁদের ভীতিগ্রস্ত না হ'য়ে শান্ত থাকতে বলি এবং সেইদিনই, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে মুসলিম লীগের দুই নেতার সাথে আমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন এবং শহরের হিন্দুদের মনের আতঙ্ক ও অনেকেই দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছেন, তা জানিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেবকে, বিস্তারিতভাবে এক পত্র লিখি এবং তাঁকে নেতৃস্থানীয় হিন্দু-মুসলমানকে ডেকে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করার অনুরোধ জানাই। মজিদ সাহেবের আবেদনে সেইদিনই তার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়ে এসেছিলেম। আমার ধারণা ছিল, কোনও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমি পেলেই তা তঁাকে অবিলম্বে জানান, সহযোগিতা করারই একটি অংশ। সেই ধারণার বশেই আমার অভিমতসহ সংবাদটি তাঁকে জানাই কিন্তু ফল হ'ল—'উল্টা বুঝিলি রাম' (!) গোছের। মজিদ সাহেব তার উত্তরে আমাকে এক অত্যন্ত অশিষ্ট পত্র লেখেন। পত্রের প্রথমেই আমাকে সম্বোধন করা হয়েছে—"My dear Lahiri" (আমার প্রিয় লাহিড়ী) ব'লে। "লাহিড়ী"র আগে 'মিস্টার' বা 'শ্রী' কিছুই নেই। তারপরেই আরম্ভ হয়েছে, নরমে-গরমে হুঙ্কার ও গর্জন! সে চিঠি আজ আমার কাছে নেই। ঐসব চিঠিপত্র ও বহু নথিপত্রই রাজসাহীতে আমার কাছে ছিল কিন্তু আমি অসুস্থ হয়ে এখানে চিকিৎসার জন্য এসে ঘটনাচক্রে আর রাজসাহীতে ফিরে যেতে পারি নি। আমি এখানে ভারতীয় নাগরিক হ'য়ে থাকবো বলে আসি নি; তাই, আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত কোনও নথিপত্রই আনা হয় নি; তাই পত্রখানির 'হুবহু' নকল এখানে দিতে পারলেম না; আমার স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়িয়ে যা, পাচ্ছি তা-ই তুলে ধরছি। মজিদের ঐ পত্রখানিতে প্রথমেই তিনি আমাকে লিখেছিলেন—"পশ্চিমবাংলার শান্তিপুরে মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন হয়েছে, তার জন্য আপনি কোনও দুঃখ প্রকাশ করেন নি, বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিন্দাও করেন নি। এতেই আপনার মনোভাব সবিশেষ প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দুরা, এখানে আছে দ্বিধাবিভক্ত রাষ্ট্রানুগত্য নিয়ে কেবলমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। আপনাকে বন্ধুভাবে উপদেশ দিচ্ছি, ঐ মনোভাব ত্যাগ করতে এবং অন্যান্য হিন্দুরাও যা'তে ত্যাগ করে তার ব্যবস্থা করতে।" এবারে মজিদ সাহেবের ঐ পত্রের তাঁর নিজস্ব ভাষায় যেটুকু মনে আছে, তা-ই তুলে ধরছি—

"Hindus are living here with divided loyalties for their personal ends. As a friend I advise you to drop that idea and ask others to do so."

এর পরেই তিনি সুরু করেছিলেন তাঁর শাসানি। "আমি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে, এর পর প্রয়োজনবোধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবো এবং তার ফল ভোগ আপনাদের অবশ্যই করতে হবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা এদেশ ছেড়ে চ'লে যেতে চান, তাঁরা যত তাড়াতাড়ি যান, ততই তাঁদের পক্ষে মঙ্গল।"......ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐ পত্র পেয়েই আমিও তার একটা উত্তর দিই। আমার উত্তরে আমিও তাঁকে 'My dear Majid" অর্থাৎ 'আমার প্রিয় মজিদ' বলেই সম্বোধন ক'রে যে পত্র লিখেছিলেম, তা'র ভাবার্থ টা এখানে তুলে ধরছি। "আপনার ঐ পত্র এবং পত্রের বিষয়বস্তু নেহাতই অ-হেতুক। প্রথমেই আপনাকে জানাই, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত—একটা হিন্দু রাষ্ট্র নয় এবং আমি সেই সরকারের প্রতিনিধি বা প্রতিভূ হিসাবে এখানে নেই। আমি এখানে আমার নাগরিকত্বের জোরেই আছি। আপনার চোখ-রাঙানির আমি কোনও ধার ধারি না। অতীতে, আপনার চেয়ে আরও অনেক জাঁদরেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দেখেছি। তাঁরাও তাঁদের কড়া শাসনেও আমাকে ভয় দেখাতে বা আমি যেটাকে আমার কর্তব্য মনে করেছি তা' থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে পারেন নি। আপনিও পারবেন না। যতদিন এখানে আমার জনসেবার সুযোগ থাকবে, ততদিন আমি এখানেই থাকবো—কারো ভয়েই এখান থেকে চ'লে যাব না। আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এখানে আছি কি না, তা আপনার চেয়ে আমার দেশবাসীরাই ভাল জানেন। তাঁদের কাছেই আপনি খোঁজ নিয়ে জানবেন।" সবশেষে যে ছত্রটি লিখেছিলেম তা এখনও আমার মনে আছে এবং সেই বাক্যটি এখানে উদ্ধৃত করছি—"I value your friendship, not because that I desire any material gain from you. But because you happen to be the servant of a state, of which I am a citizen." মজিদ সাহেব, তাঁর পত্রে 'বন্ধুভাবে' উপদেশ দিয়েছিলেন; তাই, আমি তাঁর সেই বন্ধুত্বেরই উত্তর দিতে গিয়ে ঐ কথা লিখেছিলেম। পত্রখানি পেয়েই তিনি নাকি খুব ক্রুদ্ধ বা ব্যথিত (!) হয়েই আমার

সহকর্মী স্বাধীনতার সংগ্রামী বন্ধু—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, উকিলের কাছে বলেন যে আমি তাঁকে "চাকর" (servant) ব'লে অপমান করেছি এবং তিনি, শ্রীবীরেনকে আমাকে জানাতে বলেছেন যে—"তিনি এক আল্লা ছাড়া কারোরই চাকর নহেন।" ("I am nobody's servant save and except that of Allah.") আমি তাঁকে রাষ্ট্রের চাকর বলেছিলেম কিন্তু তা'তেও নাকি তাঁকে অপমান করা হয়েছে!

যা হোক, ঐ পত্র তিনখানির, অর্থাৎ আমার প্রথম ও শেষ পত্রখানির ও মজিদ সাহেবের আমার প্রথম পত্রের উত্তরখানির নকল, তদানীন্তন কালের পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবকে এবং নাজিমুদ্দিন সাহেব, জিন্নাহ সাহেবের পরলোকগমনের পর, গভর্ণর জেনারেল হ'য়ে যাওয়ার পরে জনাব নুরুল আমিন সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হ'লে তাঁকেও দিয়েছিলেম। আমি ও আমার বন্ধু শ্রীগনেন্দ্র ভট্টাচার্য, এম এল এ, একসাথে নুরুল আমিন সাহেবের সাথে দেখা ক'রে তাঁকে দিই। তিনি পত্র তিনখানি পড়ে বলেন—"যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর" হয়েছে। এরও পরে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি সাহেব ১৯৪৮ সালের শেষাশেষি পূর্ববঙ্গ সফরে এলে, তাঁকেও ঐ পত্র তিনখানির নকল আমি দিই। লিয়াকত আলি সাহেবের সফর সম্পর্কে একটু পরেই আরও কিছু তথ্য তুলে ধরবো।

এই চিঠির ব্যাপার নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেবের সাথে আমার যে গোলমালের সূত্রপাত হয়, তা নানা ব্যাপারে দিনের পর দিন বেড়েই চলে; কারণ, তাঁর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আমি "পূর্ববঙ্গ-এসেম্বলিতে" ও পাক-ভারতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে সব প্রকাশ করে দিই। মজিদ সাহেব আমাকে জব্দ করার জন্ত নানা রকমের 'ফিকির ফন্দি'-ই করেন কিন্তু কিছুই কার্যকরী হয় না। আমাকে মজিদ সাহেব যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিটাই বোধহয় রাজনীতিক উচ্চ মহলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা-ই আমার রক্ষাকবচের কাজ করে। বিশেষ বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, রাজনীতিক উচ্চ মহল থেকে নাকি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর নিজ ক্ষমতা বলে আমাকে গ্রেপ্তার না-করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যাক, এই অবস্থা চলতে থাকাকালেই আমাকে সরকারী কাজ উপলক্ষে ঢাকায় যেতে হয়। সম্ভবত জমিদারী-দখলের আইন প্রণয়নের জন্ত যে 'সিলেক্ট-কমিটি' হয়, তারই অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্ত আমি

ঢাকায় যাই। কুমিল্লা থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ও গিয়ে উপস্থিত হন, সূত্রাপুর থানার অধীন ৫১নং হেমেন্দ্র দাস রোডের আমাদের বাসায়। সকালবেলায় আমাদের বাসার 'ঝি'কে বলা হয় খাবার আনতে। সে ফিরে এসে জানায়, 'রেডিও'তে না কি বলছে যে, কায়েদ-ই-আজম জনাব জিন্নাহ সাহেব পরলোকগমন করেছেন। খবরটি সকলের কাছে আকস্মিক ও অ-প্রত্যাশিত। জিন্নাহ সাহেবকে বলা হয়, পাকিস্তানের জনক, কিন্তু রাষ্ট্রের সেই জনকের কোনও গুরুতর অসুখের সংবাদ পাকিস্তান সরকার আগে কোনদিন দেন নি। তাঁর অসুখ সম্পর্কে প্রতিদিন সরকার থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে 'বুলেটিন' বা প্রচারপত্র দেওয়া উচিত ছিল এবং সেইটাই সকলে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করতে পারে কিন্তু কোন প্রচারপত্রই প্রকাশ করা হয় নি, তবে ২।১ দিন আগে কলকাতার সংবাদপত্রে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হতে দেখেছিলাম। তাতে ছিল জিন্নাহ সাহেব সম্পর্কে—"Is he daed or dying ?" অর্থাৎ জিন্নাহ সাহেব কি মৃত বা মরনোন্মুখ? তার বেশি আমরা কিছু জানতেম না। এখন হঠাৎ এই দুঃসংবাদ! আমরা নিজেরাই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি—'অন্যে পরে কা কথা!' জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ আজও পর্দার অড়ালে ঢাকা! জিন্নাহ সাহেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক, ডাঃ লতিফ সাহেব পরে সংবাদপত্রে পাকিস্তান সরকারের সম্পর্কে যে অমার্জনীয় অপরাধের বিবৃতি দেন, সরকারপক্ষ থেকে তারও কোন প্রতিবাদ হয় নি। কেন যে প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি সাহেব, যিনি নিজেই একদিন আমার কাছে বলেছিলেন যে কায়দ-ই-আজমের সাথে তাঁর সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মত! সেই ভক্তি-বৎসল পুত্রের সরকার যে কেন ঐ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে জন-চক্ষুর অন্তরালে সুনিপুণভাবে রেখেছিলেন, তা আজও প্রকাশ পায় নি, তবে আমরা বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছি যে পাকিস্তানের কাছে অপ্রিয় ষড়যন্ত্রমূলক সব কাজকেই—তা' জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুই হোক, বা লিয়াকত আলি সাহেবের হত্যাই হোক, অথবা ব্যাপক হিন্দুনিগ্রহ কিংবা হিন্দু নিধনই হোক না কেন, সব কিছুকেই অত্যন্ত সুনিপুণভাবেই যবনিকার অন্তরালে ঢেকে রাখা হয়েছে! জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর বিশদ বিবরণও, তা-ই এতদিন পরে আজও পাওয়া যায় নি—সেদিনের তো কথাই নেই! এই সংবাদের পরে আমাদের সরকারী কাজ, অর্থাৎ যেজন্য আমরা ঢাকায়

গিয়েছিলাম, তা বন্ধ হয়ে যায়। আমি রাজসাহীতে ফিরি। ফিরেই সেখানে শুনি, মজিদ সাহেব হিন্দুদের মধ্যে চরম ও চূড়ান্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর দিনে রাজসাহী শহরের এক অশিক্ষিতা গোয়ালিনী প্রতিদিনের মতই হাঁড়িতে ঘোল-মাখন নিয়ে বিক্রির জন্য রাস্তায় বের হয়েছিল, তাকে 'পাকিস্তান রক্ষার আইনে' (Security Act) গ্রেপ্তার করে জেলে দেওয়া হয়েছে। তাহেরপুর রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার, অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীরসিকচন্দ্র রায় মহাশয়কেও ঐ একই আইনে গ্রেপ্তার করে জেল-দাখিল করা হয়েছে। কয়েকজন মুসলমান প্রজা রসিকবাবুর বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেন যে রসিকবাবু নাকি জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর সংবাদে খুশি হয়ে লোকজনকে ভুরিভোজন করিয়েছেন। একজন হিন্দুর—সে হিন্দু যতবড় সম্মানিতই হোন না কেন—বিরুদ্ধে মুসলমান করেছেন অভিযোগ। সে হিন্দু আর যায় কোথায়! মজিদসাহেব তৎক্ষণাৎ পুলিশসাহেবকে আদেশ দিয়েছেন—"Arrest him at once." (তাকে এক্ষুণি গ্রেপ্তার করুন) ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ সাথে সাথেই প্রতিপালিত হয়েছে। রসিকবাবুকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হয়েছে। না ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, না পুলিশ সাহেব কোনও তদন্তের প্রয়োজন মনে করেছেন! মজিদ সাহেবের আমলে এই অবস্থাই দেখেছি যে কোনও মুসলমান, কোনও হিন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই অভিযুক্তকে সাথে সাথেই গ্রেপ্তার করে আগে জেল-দাখিল, তারপরে তদন্ত। রসিকবাবুর বেলায়ও অবশ্য তদন্ত একটা পরে হয়েছিল। সেই তদন্তে জানা গিয়েছে যে রসিকবাবুর পুত্রবধূ মারা যান। জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর ১১ (এগার) দিন আগে। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি হিসাবে সেই দিন পরলোকগতার শ্রাদ্ধের দিন ছিল এবং সেই উপলক্ষেই পূর্বের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মত লোক খাওয়ানোও হয়েছিল। এই ঘটনার সুযোগ নিয়েই এস্টেটের কয়েক জন বিদ্রোহী মুসলমান প্রজা, যাঁদের সাথে আগেও অনেক মামলা-মোকর্দমা হয়েছে, রসিকবাবুকে জব্দ করার জন্যই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মনোভাব জেনেই অভিযোগ করেন এবং তার ফলেই রসিকবাবুর গ্রেপ্তার।

মজিদ সাহেবের হিন্দু নিপীড়ন, শুধু গ্রেপ্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি হিন্দুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দিক থেকেই আক্রমণ সুরু করেছিলেন এটা যে তাঁর নিজস্ব নীতি ছিল, সব অবস্থার বিষয় বিচার-বিবেচনা করে তা আমি মনে করতে পারি নি। আমার মনে হয়েছে, মুসলিম লীগের নীতিকেই তিনি

কাজের ভেতর দিয়ে রূপ দিয়েছেন। এই ধারণা আমার কেন হয়েছিল সে কথা আমি ক্রমশ বলতে এবং দেখাতে চেষ্টা করবো।

হিন্দুর বাসগৃহ এবং হিন্দুর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব বাড়িও তিনি ব্যাপকভাবে হুকুম দখল (requisition) করা শুরু করেছেন। শুধু সরকারী অফিস ও কর্মচারীর জন্যই তিনি হিন্দুর বাড়ি হুকুম দখল করেন না, তিনি বে-সরকারী লোকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যও হিন্দুকে তাঁর বাসগৃহ থেকে উচ্ছেদ করে সে বাড়ির দখল নিয়ে তাঁকে বাস করতে দেন। হিন্দুর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব বাড়িও হুকুম দখল করে নেন। রাজসাহীর বহু পুরাতন একটি প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে— "ভোলানাথ-বিশেশ্বর হিন্দু একাডেমি" নামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়। তার নিজস্ব স্কুলের বাড়ি ও ছাত্রাবাস ছিল সেই দুটোই তিনি অ-বাঙালী রিফিউজিদের বাসের জন্য দখল করে নেন। তার পরে পুঠিয়ার পাঁচ আনির মহারাণী হেমন্তকুমারী দেবীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত "রাজসাহী সংস্কৃত কলেজের বাড়ি"টিও দখল করে নেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঐ বাড়িগুলোর দখল নেন; আজ ১৯৬৭ সালেও সে বাড়িগুলো তেমনই সরকারের দখলেই আছে। রাজসাহীতে "সমাজসেবক সঙ্ঘ" নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, বগুড়ার বাংলাদেশ বিখ্যাত নেতা শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ রায় ("যতীনদা" নামে বাংলাদেশে পরিচিত। দেশ-বিভাগ, তথা স্বাধীনতার পরে তিনি কলকাতায় পরলোকগমন করেন) ও শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কালুদা নামে প্রখ্যাত এবং বর্তমানে, পরলোকগত) মহোদয়দের প্রেরণায় এবং শ্রীমান সত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রের ('বাগু' নামে পরিচিত) আপ্রাণ সক্রিয় সহযোগিতার ফলে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিনা মূল্যে রোগীদের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হত এবং এর একটি বেশ বড় রকমের লাইব্রেরী ছিল। সেখানে বসে প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পড়াশুনারও ব্যবস্থা ছিল। বহু ছাত্রই প্রতিদিন পড়ার টেবিলে এসে পড়ার সুযোগ পেতেন। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে, মুষ্টি-ভিক্ষার দ্বারা এবং সেই মুষ্টি ভিক্ষা শহরময় সপ্তাহে সপ্তাহে আদায় হত, শ্রীমান বাগুর সক্রিয় সহযোগিতায় কতকগুলো ত্যাগব্রতী ছাত্র ও যুবকদের দ্বারা, এইভাবে সাহায্য সংগ্রহ করে এই প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব একটি পাকাবাড়িও করেছিলেন। সেটিকেও 'হুকুম দখল' করেছেন মজিদ সাহেব কতকগুলো অ-বাঙালীকে সেখানে

আশ্রয় দেওয়ার জন্য। তাঁরা ঐ বাড়িতে ঢুকেই ঘরের দেওয়ালে টাঙান পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখের ছবিগুলো নামিয়ে নিয়ে ভেঙে, পার্শ্বে অবস্থিত মিউনিসিপ্যালিটির পুকুরে ফেলে দেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। রাজসাহীর সংস্কৃত কলেজ যখন হুকুম দখল করা হয়, তখন সিলেটের সংস্কৃত কলেজটিকেও হুকুম দখল করা হয়; সুতরাং দেখা যায়, মজিদ সাহেবের দোসর আরও ছিলেন। প্রায় সর্বত্রই একই অবস্থা। যে সব প্রতিষ্ঠানের সাথে হিন্দুর নাম যুক্ত ছিল, সে সব নামও লোপ করা হয়। রাজসাহী জেলায় দীঘাপতিয়া রাজাদের দানের তুলনা নেই। রাজসাহী শহরের হাসপাতালটিও রাজা প্রমথনাথের দানেই হয়। তাই হাসপাতালের নাম হয়েছিল—"রাজা প্রমথনাথ দাতব্য চিকিৎসালয়।" রাজা প্রমথনাথের নাম বেমালুম তুলে দিয়ে তাকে করা হয়েছে—"রাজসাহী সদর হাসপাতাল।" পরবর্তীকালে আমি পূর্ববঙ্গ রেলের স্থানীয় পরামর্শদাতা কমিটি সদস্য যখন ছিলেম, তখন দেখেছি চট্টগ্রাম লাইনের চাঁদপুর কালীবাড়ি, মেহের কালীবাড়ি রেল স্টেশনের নাম থেকে কালীবাড়ী বাদ গিয়েছে এবং কমলা সাগর স্টেশনের নাম সম্পূর্ণই বদল হয়েছে! তাতে স্বভাবতই আমার মনে হয়েছে মুসলিম লীগের নীতিই ছিল হিন্দুর শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও নামের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুরই লোপ করা। মজিদ সাহেব সেই নীতিরই একজন রূপকার ছিলেন মাত্র এবং সেই জন্যই ওপরওয়ালার কাছে তিনি একজন অতি সুযোগ্য কর্মচারী বলেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

মজিদ সাহেবের শ্রেষ্ঠ অপকীর্তির কথা এইবার বলছি। ১৯৩৮ সালেই কলকাতা থেকে একজন অ-বাঙালী মুসলমান মহিলা (অথবা নারী) রাজসাহীতে এসে তিনি মজিদ সাহেবের বাংলোতেই প্রথম ওঠেন। ঐ মহিলার নাম—"কামার বেগম।" দেশ-বিভাগের আগে তিনি, পুঠিয়ার চার আনির কুমার নরেশ নারায়ণ রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পরে চার আনি এস্টেটের দাবিদার হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এক মামলা করেন। তাঁর দাবির পেছনে যুক্তি ছিল যে, পরলোকগত কুমার বাহাদুর মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে "নুরন্নবী রায়" নাম ধারণ করেন এবং তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে তিনিই সম্পত্তির একমাত্র হকদার। কুমার বাহাদুরের হিন্দু স্ত্রী তখনও জীবিতা ছিলেন। তিনি নাটোর ছোট তরফের

রাজকন্যা। হাইকোর্টে মামলা চলে। সেই মামলায় মহিলাটি হেরে যান। ইতিমধ্যে দেশ-বিভাগ ও স্বাধীনতা হয়। এইবার সেই মহিলাটি রাজসাহীতে এসে ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেবের আতিথ্য ও সাহায্য পান। মজিদ সাহেব, চার আনির রাজবাড়িতে তাঁদের সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলো রাজসাহী কোর্টে পরীক্ষা করে দেখার জন্য উপস্থিত করতে আদেশ দেন। একজন রাজকর্মচারী সেগুলো নিয়ে কোর্টে হাজির হন, সেদিন অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করা হয় না। মালখানায় সেগুলো জমা দিয়ে যেতে হয় ঐ কর্মচারীটিকে সেদিনের মত। পরদিন সকালেই মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর ক্যাপ্টেন শামসুল হক (বর্তমানে পরলোকগত) সাহেবের নেতৃত্বে একদল ন্যাশনাল গার্ডের কেজি ও ঐ মহিলাটি মজিদ সাহেবের প্রেরণায় যাত্রা করেন পুঠিয়াতে। শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁরা, "আল্লা হো আকবর" নরওয়ে তকবীর" প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে শহর কাঁপিয়ে যান। তার পরেই খবর পাওয়া যায় যে, ঐ বাহিনীর সাহায্যে তথাকথিত বেগম সাহেবা রাজবাড়ি দখল করে নিয়ে মালিকানি হয়ে বসেছেন। সাথে সাথেই তিনি মুসলিম লীগের এস, এল, এ জনাব আব্দুল হামিদ সাহেবের ছোট ভাই জনাব আব্দুল সামাদ সাহেবকে (তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন) তাঁর এস্টেটের ম্যানেজার ও শামসুল হক সাহেবকে সুপারিনটেণ্ডেন্ট নিযুক্ত করেন। তখনও জমিদারী দখল আইন হয় নি; সুতরাং সরকারও জমিদারীর দখল নেন নি। এইবার বেগমের নামে প্রজার কাছ থেকে জোর জুলুম করে খাজনা আদায় করা আরম্ভ হয়। ফলে, পুঠিয়া ও চার আনির এস্টেটের সমস্ত এলাকায় প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। পুঠিয়া ছিল বহু পুরাতন স্থান। নাটোর রাজাদেরও উৎপত্তি পুঠিয়ার রাজাদেরই সাহায্যে। পুঠিয়া ছিল এককালে রাজসাহী জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। সেই প্রাণ কেন্দ্রেই মজিদ সাহেব আঘাত হানলেন। দেখতে দেখতে পুঠিয়ার লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে যেদিকে পারলেন, পালিয়ে গেলেন—যে পুঠিয়া শহর না-হয়েও সর্বদা জন-কোলাহলে মুখরিত থাকতো সেই পুঠিয়া দেখতে দেখতে শ্মশানের নীরবতায় ভরে গেল। পুঠিয়া ছিল জমিদার প্রধান গ্রাম; আর সেই সব জমিদারদের অবলম্বন করেই বহু সংখ্যক হিন্দু সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন; সুতরাং গ্রামটি হিন্দু প্রধানও ছিল। সেই হিন্দুরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। কামার বেগমের রাজবাড়ি দখলের ব্যাপার নিয়ে যে আতঙ্ক

পুঠিয়াতে সৃষ্টি হয়েছিল, তা পুঠিয়া গ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকে নি—সমস্ত জেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ও শহরে হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তবে তখনও বিশেষ কেউ দেশ-ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন নি। হিন্দুদের মনে নতুন করে আবার সংশয় জেগেছিল যে, যেখানে আইনের শাসন নেই, সেখানে কি ধন-প্রাণ-সম্মান নিয়ে তাঁরা নিরাপদে বাস করতে পারবেন ?

যাক, বেগম রাজবাড়ি ও জমিদারী দখল করে বেশ জাঁক-জমকের সাথে সুখেই দিন কাটাতে আরম্ভ করেন, তবে জাঁক-জমক তাঁর বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে নি। আমি বেগমের বিভিন্ন রূপ দেখেছি, জমিদারী থাকতে তাঁকে দেখেছি দামী সিগারেট খেতে খেতে ট্যাক্সিতে চড়ে শহরে ঘুরে বেড়াতে আবার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পরে, রিক্সায় চড়ে বা পায়ে হেঁটেও বিড়ি টানতে টানতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেও দেখেছি। বেগমের বিষয় নিয়ে তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী জনাব তফাজ্জল আলি সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা প্রসঙ্গে মন্ত্রী সাহেব একদিন মন্তব্য করেছিলেন—বেগম তো একটি বাজারে স্ত্রীলোক (তিনি বলেছিলেন—She is a public woman). কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই বাজারে—স্ত্রীলোকটি আজও রাজবাড়ি দখল করেই বসে আছেন। আজ তাঁর জবর দখলি জমিদারী আর নেই—সরকার দখল করে নিয়েছেন কিন্তু তিনি রাজবাড়িতে থেকেই পুকুরের মাছ, গাছের নারকেল, (পুঠিয়াতে বহু নারকেল গাছ আছে) ঝাড়ের বাঁশ, বাগানের ফলবান গাছও এমন কি, রাজবাড়ির দালান ভেঙে তার ইট, কাঠ ইত্যাদি নিজের ইচ্ছামতভাবেই বিক্রি করে চলেছেন ! সরকারের কোন বাধা নেই ! জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেবের কীর্তি স্তম্ভ (!) আজও অম্লানই আছে।

মজিদ সাহেবের আরও অনেক কীর্তিই আছে। তার মধ্যে মাত্র আরও গুটি কয়েকের কথা বলছি। তিনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে না-পেরে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সহকর্মী ও আমার বিশেষ স্নেহভাজন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, উকিলকে নিবর্তমূলক আইনে (Security Act) গ্রেপ্তার করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও তাঁদের হত্যা করতে ষড়যন্ত্র ও সাহায্য করেছেন। বীরেন কিন্তু দেশ-বিভাগের বহু আগে থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলাতেই যান নি এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐ সময়ে কোনও সাম্প্রদায়িক

হাঙ্গামাও হয় নি। তবু তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। এমনি কত ঘটনার কথা বলবো ? বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যায়, সুতরাং সেদিক দিয়ে আর বেশি দূর না গিয়ে আর মাত্র একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলি তায়েব সাহেব, তাঁর কার্যকালে যা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেব ব্যাপকভাবে আরম্ভ করেন। অর্থাৎ হিন্দুদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলো ব্যাপকভাবে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া সুরু হল! নদীর এক কূল ভাঙে আর অপর কূল গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তা-ই হয়। হিন্দুর বন্দুক প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়, আর মুসলমানকে বিনা-তদন্তেই বে-পরোয়াভাবে লাইসেন্স দেওয়া হয়। আমি উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কেই মজিদ সাহেবের সাম্প্রদায়িক মনের নিন্দনীয় অপকীর্তি হিসাবে, পূর্ববঙ্গ বিধানসভায় তুলে ধরি। রাজসাহী মুসলিম লীগের এম-এল-এ জনাব মাদার বক্স সাহেব মজিদ সাহেবকে পুরোপুরি সমর্থন করে বিধানসভায় তাঁর বক্তৃতা করেন। মাদার বক্স সাহেবের কাছে তাঁর মজিদ সমর্থনের সুফলও হাতে হাতেই দেখা দেয়। মাদার বক্স সাহেব ছিলেন রাজসাহী আদালতের এক পশারহীন উকিল। তাঁর আয়ের প্রধান ক্ষেত্র ছিল, ওকালতি নয়—চলতি কথায় যাকে বলা হয়, 'টোকালতি' (অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদের ও মন্ত্রীদের কাছে গিয়ে তদ্বির !)—তাই। মাদার বক্স সাহেব কিন্তু মানুষ হিসাবে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে 'ঝানু' রাজনীতিকের কোন ঘোর-প্যাঁচ ছিল না, যার কিছু কিছু ছিল, জনাব আব্দুল হামিদ, এম, এল, এ সাহেবের মধ্যে। মাদার বক্স সাহেব, তাঁর মনের সরলতার জন্যই একদিন আমার কাছে বলেছিলেন,—"দাদা ! রাজসাহী শহরে আমার কোনও বাড়ি ছিল না ; তাই খোদার কাছে আমি প্রতিদিনই 'মোনাজাত' করতেম—খোদা। আমাকে একটা বাড়ি করার অর্থ দাও। খোদা আমার প্রার্থনা শুনলেন এবং এমন দেওয়াই দিলেন যে টাকা যেন আকাশ থেকে উড়ে এসে পড়তে লাগলো এবং তিন মাসের মধ্যে আমার হাতে দশ হাজার টাকার উপরে জমে গেল। আমি ঐ টাকা দিয়ে শ্রীনির্মল মৈত্রের (পূর্বে রাজসাহীতে পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং দেশ-বিভাগের পরে, অপশান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন) নতুন তৈরী বাড়িটি কিনলেম।" কী ভাবে যে ঐ টাকা উড়ে তাঁর কাছে এসেছিল, সে কথাও তিনি আমাকে

বলেছিলেন। রাজসাহীর প্রতিটি লোকই, এমন কি সরকারী কর্মচারীরাও সে কথা জানেন। মাদার বক্স সাহেব আমাকে যা বলেছিলেন, তাঁর কথাতেই তা এখানে বলছি। তিনি বলেছিলেন—"আপনার বিরুদ্ধে মজিদ সাহেবকে সমর্থন করে বিধানসভায় বক্তৃতা করাতে তিনি আমার উপর অত্যন্ত খুশি হন এবং আমাকে বলেন যে, বন্দুকের লাইসেন্সের জন্ত যাঁরা দরখাস্ত করবেন, তাঁদের দরখাস্তের মধ্যে যাতে আপনার সুপারিশ থাকবে, তাঁদেরই কেবল তিনি লাইসেন্স দেবেন এবং ঐ সুপারিশের জন্ত মাদার বক্স সাহেব প্রতি সুপারিশে একশো টাকা করে নিতে পারবেন। মজিদ তো আমাকে একশো টাকা করে নেওয়ার লাইসেন্স (!) দিলেন, আমি কিন্তু একশো থেকে তিন শো টাকা পর্যন্তও নিয়েছি।" এইভাবেই রাজসাহী শহরে মাদার বক্স সাহেবের বাড়ি হয়েছিল। রাজসাহীতে জনৈক মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মাদার বক্স সাহেব, তাঁর নতুন বাড়িতে একটি চায়ের সভা (Tea-party) দেন। ঐ সভাতে পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এসদাদ আলি সাহেব সকলের সামনেই মাদার বক্স সাহেবকে বলেন,—"আপনার এই বাড়িটার নাম—"Gun house" (বন্দুক বাড়ি) দিন! মজিদ সাহেবের এও এক কীর্তি।"

তার পরেও মজিদ সাহেব হিন্দুদের শোষণ করে চাঁদা তুলতে আরম্ভ করেন। ঐ চাঁদা তোলার জন্ত তিনি পূর্ববঙ্গ সরকারের কোনও অনুমতিও নেন নি, সুতরাং, তার হিসাব রাখারও তিনি কোনও প্রয়োজন বোধ করেন নি। শুনেছি, প্রায় লাখ টাকার মত তিনি তুলেছিলেন। তার কিছু অংশ অবশ্য তিনি ভাল কাজেও ব্যয় করেছেন। প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকা দিয়ে রাজসাহী শহরের ঈদ গাহ—ময়দানে "জিন্নাহ হল" নামে এক সুবৃহৎ "টাউন হল" তৈরি করান। আর একটা সত্যি সত্যি ভাল কাজও তিনি করেছিলেন। আজ রাজসাহী শহরে সরকারী পর্যায়ে যে মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠেছে। বে-সরকারী পর্যায়ে তারও একটা বনিয়াদ, মেডিক্যাল স্কুলরূপে তিনি গড়ে গিয়েছিলেন। তিনি যে টাকা উঠিয়েছিলেন তার কোনও হিসাব অবশ্য তিনি কাউকেই দেন নি। এই টাকার ব্যাপার নিয়েই তৎকালীন জবরদস্ত পাঞ্জাবী বিভাগীয় কমিশনার সাহেব (বর্তমানে নামটি মনে পড়ছে না) মজিদ সাহেবের বিরুদ্ধে যান এবং তাঁরই রিপোর্টে তিন বছর রাজসাহীতে কাটিয়ে বদলি হন। বদলি হলেন, কিন্তু কোথায়? যুক্ত বাংলার সর্ববৃহৎ জেলা—মৈমনসিংহ। তাঁর উন্নতিই হল।

সেখানে গিয়েও, শুনেছি তিনি সাতশো হিন্দুর বাড়ি হুকুম দখল করে নেন।

মজিদ সাহেব সম্পর্কে এত কথা বললেম শুধু পাকিস্তান—সরকারের শাসন পরিচালনায় মুসলিম লীগের কী নীতি ছিল, সেইটা তুলে ধরার জন্যই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলি তায়েব সাহেবের ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেবের কার্যকালের ঘটনাগুলোর এবং ঐ দুই ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরীর পরিণতি সম্পর্কে এখন তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বিচার করলেই সকল মুসলিম লীগের শাসন নীতি সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। আমি সে সম্বন্ধে নিজে কোনও মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

মজিদ সাহেব সম্পর্কে আমি সব কথা বিধানসভায় ও পাক-ভারতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশ করে দিয়েছি, সুতরাং তিনি স্বভাবতই আমার উপর বিরূপ হবেন। হয়েছিলেনও। তার প্রমাণ দেখা যায়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি সাহেবের পূর্ববঙ্গ সফরের সময়। লিয়াকত আলি সাহেব ঢাকা এসেছেন। রাজসাহীতেও আসবেন। রাজসাহীতে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি বিবরণপত্র (representation) তাঁকে দেওয়ার ব্যবস্থা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেব করলেন। ঐ দুইটি কমিটির কোনটিতেই আমার স্থান হল না, যদিও সরকারী পর্যায়ে আমিই তখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলাম। মজিদ সাহেব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তিনজন তাঁর বাধ্য অনুগত হিন্দুকে নিয়ে বিবরণপত্র (representation) দেওয়ার জন্য একটি কমিটি করলেন। ঐ তিনজন হলেন, (১) রায় বাহাদুর ধরণীমোহন মৈত্র (বর্তমানে পরলোকগত), (২) শ্রীপ্রফুল্ল নাথ বিশী (অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট) ও ডাঃ শৈলেশচন্দ্র নন্দী। এই অবস্থা দেখে আমি ঢাকায় চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সব অবস্থা জানাই। সব কথা শুনে তিনি আমাকে অবিলম্বে রাজসাহীতে ফিরে যেতে বলেন এবং আরও বলেন যে সেখানে গিয়ে সব দেখা-সাক্ষাতের পর তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবেন যে ঐসব সাক্ষাৎ-কারীদের মধ্যে আমার নাম নেই কেন? এবং তিনি নিজেই তারপরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখা করবেন। তার ফলে, তাঁর কথাতেই বলি, তিনি বলেছিলেন যে—"This will bring about a sobering effect

upon the District Magistrate there." অর্থাৎ তিনি নিজে থেকে আমাকে ডেকে দেখা করলে তার ফলে জেলা শাসকও অনেকটা নরম হবেন। তিনি আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কি কি অন্যায় করেছেন, তার একটা বিবরণপত্র তৈরী করে তাঁকে সে সময় দিতে বলেছিলেন। আমি তাঁর কথামত রাজসাহীতে ফিরে যাই এবং একটি বিবরণপত্র তৈরী করে রাখি। জনাব লিয়াকত আলি সাহেব যথা নির্দিষ্ট দিনে রাজসাহীতে এলেন। দেখা-সাক্ষাৎও সবই হোল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের "ত্রি-মূর্তি" তাঁদের বিবরণপত্র প্রধানমন্ত্রীকে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরের সংবাদ সংগ্রহের জন্য যে সব সাংবাদিক গিয়েছিলেন, তার মধ্যে কলকাতার স্টেটসম্যান (Statesman) পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন। তাঁর পুরো নাম মনে নেই; তবে, তাঁর নামের শেষের দিকে ছিল— ···Noney (নোনে)। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেওয়া মানপত্র দেখেই সন্দেহ করেন যে যাঁরা ঐ মানপত্র দিচ্ছেন, তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সত্যিকারের প্রতিনিধি নন। ঐ মানপত্রে নাকি ছিল—ঐসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুদের কোনই আপত্তি নেই। তাঁরা—সংখ্যালঘুরা —সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সমান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। কোন অভিযোগ তাঁদের নেই।···ইত্যাদি ইত্যাদি। মিঃ নোনের সন্দেহ হওয়ায় তিনি খোঁজ করে আমার বাড়িতে যান এবং আমার কাছে সব কথাই শোনেন। আমি প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়ার জন্য যে বিবরণপত্র তৈরি করে রেখেছিলেম, তার একটা নকলও তিনি নিয়ে যান।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী সন্ধ্যার সময় গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। আমার সাথে একান্তে প্রায় ৪৫ মিনিটকাল তাঁর কথাবার্তা হয়। আমার সব কথাই তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথেই শোনেন এবং অবশেষে বলেন—"I understand, there are some overzealous officers but the thing is that those officers can be brought under check. Whatever may happen, you please bring it to the notice of the Government and the Government must take step. You please don't leave Pakistan and ask others to do likewise." অর্থাৎ "আমি বুঝতে পারছি, কিছু সংখ্যক অতি উৎসাহী কর্মচারী আছেন কিন্তু ঐসব কর্মচারীগণকে শাসনে রাখা যায়। পাকিস্তানে

যা কিছু অন্যায়-অত্যাচার হোক, সেগুলো সম্পর্কে সরকারের কাছে সব তুলে ধরবেন এবং 'সরকার' নিশ্চয়ই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। আপনি পাকিস্থান ছেড়ে যাবেন না এবং অপর কাউকেই যেতে দেবেন না।"

তাঁর কথার উত্তরে তাঁকে শুধু আমি জানিয়েছিলাম যে—"নাজিমুদ্দিন সাহেব এখন গভর্নর-জেনারেল (জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর পরে)—তাঁকে সবই জানিয়েছি। জনাব নুরুল আমিন সাহেব এখন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকেও সবই জানিয়েছি। আপনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আপনাকেও সবই জানালেম। এখন দেখি, ফল কী হয়!"

ফল যে কী হয়েছে, তা আমি নিজে না বললেও 'বেগম সাহেবা' যে এখনও বাহাল-তবিয়তেই পুঠিয়ার রাজাবাড়ি দখল করেই বাস করছেন, তা দেখেই সকলে বুঝতে পারবেন। সব ব্যাপারেই ঐ একইরূপ ফল হয়েছে।

সব ঘটনা জেনে এবং সব বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করে যদি কেউ মনে করেন যে মুসলিম লীগের নীতিই ছিল হিন্দু-বিরোধী নীতি এবং তাঁদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের দেশত্যাগ করতে বাধ্য করান। তাহলে তিনি কি ভুল করবেন? ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজী কিন্তু এই সত্যটা বুঝতে চান নি। অনেক বার তিনি ভারতীয় সংসদে বলেছেন যে পাকিস্তান থেকে যে হিন্দুরা চলে আসে, তা' অভাবের তাড়নায়। ভারতের শাসকগোষ্ঠী যত শীঘ্র তাদের আসল রূপটা ধরতে পারেন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

পাকিস্তান সরকার কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ীই ঐ নীতি অনুসরণ করে চলছেন।

১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বলার আগে মুসলিম লীগের কোনও কোনও নেতার মত সেই দাঙ্গার সাথে জড়িত বা সংশ্লিষ্ট দুটি ঘটনার কথা আগে বলছি। দেশ-বিভাগের আগে থেকেই

ভাগ-চাষীদের (Share-Croppers) ব্যাপার নিয়ে একটা টিমে-তেতালা গোছের আন্দোলন চলতে থাকে। দেশ-বিভাগের তথা স্বাধীনতার পরে ১৯৪৯ সালে সেই আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হয়ে ওঠে উত্তরবঙ্গের কোন কোনও জেলায়। পূর্ববঙ্গের পূর্ব-দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা তার মধ্যে প্রধান স্থান নেয়। পূর্ব-দিনাজপুরের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এবং রাজসাহী জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যেই তা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। উভয় সম্প্রদায়ই কৃষক ও বর্তমানে অধিকাংশই ভাগ-চাষী। রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানায় বহু সাঁওতালের বাস আগে থেকেই ছিল। দেশ-বিভাগের পরে, রাজসাহী জেলার সাথে এসে যুক্ত হয়েছে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার কয়েকটি থানা। মালদহের নাচোল ও নবাবগঞ্জ থানায়ও অনেক সাঁওতালের বাস। কয়েকটি থানার সাথে ঐ দুটি থানাও রাজসাহী জেলায় আসে। গোদাগাড়ী থানার সাথে ঐ দুটি থানার পরিস্থিতি সংলগ্ন এবং সাঁওতালদের মধ্যেকার পরিবেশও এক ও অভিন্ন। গোদাগাড়ী থানার সাঁওতালদের সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এসেছিল, গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯২১ সালের কংগ্রেস-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

সেই সময় কংগ্রেসের আদর্শই ছিল, "দিতে হবে ম্লান মূক মুখে ভাষা।" যেথানেই নির্যাতিত শোষিত অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের বাস, সেখানেই কংগ্রেসের কাজ; তাই, কংগ্রেস সেদিন গণ-প্রতিষ্ঠান হয়ে গড়ে উঠেছিল। সেই সময় দেখেছি, সাঁওতালরা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যেও সবচেয়ে শোষিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত সম্প্রদায়; তাই, আমরা তাদের মধ্যেও আমাদের কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলেছিলেম। গোদাগাড়ী থানাকে বলা হত রাজসাহী জেলার শস্যভাণ্ডার কিন্তু অতীতে সে অবস্থা ছিল না। শুনেছি গোদাগাড়ী থানা অঞ্চল বিরাট বনজঙ্গলে ভর্তি ছিল। সেখানে বাঘ, হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি নাকি চরে বেড়াত। সেই অবস্থায় সাঁওতালরা এসে না কি সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করেই বন-জঙ্গল 'সাফ' করে তাকে আবাদী জমিতে রূপান্তরিত করে। যখন তারা বন কেটে জমি বের করে, জমিদার তখন তাদের খাজনা নেন নি এবং যে যতটা জমি বের করবে, সে ততটা জমির দখলদারিও পাবে,—এই ছিল জমিদারদের মৌখিক আদেশ। জমি বের করে সাঁওতালরা যখন জমিতে 'সোনা' ফলাতে সুরু করলো, তখন জমিদার থেকে আরম্ভ করে অন্য সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে

পড়লো। জমিদারগণ তাদের একটা নামমাত্র খাজনা ধার্য করে জমির স্বত্ব ভোগের অধিকার তাদের দেয়। সুতরাং ঐ সব সাঁওতালরাও ছোট-খাটো জোতদার হয়ে পড়ে। তাদের বসতি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান বাঙালীরাও ক্রমশ গিয়ে বসতি করে এবং ছোট-খাটো মুদীর দোকান খুলে বসে। আজকে যেমন পাক-ভারতে মুদ্রা-স্ফীতি (infilation) হয়ে লোকের হাতে টাকা-পয়সার 'ছড়াছড়ি' হয়েছে, আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে সে অবস্থা ছিল না। লোকের হাতেই টাকা-পয়সা কম ছিল, সাঁওতালদের তো টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। তারা টাকা সংগ্রহের দিক দিয়ে যেতও না, কারণ টাকার হিসাব জানা তো দূরের কথা, টাকা-পয়সা গুণতেও জানতো না। মুদীরা তেল-নুন প্রভৃতি ছোট-খাটো আবশ্যকীয় জিনিষগুলো তাদের ধারেই দিয়ে যেত এবং সাঁওতালদের সততা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে ফসল উঠলে দেনাগ্রস্ত সাঁওতালদের একটা কাল্পনিক হিসাব শুনিয়ে দিয়ে দেনা শোধ করতে বলতো। সাঁওতালরাও মুদীদের দাবিমত দেনা (সুদ ও সুদের সুদ সহ) ফসল দিয়েই শোধ করে দিত। এইভাবেই চলছিল কিন্তু ক্রমশ এমন একটা সময় আসে, যখন সাঁওতাল খাতকদের দেনা আর তাদের উৎপন্ন ফসল দিয়েও শোধ হয় না; তখন, জমি দিয়েই দেনা শোধ করা আরম্ভ হয়। এইভাবেই যে সাঁওতালরা নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে, নিজেদের জীবন বিপন্ন করে জমি বের করেছিল, জমিতে 'সোনা' ফলিয়েছিল, তারাই ক্রমশ জমিহীন ভাগ-চাষী হয়ে পড়ে; আর, সামান্য পুঁজির মুদীরাই দেখা দেয় জোতদাররূপে! এটাই রাজসাহীর সাঁওতালদের ইতিহাস। এই অবস্থা দেখে, আমরা জেলা কংগ্রেস থেকে ১৯২১ সালে দু'জন কংগ্রেস কর্মীকে স্থায়ীভাবে তাদের মধ্যে রেখে তাদের শিক্ষার ও দোকান পরিচালনার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করি। সেই দুজন কর্মী ছিল, (১) আমার খুড়তুতো ভাই—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী ও (২) শ্রীশিবেন মণ্ডল। শিবেন এখন কোথায় কীভাবে আছে, তা জানি না। আমার ভাই—শ্রীমান মণীন্দ্র এখন কালিকানন্দ নামে সন্ন্যাসী হয়ে পরলোকগত পূজ্যপাদ রামদাস স্বামীজীর 'আনন্দাশ্রমে (দক্ষিণ ভারতে) বর্তমানে আছে।

অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মত রাজসাহীর সাঁওতালদের মধ্যেও ১৯২১ সালের ও পরবর্তীকালের কংগ্রেস আন্দোলনই একটা জাতীয় ও সম্প্রদায়গত নব-জাগরণের সূত্রপাত করে। দেশ-বিভাগের পরে রাজসাহীর এই নব-জাগ্রত সাঁওতালদের সাথে এসে যুক্ত হয়, ভূতপূর্ব মালদহ জেলার কয়েকটি থানার—

বিশেষ করে, নাচোল ও নবাবগঞ্জ থানায় বিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী সাঁওতালরা ইংরেজ আমলে মালদহের সাঁওতালদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আমার যতটা মনে পড়ে তাতে মনে হয়, শ্রীজে. এন. তালুকদার, আই-সি-এস মহাশয় বোধহয় তখন মালদহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সাঁওতালরা, তাদের প্রধান অস্ত্র তীর-ধনুক নিয়ে সংগ্রাম করে এবং সরকার পক্ষের পুলিশ তাদের হাতিয়ার বন্দুক নিয়ে বিদ্রোহীদের ওপর গুলীবর্ষণ করে। সাঁওতালদের দলপতি জিতু সাঁওতাল নিহত হয়। বিদ্রোহ দমিত হয় কিন্তু মালদহের সাঁওতালদের মধ্যে অন্যায় অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার একটা ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। সেই ঐতিহ্যবাহী মালদহী সাঁওতালরা দেশ-বিভাগ, তথা বাংলা বিভাগের ফলে, রাজসাহীর সাথে যুক্ত হয়ে রাজসাহী জেলার অধিবাসী হয়েছে এবং রাজসাহীর আদি অধিবাসী সাঁওতালদের সাথে এক হয়ে গিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, পূর্ববঙ্গে যদিও খাতাপত্রে এবং কাগজ-কলমে "পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস" নামে একটা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। তার পক্ষে আর কোনও সংগ্রামী আন্দোলন করা সম্ভবপর ছিল না। কোনও হিন্দু পরিচালিত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না, সেরূপ আন্দোলন করলে ব্যাপক আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই তখনও ছিল, কারণ, তখন পর্যন্ত মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে কোনও বিরোধী দল গড়ে ওঠে নি। তখন পর্যন্ত সকলেই একটি মাত্র রাজনীতিক দল—"মুসলিম লীগের" সদস্য; আর, সেই মুসলিম লীগ অনবরত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে চলেছে যে, "হিন্দুস্থান সরকার" (ভারত সরকারকে মুসলিম লীগ 'হিন্দুস্থান সরকার' বলেই প্রচার করে—তখনও করেছে, আজও সমানভাবেই করে চলেছে) ও হিন্দুরা (পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাও) পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে। "পাকিস্তান" নামটির উপরে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তখন তো একটা অত্যন্ত প্রীতি ও ভালবাসা ছিলই, যার রেশ আজও চলছে, সেই অবস্থায় কোন হিন্দু পরিচালিত রাজনীতিক দল যদি কোনও সংগ্রামী আন্দোলন করতো, তার ফল যে কী বিষময় হতে পারতো তা সকলেই বুঝতেন। পাকিস্তান কংগ্রেসের পক্ষে তা আরও সম্ভবপর ছিল না; কারণ, ভারতে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তানে যদিও প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছিল—"পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস" বলে, তবু মুসলমানদের মধ্যে প্রচার

করা হয়েছে যে ভারতের কংগ্রেস ও পাকিস্তানের কংগ্রেস একই মুদ্রার এপিঠ, আর ওপিঠ মাত্র। একই উদ্দেশ্য নিয়েই চলে। কোনও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান যদি জনসাধারণের সত্যিকারের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আন্দোলনে না-নামেন, তাহলে শুধু ভাল ভাল কথার মালা গেঁথে বক্তৃতা করে চিরকাল জনসাধারণের উপর প্রভাব বজায় রাখতে পারে না। সেই অবস্থায় ক্রমশ সেই সব প্রতিষ্ঠান গণ-সংযোগ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানে, তথা পূর্ববঙ্গে আমরা কংগ্রেসীরা জনসাধারণের মধ্যে কোনও আন্দোলন গড়ে তুলে তাদের সাথে সংযোগ রাখতে পারি নি। আমরা গণ-সংযোগ যেটুকু রাখতেম, তা হল জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা 'এসেম্বলি'তে তুলে ধরে। এ ছাড়া আমাদের আর সুষ্ঠু কোন পথ ছিল না। আমরা যখন সাক্ষাৎভাবে সংগ্রামী কোনও আন্দোলন না করে, জনগণ থেকে কিছুটা দূরে সরে পড়ছিলেম, তখন 'কম্যুনিষ্ট পার্টি' কিন্তু দূরে সরে থাকেন নি। তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন, তে-ভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে। দিনাজপুরের কম্যুনিষ্ট সদস্য শ্রীরূপনারায়ণ রায় (১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত এবং পরে দিনাজপুর জেলা বিভক্ত হওয়ার ফলে তাঁর এবং শ্রীনিশিথনাথ কুণ্ডুর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়) এবং রাজসাহীতে শ্রীমতী ইলা মিত্র ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। যদিও ঐ তে-ভাগা আন্দোলনটি কোনও সম্প্রদায়গত আন্দোলন ছিল না, তবু কিন্তু দিনাজপুরে ভাগ-চাষী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা এবং রাজসাহীতে সাঁওতালদের মধ্যে বিশেষভাবেই প্রভাব বিস্তার করে এবং কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বেশ একটা দৃঢ় ভিত্তির উপরই গড়তে থাকে।

এই প্রসঙ্গে ভারতের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও একটা কথা এখানে তুলে ধরছি। দেশ-বিভাগ, তথা স্বাধীনতার পরে, ভারতের শাসন-ক্ষমতায় গিয়েছেন, "কংগ্রেস"। 'কংগ্রেস' শাসন-ক্ষমতায় যাওয়ার পর কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান আর কোনও আন্দোলনে যায় নি। সংগ্রামের যে ঐতিহ্য তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে গড়ে তুলেছিলেন, তাকেই মূলধন করে নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে থাকেন কিন্তু এই অবস্থা তো চিরকাল চলতে পারে না। চলেও নি। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান ক্রমশ জন-সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে, তাই, দেখছি ভারতের অনেকগুলো প্রদেশেই কংগ্রেসের আসন কেঁপে উঠেছে। কংগ্রেসের সংগ্রামী ঐতিহ্যের মূলধন ভাঙিয়ে খেতে খেতে ক্রমশ তা ক্ষীয়মাণ হয়ে এসেছে।

পূর্ববঙ্গে আমাদের অবস্থাও তাই হত, যদি না আমরা এসেম্বলির মাধ্যমে লোকের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরতেম। এসেম্বলিতে বিরোধী দলে থাকায় আমাদের সেই সুবিধাটুকু ছিল, কিন্তু ভারতে কংগ্রেসের পক্ষে এতদিন পর্যন্ত সে সুযোগ কোন প্রদেশেই ছিল না। কোন কোনও প্রদেশে বর্তমানে সে সুযোগ (আমি একে সুযোগই বলতে চাই) এসেছে বটে কিন্তু কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান বিরোধী দল হিসাবে সম্প্রতি (১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষে বাজেট অধিবেশনে) যে নজির দেখালেন, তাতে তার ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ মনে হয় না।

যাক, পূর্ববঙ্গের—বিশেষ করে, উত্তরবঙ্গের—যে তে-ভাগা আন্দোলনের কথা বলছিলেম, তাতে আবার ফিরে যাই। এতকাল পর্যন্ত জোতদার ও তাঁর ভাগ-চাষীর মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল যা তা হচ্ছে, চাষীরা জমির চাষ-বাস সবই করবেন, জমি ও ফসলের তদারকীও তাঁরাই করবেন, ফসল কাটার সময় জোতদার বা তাঁর লোককে খবর দিয়ে ফসল কেটে জোতদারের বাড়িতে বা তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে তা ওঠাবেন এবং ফসল 'মাড়াই' হলে তার অর্ধেক অংশ পাবেন ভাগ-চাষী বা আধিয়াররা। এখন চাষীদের দাবি হয়েছে যে, তাঁরাই জমিতে মেহনত করে, 'বুকের রক্ত জল করে' ফসল ফলাবেন; সুতরাং তাঁরা নেবেন, উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ (⅔) এবং জমির মালিক, মালিকানা হিসাবে পাবেন এক-তৃতীয়াংশ (⅓) ফসল, ফসল কাটার আগে তাঁরা (চাষীরা) জোতদারকে কাটার দিন সম্পর্কে জানাবেন বটে; তবে কাটা ফসল তাঁরা নিজের বাড়িতে বা নিজেদের এক্তিয়ারের মধ্যে তাঁদেরই নির্দিষ্ট স্থানে ওঠাবেন এবং ফসল মাড়াই হলে জোতদার তাঁর প্রাপ্য (⅓) অংশ নিজের লোক দিয়ে নিয়ে যাবেন। ১৯৪৯ সাল থেকেই রাজসাহী জেলার নাচোল, গোদাগাড়ী প্রভৃতি থানায় সেইভাবেই কাজ আরম্ভ করে দেন—ঐ সব অঞ্চলের ভাগ-চাষীরা—বিশেষ করে, সাঁওতালরা। জোতদারদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান বহু জমির মালিক বড় জোতদারও ছিলেন। রাজসাহী শহরের রায়বাহাদুর শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র এবং রায়বাহাদুর শ্রীধরণীমোহন মৈত্র (বর্তমানে পরলোকগত) রাজসাহীর অতি প্রতিষ্ঠাবান জমিদার ও জোতদার ছিলেন। 'সরকার' জমিদারী দখল করে নেওয়ার পরেও তাঁরা উভয়েই গোদাগাড়ী ও নাচোল থানায় বিস্তর জমির মালিক-জোতদার ছিলেন। তাঁরা চাষীদের ঐ ব্যবস্থা মেনে নিতে

ছিলেন। সাঁওতালভ্রমে কাল রং-এর মানুষেরও নিষ্কৃতি ছিল না। এক দিন সন্ধ্যার পরে কলম গ্রামের কতক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোক (জেলে) আমনুরা স্টেশন থেকে ট্রেনে রাজসাহীতে আসছিলেন। তাঁদেরই সাঁওতাল মনে করে মারতে মারতে পুলিশ নিয়ে আসেন রাজসাহী শহরে বোয়ালিয়া থানাতে। তাঁরা যতই বলেন যে, তাঁরা সাঁওতাল নন—তাঁরা কলম গ্রাম নিবাসী মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোক—তাঁদের জমিদার ৺সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র ও শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্র ('বাগু' নামে পরিচিত) এই শহরেই থাকেন। সেই বাড়ির কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই তাঁদের কথার সত্যতা যাচাই করা যাবে। কে কার কথা শোনে! অবশেষে একজন দারোগা এসে সব শুনে বলেন যে, বাগুবাবুর বাড়ি তো থানা থেকে এক মিনিটের রাস্তাও নয়। তাঁকেই ডেকে একবার দেখা যাক না কেন, ওদের কথা সত্য কি না! তা-ই অবশেষে হয়। 'বাবু' থানায় যেতেই ওই লোকগুলো হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠেন। বাগু তাঁদের কথা সত্য বলে বলায় তাঁরা মুক্তি পান এবং সে রাত তাঁরা কাটান তাঁদের জমিদার বাবুদের, অর্থাৎ বাগুবাবুদের বাড়িতেই।

এই অবস্থা যখন ঐ অঞ্চলে চলছিল, তখন স্বভাবতই এসেম্বলির সদস্য হিসাবে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সবিশেষ জানা আমার অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি। এমন সময়ে একদিন বাগুদের বাড়িতেই দেখি তাদেরই তহশিলদার সাগ্রাম মাঝি (সাঁওতাল) বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বাগুর বাড়িতে এসে লুকিয়ে আছেন। তাঁকে গোপনে ডেকে তাঁর কাছে সেই অঞ্চলের অত্যাচার কাহিনীর কিছু কিছু খবর নিই। তাঁর কাছেই শুনি, আঁধারকোঠা গ্রামের রোমান ক্যাথলিক মিশনারী সাহেব ফাদার ক্যাটানিও (Father Cataneo) ঐ অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সাঁওতালদের সব খোঁজখবর নিচ্ছেন। তিনি সাদা চামড়ার ইতালীয় সাহেব ; সুতরাং তাঁর গায়ে বিশেষভাবে হাত লাগাতে বা তাঁর কাজে বাধা দিয়ে তাঁর ঐ অঞ্চলে ঘোরা-ফেরা একদম বন্ধ করে দিতে কালো চামড়ার পুলিশ একটু ইতস্তত করে বৈ কি তবে, তিনিও একেবারে রেহাই যে পান নি, সে কথা পরে বলছি।

সেদিনের সেই পলাতক সাঁওতাল সাগ্রাম মাঝিকে আমরা ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে বিধান সভায় সদস্য করেছিলেম।

ফাদার ক্যাটানিও সম্পর্কে সাগ্রামের কাছ থেকে খবর শুনে স্থির করি যে,

আঁধারকোঠায় গিয়েই 'ফাদারের' সাথে দেখা করবো। সব তথ্য আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে। আঁধারকোঠা গ্রামটি পদ্মার তীরে এবং রাজসাহী শহর থেকে ৬।৭ মাইল দূরে, গোদাগাড়ীর দিকে। পরদিন সকালেই রওনা হয়ে বেলা প্রায় দশটার সময় মিশনারী সাহেবদের 'আস্তানায়' পৌছই। পৌছেই সাহেবের কাছে আমার 'কার্ড' পাঠাই তাঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য জানিয়ে। সাহেব খবর পেয়েই লোক মারফৎ আমাকে জানান যে, তিনি তখন—পীড়িত সাঁওতাল রোগীদের দেখে ঔষধ দিচ্ছেন। কাজ শেষ করেই তিনি আসবেন। আমাকে নিয়ে গিয়ে ফাদারের লোক, "হল" ঘরের মধ্যে একখানি চেয়ারে বসাল। সামনেই একটা বড় 'dining table' (খাওয়ার জন্য টেবিল) পাতা। টেবিলে দেখি, একটা চায়ের ডিসে খানিকটা ঝোলা গুড় এবং তা থেকে যে চামচ দিয়ে কিছুটা গুড় তুলে নেওয়া হয়েছে, তা চামচের দাগ দেখেই বোঝা যায়। সেই গুড় যে ওখানে কি উদ্দেশ্যে রাখা ছিল, তা তখনও বুঝি নি। আমি বসে বসে সব দেখছি এবং ভাবছি সাহেবের সাথে কীভাবে কথা আরম্ভ করবো। সাহেব যদি তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি আমাকে না জানাতে চান, তাহলেই বা কি করবো—এই সব কথা নিয়েই মনে মনে চিন্তা করছিলেম। এমন সময়, 'ফাদার' আসেন এবং আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই অভ্যর্থনা করেন। তাঁকে যখন আমি তাঁর কাছে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাই, তখন তিনি বল্লেন—সব হবে। আমি ঐসব ঘটনা সম্পর্কে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরী করেছি। তোমাকে তার একটা নকলও আমি দেব। পাকিস্তান সরকারের এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেও তার নকল পাঠাব। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। তোমাকে তো এখন ছাড়ছি না। দুপুরে তোমাকে আজ আমার সাথে খেতে হবে। এখন আগে একটু চা খাও। এই বলেই 'ফাদার' আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কেটলি নিয়ে ছোটেন চায়ের জন্য। সাহেব নিজেই জল গরম করে এনে চা তৈরী করেন এবং বলেন যে,—"দেখ, আমি থাকি এই গ্রামে। শহর ও সভ্যতা থেকে দূরে এখানে আমি চিনি পাই না; তাই, গুড় দিয়েই চা খাই। তুমি কি তাই খাবে?" এতক্ষণে বুঝলেম, টেবিলের উপর প্লেটে গুড় কিসের জন্য। ফাদারের কথা শুনে আমি একটু লজ্জিতই হই এবং সানন্দে আমার সম্মতি জানাই। চা-পর্ব শেষ হওয়ার পর, সাহেব সাঁওতালদের উপর নৃশংস-অত্যাচারের এক ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে চলেন এবং বলেন,—"আমি ৩৫

বছরকাল এই গ্রামে থেকে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করছি। এমন অত্যাচার হতে আমি আর কোন দিনই দেখি নি। আমি সব অঞ্চল ঘুরে স্বচক্ষে সব দেখে এসেছি। তোমাদের তো সেখানে ঢুকতেই দেবে না সরকারের পুলিশ দল। আমাকেও তাঁরা কম বেগ দেন নি। একদিন তো দু'জন পুলিশ এসে রাস্তার মাঝেই আমাকে বলেন যে, তাঁরা আমাকে গ্রেপ্তার করলেন এবং আমাকে গোদাগাড়ী থানায় নিয়ে গেলেন। থানায় দারোগাবাবু বলেন যে, তাঁদের খবর আমার কাছে নাকি 'রিভলভার' আছে! সাহেব তার উত্তরে নাকি বলেন—"রিভলভারের চেয়েও বড় শক্তিশালী অস্ত্র তাঁর কাছে আছে। সর্বদাই সেই অস্ত্র নিয়েই তো আমি ঘোরাফেরা করি।" দারোগাবাবু ঐ কথা শুনে হকচকিয়ে ওঠেন এবং অস্ত্রটি বের করতে আদেশ করেন। সাহেব তখন তাঁর পাদরীর সাদা পোষাকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বুকের উপর থেকে বের করেন সেই অস্ত্রটি। সেটি আর কিছুই নয়—'ব্রঞ্জ' বা ঐ জাতীয় একটি ধাতু দিয়ে তৈরি পরমপিতা যীশুর একটি ক্রুশবিদ্ধ প্রতিমূর্তি। এই অস্ত্র নিয়েই ৩৫ বছরকাল এক মাঠের মধ্যে একাকী তিনি কাটালেন! আদর্শের প্রতি কী অসীম বিশ্বাস ও আনুগত্য। আমরা বহুবার বহু ক্ষেত্রেই শুনেছি এবং বইয়েও পড়েছি—"with missionary zeal" (অর্থাৎ পাদরী-সুলভ উৎসাহ নিয়ে) চলার কথা! সেই দিন আমি প্রথম স্বচক্ষে দেখেও বুঝি যে পাদরী-সুলভ উৎসাহ নিয়ে চলার তাৎপর্য কত গভীর। সাহেব সব ঘরগুলো ঘুরিয়ে আমাকে দেখান। কোথাও বিলাসিতার একটু চিহ্নমাত্রও দেখি না। তাঁর শয়নঘরে দেখি, একটা দড়ির খাটিয়া। তাতে একখানি কম্বল ও একটা চাদর। মাথার ধারে একটা ছোট বালিশ মাত্র। আর দেখলেম, ঐ ঘরে আছে মহামানব যীশুর একখানি প্রমাণ তৈলচিত্র। তিনি বলেন, "গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যখন দেউলির বন্দীশিবিরে বন্দী অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁরই একজন সহ-বন্দী ইতালীয় সাহেব ঐ তৈলচিত্রখানি এঁকে তাঁকে দিয়েছিলেন।"

তারপরে দুপুরে সাহেবের সাথে ভাতও খেলেম। সে কী খাওয়া! মোটা-মোটা চালের ভাত আর তাঁরই বাগানের উৎপন্ন ফুলকপির (তাও আবার ফুটে গিয়েছে) একটা ঝোলা তরকারী। তাই দিয়েই সাহেব নির্বিকারচিত্তে এক থালা ভাত খেলেন। আর আমি? একেই আমি বরাবরই খাই খুব কম ভাত; তার ওপর ভাতের চেহারা দেখেই আমার

অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে। আমার দুর্বল হজমশক্তিতে কি ঐ ভাত হজম হবে? ভয়ে ভয়ে আমি অতি সামান্যই খাই। খাওয়ার পরে আমি বিদায় নেওয়ার কথা তাঁকে জানাতেই তিনি তাঁর টাইপ করা প্রকাণ্ড রিপোর্টের একটি নকল এনে আমার হাতে দেন। সাহেবের ঐ রিপোর্টের নকল ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনার পান এবং তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর বৈদেশিক দপ্তরেও নাকি তার নকল পাঠান। কিন্তু ফল হয়েছে কি? শুধু গর্জন, বর্ষণ হয় নি!

আঁধারকোঠা থেকে রাজসাহীতে ফিরেই শুনি, মালদহগামী ট্রেনের একটি কামরায় কম্যুনিষ্ট নেত্রী শ্রীমতী ইলা মিত্র, তাঁর একজন সহকর্মী শ্রীবৃন্দাবন সাহা সহ রোহনপুর স্টেশনে ধরা পড়েছেন। তারপরে, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবের নির্দেশে তাঁদের উপরে—বিশেষ করে শ্রীমতী ইলা মিত্রের উপরে—যে কী বীভৎস, নৃশংস ও পাশবিক অত্যাচার হয়েছে, তার সম্পর্কে আর এতদিন পরে লিখে লেখনীকে কলঙ্কিত করতে চাই না। সে অত্যাচারের যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার ভাষাও আমার নেই। কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক হয়তো তাকে সভ্যতার আচ্ছাদনে ঢেকে, লোকসমাজে প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, আমি সাহিত্যিক নই এবং এই লেখার মধ্য দিয়ে কোন সাহিত্য সৃষ্টি করারও দুরাকাঙ্খা রাখি না। আমি শুধু এমন একটা কাঠামো খাড়া করে যেতে চাই, যার উপরে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকরা মাটি রং প্রভৃতি দিয়ে সত্যিকারের অবস্থার পূর্ণ রূপায়ণ কোন দিন করতে পারেন। শ্রীমতী ইলার গ্রেপ্তারের পরে রাজসাহী থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' তাঁদের সংবাদদাতার সংবাদটি ছেপেছিলেন, তাতেই শ্রীমতী মিত্রের প্রতি অত্যাচারের কিছুটা মাত্র আভাষ ছিল। সে রিপোর্টেও পূর্ণ বিবরণী ছিল না। এমনিতে যেটুকু বের হয়েছিল, তাই দেখেই সভ্যতা শিউরে উঠেছিল; পূর্ণ বিবরণ বের হলে দ্রষ্টার চোখ ও শ্রোতার কান শুধু অপবিত্রই হত না—চোখ ও কানকে অন্ধ ও বধির করে ফেলার ইচ্ছাই হতো!

শ্রীমতী ইলা মিত্রের সহযোগী ও সহযাত্রী শ্রীবৃন্দাবন সাহাকে আমি বহুদিন আগে থেকে চিনতেম ও জানতেম। সে যে গ্রামের একটি প্রাথমিক স্কুলে পণ্ডিতের কাজ করতো সেই গ্রামে আমি কংগ্রেসের কাজ উপলক্ষে ও এসেম্বলির সদস্য হিসাবে বহুবার গিয়েছি। গ্রামটির নাম (সম্ভবত)

বৃন্দাবনকে আমি চিনতেম, জানতেম কিন্তু শ্রীমতী ইলা মিত্রকে আমি কোনও দিনই দেখি নি। ইলা মিত্রের গ্রেপ্তারের পরে রাজসাহী শহরের প্রতিটি লোকের মুখে মুখেই ইলার নাম। একদিন তো রটেই যায় যে, ইলা জেলে মারা গিয়েছেন। সংবাদটি শুনে সকলেই হায়-আফশোষ করেন। পরে কিন্তু দেখা যায় খবরটি সত্যি নয়; তবে মুমূর্ষু। অনেক দিন পরে একদিন ইলাকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন, এমদাদ আলি সাহেব। একদিন কোর্টে তাঁর চেম্বারে আছি। সেদিন শ্রীমতী মিত্রের মামলার তারিখ ছিল। মামলা হল না। আবারও আর একটা তারিখ পড়লো। তখন ইলাকে নিয়ে তার উকিল ও আমার অতীতের সহকর্মী বন্ধু শ্রীবীরেন সরকার এসে ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে দেখা করার আবেদন জানায়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটু ইতস্তত করে পরে দেখা করতে সম্মত হয়ে ডাকেন। সেই দিনই আমি ইলা মিত্রকে সর্বপ্রথম দেখি। দেখি জেলখানার দুই জন 'মেট্রনের' কাঁধের উপর ভর দিয়ে শ্রীমতী ইলা সাহেবের চেম্বারে এলেন। শরীরে এক ফোঁটাও যেন রক্ত নেই। ঘাড়টা ভেঙে পড়েছে একজন মেট্রনের কাঁধের উপরে। এসেই ইলা তার উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার কথা বলতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন—আপনার উপর অত্যাচার হয়েছে নাকি?' বলতেই আর যায় কোথায়? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহিনী যেন একটা মরণোন্মুখ হুঙ্কার দিয়ে গর্জে উঠলেন। বললেন—'নেকা আর কি। তিনি কিছুই জানেন না!' এমদাদ আলি সাহেব বেশ একটু ঘাবড়িয়ে গিয়ে নেহাৎ আমতা আমতা করে বলেন—'আপনি যখন গ্রেপ্তার হন, তখন আমি তো অন্য জেলায় ছিলেম। আমি এসেছি অনেক পরে।'

ইলার চেহারা দেখে মনে খুব দুঃখ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার বেপরোয়াভাব ও দুর্জয় সাহস দেখে, সেদিন আনন্দ ও গর্বে আমার বুক ভরেও উঠেছিল। প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী, কল্পনা, শান্তি, সুনীতি প্রমুখের কথা শুনেছি। কিন্তু সত্যি-সত্যিই আজ যে মায়ের রূপ দেখলেম, তা দেখে মনে হল, মহিষ-মর্দিনী দশভূজা মাতৃরূপই বোধহয় দেখলেম।

কাদায় ক্যাটানিও সাহেবের রিপোর্ট ও অন্যান্য আরো নানাভাবে সংবাদ যতটা পারলেম তা সংগ্রহ করলেম। ঢাকা থেকে ডাক এসেছে, এসেম্বলি সেশনের। ১৯৫০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এসেম্বলির অধিবেশন

বসবে। খবর পেয়েই আমি তে-ভাগা আন্দোলন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি মুলতবী (adjournment motion) প্রস্তাবের নোটিশ ডাকযোগেই স্পীকারের নামে পাঠিয়ে দিয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমি রাজসাহী থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই।

৬ই ফেব্রুয়ারী যথারীতি এসেম্বলির অধিবেশন আরম্ভ হল। পাকিস্তানে একটা নতুন নিয়ম এসেম্বলির সর্ব প্রথম অধিবেশন থেকেই দেখে আসছি। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে একজন মৌলভী গোছের সদস্য সামনে গিয়ে "কোরাণ তেলাওৎ" করেন; আর সব মুসলমান সদস্যই উঠে দাঁড়িয়ে আনুষঙ্গিক শারীরিক পদ্ধতিগুলো নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করেন। আমরা হিন্দুরা প্রথম দিকে একটু ঘাবড়িয়েই গিয়েছিলেম—আমাদের করণীয় কি ভেবে। যাক, সে ভাবটা পরে কেটে যায়। কোরাণ আবৃত্তির পরে অধিবেশনের কাজ আরম্ভ হয়। প্রশ্নের পরই আমি আমার মুলতুবী প্রস্তাবটি উথাপন করতে চেষ্টা করলেম। কয়েক ঘণ্টা ধরেই অনেক বাক-বিতণ্ডা হোল কিন্তু স্পীকার শেষ পর্যন্ত মুলতবি প্রস্তাব তুলতে অনুমতি দিলেন না।

আমার পরেই, তপশিলী ফেডারেশনের সদস্য শ্রীমনোহর ঢালি আর একটা মুলতবী প্রস্তাব তুলতে চেষ্টা করলেন। এই ভদ্রলোককে আমরা সরকার-পক্ষের লোক হিসাবেই জানতুম। তিনি যখনই বক্তৃতা করতে উঠতেন, তখনই আরম্ভ করতেন—"This Government which is our Government…" তাঁর নেতারা—শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডল ও শ্রীদ্বারিক বাড়োরী তখন পর্যন্ত কেন্দ্রে ও প্রদেশে মন্ত্রী। সরকারপক্ষের সেই ঢালি মহাশয় হঠাৎ যে মুলতবী প্রস্তাব আনবেন, তা আমাদের অকল্পনীয় ছিল। তাঁর মুলতবী প্রস্তাবের হেতু হচ্ছে—"খুলনা জেলার কালশিরা নামক একটি গ্রামের নমঃশূদ্র পল্লীতে রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়েছিলেন, তখন একদল মারমুখী পুলিশ বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে লোকজনকে ভীষণভাবে 'মারপিট' করেছে এবং আরও অনেক অত্যাচার করেছে……" তাঁর প্রস্তাবও স্পীকার সাহেব নামঞ্জুর করলেন।

এই ব্যাপার নিয়েই আবার ৭ই ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনেও আমাদের সঙ্গে সরকারপক্ষের ও স্পীকার সাহেবের অনেক বাক-বিতণ্ডা আবারও হয়ে গেল। এবারে একটু বড় রকমেরই হল। যার ফলে আমাদের নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাশ মহাশয় (বর্তমানে পরলোকগত) একটা বিবৃতি দিয়ে

ঘোষণা করলেন যে, আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্তে এই এসেম্বলি থেকে বের হয়ে গেলেম। আমরা সবাই বের হয়ে গেলেম। কংগ্রেসের 'ব্লক' খালি হল।

এর পরে আর আমরা ২ দিন এসেম্বলিতে যাই নি। তৃতীয় দিনেই ঐতিহাসিক ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়ে যায়। মুসলিম লীগের প্রবীণ নেতারাও বলতে সুরু করেন যে, মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়ে এবং এসেম্বলি বর্জন করে আমরাই না কি সুপরিকল্পিত উপায়ে ঐ দাঙ্গা ঘটিয়েছি বিশ্বে পাকিস্তানের নিন্দা রটানোর জন্ম!

আমরা পাকিস্তানে এসেম্বলির সদস্য। যেহেতু আমরা ধর্মে হিন্দু সেই হেতু আমরা কোন সংগ্রামী আন্দোলন করলে তাতে হবে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; সুতরাং সেদিক দিয়ে আমাদের যাওয়া চলবে না। এসেম্বলির মাধ্যমে সমস্ত অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরবো, তাও উপায় নেই—তাতেও হবে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! এই পরিস্থিতির মধ্যেই হিন্দুদের পাকিস্থানে বাস করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ভারতের সরকারপক্ষ ও রাজনৈতিক দলগুলো সেই কথাগুলো একবার ভেবে দেখে এর প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করবেন কি?

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ সাল। পূর্ববঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলের কংগ্রেসী সদস্য আমরা—৬ই তারিখের প্রথম অধিবেশনের পর ৭ই তারিখের অধিবেশনে প্রথম ঘণ্টায় প্রশ্নোত্তর হয়ে গেলেই আমাদের সংসদ দলীয় নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাস মহাশয় সভায় একটি বিবৃতি দিয়ে জানান যে, গতকালের মুলতুবী প্রস্তাব (adjournment motion) নিয়ে যে বাক-বিতণ্ডা ও বিরোধী দলের প্রতি সরকার পক্ষ থেকে যে অ-শালীন মন্তব্য করা হয়েছে, তার প্রতিবাদস্বরূপ কংগ্রেস দল অনির্দিষ্টকালের জন্ত বিধানসভা ত্যাগ করে

যাচ্ছেন। সেই যে আমরা বের হয়ে (walk-out করে) আসি, তারপর থেকে আর আজ ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আর বিধানসভায় যাই নি। হাতে আমাদের কোনই কাজ বর্তমানে আর নেই। এখন আলাপ-আলোচনা ও গল্প-গুজব করেই সময় আমাদের কাটাতে হচ্ছে। ৫১ নং হেমেন্দ্র দাস রোডের আমাদের ঢাকার বাসায় তখন আমরা চারজন এম. এল-এ ও অতীত দিনের ২ জন বিপ্লবী বন্ধু থাকতেম। বিধানসভা সদস্য চারজন হচ্ছেন, (১) শ্রদ্ধেয় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (তিনি তখন কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও সংবিধান গঠন সভারও (Constituent Assembly সদস্য), (২) খুলনার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার, (৩) মৈমনসিংহের শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সরকার (উভয়েই অনুন্নত সম্প্রদায়ের কংগ্রেসী প্রতিনিধি) ও রাজসাহীর শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (বর্তমান প্রবন্ধের লেখক) এবং বিপ্লবী বন্ধু দু'জন হচ্চেন—(১) ঢাকার শ্রীস্বদেশরঞ্জন নাগ ও (২) চাটগাঁয়ের, অধ্যাপক শ্রীপুলিন দে। ঢাকাই অতীতে বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির—প্রধান ও প্রাণকেন্দ্র ছিল সুতরাং ঢাকা শহরে ও জেলায় মধ্যে বহু অনুশীলন সমিতির সদস্য আগে ছিলেন কিন্তু দেশ বিভাগের পরে বেশির ভাগই ঢাকা (পাকিস্তান) ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় (ভারতে) চলে গিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তখনও বেশ কিছু সংখ্যক অতীতের বিপ্লবী দলের সদস্য ঢাকায় ছিলেন। শ্রীস্বদেশ নাগও সেইরূপই একজন; আর শ্রীপুলিন দে তখন তরুণ যুবক মাত্র ছিলেন। তিনি সু-বিখ্যাত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার সাথে জড়িত হয়ে প্রথমে রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দেন। কয়েক বছরকাল নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে জেলে কাটিয়ে মুক্তি পাওয়ার পরে "মহারাজের" (প্রবীণ ও প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী মহাশয়ের) সাথে সমাজতান্ত্রিক দল করেন এবং পূর্ববঙ্গে ঐ দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আমারও রাজনীতিক জীবনের সূত্রপাত হয়, 'অনুশীলন সমিতির'ই সদস্য হিসাবে এবং পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগ্রামী রূপ নিলে আমি কংগ্রেসেই যোগ দিয়ে কাজ করি; ফলে, আমার সাথে বাংলার বিপ্লবী দলের বন্ধুদেরও যেমন জানা-শোনা ছিল, তেমনই জানা-শোনা ছিল একেবারে খাঁটি ও অকৃত্রিম কংগ্রেসী বন্ধুদের সাথেও। এই উভয় শ্রেণীর বন্ধুরাই মাঝে মাঝেই আমাদের বাসায় আসতেন। যখন বাইরের কোনও বন্ধু আসতেন—বিশেষ করে, 'এসেম্বলি' বর্জন করার পরের কর্মবিহীন দিনগুলোতে কেউ এলে তো—একেবারে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি মনে হত। সেই সুযোগই

১০ই ফেব্রুয়ারীতে বেলা প্রায় গোটা নয়েকের সময় ঘটে যায়। আসেন অনুশীলন সমিতিরই ভূতপূর্ব স্বাধীনতার সংগ্রামী বন্ধু—ঢাকার শ্রীঅতুলানন্দ গুহ। তিনি আসার পর পরই এসে জোটেন আমাদের বাসারই সন্নিকটবর্তী একটি বাড়ি থেকে ঢাকা জেলার বারোদি গ্রামের বিখ্যাত নাগ পরিবারের সন্তান—শ্রীসুবোধচন্দ্র নাগ মহাশয়। তিনিও ছিলেন অনুশীলন সমিতিরই একজন ভূতপূর্ব সদস্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই কয়েক বছর জেলেও কাটিয়েছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পরে কংগ্রেসেও কাজ করেছেন। এখানে একটি কথা বলে রাখি যে শুধু ঢাকা বা রাজসাহীতেই নয়, সারা বাংলা দেশেরই বিভিন্ন জেলাতেই বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলোরই অনেক কর্মী ও নেতারাই, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সংগ্রামী রূপ নেওয়ার পরে তাতেই যোগ দিয়ে বাংলার কংগ্রেসকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালি প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গড়ে তোলেন। বিপ্লবীদের কংগ্রেসের মধ্যে এনেছিলেন, বাংলার তথা ভারতের দুরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রখ্যাত রাজনীতিক নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। সেজন্ত তাঁকে অহিংসাপন্থী তথাকথিত গান্ধীবাদীদের কাছ থেকে বেগও কম পেতে হয় নি। তিনি বেগ পেয়েছিলেন যথেষ্টই কিন্তু তবু তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটুট ছিলেন। পরবর্তীকালে সকলেই জেনেছেন যে, চট্টগ্রামের তথা বাংলার প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতারা শ্রীসূর্য সেন (মাস্টারদা, ফাঁসিতে নিহত), শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী (কলকাতায় মোটর গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মারা যান), শ্রীগণেশ ঘোষ (বর্তমানে এম-পি ও কম্যুনিস্ট পার্টির একজন নেতা) ও অনন্ত সিংহ (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন) এবং স্বল্পকালের জন্ত হলেও বাংলার মাটিতে সর্বপ্রথম যাঁরা স্বাধীনতার পতাকা তুলেছিলেন, সেই মহৎ কাজের একজন সামরিক অধিনায়ক প্রমুখ তাঁদের দলবল নিয়ে যে ইংরেজের ঘাঁটিগুলো দখল করতে যান তাও তাঁরা জেলা কংগ্রেসের অফিস থেকেই করেছিলেন। তাঁদেরই হাতে তখন সেখানকার কংগ্রেসের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব ছিল। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখলে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী বিপ্লবী সন্তানের দান কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। বাংলা দেশের কংগ্রেসেও সংগ্রামী শক্তি জুগিয়ে ছিলেন বাংলার বিপ্লবী সন্তানেরাই।

আমি নিজেও একজন বিপ্লবী হিসাবেই আমার রাজনৈতিক জীবন সুরু করি। সেই কথা আগেই বলেছি। সুতরাং আমার পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, অতীতের বিপ্লবী বন্ধুরা কেউ এলে আমার মন খুশিতে

ভরে উঠবে। অতুলানন্দবাবু ও সুবোধবাবু আসাতে আমারও তাই হয়েছিল। বন্ধুদের নিয়ে গল্পে মেতে উঠেছিলাম। কোন দিক দিয়ে ১১টা বেজে গিয়েছে আমরা কেউ টেরও পাই নি। অতুলানন্দবাবু হঠাৎ তাঁর হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে দেখেই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং বলেন,—"আর না, এখনই বাসায় ফিরতে হবে। আমার এক মুসলমান বন্ধু বলেছেন, আজ শুক্রবারে জুম্মার নামাজের পরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হবে। যেখানেই থাক নামাজের আগেই কিন্তু বাড়িতে ফিরো, নইলে, প্রাণে মারা পড়তে পার।" বলেই তিনি অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। তিনি যাওয়ার পর পরই বোধহয় তখন বেলা ১১টা কি ১১॥টা হবে, ঢাকা জেলার সদর মহকুমার এস-ডি-ও (S. D. O.) শ্রীনীরাজ ভট্টাচার্য ও ঢাকা জেলার কাশিমপুরের জমিদার শ্রীঅরুণকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়—এক সাথেই আসেন আমাদের বাসায়। অরুণবাবুও ছিলেন প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। সেদিন ছিল শুক্রবার। সম্ভবত উভয়েই কোর্ট থেকেই কাজ শেষ করে এলেন। শুক্রবারে পাকিস্তানে সকালেই কোর্টের কাজ আরম্ভ হয়। সকল মুসলমানকেই জুম্মার নমাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর এই পবিত্র জুম্মার দিনেই নমাজের সময় খোদার পবিত্র নাম নিয়েই মুসলিম লীগ দল যত কিছু অ-পবিত্র সমাজ-বিরোধী কাজ করে থাকেন! অতীতে তাই দেখেছি। ১৯৪৬ সালের 'ডাইরেক্ট একশানও' (Direct action) সুরু হয়েছিল সেই শুক্রবারেই। নমাজের পরই সেটা আরম্ভ করার পরিকল্পনা ছিল; কিন্তু অতি উৎসাহী জনতার এক অংশের উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের জন্য সকালের দিকেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়; ফলে, অ-প্রস্তুত হিন্দুরাও প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পান। সুরাবর্দী সাহেবের সু-পরিকল্পিত মহা-পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। আজও শুক্রবার। আজও নামাজের পরই দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার কথা! আমি আমার জেলা রাজসাহীতে নাটোর মহকুমার মধ্যে 'হালতি'র বিল অঞ্চলে বারইহাটি বলে একটি গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে এক কালীমূর্তি ছোটবেলায় দেখেছিলাম। তখন শুনেছিলাম, ঐ কালীমূর্তি নাকি ছিলেন ডাকাতদের কালী। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে কালীর পুজো করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে নাকি ডাকাত দল তাদের সমাজ-বিরোধী কাজ করতে যেত। আজকে শুক্রবারে নমাজের পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হবে শুনে আমার অতীত দিনের সেই ডাকাতে কালীর পুজোর কথাই মনে পড়ে যায়।

শ্রীঅরুণবাবু ও শ্রীধীরাজবাবু কেবলমাত্র বসে কথা-বার্তা সুরু করেছেন, শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীধীরেনবাবুও উপস্থিত আছেন। ধীরাজবাবু এস-ডি-ও হলেও ধীরেনবাবুদের পুরোহিত বংশের সন্তান। সেই সুবাদেই তিনি ধীরেনবাবুর কাছে আসতেন এবং সেই সূত্রেই আমাদের সাথেও তাঁর সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। গল্প ভাল করে তখনও জমে ওঠে নি। কেবল সুরু হয়েছে। এমন সময় আমি বলি যে, আমাদের বন্ধু অতুলানন্দবাবু এইমাত্র বলে গেলেন যে, আজ নমাজের পরেই নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হবে। কথাটা শুনেই, ধীরাজবাবুই ঘাবড়ালেন বেশি; কারণ, তাঁর বাসা গেণ্ডারিয়া অঞ্চলে মুসলমান বস্তীর মধ্যে। তিনি ঘড়ি দেখে দেখেন যে নমাজের সময় হয়ে এসেছে; ফলে, তিনি এতই ভয় পেয়ে যান যে, একাকী বাসায় যেতেও সাহস পান না। তখন অরুণবাবু তাঁর অবস্থা দেখে বলেন যে,—"চলুন, আমি আমার মোটরে করে নিয়ে আপনার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি।" তাই হল। তাঁরা চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই খবর পেলাম, দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পূর্ববঙ্গ সরকারের সচিবালয় (সেক্রেটারিয়েট) প্রাঙ্গণেই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। তার বিবরণ একটু পরেই দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের বাসায় খবর আসে যে, অতুলানন্দবাবুর বাড়িও দাঙ্গাকারীরা আক্রমণ করে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছোরা মেরেছে। তাঁর বাড়িতেই। তাঁরও বাড়ি কাঠের পুলের ওপারে গেণ্ডারিয়া অঞ্চলেই। খবরটি শুনেই বন্ধু সুবোধ নাগ ও স্বদেশ নাগ—উভয়েই ছোটেন অতুলানন্দবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে। একে তো তাঁরা উভয়েই ছিলেন অতীতের বিপ্লবী; তার উপর তাঁরা ঢাকার লোক! ঢাকার হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়েই এতকাল টিকে থাকতে হয়েছে; তাই তাঁদের সাহসও অন্য স্থানের লোকের চেয়ে কিছুটা বেশি। তাঁরা গেলেন। আমরা যাঁরা বাসায় থাকলেম তাঁরা তাঁদের ফিরে আসা পর্যন্ত অধীর আগ্রহ নিয়েই থাকি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে উভয়েই গলদঘর্ম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসেন। তাঁদের কাছে শুনি, দাঙ্গাকারীরা অতুলানন্দবাবুর বাড়ির ভেতরে ঢুকেই সামনে পায় তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে। ছেলেকেই তারা ছোরা নিয়ে যখন আক্রমণ করতে যায়, তখন অতুলবাবু ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঢেকে ফেলেন। সেই অবস্থায় উপরেই ছোরা চলে; ফলে, ছোরার আঘাতগুলো পড়ে অতুলানন্দবাবুর পিঠের উপরে। সুবোধবাবু ও স্বদেশবাবু অতুলানন্দবাবুর

অবস্থা দেখে ঢাকা হাসপাতালে খবর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আনিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ফিরে এসেছেন। ফেরার পথে তাঁদেরও একদল দাঙ্গাকারী গুণ্ডা আক্রমণ করার জন্ত তাড়া করে। তাঁরা দৌড়তে দৌড়তে কাঠের পুল পার হয়ে এপারে এসে পড়লে গুণ্ডারা আর তাঁদের পেছনে আসে না। ঢাকায় আগে হিন্দু অঞ্চল ও মুসলমান অঞ্চল আলাদা আলাদা ছিল। ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশানের' দাঙ্গায় দেখেছি কলকাতাতেও তাই-ই ছিল। হ্যারিসন রোডের (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) এক দিকে হিন্দু অঞ্চল আর অপর দিকে মুসলমান অঞ্চল। দাঙ্গার সময়ে হিন্দু অঞ্চলে মুসলমান বা মুসলমান অঞ্চলে হিন্দু ঢুকলে জ্যান্ত অবস্থায় খুব কম লোকই বের হতে পারতেন; তাই, যাঁরা স্থানীয় লোক তাঁরা কথনও অপর সম্প্রদায়ের অঞ্চলে ঢুকতেন না। ঢাকাতেও তথনকার অর্থাৎ ১৯৫০ সালের দাঙ্গার প্রথম দিন পর্যন্ত সেই মনোভাবই দেখা গিয়েছে সেই জন্যই সুবোধবাবু ও স্বদেশবাবু সে যাত্রায় বেঁচে যান, কিন্তু দাঙ্গার প্রথম দিনের পরে আর সে মনোভাব ছিল না। মুসলমান দাঙ্গাকারীরা দেখেছিল যে, হিন্দুদের আর আগের সেই মনোবল নেই; তাই তারা—এমন কি ১৫।১৬ বছরের দাঙ্গাকারী মুসলমান তরুণ যুবকদের মধ্যেও কেউ কেউ নির্ভয়ে হিন্দু মহল্লায় এসে হিন্দুর বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েও হিন্দুর উপরে ছোরা চালিয়েছে বা হিন্দুর বাড়ি লুট করেছে।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা আমাদের বাসায় থেকেই দাঙ্গার মূল কেন্দ্রস্থল পূর্ববঙ্গ সরকারের সচিবালয়ের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাই। বিবরণ দেন সচিবালয়েরই একজন হিন্দু কেরাণী। তাঁর কাছে শুনি—"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় (বর্তমানে পরলোকগত) পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দুই মুখ্য সচিবদের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত বৈঠকের জন্ত ঢাকায় এসে পূর্ববঙ্গের মুখ্য সচিব জনাব আজিজ আহমেদের সাথে তাঁর ঘরেই বৈঠক শেষ করে শুক্রবারের জুম্মার নমাজের জন্য সচিবালয়ের সেদিনের ম[illegible]টি হয়ে যাওয়ায় যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সচিবালয়েরই কর্মচারীদের একটা দল নাকি তাঁকেই সর্ব প্রথমে ঘিরে ধরে এবং ভারত-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী ধ্বনি করতে থাকে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীসেনকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়, ঐ কর্মচারীদের কাছ থেকে। যাই হোক, পরে, তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা করে ভারত ও হিন্দু-বিরোধী ধ্বনি দিতে

দিতে নবাবপুরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতে থাকে। অহিংস সত্যাগ্রহীর মত তাঁরা শুধুমাত্র ধ্বনি দিয়েই তাঁদের কাজ শেষ করেন না। পূর্ব থেকে চিহ্নিত হিন্দুর দোকানগুলো লুটও করতে এবং হিন্দুর উপর ছোরা-লাঠিও চালাতে থাকেন। সচিবলেয়ের কর্মচারীরা রাস্তায় নেমে আসার পরে, বাইরের আরও বহু লোকই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে দল ভারী করে। হিন্দুর সেই দুঃসময়েও শুনেছি, ২।১টি বাঙালী মুসলমান যুবক সাইকেলে চড়ে নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে হিন্দুদের সতর্ক করে, চিৎকার করতে করতে যান। তাঁরা নাকি বলেন,—"হিন্দু দোকানদাররা তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ ক'রে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যান। দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে এবং দাঙ্গাকারীরা লুটপাট করতে করতে আসছে।" হিন্দু দোকানীরা যাঁরা যাঁরা পারলেন, দোকান বন্ধ করে বাড়ির দিকে ছুটলেন এবং যাঁরা তা করলেন না বা করতে পারলেন না, তাঁরা তাঁদের দীর্ঘসূত্রতার জন্য উচিত মূল্য নিজের রক্ত দিয়েই শোধ করলেন। তাঁদের দোকানও রক্ষা হল না; অবশ্য, যাঁরা তাঁদের দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও দোকান রক্ষা পায় নি, তবে প্রাণটা হয়তো রক্ষা পেয়েছে। তাও সকলেরই যে রক্ষা পেয়েছে, তা সঠিক বলা যায় না; কারণ, মহল্লায় মহল্লায়ও হিন্দু হত্যা ও হিন্দুর বাড়ি লুট-পর্ব ছড়িয়ে পড়েছে। ওয়াড়ী অঞ্চলের বহু হিন্দুই তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি নিয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে প্রাণের ভয়ে গিয়ে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিস ও প্রাঙ্গণ ভরে ফেলেছেন। সেই সময়ে, আমার যতটা মনে পড়ে তাতে মনে হয়, কংগ্রেসের নেতা শ্রীসন্তোষ বসু মহাশয় ঢাকার ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। তিনি বা তাঁর অফিসের কোনও পদস্থ কর্মচারীও রাস্তায় বের হয়ে সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের বিপন্ন লোকজনের কোনও খোঁজ-খবর নেওয়ার সুযোগ পান নি। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের সেদিনও যে অবস্থা দেখেছি, আজ পর্যন্তও সেই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে জানি না। শুনিও নি। বরং শুনেছি, উল্টোটাই। অর্থাৎ 'যথা পূর্বং তথা পরং' ভারতে কিন্তু অন্যরূপ ব্যবস্থা। যখনই ভারতের কলকাতায় বা মালদহের মত একটি মফঃস্বল জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তখনই কিন্তু কলকাতায় পাকিস্তানের যে ডেপুটি হাইকমিশন আছে তার পদস্থ কর্মচারীরা সেই সব অঞ্চলে গিয়ে নিজেরা সব দেখার সুযোগ পেয়েছেন। পাক-ভারতের রূপরেখায় দুই দেশের দুই সরকারের

মনোভাবের মধ্যে তফাৎই এইখানে। এখানে একটি কথা বলে রাখি যে, ১৯৫০ সালের সেই দাঙ্গায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন সম্পর্কে সেখানে আশ্রয়প্রার্থী ঢাকার বহু হিন্দুই এসে আমাদের কাছে ঐ অফিসের কর্তাব্যক্তির ও তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য কর্মচারীদের ব্যবহার সম্পর্কে বহু অভিযোগই করেছিলেন। ভারত সরকারের কাছেও বোধহয় সেই সব অভিযোগ গিয়েছিল।

দাঙ্গাকারীরা নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলতে থাকে। শ্রীস্বদেশ নাগ, আবারও বাসা থেকে বাইরে বের হয়েছিলেন। আমাদের বাসা যেখানে ছিল, অর্থাৎ সূত্রাপুর থানার অধীন হেমেন্দ্র দাস রোড, সে স্থানটিই শুধু নয়, সূত্রাপুর থানা এলাকার প্রায় সমুদয় অঞ্চলটাই ছিল পূর্বে হিন্দু এলাকা সুতরাং স্বদেশবাবু, তাই হয়তো কতকটা নির্ভয়েই রাস্তায় বের হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি 'হন্তদন্ত' হয়ে ছুটে এসে বলেন—তাঁর এক মুসলমান বন্ধুর কাছে তিনি শুনে এলেন যে, বিরোধী দলের কংগ্রেসী 'এম-এল-এ'-দের বাড়িগুলোও নাকি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছে দাঙ্গাকারীরা। আমাদের বাসায় ফটকে আমাদের নামলেখা (নেম প্লেট) কাঠের ফলক লোহার কাঁটা দিয়ে আটকানো ছিল। স্বদেশবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই নাম লেখা ফলকটি তুলে ফেললেন। ইতিমধ্যেই খবর পাই যে, বাংলা বাজারে যে হোটেলে শ্রীমনোহর ঢালি (এম-এল-এ) ছিলেন এবং যিনি খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামের ঘটনা নিয়ে পূর্ববঙ্গ এসেম্বলিতে একটি মুলতুবি প্রস্তাব তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই হোটেলটি আক্রান্ত হয়েছে। শ্রীমনোহর ঢালি মহাশয়, আক্রমণকারীদের মারমুখী মূর্তিতে আসতে দেখেই একবস্ত্রে খালি গায়ে পাগলের মত রাস্তায় বেরিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলেন। দাঙ্গার পর তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি তখন কী বলে চিৎকার করছিলেন এবং কোথায় ছুটে চলেছিলেন, তাঁর সে সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান ছিল না। হিন্দুরা তো সকলেই তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত! কে কাকে সাহায্য করে? মনোহরবাবুর সেই পাগলের মত অবস্থা দেখে একজন বাঙালী মুসলমান ভদ্রলোকই তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তিনদিন রেখেছিলেন; তাই তিনি সে যাত্রায় বেঁচে যান। তিনদিনের মধ্যে তাঁর কোনই খবর না পেয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই মনে করেছিলেন যে, তিনি 'খতম'

হয়ে গিয়েছেন! সেই সময় সারা ঢাকা শহর ও জেলার গ্রামাঞ্চলে যে কী তাণ্ডব চলছিল, তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। আমার বিশিষ্ট বন্ধু নোয়াখালির 'এম-এল-এ' শ্রীহারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (সম্প্রতি এই বহু সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা, পরলোকগমন করেছেন) মশায় সেই সময় 'ভিক্টোরিয়া পার্কে'র কাছে অবস্থিত সেণ্ট্রাল ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার বাড়ির তে-তলায় ছিলেন। তিনি সেই তে-তলায় থেকে ঐ অঞ্চলের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য নিজ চোখে দেখে যে একটা বীভৎস চিত্র দেন, তা শুনলেও লোকে আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন। ঐ পার্কেরই অপর এক কোণে একটি বাড়িতে একটা কমার্শিয়াল স্কুল ছিল। তার মালিক ছিলেন,...মুখার্জী উপাধিধারী একজন বিশিষ্ট বাঙালী হিন্দু। তাঁকে যেভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলতে দেখেছেন হারানবাবু তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়-বিদারক। হারানবাবু বলেছিলেন, কুড়ুল দিয়ে যেভাবে লোকে কাঠ ফাঁড়ে সেইভাবে দুর্বৃত্তেরা শ্রীমুখার্জিকে লাঠি, লোহার রড প্রভৃতি দিয়ে আঘাত করতে থাকে, তিনি আহত হয়ে আর্ত চীৎকার করতে থাকেন, কিন্তু ঐ অঞ্চল হিন্দু-অধ্যুষিত হলেও কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান না। পূর্বেই বলেছি, ঢাকার হিন্দু মুসলমানগণ বরাবর সবগুলো সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়েই আত্মরক্ষার কৌশল বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করে নিজেদের রক্ষাই শুধু করেন নি, প্রতিপক্ষকে চরম আঘাতও হেনেছেন। হিন্দুরাও যে সেদিক দিয়ে মুসলমানের পেছনে ছিলেন, তা' মোটেই না। তার প্রমাণ আমরা দেখেছি ঢাকার নবাবপুরে রাস্তার পাশে একেবারে জেলা-কোর্টের গায়ে লাগা একটা মসজিদের ভাঙা স্তূপ থেকে। ঢাকার হিন্দুরাও ছিলেন বে-পরোয়া, অকুতোভয়। দেশ বিভাগ, তথা পাকিস্তান সৃষ্টির এই আড়াই বছরেরও কিছু কম সময়ের মধ্যেই হিন্দুর সেই সাহস—সেই মনোবল একদম ভেঙে গিয়েছে। আমরা ঢাকায় থেকে ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় যা' দেখেছি তাকে 'দাঙ্গা' বলা ঠিক নয়। সেটা হয়েছিল একতরফা হিন্দু-গৃহ-লুণ্ঠন ও হিন্দুর হত্যা। 'দাঙ্গা' হয় উভয় পক্ষের সংঘর্ষে। এই দাঙ্গায় আমরা দেখেছি একতরফা আক্রমণ; অপর পক্ষের কোন প্রতিরোধ তো ছিলই না—প্রকাশ্য প্রতিবাদেও তাঁদের মুখর হতেও শুনি নি। এই পরাজিতের মনোভাব যে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তার জন্য দায়ী কে? ঢাকার সাধারণ হিন্দুরা, না কংগ্রেস নেতারা যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন? আমার মত

স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন ক্ষুদ্র সৈনিকের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চূড়ান্ত ধৃষ্টতাই হবে; তাই, আমার মতামত এখানে তুলে ধরতে ক্ষান্ত থেকে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের উপরই এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার ছেড়ে দিয়ে রাখলেম। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় দেখেছি ঢাকার হিন্দু এলাকা বলে পৃথক সত্তার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। দাঙ্গাকারীরা আমাদের বাসার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছিল কিন্তু রাস্তার মধ্যে হিন্দু বাড়ি লুট করতে করতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়। সেদিনের মত তারা লুটের মালপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ইতিমধ্যে আমরা খবর পাই এস-ডি-ও শ্রীধীরাজভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসার আশেপাশে আক্রমণ চলতে থাকায় তিনি সপরিবারে গিয়ে ওঠেন একটি আশ্রয় শিবিরে। সাময়িকভাবে তখন তখনই একটা আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। গেণ্ডারিয়া অঞ্চলেই তখন ঢাকার প্রখ্যাত নেতা শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। তাঁর বাড়িও আক্রান্ত হয়েছিল। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, অন্তত ঐ অঞ্চলে যিনি আক্রমণকারীদের সামনে সিংহ-গর্জনে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলে শুনেছি। তাঁর প্রতিরোধশক্তি দেখে আক্রমণকারীরা পিছিয়ে যায়। এই শ্রীশবাবুর রাজনীতিক জীবন সুরু হয় পূর্ববঙ্গে 'অনুশীলন সমিতি'র স্রষ্টা ৺পুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের সহকর্মী হিসাবে। তিনি ঢাকার উকিল ছিলেন এবং বিপ্লবী কর্মীদের বহু মামলায় তিনি আসামীপক্ষের সমর্থনে বরাবর এগিয়ে গিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আসামের গৌহাটি শহরে ফেরারী বিপ্লবীদের সাথে পুলিশের যে খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং যার ফলে আমাদের দলের আমরা ৫ (পাঁচ) জন ধৃত হই—আমি পুলিশের রাইফেলের গুলীতে আহত হয়ে পরে কামাখ্যা পাহাড়ের উপরে ধরা পড়ি, এবং সেই ঘটনাকে অবলম্বন করে যখন আমাদের তৎকালীন ভারতরক্ষা আইনে 'স্পেশাল ট্রিবিউনালে' বিচার হয়, তখন সেই মামলায় কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার শ্রী এস. এন হালদার সাহেব ও ঢাকা থেকে শ্রীশবাবু আমাদের পক্ষ সমর্থন করতে বাংলা দেশ থেকে যান। শ্রীশবাবু বরাবরই ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ই তাঁকে গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসের নেতৃত্বে নিয়ে আসেন। তিনি গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসে আসেন বটে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (তিনি কিছুকাল আগে পশ্চিম বাংলায় এসে ৯১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন) তিনি যদিও কংগ্রেসসেবীই ছিলেন, তবু তিনি কোনও দিনই গান্ধীজীকে "মহাত্মা"

বলতেন না। আমার রচিত—"India Partitioned and minorities in Pakistan" ইংরাজী বইখানির ভূমিকা তিনিই লিখেছিলেন। তাতেই দেখবেন, গান্ধীজীর নামের আগে তিনি 'মহাত্মা' কথাটি লেখেন নি—আমি বলা সত্ত্বেও তিনি লিখতে রাজী হন নি। এইরকমই একরোখা তিনি বরাবরই ছিলেন। এইটেই ছিল তাঁর চরিত্রের ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তিনি সেদিন তাঁর বাড়িতে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

স্বদেশবাবুকে তাঁর মুসলমান বন্ধুর দেওয়া খবর, অর্থাৎ আমাদের বাড়িও যে আক্রান্ত হবে সেই খবর সত্য বলেই আমরা ধরে নিয়েছিলেম। অতুলানন্দ বাবুকে, তাঁর জনৈক মুসলমান বন্ধুর দেওয়া দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার খবর সত্যে পরিণত হতে দেখে, আর মুসলমানদের দেওয়া খবর অবিশ্বাস করার আমাদের কোন কারণ ছিল না। ১৯৫০ সালের দাঙ্গা যে সুপরিকল্পিত ও পূর্বনির্দিষ্ট ছিল সে বিষয়ে অন্তত আমার মনে আর কোনও সন্দেহ ছিল না। তখনও না, এখনও না। সেটারই প্রমাণ আমি ক্রমশ আরও তুলে ধরবো। যাক, আমাদের বাড়িও আক্রান্ত হবে ধরে নিয়েই আমরাও প্রস্তুতই হয়ে ছিলেম। আমরা ঠিক করেছিলেম, মরতেই যদি হয় তবে কোনওরূপ দুর্বলতা না দেখিয়ে বীরের মতই মৃত্যুকে বরণ করবো। কিন্তু আমাদের বাড়ি আর আক্রান্ত হল না। কেন যে হতে পারলো না, সেই কথাটাই বলছি। সন্ধ্যার পরই তিনজন মন্ত্রী-বন্ধু—(১) ডাঃ এ. এম. মালেক, (২) জনাব হবিবুল্লা বাহার ও (৩) জনাব তফাজ্জল আলি সাহেব, এক 'ট্রাক' ভর্তি বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে আমাদের বাসায় আসেন। পুলিশরা বন্দুক নিয়ে রাস্তায় 'টহল' দিতে থাকেন; আর মন্ত্রীরা আমাদের উপরতলায় এসে আমাদের সাথে আলোচনা আরম্ভ করেন। নানা বিষয়েই আমরা আলোচনা করি। মন্ত্রীদের আমরা বলি যে একখানি 'জীপ' গাড়ি দু-একজন পুলিশ পাহারা সহ আমাদের দিলে যে সব হিন্দু, মুসলমান মহল্লায় আটক পড়ে (marooned হয়ে) আছেন, তাঁদের আমরা নিরাপদ স্থানে উদ্ধার করে আনতে পারি। মন্ত্রী-বন্ধুরা তা' দিতে রাজীও হন। কিন্তু তাঁরা তা' দেন নি। আমার বিশ্বাস দিতে পারেন নি। কেন আমার ঐ বিশ্বাস হয়েছে, তাও আমি ক্রমশ দেখাতে চেষ্টা করবো। তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি ঠিক না রাখলেও, বা না রাখতে পারলেও তাঁরা যে একদল বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে এসে রাত ১২টা পর্যন্ত আমাদের

বাসায় থাকেন এবং সিপাহীরা রাস্তায় টহল দিয়ে চলেন, শক্তির এই বহিঃপ্রকাশ (demonstration) যে ভবিষ্যৎ আক্রমণকারীদের উপর এমন একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে আর আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হয় নি, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। মন্ত্রী-বন্ধুরাও হয়তো পূর্বে থেকে অন্যান্য মুসলমানদের মত খবর পেয়েই হোক, বা আশঙ্কা করেই হোক, একদল সশস্ত্র সিপাহী নিয়ে এসেছিলেনও বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যেই। যাক, আমাদের বাড়ি আর আক্রান্ত হল না; তবে, পুলিশ পাহারা সহ 'জীপ' না পাওয়ায় আমরা আর অন্যান্য হিন্দুকে উদ্ধার করতে পারলেম না। তবে, ভগবানই হয়তো অনেকের উদ্ধারের একটা যোগাযোগ অন্যের মারফৎ করে দিলেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী তখন ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তাঁকে আমি ১৯৪৬ সাল থেকেই দেখেছি। সুরাবর্দীর মন্ত্রীসভায় ও দেশ বিভাগের আগেই তিনি বাংলা দেশের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন। দেশ বিভাগের পরেও তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। বরাবরের সেই মুসলিম লীগ সমর্থক সেই শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় হঠাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই করাচি থেকে ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। অতীতে তিনি যাই করুন না কেন, সেদিন ঢাকার কিছু সংখ্যক হিন্দুর—তার মধ্যে তাঁর সমগোত্রীয় হিন্দুই হয়তো বেশি ছিলেন—তিনি যথেষ্ট উপকার করেছেন। তিনি তাঁর গাড়ি ও পুলিশ নিয়ে গিয়ে অনেক হিন্দুকেই উদ্ধার করেছেন। হোক না কেন তাঁদের বেশির ভাগই তাঁর স্বজাতীয়, তবু তাঁরা হিন্দু, তাঁরা বিপন্ন মানুষ। যা আমরা করতে পারলেম না, তিনি তা' সেদিন তাঁর মন্ত্রিত্বের পদাধিকারবলে করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, "devils must be given their due shares." অর্থাৎ মানুষ যতই মন্দ হোক না কেন, তার করা ভাল কাজও অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। যোগেনবাবুর রাজনীতিক মতের সাথে কোনও দিনই অতীতে আমরা এক মত তো হতেই পারি নি, বরং সব সময়েই দেখেছি, তিনি আমাদের মতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজই করেছেন; তবু, তাঁর সেদিনের কাজের জন্য আমি তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তার পরের দিনই তিনি সম্ভবত খবর পেয়েই, তাঁর জেলা বরিশালে চলে

যান। সেখানে গিয়েই সব অবস্থা স্ব-চোখে দেখে ও জীবিত আত্মীয়স্বজনের কাছে পূর্ণ বিবরণ শুনে তাঁর এতকালের সযত্নে পোষিত মুসলিম লীগের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের মোহমুক্তি ঘটে। তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও তাঁর সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে যাঁর কাছেই খোঁজ করেন তাঁর কাছ থেকেই শোনেন—'নাই, নাই, নাই', আর শোনেন, চার দিকেই বুকফাটা আর্তনাদ ও মর্মভেদী হাহাকার! তিনি বরিশালে গিয়ে দেখেন, তাঁর সমাজের বস্তিগুলোয় শ্মশানের দৃশ্য। বাড়ি নেই, ঘর নেই, নেই বলতে কিছুই নেই; আছে শুধু—ছাই, আর ছাই!

অবশেষে ১০ই ফেব্রুয়ারীর সেই ভয়াবহ রাতও শেষ হয়। রাত ১২টা পর্যন্ত তো মন্ত্রীরাই ছিলেন আমাদের বাসায়। তাঁরা চলে যাওয়ার পরে বাকী রাতটুকু আমাদের কাটে না-ঘুম, না-জাগা অবস্থায়। বন্ধু রাজেনবাবু তো বেশ একটু ঘাবড়িয়েই গিয়েছিলেন! রোজ তিনি রাতে 'লুঙ্গি' পরে শুতেন। সেদিনে ধুতি-পরা অবস্থায়ই শুয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'লুঙ্গি' পরলেন না? উত্তরে তিনি বলেন, 'মরি তো নিজেদের পোষাকেই মরতে চাই!' সেই দাঙ্গার পরে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দুই তাঁদের এতকালের অভ্যস্ত হিন্দুয়ানি জ্ঞাপক ধুতিই শুধু ছাড়েন নি, তাঁদের ভাবা-কৃষ্টি প্রভৃতিও ছেড়ে হিন্দু-মুসলমানের, মধ্যেকার বাইরের ব্যবধান ক্রমশ সঙ্কুচিত করে আনছিলেন। সে সম্বন্ধে যথাসময়ে আরও বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করবো। এখন, দাঙ্গা সম্পর্কে যা বলছিলেম তার বিষয়েই বলি।

১১ই তারিখ সকাল থেকেই ঢাকা শহরে, আগের রাতে কোথায় কী হয়েছে,

তার মোটামুটি খবর পেতে থাকি। গ্রামের দিকের খবরও ক্রমশ আসতে থাকে। ঐ ১১ই তারিখের পর থেকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কোথায় কী হয়েছে, তারও অনেক খবরই ক্রমশ আমরা জানতে পারি ; তবে, একথাও ঠিকই যে আমরা যা জেনেছি, তাও সম্পূর্ণ খবর নয়। আংশিক মাত্র। পুরো-পুরি সঠিক খবর সরকারপক্ষ থেকে যতটা সম্ভব তা' গোপনে রাখারই সবিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা যে সব খবর পরে পেয়েছি বা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা' আসল ঘটনার 'ছিটে-ফোঁটা' মাত্র। পুরো খবর আমরাও সংগ্রহ করতে পারি নি। কেউ আর কোনও দিন পারবেন বলেও আমি মনে করি না। ঐ দাঙ্গায় পূর্ববঙ্গের কোন্ জেলায় কত লোক প্রাণ হারিয়েছেন, কত টাকার ধন-সম্পত্তি লুন্ঠিত বা অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কত নারী ধর্ষিতা বা অপহৃতা হয়েছেন, তার সঠিক খবর আর কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভবপর নয় ; তবু, আমরা যেটুকু খবর পেয়েছিলেম বা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেম তাই এখানে তুলে ধরবো।

ঢাকা জেলার গ্রামের খবর হচ্ছে, হিন্দু-হত্যা ও হিন্দুর উপর নানা রকমের নির্যাতন, নারী-ধর্ষণ, নারী-হরণ সহ আগুনের তাণ্ডবে গৃহদাহ প্রভৃতি। ঢাকার গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি, আমাদের বন্ধু শ্রীগণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এল এ মহাশয়ের গভর্নরের কাছে ২১।১১।৫১ তারিখে প্রেরিত পদত্যাগপত্রে তিনি সে সম্পর্কে কিছু কিছু বলেছিলেন। গ্রামের যে সব হতভাগ্য হিন্দু ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় তাঁদের আত্মীয়স্বজন হারিয়েছিলেন, যাঁদের বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়ে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল, যাঁদের জমিজমাও বে-দখল করে জোরপূর্বক নেওয়া হয়েছিল, সেই সব হতভাগ্যদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য সব রকম চেষ্টা করেও—এমন কি, কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ মালেক সাহেবকে নিয়ে গিয়ে কয়েকটি গ্রাম দেখানোর পরে, তিনি, তাঁর সাথেই ভ্রমণরত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ও এস ডি ও-কে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার মৌখিক আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও যখন কিছুই ফল হয় না, তখনই তিনি (গণেনবাবু) হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করার আর তাঁর কোনও অধিকার নেই মনে করে এসেম্বলির সদস্যপদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ পদত্যাগপত্র পাঠান। সেও একটা কত বড় যে মর্মান্তিক ব্যাপার তা' সকলেই হয়তো বুঝবেন। আমরা যাঁদের প্রতি-নিধিত্ব করবো, তাঁদের কোন উপকার করতে পারবো না, অথচ প্রতিনিধিত্বের

'ঠাট' বজায় রেখে আমাদের চলতে হবে। এ যে কত বড় অসহায় অবস্থা, তা' ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝবেন। বন্ধু গণেন্দ্রবাবু সেই দুর্বিসহ অবস্থা মেনে নিলেন না। ধীরেনবাবু (কুমিল্লার), হারাণবাবু (নোয়াখালির) ও আমি, গণেনবাবুকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেম যে "ষোল আনা উপকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আমরা করতে পারছি না ঠিকই, তবু সামান্য হলেও কিছু তো করছি; তার পরে, সব চেয়ে বড় কথা, অত্যাচারিত-নিপীড়িত ঐ সব হতভাগ্যদের কথা তো আমরা বিধানসভার মারফত দেশ-বিদেশে তুলে ধরছি। সেটাও তো একটা কম কাজ নয়। বিধানসভার সদস্যপদ ছেড়ে দিলে তো তাও হবে না।" গণেনবাবু আমাদের যুক্তি সেদিন মেনে নেন 'নি। তিনি শুধু বলেছিলেন যে, "আপনারা এখনও বেকুবের স্বর্গে বাস করছেন! দেখবেন, এমন দিন আসবে যেদিন পাকিস্তানের বিধানসভাতে বিদেশী কোনও সাংবাদিকের প্রবেশাধিকার থাকবে না এবং দেশীয় সংবাদপত্রগুলোর উপরও 'সরকার' প্রভাব বিস্তার করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের যত কথাই যুক্তিতর্ক ও প্রমাণ প্রয়োগ দিয়ে আপনারা বলুন না কেন, তা' প্রকাশ করতে দেবে না। আমি সেই অবস্থা আসার আগেই ভারতে গিয়ে ভারত সরকারের এবং বহির্বিশ্বের কাছে সব ঘটনা তুলে ধরতে চাই।" গণেনবাবু কলকাতার উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিলেন। ভারত সরকারের কাছে সব ঘটনা তুলে ধরার জন্য তিনি দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ও উপ-প্রধানমন্ত্রী প্যাটেলের কাছে সব কথা তুলেও ধরেছিলেন বলে শুনেছি। কিন্তু নেহরু ও নেহরু সরকার তাঁর কথায় কান দেন নি। অবশেষে সেদিক থেকে হতাশ হয়ে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে মনুমেন্টের পাদদেশে জনসভায়ও বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণের কাছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের করুণ অবস্থার কথা 'পেশ' করেছিলেন। তখনও নেহরুর ও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রভাব ভারতের জনসাধারণের উপর অত্যন্ত বেশি। সেই অবস্থায় নেহরুই যে কথায় কান দিলেন না, সে কথায় জনসাধারণ যে প্রভাবিত হয়ে সরকারের উপর 'চাপ' সৃষ্টি করবে, তা' সম্ভবপর ছিল না। হয়ও নি। শুনেছি, ডাঃ বিধান রায়ের সরকার গণেনবাবুকে একটা বাস্তুত্যাগীর আশ্রয়-শিবিরে চাকুরী দিয়ে তার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মারফতে। গণেনবাবু সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তিনি একটি হাইস্কুলের শিক্ষকের পদ নিয়ে দারিদ্র্যকেই বরণ

করে নিয়ে ২৪ পরগনার কোনও এক গ্রামে গিয়েছিলেন। ঢাকার আর একজন স্বনামধন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীজিতেন কুশারীকে ও খুলনার আমাদের ভূতপূর্ব সহকর্মী বিধানসভার সদস্য শ্রীগোবিন্দ ব্যানার্জি মহাশয় দ্বয়কেও ঐরূপ কাজ দেওয়া হয়েছিল। জিতেনবাবু (এখন পরলোকগত) ঐ কাজে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন নি, তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের জন্য এবং গোবিন্দবাবুও চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তাঁর আইন ব্যবসাতেই আবার ফিরে যান। তিনি এখনও কলকাতায় আইন ব্যবসাই করছেন, আর গণেনবাবু, এখনও যাদবপুর অঞ্চলের ২নং পোদ্দারনগর কলোনীতে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে দরিদ্রের জীবনই যাপন করছেন। তিনি ঢাকা ছেড়ে আসার সময় আমাদের যুক্তির প্রতিবাদে যা বলেছিলেন, অর্থাৎ বিদেশী সাংবাদিক-দেরও পূর্ববঙ্গের, তথা পূর্ব পাকিস্তানের বিধানসভায় প্রবেশাধিকার থাকবে না এবং ঢাকার সংবাদপত্রগুলোও সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচারের কোন কথা প্রকাশ করতে পারবে না, তা' যেন ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে ফলে গিয়েছিল। ১৯৬২ সালের রাজসাহীর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তা' মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। গণেনবাবুও যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন, তাঁর সে উদ্দেশ্যও সফল হতে পারে নি। তাই, তিনি এখন রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে অবসর জীবনযাপন করছেন। খান আব্দুল গফুর খানের মত একজন শ্রেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা (অবশ্য অতীতের সংগ্রামী কংগ্রেসের) আফগানিস্তানে বসে তাঁর পাখতুনিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের যে কাজ করতে পারছেন, ভারতে এসে কিন্তু কংগ্রেস সরকারের আমলেও তাঁর সে সুযোগ হচ্ছে না। ইদানীংকালে ভারতের জনমতের চাপে খান গফুর খানকে ভারত সরকার ভারতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন বটে কিন্তু খান সাহেব যখন বলেছেন যে তিনি আদর-আপ্যায়ন বা খানাপিনার জন্য ভারতে বেড়াতে আসবেন না, তাঁকে যদি পাখতুনিস্তানে স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারত সরকার সাহায্য করতে রাজী হন, তবেই তিনি আসবেন। খান সাহেবের ঐ জবাবের পরে কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোনখবর সংবাদপত্রে দেখেছি বলে মনে পড়ে না যে ভারত সরকার খান সাহেবের সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। খান আব্দুল গফুর খানের মত লোকের বেলায়ও পাকিস্তান সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতিই যেখানে এইরূপ, সেখানে গণেন ভট্টাচার্যের মত লোক আর কী করতে পারেন পারেনও নি।

ঢাকায় ১৯৫০ সালের দাঙ্গা সম্পর্কে বলতে গিয়েই শ্রীগণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করার কথা এসে পড়ে এবং সেই প্রসঙ্গ নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে এত কথা এসে পড়েছে; ফলে, আমি আমার কাহিনী থেকে অনেকখানি দূরে সরে পড়েছি। যাক, এখন মূল বক্তব্যেই আবার ফিরে যাই।

১১ই ফেব্রুয়ারী ও তার পর থেকে আমরা নানা স্থানেরই দাঙ্গার খবর পেতে থাকি। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বোধ হয় হয়েছিল বরিশাল জেলা। তার মধ্যে আবার বরিশাল জেলার নম.শূদ্র সম্প্রদায়ের ক্ষতিই হয় সর্বাধিক। তাঁদের বাড়িঘরও পুড়েছিল বেশি এবং লোকও নিহত হয়েছিলেন সব চেয়ে বেশি। বরিশাল, ফরিদপুর খুলনা প্রভৃতি জেলায় বহু সংখ্যক নমঃশূদ্রের বাস ছিল। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধও ছিলেন এবং মনোবলও তাঁদের ছিল অটুট। তাঁরা সংগ্রামীও ছিলেন বরাবরই। মুসলমান ও নমঃশূদ্রের মধ্যে ইংরাজ আমলেও বহুবার সঙ্ঘর্ষ ও দাঙ্গা হয়েছে কিন্তু কোনও সঙ্ঘর্ষেই মুসলমানগণ, নমঃশূদ্রগণকে পর্যুদস্ত করতে পারেন নি; বরং, তাঁদের হাতে পাল্টা মারই খেয়েছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সেখানে সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের যে ধারা দেখেছি, তা' ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে এই সত্যই প্রকাশ পাবে যে হিন্দুর জোট ও সঙ্ঘবদ্ধতা ভেঙে দিয়ে তাঁদের মনোবল একদম ভেঙে দেওয়াই ছিল মুসলিম লীগের নীতি ও উদ্দেশ্য। এই সত্যটাই আমি উদ্‌ঘাটন করে ক্রমশ তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। বরিশালের নম.শূদ্রদের উপর ১৯৫০ সালের আক্রমণ সেই নীতিরই ফল। শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় দাঙ্গা বাধার ২.৩ দিনের মধ্যেই বরিশাল গিয়ে পৌছান। তখনও তিনি কেন্দ্রের একজন মন্ত্রী। মন্ত্রী থেকেও তিনি তাঁরই আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতীয়দের রক্ষা করতে পারেন নি। হয়তো, তাঁর পৌছানোর আগেই গৃহদাহ, লুঠপাট ও হত্যা—সবই হয়ে গিয়েছিল; তবু তিনি মন্ত্রী হিসাবেই সেই বিভৎসতার স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা' করেন নি। তিনি ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তার অভিব্যক্তি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন নি। মন্ত্রী হিসাবে তিনি সে কথা প্রকাশ করলে, তার একটা বিশেষ মূল্য বিশ্বের দরবারে হয়তো হতে পারতো। তা' হয় নি। তিনি কিছু না বললেও বরিশালে একটি হিন্দু-বাবও ছিলেন। তিনি গর্জে উঠেছিলেন।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু সতীন সেন (পরে পাকিস্তান সরকারের বন্দী অবস্থায় ঢাকায় পরলোকগমন করেন) ছিলেন সেই বাঘ। তিনি জোর গলায় প্রকাশ্যভাবেই তৎকালীন ঐ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট—মিঃ ফারুকির (আই সি এস) সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি পুলিশদলকে নিষ্ক্রিয় রেখে ঐ গৃহদাহ-হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজে উস্কানি দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন; ফলে, সতীনবাবুকে ও তাঁর সহকর্মী শ্রীপ্রাণকুমার সেনকে (১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলির সদস্য হন। বর্তমানে পরলোকগত) পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হয়। আমাদের যে সব বন্ধু পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন, তাঁদের কারো কারো কাছে পরে শুনেছি যে যোগেনবাবু ক্রুদ্ধ অবস্থায় করাচিতে ফিরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি সাহেবকে সব বলেন। সেই নিয়ে জনাব লিয়াকত আলি সাহেবের সাথে তাঁর কিছু গরম গরম কথাও না কি হয় এবং লিয়াকত আলি সাহেব যোগেনবাবুকে মন্ত্রীর গদী থেকে নামিয়ে জেলখানার আরামঘরে (!) পাঠানোর নাকি ব্যবস্থা করেন। যোগেনবাবু তার আভাষ পেয়েই করাচি থেকে কেটে পড়েন। এখন তিনি ভারতের নাগরিক। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে যোগেন্দ্রবাবু ভারতীয় সংসদের সদস্য পদের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু হতে পারেন নি। অতীতের পাপকে ধুয়ে-মুছে ফেলতে কিছুটা সময় তো লাগবেই; তবে তিনি যদি সত্যি সত্যিই জনসেবার জন্য আগ্রহী হন এবং সেবকের ভূমিকা নিয়ে কাজ করে যান, তবে অবশ্যই একদিন জনসাধারণের কাছ থেকে তার ন্যায্য পুরস্কারও অবশ্যই পাবেন। বরিশাল জেলার হিন্দু-হত্যা প্রসঙ্গে আরও একটি কথা জানিয়ে রাখি যে, ম্যাজিস্ট্রেট ফারুকি সাহেব তাঁর কাজের পুরস্কারস্বরূপ রাজসাহী বিভাগের কমিশনার হন!

বরিশালের চেয়েও আরও মর্মান্তিক, আরও ভয়াবহ ঘটনার খবর আমরা পাই। সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে রেল গাড়িতে ভ্রমণরত নিরীহ নিঃসন্দিগ্ধ হিন্দু যাত্রীদের অমানুষিকভাবে হত্যা। সব কথা শুনে মনে হয়, বিভিন্ন কেন্দ্র এবং কোন্ তারিখে কোথায় ট্রেন থামিয়ে ঐ হত্যাকার্য সু-সমাধা করা হবে, তার পরিকল্পনা আগেই ঠিক করা হয়েছিল এবং রেল বিভাগের মুসলমান কর্মচারীদের অনেকেই তা' জানতেন, যেমন জানতেন এই দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার দিন-ক্ষণ-তারিখ, অনেক মুসলমানই! আগেই বলেছি, সেই তারিখ ও সময়

একজন মুসলমান বন্ধুর কাছে জেনেই অতুলানন্দবাবু ১০ই ফেব্রুয়ারীর সকালেই আমাদের বাসায় এসে বলেছিলেন। রেলের হত্যাকাণ্ডের একটা ঘাটি হয়েছিল, মৈমনসিংহ জেলার ভৈরববাজার রেল স্টেশন পার হয়ে মেঘনা নদীর উপর যে 'এণ্ডারসন ব্রীজ' আছে তার উপর। ভৈরববাজার স্টেশন দিয়ে সেদিনে যত গাড়ি কুমিল্লা বা চট্টগ্রামের দিকে গিয়েছে, সব গাড়িগুলোকে নিয়ে গিয়ে মেঘনার উপরের রেল-সেতুর (যাকে সাধারণত বলা হয়, "ভৈরব ব্রীজ") উপর দাঁড় করিয়ে হিন্দুদের বেছে বেছে বের করে হত্যা করা হয়েছে এবং মৃত বা আহতদের দেহ মেঘনায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সেদিনে কত লোক যে সেখানে নিহত হন, তার কোনও সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারবেন না। তবে, ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের কারো কারো কাছ থেকে পরবর্তীকালে শুনেছি যে মেঘনার কাল জল সেদিন হিন্দুর তাজা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। ট্রেনের ভ্রমণরত কোন হিন্দুই বাদ পড়তে পারে নি। ঐ ভীষণ হত্যাকাণ্ড দেখে যদি কোনও যাত্রী বলেছেন যে তিনি হিন্দু নন—মুসলমান, তখন তাঁকে উলঙ্গ করে দেখা হয়েছে যে তিনি সত্যিই হিন্দু, না মুসলমান! ঢাকায় দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার দিনে শ্রীবসন্তকুমার দাস (বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা) মহাশয়ের বাসায় সিলেট থেকে তাঁর জনৈক আত্মীয় এসে আটক পড়েন। পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে শুনে তিনি তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বসন্তবাবু তাঁকে নানাভাবেই নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। তিনি ঢাকা ছেড়ে যান কিন্তু তিনি তাঁর সিলেটের বাড়িতে পৌছন নি—আর কোনও দিন পৌছবেনও না!

ভৈরব ব্রীজের হত্যাকাণ্ডের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের সব সংবাদপত্রেই প্রকাশ করা হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ ঢাকার কোন সংবাদপত্রে হত্যাকাণ্ডের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ঘটনাটি প্রকাশ করা হয় নি। ভৈরব ব্রীজের হত্যাকাণ্ড ছাড়াও যে আরও একটি কেন্দ্র উত্তরবঙ্গে বেছে নিয়ে সেখানেও অনুরূপই হিন্দু-হত্যা একই দিনে হয়; সেই ঘটনা পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও সংবাদপত্রে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সে ঘটনাটি বেমালুম লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গিয়েছিল। আমি ঘটনাটির বিষয় পরে বিশেষভাবে জানতে পারি এবং আমার "India partitioned and minorities in Pakistan" নামক ইংরাজী বইয়ে—যে বইখানি U. N. O.-এর 'Human Rights Committee'-তে পাঠান হয়েছিল এবং সেখান থেকে পুস্তকখানি তাঁরা যে

পেয়েছেন এবং তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যা করণীয়, তা করেছেনও, বলে আমাকে জানিয়েছেনও—সে বিষয় উল্লেখ করেছি। সেই ঘটনার কেন্দ্রস্থল ছিল, রাজসাহী ও বগুড়া (উভয় জেলাই পাকিস্তানে) জেলার সীমান্তে 'সান্তাহার' নামক রেল স্টেশনে। স্থানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল, সান্তাহার রেল স্টেশনের 'আপ'-এর 'ডিস্ট্যাণ্ট সিগনালের' কাছে। ঐ দিনের সমস্ত 'আপ' (Up) এবং 'ডাউন' (Down) ট্রেনগুলোকে ঐ ডিস্ট্যাণ্ট সিগনালের কাছে থামান হয় এবং ট্রেনে সব হিন্দু যাত্রীকে ভৈরব ব্রীজের হত্যাকাণ্ডের মত একই পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়। ঐদিন যে ঐরূপ হত্যা করা হবে, তা অনেক মুসলমানই জানতেন। তাঁদের এই জানাটাই প্রমাণ করে যে ঘটনাটি পূর্ব-পরিকল্পিত। মুসলমানদের মধ্যে ঐ ঘটনা যে ঘটবে তা কেউ কেউ যে জানতেন তার প্রমাণ তুলে ধরছি। প্রথম নম্বর প্রমাণ—ডাঃ সুধীর চ্যাটার্জী মহাশয় ছিলেন বগুড়ার একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় চিকিৎসক। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী এবং জনসেবায় মানবদরদী। তাঁর জনসেবার মধ্যে ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। জাতিধর্ম বা বর্ণেরও তাঁর কাছে কোন তারতম্য ছিল না ; তাই তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর কল্যাণসাধন করাই তাঁর একমাত্র ধর্ম বা লক্ষ্য ও আদর্শ। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান সুধীন চ্যাটার্জী রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে ইংরেজ আমলে আমার সাথে হিজলি বন্দীশিবিরে ছিল। ডাঃ চ্যাটার্জী সেই দিন তাঁর কি একটা বিশেষ কারণে কলকাতায় যাওয়া স্থির করে বগুড়া রেল স্টেশনে যান। তিনি টিকেটমাস্টারের কাছে টিকেট চান। মাস্টার সাহেব কিন্তু অন্য সব প্যাসেঞ্জারকেই টিকেট দেন। ডাক্তারবাবুকে আর দেন না। এদিকে ট্রেন এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। মাস্টার সাহেব নানা টালবাহানা করে তাঁকে কিছুতেই টিকেট দেন না। এবং সেদিনের মত তাঁর যাওয়া স্থগিত রাখতে বিশেষভাবে তাঁকে অনুরোধ করেন ; বলেন "একটি বিশেষ কঠিন রোগী আছে, তিনি তাকে না দেখলে রোগীটি হয় তো মারাই যাবে।" ডাক্তারবাবু কিন্তু তবুও যাবেন এবং গেলেনও। বিনা টিকিটেই ট্রেনে গিয়ে উঠলেন। লোকে কথায় বলে—"মানুষের মরণ-লেখা পায়।" মানুষের মৃত্যুর কথাটা নাকি লেখা থাকে কপালে নয়—পায়ে। যেখানে যার মৃত্যু হবে ঠিক থাকে, সেখানে তাকে যেতেই হবে, পায়ে হেঁটে হলেও সে সেখানে যাবেই। ডাক্তারবাবুও গিয়ে ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর

গন্তব্যস্থানেও পৌছন নি, বগুড়ার বাড়িতেও আর ফেরেন নি, আর কোনও দিন ফিরবেনও না।

সেদিনের 'ডাউন' ট্রেন যতগুলোই কলকাতার পথে সান্তাহার স্টেশনের দিকে গিয়েছিল, সবগুলোকেই ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে থামিয়ে তার মধ্যকার হিন্দুযাত্রীদের হত্যা করা হয়েছিল। কত সংখ্যা যে ঐভাবে মারা গিয়েছিল, তা' কেউ সেদিনেও বলতে পারে নি—আজ তো এতদিন পরে আর কারো পক্ষেই তার সঠিক সংবাদ দেওয়া সম্ভবপরই নয়, তবে শুনেছি যে 'ডাউন ট্রেনের' হিন্দুরাই 'আপ ট্রেনের' হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি মারা গিয়েছিলেন; কারণ "আপ ট্রেনের" হিন্দুদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা জোর করেও সান্তাহারের কয়েক স্টেশন আগে, 'আত্রাই' রেল স্টেশনে একটি তরুণ মুসলমান যুবক নামান। ঐ যুবকটি ছিলেন আত্রাই-এরই একটি বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারের সন্তান। নাম মোল্লা আবুল কালাম আজাদ। মরহুম মোল্লা আহশানুল্লা সাহেবের ছেলে। মোল্লা আবুল-কালাম প্রায় সব হিন্দুকে—স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ প্রায় সকলকেই গাড়ি থেকে নামিয়ে নেন। অনেক হিন্দুই তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছিলেন; তাই যেখানে আবুল কালাম সাহেব জানতে পেরেছিলেন যে, যাত্রী হিন্দু, সেখানে প্রয়োজনবোধে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা জোর করেও তাঁদের নামিয়েছিলেন। সন্দিগ্ধ হিন্দু যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য আত্মপরিচয় একদম গোপন করেই ঐ ট্রেনেই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের গন্তব্যস্থানে কেউ পৌছতে পারেন নি—তাঁদের হয় প্রাণ দিতে হয়েছে, নয় তো আহত অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকার পর ভাগ্যের জোরে পরে চিকিৎসায় ভাল হয়েছেন। আবুল কালাম সাহেব কিন্তু যাঁদের নামিয়েছিলেন, তাঁদের খাওয়ার জন্য চিড়া-গুড় ও শিশুদের জন্য দুধ—সবই দিয়ে তাঁদের সেদিনের বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই ঘটনার ফলে, ঐ অঞ্চলের—আত্রাই, পাঁচপুর প্রভৃতি স্থানের হিন্দুরা—নানাভাবেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা—বিশেষ করে, রাজসাহী জেলার মুসলমানদের সম্পর্কে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি জানি যে, তাঁরা সাধারণত শান্তিপ্রিয়। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানই হচ্ছেন কৃষক এবং অল্পবিত্তর জমির মালিক। তাঁরা এক জমিজমা সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে বিশেষ যান না। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে কোনও রকমে চারটা মোটা ভাত

খেয়ে এবং মোটা কাপড় পরে বেঁচে থাকতে পারলেই তাঁরা খুশি। সেই জন্যই আবুল কালাম সাহেবের কাজ যে শুধু হিন্দুদের কাছেই তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল, তা নয়। মুসলমানদের মধ্যেও তিনি ঐ একটি ঘটনাতেই খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তার প্রমাণ দেখেছি, জেলা বোর্ডের নির্বাচনে ও ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলির সাধারণ নির্বাচনে। আবুল কালাম সাহেব জনাব ফজলুল হক্ সাহেবের 'যুক্তফ্রন্ট' দলের প্রার্থী হিসাবে এসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমান আয়ুব সরকারের আমলের পূর্ব পাক এসেম্বলির বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে তাঁর ভাষণের কথা প্রায়ই ঢাকা রেডিওর সংবাদে শুনতে পাই। আমি তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি এবং তাঁর জনসেবার ভূয়সী প্রশংসা করি।

১১ই ফেব্রুয়ারীতে রাজসাহী শহরের সাহেববাজারের মধ্যে বেলা ১১-১২টার মধ্যে আড়ানী ইউনিয়নের (ঐ আড়ানী গ্রামেই আমারও বাড়ি ছিল) ভারতীপাড়া গ্রামের নাথ-সম্প্রদায়ের এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। মিঃ মজিদ তখনও রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। খবর পেয়েই তিনি ঘটনাস্থলে যান এবং সমবেত লোকজনকে কিল-চড়-ঘুষি মেরে তাড়িয়ে দেন। আসামী কেউ ধরা পড়ে না। রাজসাহী জেলার এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমি পরে জেনেছি। ঘটনার সময় তো আমি ঢাকায়; তখন তাই কিছু জানতে পারি নি। পুলিশ কিন্তু ঐ হত্যাকাণ্ডটিকে সাম্প্রদায়িক হত্যা না বলে তাকে টাকা-ছিনতাই উপলক্ষে হত্যা বলে রিপোর্ট দেন। একই অবস্থা আয়ুবী আমলেও দেখেছি। রাজসাহী শহরে আমার বাড়ির কাছেই ছিল গুরুপদ মণ্ডলের বাড়ি। বাড়ির অবস্থা তাঁর ভাল ছিল। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। কোর্টে দলিল লেখার কাজ করতো। রাজসাহী শহরে সেদিন প্রবল গুজব যে, সেদিন পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা আরম্ভ হবে। কারণটা এখন ঠিক মনে নেই। সন্ধ্যার সময় গুরুপদ গিয়েছে তার বন্ধুকে হুঁশিয়ার করতে। ফেরার সময় কে বা কারা তার গলাটা একেবারে "জবাহ" করার মত করে কেটে দেয়। সে সেই অবস্থায় ছুটতে ছুটতে এসে আমার বাড়ির কাছে পুলের উপরে পড়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তখন যিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনিও জানতেন যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গুজব শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তিনি সন্ধ্যার পরে কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান নেতাকে তাঁর বাসায় ডেকে আলোচনা সভা বসিয়েছিলেন আমাকে অবশ্য সেই সভায় ডাকা হয় নি; কারণ, আয়ুবী আমলে

আমি তো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়েছি। ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠীতে যখন আলোচনা সভা চলছিল, তখনই ঐ হত্যাকাণ্ডটি হয়। এই ঘটনায় ২।৩ দিন পরে একজন 'আই বি'র দারোগা আমার বাসায় এসে ঐ হত্যা সম্বন্ধে আমি কি মনে করি তা' জানতে চান। প্রথমে আমি কিছু বলতে অস্বীকার করি, বলি—"আমি তো এখন আর হিন্দুর কোন প্রতিনিধি নই। আমার মতামতের আর কী মূল্য আছে?" তবু কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। বলেন, কর্তৃপক্ষ নাকি তাঁকে পাঠিয়েছেন আমার মত জানতে। তখন আমি বলি যে, ঐ হত্যা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কারণেই হয়েছে। তিনি কিন্তু আমাকে নানাভাবে বোঝাতে থাকেন যে, হত্যাটির সাথে যুক্ত স্ত্রীলোকঘটিত কারণ? তিনি বলতে চান যে, গুরুপদর দু'টি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে এবং তাদের সাথে অপর এক হিন্দুর প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে গুরুপদ বাধা দেওয়ায় তাকে হত্যা করা হয়েছে! আমি তাঁর উক্তি মেনে নিই না এবং বুঝি যে কর্তৃপক্ষ কেন তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য, আমার কাছ থেকে ঐরূপ একটা মত সংগ্রহ করে ত-ই 'রেডিও' ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করা! তা' হল না। আমি না-বললে কী হবে? পুলিশ রিপোর্ট তা-ই হল এবং ২ জন হিন্দুকেই ঐ হত্যার ব্যাপারে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হল। আর হল, আমার বাড়ির চতুর্দিকে ৭।৮ জন শাদা পোশাকে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার জন্য গুপ্তচরের পাহারা! এই সব যখন হয়, তখন অবশ্য মজিদ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। তাঁর জায়গায় অন্য ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। মজিদ সাহেব না থাকলে কি হবে? সেই পাকিস্তান সরকারই আছে। আগেকার মুসলিম লীগ সরকার নেই বটে, কিন্তু তার স্থান নিয়েছে ততোধিক হিন্দু-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আয়ুবী 'কনভেনশন'-পন্থী মুসলিম লীগ সরকার। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার অনেক পরে; তবু, এখানে কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেম এই জন্য যে, পাকিস্তানে হিন্দুদের আমি কি নিদারুণ অবস্থায় থাকতে দেখেছি, সেইটাই তুলে ধরার জন্য। যেখানে সরকার ও তার পুলিশ নিরপেক্ষ হতে পারে না, সেখানে সুবিচার যে লোকে পাবে তার আশা কোথায়? একমাত্র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে, অর্থাৎ জনাব ফজলুল হক, জনাব আবুহোসেন সরকার ও জনাব আতাউর রহমান খাঁর আমলেই হিন্দুরা নিরুদ্বেগে কাটাতে পেরেছিলেন। এই তো অবস্থা।

স্বাধীনতার পর দুই বছর ধরে প্রতিদিন তিল তিল করে করে নানা উপদ্রব, অত্যাচার ও নিপীড়নে হিন্দুদের যে মনোবল ক্রমাগত ভেঙে দেওয়া হচ্ছিল, তা' এখন এইবারের দাঙ্গায় একেবারে সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে যায়। লোকে, যিনি যেভাবে পারেন সেইভাবেই পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটতে থাকেন। ট্রেনে, স্টীমারে বা 'প্লেনে' লোক আর ধরে না। অবস্থা সঙ্কটজনক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীও সঙ্কটের গুরুত্ব বুঝে ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান সরকার যদি অবিলম্বে ঐ দাঙ্গা বন্ধ না করেন, তবে তিনি অন্য পন্থা নিতে বাধ্য হবেন! এইবার পাকিস্তান সরকারের একটু 'চমক' ভাঙে। ১১ই ফেব্রুয়ারীর রাতে ঢাকা রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে, বিধানসভার অধিবেশন সাময়িকভ বে অনির্দিষ্টক লের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ১২ই তারিখে সব মেম্বাররাই—বিশেষ করে মুসলমান সদস্যরা নিজ নিজ বাড়িতে ফেরার জন্য প্রস্তুত হন। হিন্দুদের পক্ষে ট্রেনে যাওয়া তো বিপদ-সঙ্কুল। ট্রেনের হত্যার খবর ঢাকায় পৌঁছে গিয়েছে। রাজসাহীর এক ব্যক্তির কাছে আমি খবর পাই যে, রাজসাহীর শ্রীযতীন্দ্র তলাপাত্র এই সময়েই ঢাকায় রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঢাকায় আর পৌঁছুতে পারেন নি, রাস্তা থেকেই নিখোঁজ হয়েছেন। পরের কথা বলছি। ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। বাচ্চা-বাচ্চা কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই রাজসাহীতে আমার বাসায় উপস্থিত হয়ে ছেলে-পিলেসহ অনাহারে দিন কাটছে বলে কাঁদাকাটি করতেন। আমার সাধ্য মত আমি কিছু কিছু সাহায্য দিয়েছি। রাজসাহীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ আব্দুল সোভান সাহেবকে মহিলাটির সব কথা জানাই এবং তিনি তাঁর discretionary fund, অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের ইচ্ছা মত খরচের জন্য যে তহবিল থাকে সেই তহবিল থেকে এককালীন সাহায্য বাবদ মহিলাটিকে ২০০৲ দুইশত টাকা দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের এই দান কিন্তু ৮ই এপ্রিলের নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তির পরের ঘটনা।

এই সব খুন-গৃহদাহ ইত্যাদি যখন পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় চলছে এবং সে খবরগুলো ঢাকায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে তখন আমাদের হিন্দু সদস্যরাও নিজ নিজ বাড়িতে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ট্রেনের হত্যাকাণ্ডের জন্য যেতে সাহস পাচ্ছেন না। আমাদের বন্ধু কুমিল্লার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তো অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর

সব ঘটনা একটু পরেই বলছি। এখন আমার নিজের কথাই আগে বলে নিই।

১২ই তারিখে আমি রাজসাহী থেকে একটা তারবার্তা পাই। তা'তে ছিল—"Continue your stay there" অর্থাৎ আপনি ওখানেই (ঢাকায়ই) থাকুন। হঠাৎ এইরূপ একখানি টেলিগ্রাম আসার কোনও কারণই আমি বুঝতে পারি না। যাই হোক, তারবার্তার নির্দেশ মত আমি রাজসাহীতে যাই না। ঢাকাতেই থাকি এই আশায় যে, রাজসাহী শহরের মুসলমান সদস্যরা জনাব আব্দুল হামিদ ও জনাব মাদার বক্স ফিরে এলে তাঁদের কাছে শোনা যাবে। আবার বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা হওয়ায় রাজসাহীর মুসলমাম বন্ধুরা ফিরে এলেন। মাদার বক্সের চেয়ে হামিদ লেখাপড়ায় অত্যন্ত খাটো হলেও রাজনীতির দিক থেকে একটু অতিরিক্ত সেয়ানা। ১৯৪৭ সালে যখন পাক-ভারত উপ-মহাদেশ সৃষ্টি হয়ে স্বাধীন হয়, তখন হামিদ সাহেব ছিলেন জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি। মুখের ভাষা তার অত্যন্ত মিষ্টি—"দাদা" ছাড়া কথা বলেন না। অন্তরের দিক দিয়ে ঠিক ততখানি মিষ্টি কি-না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। মাদার বক্স কিন্তু ছিলেন ঠিক তার উল্টো। শিক্ষার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন এম-এ. বি-এল. উকিল। বয়সও কম। রাজনীতির 'প্যাচ' হামিদ সাহেবের মত অত বোঝেনও না, করেনও না। রাজসাহী থেকে আমার পাওয়া তারবার্তার কথা হামিদকে বলে কী হয়েছে তা' জানতে চাওয়ায় তিনি আমাকে বলেন,—"কিছুই তো শুনি নি, দাদা!" মাদার বক্সকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন,—"সব কথা আপনাকে বলতে পারবো না; তবে, আপনার পক্ষে এখন রাজসাহীতে না যাওয়াই ভাল।"

দ্বিতীয়বার বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়ে তা' ১৩ই মার্চ পর্যন্ত চলে এবং ঐ সময় পর্যন্ত আমি ঢাকাতেই ছিলেম কিন্তু কেন যে রাজসাহী থেকে ঐরূপ একটা তারবার্তা আমার কাছে এল তার কোনই 'হদিস' আমি জানতে পারি নি! ১৩ই মার্চেই আমি আকাশপথে 'প্লেনে' কলকাতায় গিয়ে রাজসাহীর বন্ধু-বান্ধবগণের কাছ থেকে ঘটনাটির মোটামুটি একটা আভাষ পাই। তাঁদেরও শোনা খবর। সেই খবর শুনেই আমি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সাহেবের নামে একখানি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁকে জানাই যে তাঁর সরকারের যদি আমার বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ থাকে যার জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা দরকার, সেই খবরটি আমাকে

জানালেই আমি স্বেচ্ছায় তখন-তখনই রাজসাহীতে ফিরে গিয়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করব। নুরুল আমিন সাহেব অবশ্য আমার সে পত্রের কোন উত্তর দেন নি; তবে, আমি রাজসাহীতে ফিরলে আমাকে গ্রেপ্তারও করা হয় নি। রাজসাহীতে দাঙ্গার সময় যে ঘটনাটি ঘটেছিল এবং যে পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে ঢাকায় যে তারবার্তা এসেছিল, তারই একটা বিশদ বিবরণ এখানে তুলে ধরছি, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় (বাণ্ডর) কাছ থেকে তার ১২।৭।৬৭ সালে লেখা সম্প্রতি পাওয়া একখানি পত্র থেকে। শ্রীমান সত্যেন্দ্র, ওরফে বাণ্ড, ঐ দিনের রাজসাহীর ঘটনার সাথে নিজে জড়িত ছিল। জনসমক্ষে সেদিন তাকে অন্যান্য আরও কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দুর সাথে মুসলিম লীগের তথাকথিত গণ-আদালতের সামনে আসামী হয়ে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল; সুতরাং ঘটনাটির বিশদ বিবরণ তার চেয়ে আর কেউ ভালভাবে দিতে পারবে না। সেই জন্যই তারই পত্র থেকে তারই ভাষায় লেখা কিছুটা অংশ 'হুবহু' উদ্ধৃত করছি। তা'তে আরও অনেক তথ্যই সকলে জানতে পারবেন। শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ২৮শে আষাঢ় (৬ই জুলাই, ১৯৬৭ সাল) তারিখের ৭২ বর্ষের ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত "পাক-ভারতের রূপরেখা" প্রবন্ধে মজিদ-কাহিনী পড়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পত্রখানি আমাকে কলকাতা থেকে লিখেছিল। সেই পত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—

"মজিদ-কাহিনী অত্যন্ত মনোযোগ ও উৎসাহের সাথেই পড়ে ফেললেম। বর্ণনা ও তার কাহিনী আমার খুবই ভাল লেগেছে। পড়তে পড়তে সেইসব দিনগুলির কথা মনের পর্দায় জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠছে। আমার তো ভাল লেগেছেই, আমি মনে করি, আরও যারা পড়বে এবং পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে জানার যাদের আগ্রহ আছে, তারা পড়ে অনেক কিছুই জানতে পারবে। যে বিভাগীয় কমিশনারের নাম আপনার মনে নেই লিখেছেন। আমার মনে হয় তার নাম মিঃ খুরশীদ [এখন আমারও মনে পড়েছে যে তাঁর নাম মিঃ খুরশীদই ছিল—(লেখক)]। মজিদ-কাহিনীতে নাচোলের সাঁওতালদের উপর অমানুষিক অত্যাচার যার রিপোর্ট আঁধারকোঠার Most Reverend Father দিল্লীতে তাঁদের ইটালীয় দেশের এমব্যাসিতে পাঠিয়েছিলেন এবং সেই 'এম্ব্যাসি' থেকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল পেয়ে রেডিও মারফত নাচোল সম্বন্ধে বলেছিলেন, শ্রীমতী ইলা মিত্রের উপর অত্যাচার এবং তাঁর কলকাতার

আসার বৃত্তান্ত সবই আপনার জানা। ময়মনসিংহে হাজংদের উপরও মজিদ সাহেব ভীষণ অত্যাচার চালিয়েছিল এবং তার ফলে তারা বহু সংখ্যায় ভারতে চলে আসে। রাজসাহীর সাঁওতালরা আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রাজসাহী ত্যাগ করে আসে। তখন সদর মহকুমা হাকিম তাদের ফেরাতে গেলে তাঁকে তারা বলেছিল—তোদের দেশে বিচার নেই, আমরা থাকব না ইত্যাদি, বহরমপুর গোরাবাজারের কাল্পনিক মুসলমান হত্যার কথা ও সেখানকার রাস্তা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে, এই সব কথা প্রচার করে রাজসাহীতে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা এবং সেই উদ্দেশ্যকে সকলের কাছে জোরদার করে তুলে ধরার জন্যই বীরেনের গ্রেপ্তার ঐ হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে —এই সব ঘটনার অনেক কিছুই আপনি জানেন। আরও অনেক কিছুই ঘটেছিল যার অনেক কিছু সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগতভাবে জানা নেই; কারণ, আপনি তখন রাজসাহীতে ছিলেন না। সেই কথাগুলি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।"

"বীরেনকে গোরাবাজারের হত্যার জন্য গ্রেপ্তার করেছিল ৩০শে জানুয়ারী। কিন্তু তবু তার নামে, আপনার নামে, ডাঃ সুরেশ, ডাঃ মোহিনী, সনৎ ও আমার নামে 'ওয়ারেণ্ট' বের করেছিল, ১১।২।৫০ সালে। আপনি তখন মজিদের নাগালের বাইরে। আমাদের বিরুদ্ধে 'ওয়ারেণ্ট' শৈলেশ নন্দীর পরামর্শে recall করে। শৈলেশ মিঃ মজিদকে বলেছিল ও বুঝিয়েছিল যে আমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করলে পশ্চিমবঙ্গে খুব প্রতিক্রিয়া হবে। সেটা ১১।২ তারিখের দুপুরবেলা। আমি অবিশ্যি কিছু জানতে পারি নি। তখন বাড়িতে আমি শুয়েছিলেম। অনেক ইতিহাস আছে। ঐ দিনই বিকেলে মোসলেম লীগ কর্তৃক একটি জনসভা—'ভূবনমোহন পার্কে' আহূত হয়। দশ হাজারের বেশি লোক পার্কে ও চারিপাশে জমা হয়েছিল। আলম প্রভৃতি আপনার বিরুদ্ধে দৃক্‌পাতহীনভাবে বিষোদ্গার করেছিল। আপনি ঢাকায় নাচোল সম্বন্ধে বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে নাচোলের ব্যাপার দিতে চেয়েছিলেন এই অভিযোগ। সেদিন আপনি রাজসাহীতে উপস্থিত থাকলে রাজসাহী হিন্দুরক্তে স্নাত হয়ে যেত, কারণ ওদের কথার উত্তর আপনি দিতে যেতেনই। তার পরই ঘটনা ঘটত। আলম 'সমাজসেবক সঙ্ঘ' নিয়ে আমার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে allegation দিয়েছিল। আমি পাকিস্থানের সত্যকার নাগরিক নয়। জানি না, সেদিন দেবী সরস্বতী আমার কণ্ঠে

এসে উপস্থিত হয়েছিলেন কি না! আমি বিনা সঙ্কোচে অবিচলিতভাবে একটুকুও বিরতি না দিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আলমের মিথ্যা ভাষণের যোগ্য উত্তর দিয়েছিলেম। সেদিনের জনসভায় সভাপতি মোসলেম লীগের সভাপতি নওগাঁর উকিল জনাব নবিরুদ্দিন সাহেব ছিলেন। তিনিই ঐসব wild allegation-এর উত্তর দিতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন। শ্রীব্রজেন মৈত্রের ও শ্রীসনৎ মৈত্রের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ নিয়েছিল তাদের স্ত্রী কোথায় আছে জানতে চেয়ে! সে এক দুঃখজনক পরিস্থিতি। আপনি আপনার প্রবন্ধের শেষের দিকে যে 'প্যারা' লিখেছেন—"সব ঘটনা জেনে ও সব ঘটনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে…ভারতের শাসকগোষ্ঠী যত শীঘ্র সত্যের আসল রূপটা ধরতে পারেন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল"—সবগুলি কথা অতি সুন্দর ও কালোপযোগী হয়েছে।"

এইতো গেল শ্রীমান সত্যেন্দ্রমোহনের চিঠি। আমি রাজসাহীতে ফিরে আরও জানতে পেরেছি যে আফাজ মোক্তার (ইনি বহরমপুরের গোরাবাজার থেকে বাস্তত্যাগ করে রাজসাহীতে যান এবং ইনিই সেখানে রটান যে গোরাবাজারের রাস্তা নাকি মুসলমানের রক্তে একদম লাল হয়ে গিয়েছে। এই ভদ্রলোকের সম্পর্কে কিছু বলার আছে। পরে বলছি।) ও আরও কয়েক ব্যক্তি আমার গ্রামে—আড়ানিতে গিয়ে বক্তৃতায় আমার মাথা নেওয়ার জন্ম জনসাধারণকে উত্তেজিত করেছিলেন।

এইতো গেল পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থা! এই অবস্থার মধ্যে থেকেই আমাদের কাজ করতে হয়েছে। এটা শুধু আমার বেলাতেই নয়—আমাদের সকলের বেলাতেই। একজন সহকর্মী বন্ধু-সদস্যকে তো প্রাণও দিতে হয়েছে। তাঁর কথা পরে বলব।

এখন, শ্রীমান সত্যেন্দ্রমোহনের পত্রের উদ্ধৃতিতে যে যে নামগুলো উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করি। তাঁদের সম্যক পরিচয় জানলেই সকলে জানতে পারবেন যে পাকিস্তানে হিন্দুর মান-সম্মান কোন্ পর্যায়ে নেমে গিয়েছে এবং কি সুখেই (!) তাঁরা সেখানে আছেন!

(১) শ্রীবীরেন সরকারের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে, সে ছিল একজন নৈষ্ঠিক স্বাধীনতা সংগ্রামী। যে বয়সে ছেলেরা 'হাফ-প্যাণ্ট' পরে, 'মার্বেল' খেলে বেড়ায় সেই বয়সেই শ্রীমান বীরেন্দ্র ১৯৩০ সালে রাজসাহী শহরে 'আই-বি'

বিভাগের ইন্সপেক্টারের বাড়িতে বোমা ফেলার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে 'হাফ-প্যান্ট' পরা অবস্থাতেই রাজসাহী জেলে আসে। আমরা অনেকেই তখন ১৯৩০ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে ধৃত হয়ে ঐ জেলেই ছিলেম। তারপর থেকে বীরেন বহুবার আমার সাথে কংগ্রেসের আন্দোলনেও জেলে গিয়েছে এবং জেল থেকেই পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়ে 'বি-এ'-ও পাশ করে। পরে সে আইনের পরীক্ষা দিয়ে উকিল হয়। এখন সে রাজসাহী জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত 'এ্যাডভকেট'।

(২) ডাঃ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন রাজসাহীর অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন চিকিৎসক। রাজসাহীতে তাঁদের প্রাসাদতুল্য একটি বাড়িও ছিল। তিনি সেই বাড়ি ছেড়ে এদিকে কখনও আসবেন সে পরিকল্পনা তাঁর কোনদিনই ছিল না কিন্তু এখন আসতে বাধ্য হয়েছেন। কলকাতার নিউ-আলিপুরে তাঁর একটি প্রকাণ্ড বাড়িও ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। সেখানে থেকেই তিনি চিকিৎসা ব্যবসা করেন। শুনেছি, তাঁ'র চিকিৎসাধীন একটি কঠিন রোগীকে দেখানোর জন্য রোগীপক্ষ কলকাতার প্রখ্যাত ডাক্তার শ্রী এস. এন. দে মহাশয়কে আনেন এবং ডাঃ দে রোগীকে ও রোগীর জন্য দেওয়া ডাঃ চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপত্র দেখে সকলের সামনেই বলেন যে ডাঃ চক্রবর্তী যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন, তা'তে আর কোনও ঔষধের সংযোগ বা পরিবর্তনের দরকার নেই। ডাঃ দে নাকি এও বলেন যে, ডাঃ চক্রবর্তী ছিলেন রাজসাহীর বিধান রায়।

(৩) ডাঃ মোহিনী মজুমদারও ছিলেন রাজসাহীর একজন সুচিকিৎক। তাঁরও নিজস্ব একটা বৃহৎ দোতলা পাকা বাড়িও রাজসাহীতে ছিল। সেসব ফেলেই তাঁকে এদিকে আসতে হয়েছে এবং তাঁর রাজসাহীর বাড়িটিও এখন পর্যন্ত একজন মুসলমান কর্তৃক বেদখল হয়ে আছে। বর্তমানে ডাঃ মজুমদার যাদবপুর 'টি-বি' হাসপাতালে 'রেসিডেন্ট সার্জন' হয়ে আছেন।

(৪) শ্রীসনৎ মৈত্র মহাশয় 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুস্তকের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ৺অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের ছোট ভাই ৺অশ্বিনীকুমার মৈত্র মহাশয়ের পুত্র। অশ্বিনীবাবু ও শ্রীমান সনৎ উভয়েই রাজসাহীর বিখ্যাত উকিল ছিলেন। সনৎ তো রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রাজসাহীতে থাকেন না বলে তাঁকে মজিদ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পাকিস্তানে সত্যিকার নাগরিক নন বলে ঘোষণা

করেন এবং চেয়ারম্যানের পদই শুধু নয়, মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য পদও ছাড়তে বাধ্য করেন। এখন তিনি কলকাতায় এসে এখানেই তাঁর ওকালতি ব্যবসা করছেন এবং একটি বেশ বড় বাড়িও ইতিমধ্যে কলকাতাতেই করেছেন। গুণী ব্যক্তিকে যে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারেন না, তা' প্রমাণ করেছেন ডাঃ সুরেশ চক্রবর্তী এবং শ্রীসনৎকুমার মৈত্র মহাশয়।

(৫) শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্র, ওরফে বাগু, (যাঁর চিঠি থেকে একটি অংশ উপরে উদ্ধৃত করেছি) হলেন সেকালের প্রখ্যাত উকিল ও বিশিষ্ট জমিদার ৺ভুবনমোহন মৈত্র মহাশয়ের ছোট ছেলে। রাজসাহী শহরের বিখ্যাত "ভুবনমোহন পার্ক" (যেখানে উপরে উল্লিখিত মুসলিম লীগের আহূত জনসভা হয়েছিল) স্বর্গীয় ভুবনমোহনেরই দান করা জমিতে তাঁর নামে মিউনিসিপ্যালিটি করেছিলেন। শ্রীমান সত্যেন্দ্রের বড় ভাই ৺সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র রাজসাহীর উকিল, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বেঙ্গল এসেম্বলির কংগ্রেস দলের এম-এল-এ ও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহিকা (working) কমিটির একজন সদস্যও ছিলেন। এই পরিবারের ছেলেরাও অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে জেল খেটেছে। পরিবারটি রাজসাহী জেলায় সর্বজন পরিচিত।

(৬) শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র মহাশয়ও একজন এম-এ, বি-এল উকিল কিন্তু তিনি ওকালতি করেন না। নিজ জমিদারীর দেখাশোনা করেন। লাখ টাকা আয়ের তাঁর জমিদারী এবং সেটা সবই প্রায় দেবত্তর সম্পত্তি। এঁরই ছেলে ভারত-বিখ্যাত প্রখ্যাত সরোদ ও বীণাবাদক শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র। ব্রজেন্দ্রবাবু অত্যন্ত নির্বিরোধী অমায়িক ভদ্রলোক। তিনি দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। পাকিস্তানে এহেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও কম নির্যাতিত হন নি এবং এখন পর্যন্তও হচ্ছেনই।

(৭) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর (বর্তমান প্রবন্ধের লেখক) একমাত্র পরিচয় হচ্ছে, তিনি অতীতের একজন অক্লান্ত কর্মী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলেন এবং সেই অপরাধে তাঁকে ২২ বছরেরও অধিককাল ইংরেজের কারাগারে ও বন্দীশিবিরে কাটাতে হয়। পারিবারিক পরিচয় তাঁর বিশেষ কিছু নেই। তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তিনি বেঙ্গল এসেম্বলির ও পূর্ববঙ্গ এসেম্বলিরও সদস্য ছিলেন, পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল না হওয়া পর্যন্ত। অল্প সময়ের জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অর্থমন্ত্রীও ছিলেন। তিনিই

বোধ হয় রাজসাহী জেলার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক গ্রামের ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ব্যক্তি। অবশ্য এটা তাঁর দাবি। সে দাবির সত্যাসত্য সম্পর্কে আজও যাঁরা রাজসাহী জেলায় আছেন বা রাজসাহীর লোক হয়ে ভারতে এসেছেন, তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন।

এইবার শ্রীসত্যেন্দ্রমোহনের চিঠিতে ও আমার লেখায় যে দু'জন মুসলমানের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করি; তাঁদের চরিত্রও জানার পক্ষে সকলের কিছুটা সুবিধা হবে।

(১) মৌলভি আজিজুল আলমও রাজসাহী কোর্টেরই একজন বি-এল উকিল। তাঁর বাড়ি আমার গ্রামের বাড়ির কাছেই এবং তিনি আমাদের গ্রামের স্কুলে আমার ছোট ভাই 'জিতেশচন্দ্র লাহিড়ীর' সাথে পড়তেন; সুতরাং তাঁকে আমি তাঁর ছোটকাল থেকেই জানি। তিনিও আমাকে বড়ভাই-এর মতই সম্মান করতেন। এখনও সম্ভবত করেন কিন্তু মুসলিম লীগের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতাই বোধ হয় সময়ে সময়ে তাঁকে বিকারগ্রস্ত করে তোলে! তখন যে তিনি কি বলেন ও কি করেন, তা' বোধ হয় তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না। এইরূপ একজন বিকারগ্রস্ত লোকের উত্তেজক কথায়ও তাই বোধ হয় সাধারণ লোকে উত্তেজিতও হন না; তবু তিনি বলে যান! সময়ে সময়ে সকলেই মনে করেন তিনি অত্যন্ত ভারত, তথা হিন্দু-বিরোধী! আবার পরক্ষণেই শুনবেন, তিনি বলছেন— "Hats off to the Indian Leaders and Indian Judges" (ভারতের নেতাদের ও ভারতের বিচার বিভাগের জজদের 'সালাম' জানাই!) আলম সাহেব হচ্ছেন এইরূপ একজন ভাবপ্রবণ অকৃতকার্য ব্যর্থ রাজনীতিক এবং উকিল।

(২) মৌলভী আফাজ সাহেব একজন বাস্তুত্যাগী (বহরমপুর গোরাবাজার থেকে গিয়েছেন) মুসলমান মোক্তার। তিনি রাজসাহীতে গিয়ে অনেক দুষ্কর্মই করেছেন। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান দুষ্কর্ম হচ্ছে, তাঁর জালিয়াতি। তিনি রাজসাহীর অধিবাসী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সাহেব শ্রীভবানী নন্দীর বাড়িখানি দখল করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ভবানীবাবুর জালসহিযুক্ত একটা দলিল করিয়ে রেজেস্টারী অফিসে সংশ্লিষ্ট পার্টির অগোচরেই রেজেস্টারী করতে দেন। যখন এইটা করেন, তখন ভবানীবাবু মারা গিয়েছেন। তাঁর পৌত্রেরাই তখন মালিকানা ভোগ করছিলেন। কিভাবে তাঁরা ব্যাপারটা

জানতে পারেন এবং বীরেন সরকার উকিলকে সব জানান। বীরেন তৎক্ষণাৎ মুন্সেফ কোর্টে ঐ জাল দলিল সম্পর্কে মামলা দায়ের করে মুন্সেফের কাছে প্রার্থনা করেন যে অবিলম্বে ঐ Original দলিলটা Seize করে Safe-custody-তে ট্রেজারিতে রাখার জন্য। মুন্সেফের আদেশে রেজেস্টারী অফিস থেকে দলিলটি দখল করে নিয়ে ট্রেজারিতে রাখা হয়। আফাজ সাহেব এইবার বড়ই বেকায়দায় পড়ে বীরেনের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করেন এবং অবশেষে ষোল কি সতের হাজার টাকা নগদ দিয়ে বাড়িটির খরিদানা দলিল রেজেস্টারী করিয়ে নেন। এহেন একজন মুসলিম লীগের নেতা হচ্ছেন আফাজ সাহেব। আয়ুবী আমলে তিনি মৌলিক গণতন্ত্রের (Basic Democracy) কৃপায় এখন রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান!

এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলে রাখি যে, রাজসাহী জেলার নবাবগঞ্জ শহরে জনকয়েক মালদহের মুসলমান ঐরূপ জাল দলিল তৈরী করার কারবার চালায়। এইরূপ জাল দলিলের ফলে, অনেক হিন্দুর বাড়ি, জমি প্রভৃতি হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে। বিক্রেতা কিছু জানতেও পারেন নি। পরে ক্রেতা কোর্ট থেকে 'পেয়াদা' নিয়ে এসে সম্পত্তির দখল নিয়েছে। দলিলটি রেজেস্টারী হওয়ার পরে যখন ক্রেতা Original দলিল ফেরৎ পায়, তখন একদিন থানায় গিয়ে বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে বলে একটা 'এজাহার' করে এবং জানায় অন্যান্য জিনিষের সাথে যে হাতবাক্সে ঐ দলিলটি ছিল তা-ও চুরি হয়ে গিয়েছে। তখন আর দলিলটি যে জাল, তা' প্রমাণ করার মূল সূত্রই লোপ পেয়ে যায়। পাকিস্তানে থাকতে আমি আরও শুনেছি যে এই বহরমপুর শহরেই এমন একজন হিন্দু মোক্তার আছে যে ভুয়া লোককে আসল লোক সাজিয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিক্রি দলিলের 'এফিডেবিটে' সনাক্ত করে থাকে। চোরাকারবারী বা সমাজবিরোধীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই। অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থই এদের একতার বন্ধনে বেঁধে রাখে।

পাকিস্তানের হিন্দুদের জীবনে বহু সমস্যার মধ্যে এটাও একটা নতুন ধরণের সমস্যা। আফাজ মোক্তার সাহেবের মত লোকেরাই এই সমস্যা সৃষ্টি করে চলে। প্রতিকার করার সুযোগ কমক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরে এটাও একটা নতুন উপসর্গরূপেই হিন্দুদের কাছে দেখা দিয়েছে। ১৯৫০ সালের ব্যাপক হিন্দুহত্যা হিন্দুদের মনোবল একদম ভেঙে

দেওয়ায় তাঁদের কোনও অন্যায়েরই আর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। ভারত সরকার এই কথাগুলো মনে রেখে পাকিস্তানের হিন্দুদের সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করলেই তাঁদের উপর সুবিচার করা হবে; নচেৎ, শুধু শুধু তাঁদের পাকিস্তানে থাকার সস্তা উপদেশ দেওয়ার কোনও অধিকারই ভারত সরকারের আছে বলে আমি মনে করি না। পাকিস্তানের হিন্দুরাও ভারতবাসী হিসাবেই জন্মেছিলেন এবং তাই ভারতে আসার ও ভারত সরকারের কাছে তাঁদের পুনর্বাসনের দাবি জানানোরও পূর্ণ অধিকার আছে বলে আমি মনে করি। এটা ভিক্ষার দান নয়—এটা তাঁদের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রাম। একথাটা ভারত সরকার ও পাকিস্তানের বাস্তু-ত্যাগীদের—উভয়েরই মনে রাখা দরকার। দেশ বিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের নথিভুক্ত উদ্বাস্তুর সংখ্যাই ৫০ লক্ষ। তা ছাড়া আরও অসংখ্য উদ্বাস্তু এসেছেন, যাঁদের উদ্বাস্তু পরিচয়পত্র নেই বা যাঁরা কোনওরূপ সাহায্যও চান নি। আজ সকল উদ্বাস্তুর সম্পর্কেই আবার সহানুভূতিপূর্ণ খোলা মন নিয়েই ভারত সরকারের বিচার-বিবেচনা করার দিন এসেছে; নচেৎ, আমার আশঙ্কা হয়, শুধু উদ্বাস্তুদেরই নয়—দেশেরও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারময়। ভারতে এই অন্ধকারের রাজ্য সৃষ্টি করাই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করেই অগ্রসর হচ্ছেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গাও সেই পরিকল্পনার একটি অংশ। "পাক-ভারতের রূপরেখা"-য় আমি পাকিস্তানের হিন্দুদের সমস্যা ও তার প্রতিকারের পথ কি, সেই কথাটাই তুলে ধরতে চাই। সেই জন্যই এত কথা বলতে হচ্ছে।

এইবার ধীরেনবাবুর কথা বলি। এক-এক অঞ্চলের দাঙ্গার খবর আমাদের বাসায় এসে পৌঁছয়, আর ধীরেনবাবু অতি সঙ্গত কারণেই তাঁর কুমিল্লার বাসায় যাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েন। সেখানে তাঁর তরুণী পুত্রবধূ ও অবিবাহিতা ছোট মেয়েটি আছেন। তাঁদের এই দুর্দিনে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও পুরুষমানুষ তো নেই-ই, বয়স্কা প্রবীণা কোনও মহিলাও নেই। কয়েকবছর আগে ধীরেনবাবুর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। ধীরেনবাবু যখন শুনলেন যে এসেম্বলির অধিবেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং মুসলমান সদস্যরা নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাচ্ছেন, তখন তিনি ছুটলেন মুসলিম লীগের 'পার্টি-হাউসে' যেখানে থাকেন মুসলিম লীগের সদস্যবৃন্দ। পূর্ববঙ্গ সরকার মুক্তাপাড়ার জমিদারের শ্বেতপাথরে বাঁধান মেঝেওয়ালা (floor)

বিরাট প্রাসাদোপম ঢাকার দোতলা বাড়িটি হুকুম-দখল (requisition) করে নিয়ে দলীয় সদস্তদের থাকার জন্য দিয়েছেন। ধীরেনবাবু সেখানে গিয়ে কুমিল্লার অতি প্রবীণ ও বর্ষীয়ান নেতা জনাব আবিছর রেজা চৌধুরী সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁদের সাথে তিনিও যেতে চান জানিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। চৌধুরী সাহেব কুমিল্লা জেলাবোর্ডের 'চেয়ারম্যান' ও বিধানসভার মুসলিম লীগ দলের সদস্ত। বয়েসও তিনি প্রবীণ। ধীরেনবাবুর চেয়ে বড়ই হয়তো হবেন। বড় যদি না-ও হন, সমবয়সী তো নিশ্চয়ই। এহেন একজন ভদ্রলোকের কাছে সহৃদয়তাপূর্ণ ভদ্র ব্যবহারই ধীরেনবাবু পাবেন আশা করেছিলেন কিন্তু তিনি তা' পান নি; বরং অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহারই পেলেন। রেজা চৌধুরী সাহেব ধীরেনবাবুকে বলেন,—"দেশ বিভাগের পর থেকে আপনারা ক্রমাগত চেষ্টা করতে করতে অবশেষে এই দাঙ্গা বাধাতে পেরেছেন। পাকিস্তানের নিন্দা ও দুর্নাম বিশ্বে প্রচার করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। একথা আজ সব মুসলমানই জেনে ফেলেছেন। সেই অবস্থায় আপনার নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে আপনাকে সাথে নিয়ে যেতে পারবো না।" এই সাফ জবাবের পরে ধীরেনবাবু আর কি বলতে পারেন! তিনি অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট অন্তরে মুখ ভার করে বাসায় ফেরেন এবং সব কথা বলেন। সব কথা শুনে আমাদের অতীত বিপ্লবী দিনের বন্ধু বারোদির জমিদার শ্রীসুবোধ নাগ মহাশয় ধীরেন-বাবুকে বলেন যে তিনি তাঁর অতি বিশ্বস্ত একজন মুসলমান তহশীলদারের সাথেই তাকে তাঁর কুমিল্লার বাসায় পৌঁছে দেবেন। দিলেনও। কিন্তু চৌধুরী সাহেবের কথা ভোলবার নয়। আমরা ভুলিও নি। আমার মনে প্রশ্ন এসেছে, এ কার কণ্ঠস্বর? রাজসাহীতে আলম, আফাজ প্রভৃতি আমার বিরুদ্ধে যা' প্রচার করেছে, এ-ও তো ঠিক তাই-ই। কণ্ঠ পৃথক পৃথক বটে কিন্তু সুর ও স্বর তো একই? পরে জানা গিয়াছে পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই সব জেলাতেই ঐ একই প্রচারণা হয়েছে। আমরা—কংগ্রেসীরাই—ঐ দাঙ্গা বাধিয়েছি! এই দাঙ্গার বিস্তৃতির জন্ত প্রথমে প্রচার করা হয় যে হাওড়ার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ওয়াজির আলি খানকে হিন্দুরা হত্যা করেছে! তা'তেও যখন লোকে মেতে ওঠেন না, তখন সর্বশেষ 'ব্রহ্মাস্ত্র'-স্বরূপ প্রচার করা হল যে কলকাতায় জনাব ফজলুল হক সাহেবকে হিন্দুরা হত্যা করেছে! পরে শুনেছি, এই সংবাদটি রাজসাহীতে পৌঁছানোর সাথেসাথেই, পূর্ব-বর্ণিত আজিজুল আলম সাহেব নাকি 'বার লাইব্রেরী' থেকে পাগলের মত কাছারীর

প্রাঙ্গণে ছুটে বেরিয়ে চীৎকার করতে থাকেন,—"ঘুমন্ত সিংহ জেগে ওঠ। তোমাদের প্রিয় নেতা হক সাহেবকে হিন্দুরা হত্যা করেছে। এর প্রতিশোধ নাও" ইত্যাদি ইত্যাদি। ফজলুল হক সাহেবের মত জনপ্রিয় নেতা সত্যি সত্যিই যদি নিহত হতেন, তাহলে তার প্রতিশোধ যে ভীষণভাবেই নেওয়া হ'ত, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু হতে পারে নি। পূর্ববঙ্গ সরকার সাথে সাথেই 'রেডিওগ্রাম' পাঠিয়ে প্রত্যেকটি জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে জানিয়ে দেন যে জনাব হক সাহেব সুস্থ দেহেই আছেন—সংবাদটি একেবারে নিছক গুজব। পূর্ববঙ্গ সরকার যে এত তাড়াতাড়ি গুজবটির প্রতিবাদ করেছিলেন, তার পেছনের কারণ ছিল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী-র "অন্য পন্থা"র ঘোষণা। এইসব গুজবও কি হিন্দুরাই ছড়িয়েছিলেন? হাঁড়িকাঠের মধ্যে তাঁদের গলা বাড়িয়ে দিয়ে খড়্গাঘাত ঘাড়ে নেওয়ার জন্য তাঁদের মনে এতই কি একটা বিভৎস 'সখ' জেগেছিল? রেজা চৌধুরী সাহেব ও তাঁর দলবল সে কথার জবাব কোনদিনই দিতে পারবেন বলে আমি মনে করি না।

যে সময়ে আলম সাহেব ঘুমন্ত সিংহকে জেগে ওঠার জন্য আহ্বান জানান সেই সময় (পরে শুনেছি) রাজসাহী জেলার নওগাঁ শহরে রটে যায় যে ভারতের বালুরঘাট দিয়ে ভারতীয় ফৌজ আক্রমণ করে নওগাঁ মহকুমার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এটাও ছিল একটা গুজব। কিন্তু খবরটা শুনেই "সিংহ" ও "শেয়াল"—সব এক সাথেই পলায়নোন্মুখ হয়ে পড়েন। স্থানীয় সরকারপক্ষও মুহূর্তের মধ্যে মহকুমার মধ্যে যত 'বাস, ট্রাক, লরি' প্রভৃতি ছিল সবই রিকুইজিশন করেন, সরকারী কর্মচারীদের পরিবার সহ সরকারী নথিপত্র সরিয়ে ফেলার জন্য। আসল কথা হচ্ছে, এই দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের জন্য হিন্দু, মুসলমান, কেউই প্রস্তুত তখনও ছিলেন না, আজও হয়েছেন বলে আমি মনে করি না। নেহরুজীর ঐ ঐতিহাসিক উক্তি যে কি পরিমাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তার একটা নজির দিই। ১০ই মার্চ তারিখে পূর্ববঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেলে, আমি যাই স্পীকার করিম সাহেবের চেম্বারে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য। স্পীকার সাহেব আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই জড়িয়ে ধরে বলেন,—"লাহিড়ীবাবু! এই হয়তো শেষ সাক্ষাৎ!" আমি তখন তাঁকে বলি,—"সে কি! শেষ দেখা হবে কেন?" উত্তরে তিনি বলেন,—"ভারত নাকি আমাদের আক্রমণ করবে?" আমি

তাঁকে তখন বলি—"তা' কিছুতেই সম্ভব নয়। আবারও আমরা আসবো, আবারও দেখা হবে।" এই কথাগুলো এখানে উল্লেখ করলেম এইজন্যই যে, নেহরুজীর ঐ উক্তিটি শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়—উচ্চতর রাজনৈতিক মহলেও একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সেই কারণেই দাঙ্গার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব খুব বেশি বাড়ে নি। এই দাঙ্গার পেছনে কোন্ শক্তি এবং কি উদ্দেশ্যে কাজ করেছে, তা' পরে ক্রমশ বলব।

এই দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিন্দুর মনে, ভাষায় ও কৃষ্টিতে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং পাকিস্তানের পক্ষেই বা তার নাগরিকদের পোষাক-পরিচ্ছদের সমস্যার কিরূপ সহায়ক হয়েছিল, তারই দু-একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি।

দেশ বিভাগের আগে হিন্দু-মুসলমান—সকলেই ধুতিই পরতেন। তার পরে স্বাধীনতা এলে মুসলমান ধরলেন ধুতির বদলে 'লুঙ্গি' বা 'পায়জামা', আর হিন্দুর পোষাক তখনও আগের মত ধুতিই চললো। এই দাঙ্গার পরে কিন্তু অবস্থাটা নতুন একটা রূপ নিল। আমরা ঢাকায় গিয়ে দাঙ্গার পরে রাস্তা-বাটে ধুতি-পরা লোক দেখি-ই নি বললেও অত্যুক্তি হবে না। সবারই পরনে হয় লুঙ্গি, না হয় পায়জামা! এই সম্পর্কে একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা বলি। শ্রীফণীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি-এল রাজসাহীতে ইনকামট্যাক্স বিভাগে ওকালতি করতেন, দাঙ্গার পরে একবার তিনি ঢাকায় যান একটা আপীলের মামলা নিয়ে। ঢাকা থেকে ফেরার ট্রেন রাত ৮৷৯টার সময়। শ্রীমান ফণী 'চোস্ত' পায়জামা ও বুটিদার পাঞ্জাবী প'রে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় রওনা হন ঢাকা স্টেশন থেকে। সেই কামরায় অন্যান্যদের মধ্যে পাবনার ট্রেজারী অফিসারও ছিলেন। ট্রেন ছাড়লে ঐ অফিসার ভদ্রলোকটি হিন্দুদের, ভারত সরকারের ও নেহরুজীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেন, আর ফণীবাবুকে তাঁর সে সম্পর্কে মতামত কি তা' জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। ফণীবাবুও মনোযোগী শ্রোতা হিসাবে "হাঁ,-হুঁ" দিয়েই তাঁর মতামত জানাতে থাকেন। সেদিন ছিল গাড়িতে অত্যন্ত ভিড়। ইণ্টার ক্লাশ কামরায় তিলধারণেরও স্থান ছিল না। রাজসাহীরই একজন মুসলমান ভদ্রলোক—মহসীন সাহেব ঐ গাড়িতে ঢাকা থেকে মৈমসিংহ পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে এসেছেন। মৈমনসিংহে গাড়িখানি প্রায় একঘণ্টা বা তারও কিছু বেশি সময়। থেমে থাকতো। মহসীন সাহেব ভাবেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর

কামরায় কোথায়ও স্থান যদি থাকে, তাহলে টিকেট বদলিয়ে তিনি সেখানেই উঠবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোর ভেতরে উঠে তাই তিনি দেখে বেড়ান। দেখতে দেখতে ফণীবাবু যে কামরায় আছেন, মহসীন সাহেব সেই কামরায় এসে ফণীবাবুকে দেখেই একেবারে 'তাজ্জব' বনে যান এবং বলেন,—"আরে ফণী! তুই যে দেখি একেবারে চেহারাই পাল্টিয়ে ফেলেছিস!" বলেই তিনি নেমে গেলেন বটে, কিন্তু 'ট্রেজারি অফিসারটি ফণীবাবুকে নিয়ে পড়েন এবং বলেন,—"মশায়! আপনি যে একজন হিন্দু, একথা বলেন নি কেন?" তাঁর উগ্রমূর্তি দেখে ফণীবাবু 'আমতা-আমতা' করতে করতে তাঁর ছোট 'এটাচি কেস'টা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন! সেই ফণীবাবু এখন রাজসাহী ছেড়ে এসে মালদহে ইনকাম ট্যাক্স বিভাগেই ওকালতি করছেন। এমনিভাবে ঐ দাঙ্গা পাকিস্তানের নাগরিকদের পোষাকের সমস্যার একটা 'সুরাহা' করেছে। এখন প্রায় সকল নাগরিকেরই একই রকম পোষাক, অন্তত রাস্তা-ঘাটে হয়ে এসেছে। পায়জামা ও লুঙ্গি পেয়েছে পাকিস্তানের জাতীয় পোষাকের মর্যাদা।

পশ্চিমবঙ্গে এসেও দেখছি এখানে তরুণ সম্প্রদায়ও ধুতি ছেড়েছেন। ধরেছেন প্যাণ্টালুন বা পায়জামা। তবে, পাকিস্তানের হিন্দুরা যে-মনোভাব থেকে ধুতি ছেড়েছেন, এঁরা কিন্তু সেই মনোভাব থেকে করেন নি। পাকিস্তানের হিন্দুরা করেছেন ভয়ে; আর এখানের তরুণরা করেছেন অনুকরণপ্রিয়তার জন্য। ওটা একটা ফ্যাশনের পর্যায়ে এসে গিয়েছে। আমার মনে অনেক সময়ই হয়েছে, এদিকে তো "ইংরাজী হটাও" আন্দোলনে অনেক বড় বড় নেতা উঠে-পড়ে লেগেছেন কিন্তু কেউই তো "ইংরাজের পোষাক হটাও" আন্দোলন করছেন না! ভাষারই বোধ হয় সব অপরাধ,—পোষাকের কিছুই নেই! আমার তো মনে হয়, পোষাকের সাথে সাথে মনের ভাবেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত। গেরুয়া পরলেই মনে যেমন একটু বৈরাগ্য ভাব আসে, আবার বুট, পট্টি, প্যাণ্ট পরলেই একটু 'গট্-মট্' করে হাঁটতে ইচ্ছা হয়। তাই না কি? দেশের চিন্তাশীল নায়কদের কাছে আমি এই প্রশ্নটি তুলে ধরছি, তাঁদের কাছ থেকে একটা মীমাংসার সূত্র পাব আশা করে।

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরে পাকিস্তানের হিন্দুদের মুখের ভাষাও কিছু কিছু পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। হিন্দুরা 'জল'-কে জলই বলতেন, এখন

তরুণদের মধ্যে অনেকেই 'পানি' বলতে আরম্ভ করেছেন। কথায় কথায় তাঁরা "জি, হঁ', বা জে" প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। প্রবীণ হিন্দুকে নমস্কার জানাতে গিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন—"আদাব, স্যর।" আমি পাকিস্তানে থাকাকালে প্রতিদিনই প্রায় ঐরূপ ঘটনা আমার সাথেই হতে দেখেছি। আমি আমাকে 'আদাব' জানানোর কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেয়েছি—"অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, স্যর।" এমনিভাবেই হয়তো একদিন আরও বেশি অভ্যাস হতে হতে হিন্দু-মুসলমান একসাথে মিশেই যাবে। এই মিশে যাওয়াটা আমিও চাই। ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে একটা সম্প্রদায় সীমাবদ্ধ থাকুক, সেটা আমিও চাই না; তাতে জাতি গঠনে বিপত্তি দেখা দেয়। যেমন দেখা দিয়ে চলেছে বিহার প্রদেশে কায়স্থ ও ভূমিহার ব্রাহ্মণের মধ্যে। সেখানে দেশের স্বার্থের চেয়ে সম্প্রদায়ের স্বার্থই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একটা জাতির মধ্যে গণ্ডী কেটে তাকে সীমিত করে রাখা কোনও জাতীয়তাবাদীই পছন্দ করবেন না। আমিও করি না কিন্তু ভয়ে যদি অপরের পোষাক অপরের ভাষা গ্রহণ করতে হয়, সেটাতেই আমার আপত্তি। পাকিস্তানে হিন্দুদের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তা' নিছক ভয়েই হয়েছে ও হচ্ছে। সেই কথাটাই আমি সকলকে একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

১৩ই মার্চ তারিখে পূর্ববঙ্গ-বিধানসভার দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিবেশনে (প্রথম পর্যায়ের অধিবেশন দাঙ্গার জন্য বন্ধ হয়ে যায়) ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট পাশ হওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায়। সদস্যরা সকলেই যে যাঁর বাড়ির দিকে ছোটেন কিন্তু আমি যাই কোথায়? রাজসাহী তো আমার পক্ষে অজ্ঞাত কারণেই তখনও নিষিদ্ধ অঞ্চল। রাজসাহী থেকে তারবার্তায় দাঙ্গার সময় আমাকে ঢাকাতেই থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে কথা আগেই বলেছি। তারপরে ঢাকাতে থাকাকাল পর্যন্ত ঐরূপ নির্দেশ আমায় কারণ

জানতে পারি নি। রাজশাহীতে যখন যেতে 'নিষেধ', তখন আমি আগে থেকেই ঠিক করি, বিধানসভা বন্ধ হয়ে গেলে, আমি কলকাতাতেই যাব। তখন 'প্লেনে' কলকাতার টিকেট পাওয়াও এক মস্তবড় দুর্ঘট ব্যাপার। পলায়নোন্মুখ লোকের এত ভিড় যে ১৫ দিন আগেই সব টিকেট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় কীভাবে টিকেট পাওয়া যায়? মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেবকে সব অবস্থা বলার পরে তিনি ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসে ফোনে খবর দিয়ে আমার জন্য ১৪ই মার্চের তাঁদের সকালের 'প্লেনে' একটা আসন রিজার্ভ করে দেন। প্রত্যেক প্লেনেই সরকারের জন্য দুটো করে আসন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 'রিজার্ভ' রাখার সর্ত ছিল। তারই একটা আসন আমাকে দেওয়ার জন্য নুরুল আমিন সাহেব ব্যবস্থা করে দেন। আসন তো রিজার্ভ হয়ে আছে কিন্তু 'এরোড্রোম' যাই কেমন করে? দাঙ্গার সময় যেদিন ট্রেনে অ-মুসলমানগণকে হত্যা করা হয়, সেইদিনই তেজগাঁর 'এরোড্রোমে'ও অ-মুসলমান বহু যাত্রীকে ছোরা মেরে নিহত ও আহত করা হয়। এ ঘটনাটির কথাও ঢাকায় সকলেই শুনেছিলেন। আমরাও শুনেছি। অন্য সকলে যা শুনেছিলেন, আমরা তার চেয়ে বেশি বিস্তারিত খবরই জানতে পারি। আমাদেরই অতীতের এক বিশিষ্ট বিপ্লবী বন্ধু সেইদিনই কলকাতা থেকে ঢাকার তেজগাঁ বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হন এবং প্লেনের যাত্রীরা নামামাত্রই তাঁদের উপর যুগপৎ এক অমানুষিক আক্রমণ আরম্ভ হয়। অনেক যাত্রীই সেই আক্রমণে নিহত হন। আমাদের বন্ধুটি আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে প্রেরিত হন। বন্ধুটির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁর ঢাকায় আসার কারণ এবং কীভাবে তিনি, অন্যান্যদের মত নিহত না হয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হয়েছিলেন, তার একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। বন্ধুটি ছিলেন ঢাকারই লোক। নাম তাঁর, শ্রীগোবিন্দ কর। তিনি বাল্যকালেই ঢাকায় বিপ্লবী দলে (অনুশীলন সমিতিতে) যোগ দেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঢাকায় তাঁর মামার বাড়ি থেকে 'ফেরার' হন। তাঁর বাপ-মা অনেককাল আগেই মারা গিয়েছিলেন। তিনি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন এবং সেখান থেকেই পড়াশোনা করতেন। সেই অবস্থাতেই তিনি ফেরারী হয়ে নানাস্থানে থাকার পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই পাবনা জেলার আট ঘরিয়া গ্রামে এক মাঠের মধ্যে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সাথে তাঁর ও তাঁর সহকর্মী—

কুমিল্লার নিকুঞ্জ পাল মহাশয়ের এক প্রচণ্ড খণ্ডযুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষেই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। বিপ্লবীদের কাছে 'রিভলভার' ও 'পিস্তল'; এবং পুলিশের কাছে, রাইফেল। সঙ্ঘর্ষের পর বিপ্লবী দুইজনেই গুরুতর রকমে আহত হয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে, উভয়ের প্রতি 'দ্বীপান্তর' দণ্ডের আদেশ হয় এবং দ্বীপান্তরে জেল খেটে মুক্তি পেয়ে বের হয়ে আসার পরে এবারেও গোবিন্দবাবু, সু-বিখ্যাত কাকোরী-ষড়যন্ত্রের মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৭ সালে উত্তরপ্রদেশে ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুসারে পরিচালিত সাধারণ নির্বাচনে "কংগ্রেস" জয়যুক্ত হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলে কাকোরী-মামলার দণ্ডিত আসামীদের মুক্তি দেন। গোবিন্দবাবুও সেই সাথে মুক্তি পান। তিনি 'বে-থা' করেছিলেন না। সে অবসরও পান নি। এক জীবনে দুই-দুইবার যাঁকে দ্বীপান্তর খাটতে হয়, তিনি আর 'বে-থা' করেন কখন? তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন বলতে তাঁর মামার পরিবারবর্গই ছিলেন তাঁর একান্ত আপনার লোক, যাঁদের কাছে তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ ঋণী। কলকাতায় থেকে তিনি ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পান, তখনই তিনি ঠিক করেন যে সেই দুর্দিনে তাঁকে তাঁর মামার বিপন্ন পরিবারবর্গের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাই তিনি ঢাকায় এসে ছিলেন। আগেই বলেছি, গোবিন্দবাবু ছিলেন ঢাকার লোক; সুতরাং ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল। তাই তিনি মুসলমানের 'লুঙ্গি' পরেই ঢাকায় আসেন। তারপরে যখন তাঁকেও ছোরা মারতে থাকে আক্রমণকারীরা, তখন তিনি চীৎকার ক'রে তাদের বলেন যে তিনি তো একজন মুসলমান—তাঁকে মেরে ফেলা হচ্ছে কেন? তাঁর ঐ কথা শুনে আক্রমণকারীরা বিভ্রান্ত হয় এবং তাঁর কথার উপর বিশ্বাস করেই তাঁকে তারাই 'ট্যাক্সি' ক'রে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। হাসপাতালে তিনি মুসলমান নামেই ভর্তি হন এবং আমাদের বাসায়; তিনি যে একজন হিন্দু সে কথা কোনমতেই প্রকাশ না-করার জন্য সতর্ক করে খবর দিয়ে দেখা করার জন্য বলে পাঠান। স্বদেশ নাগ ও সুবোধ নাগ, উভয়ে এক সাথে গিয়েই তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে সব ঘটনা শুনে এসে আমাদের সেদিনকার তেজগাঁ এরোড্রোমের হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দেন। সুতরাং, অন্য সকলে সেই হত্যাকাণ্ডের খবর যতটা জানতেন, আমরা তার চেয়ে কিছু বেশি-ই জানতেম। তাই ঢাকা শহর থেকে তেজগাঁ এরোড্রোমে

যাওয়া তখনও আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করতে পারি নি। এই অবস্থায় শ্রী......"বর্মণ" উপাধিধারী এক হিন্দু পুলিশ ইন্সপেক্টর (তাঁর নামটি এখন মনে পড়ছে না) স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি আমাকে বলেন যে, আমার যাত্রার দিন পুলিশের পোষাক পরেই তাঁর 'রিভলভার' নিয়ে আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়ে 'প্লেনে' তুলে দিয়ে আসবেন। তিনি তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক রেখেছিলেনও। এই যে পুলিশ-অফিসারটির কথা বললেম, সেই পুলিশ-অফিসারটির এবং তাঁর মত আরও ২।১টি হিন্দু সরকারী পদস্থ কর্মচারীর সম্পর্কে তাঁদের চাকুরীর অবস্থার বিষয় কিছু বলা দরকার মনে করি। তা'তেই সকলে বুঝতে পারবেন যে হিন্দু চাকুরীয়াদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পাকিস্তানে কত সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ বিভাগের সময় বর্মণবাবু ছিলেন পুলিশের একজন সার্কেল ইন্সপেক্টর, অর্থাৎ তাঁর অধীনে কয়েকটি থানার কাজকর্ম দেখা-শোনারও ভার স্বাভাবিক নিয়মেই ছিল। জানি না, কি কারণে তিনি 'অপশান' (Option) দিয়ে ভারতে যান নি। হয়তো দেশ ছেড়ে যেতে চান নি বা যাওয়ার পথে তাঁর কিছু পারিবারিক অসুবিধা ছিল, অথবা তিনি মনে করেছিলেন হিন্দু ওপরওয়ালারা তো সব চ'লে যাচ্ছেন, তার ফলে তাঁদের শূন্যস্থান ন্যায়সঙ্গত কারণেই পূর্ববঙ্গ সরকার তাঁকে দিয়েই একটি পূরণ করবেন! পূর্ববঙ্গ সরকার কিন্তু তা' করেন নি; বরং তাঁকে সার্কেল ইন্সপেক্টরের পদ থেকে সরিয়ে 'ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে' 'সি, আই, ডি'র (C. I. D) ইন্সপেক্টর করেছিলেন! থানার উপর আর তাঁর কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। নাজিমুদ্দিন সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে আমাদের তৎকালীন দলনেতা শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের সাথে একত্রিত হ'য়ে যখন আমরা নাজিমুদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা ক'রে পুলিশ বিভাগের অকর্মণ্যতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেম, তখন তিনি হিন্দুদেরই সেজন্য দায়ী ক'রে বলেছিলেন যে হিন্দু অফিসাররা 'অপ্‌শান্' দিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্যই ঐরূপ অবস্থা হয়েছে—যিনি ছিলেন রাইটার কনস্টেবল, তাঁকে করতে হয়েছে থানার ইন্‌চার্জ অফিসার! কথাটা যে সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়, তা' বর্মণবাবুর পদোন্নতি (!) দেখেই কি বোঝা যায় না? শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ধীরাজবাবুও দেশ বিভাগের সময়ই ছিলেন, 'এস, ডি, ও' (S. D. O) এবং তিনিও 'অপ্‌শান্' দিয়ে ভারতে

যান নি। তিনিও আর পদমর্যাদায় তার উপরে তো উঠতে পারেনই নি, উপরন্তু ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় তাঁকে একটি বাস্তুত্যাগীদের আশ্রয় শিবিরে নিরাপত্তার জন্য স্থান নিতে হয় এবং দাঙ্গার পরে আর তিনি মহকুমা শাসনকর্তা S. D. O-র পদেও থাকতে পারেন না—তাঁকে ঢাকার সচিবালয়ে গিয়ে একজন মাননীয় কেরানীর পদ (dignified clerk !) নিতে হয়। আরও অন্তত দুইজন প্রধান হিন্দু কর্মচারীকে আমি জানি, যাঁদের একজনের নাম শ্রীঅজিত দত্তচৌধুরী, 'সি-এস-পি' (ভারতের 'আই-এ-এস' সমতুল্য) এবং অপর জনের নাম—শ্রী এস বি দাশ ; তঁদের কথা একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার এবং তা' যথাকালেই বলবো।

ইন্সপেক্টর বর্মণবাবুর কথা বলতে গিয়ে এই কয়টি নাম উল্লেখ করেছি, পাকিস্তানে হিন্দু-কর্মচারীদের (অফিসারদের) ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ যে কেমনভাবে রুদ্ধ তা-ই দেখানোর জন্য। এখন আমাদের আগের কথায় ফিরে যাই।

বর্মণবাবু আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়ে 'প্লেনে' উঠিয়ে দেন। আমি নিরাপদেই কলকাতায় পৌঁছি। ১৫ই মার্চ তারিখে সকালে উঠেই আমি যাই, ১৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে শ্রীবীরেশ চক্রবর্তীর বাসায়। শ্রীবীরেশের কথা পূর্বেই বলেছি। সে নিজের নীতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আর যখন স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে থাকতে পারে না, তখন সে 'রাজসাহী সম্মেলনী নামে রাজসাহী-বাসিন্দের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি কোনও রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল না—ওটা ছিল সম্পূর্ণভাবে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শ্রীবীরেশ আজ আর নেই। ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কাল-'ক্যান্সার' রোগে পরলোকগমন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি আজও টিকে আছে এবং তার প্রধান কর্মকেন্দ্র, ১৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীটেই আছে। রাজসাহীর অধিবাসী যিনি যেখানে থেকেই হোক—তা' ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকেই হোক, বা পাকিস্তান থেকেই হোক—কলকাতায় এলেই একবার ঐ বাসায় গিয়ে থাকেন এবং খবরের আদান-প্রদান করেন। কার্যত ঐ বাসাটি হয়েছিল, রাজসাহীবাসীদের সুখ-দুঃখের সংবাদ সংগ্রহের একটা কেন্দ্রস্থল। সেই কারণেই আমি ভোরে উঠেই সেখানে যাই, রাজসাহীতে কী ঘটেছে যার জন্য ঢাকায় আমার কাছে দাঙ্গার সময় ঐরূপ তার (telegram) যায়, সেই

বিষয়টি জানার জন্ত। কী যে সে সময় রাজসাহীতে ঘটেছিল, তা' তো সেই দুর্ঘটনায় একজন তথাকথিত প্রধান আসামী শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রের চিঠিতে আগেই প্রকাশ করেছি। সেই চিঠিতে যে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে একজন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে সেই ঘটনার আংশিক আভাষ আমি পাই, শ্রীমান বীরেশের কাছ থেকে। সে বলে—"সেদিন আপনি রাজসাহী শহরে উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই আততায়ীর হাতে নিহত হতেন এবং সমস্ত হিন্দুদের জীবনে এক ভয়াবহ দুর্যোগ দেখা দিত।" সেই খবর শুনেই আমি কলকাতা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে এক পত্র লিখে জানাই যে, তাঁর সরকারের আমার বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে ত' আমাকে জানালে আমি স্বেচ্ছায় গিয়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবো। সে পত্রের আমি অবশ্য কোনও উত্তর পাই নি। সে কথা আগেই বলেছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমি এখানে জানাতে চাই যে, পরবর্তীকালে সামরিক শাসনের সময়ে আমি আমার সেই কথা ঠিকই রেখেছিলাম। আমার বিরুদ্ধে যখন "এব্‌ডো" (EBDO) আইনে নোটিশ হয়, তখন আমি বহরমপুর শহরে আমার ছোট ভাইয়ের বাসায় মাত্র কয়েকদিন আগে এসেছিলাম। সংবাদপত্রে ঐ নোটিশের খবর দেখে আমি তৎক্ষণাৎ রাজসাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং ঢাকায় গিয়ে ঐ মামলার বিচারের জন্ত যে 'ট্রাইব্যুনাল" গঠিত হয়েছিল, তার সম্মুখীন হই। যথাকালে, এই মামলা সম্পর্কে সমস্ত ইতিহাস বিস্তারিতভাবেই বলবো।

কয়েকদিন কলকাতায় থাকার পরে বহরমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। কৃষ্ণনগর রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার পরে ট্রেনটি কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিতা 'খড়ে' নদীর (ভৌগলিক নাম—'জলঙ্গী' নদী) রেলের সেতুর কাছে এসে হঠাৎ থেমে যায়। আগেও অনেকবার আমি কলকাতা থেকে বহরমপুরে গিয়েছি কিন্তু কোনও দিনই আমি এখানে ট্রেন দাঁড়াতে দেখি নি। হঠাৎ কেন দাঁড়াল তা' ভেবে দেখারও আমার অবসর হলো না। দেখলাম, যাত্রীরা সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে দেখছেন। তাঁরাই বলাবলি করছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ভাবী সংগ্রামের জন্ত সব সেনাবাহিনী নদীর ধার দিয়ে ছাউনি ফেলেছেন এবং তাঁরা নদীতে গা ধুতে নেমেছেন। ঐ মিলিটারিদের প্রয়োজনেই ওখানে সব ট্রেন আজকাল থামছে। আমিও কৌতূহলবশেই উঠে দাঁড়িয়ে দেখি যে, নদীর ধার দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সব ছাউনি ফেলা হয়েছে। ছাউনিগুলোর

উপরে ডাল-পালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের 'শিখ' সৈন্যদের অনেকেই নদীতে নেমেছেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সূত্রপাতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নেহরুজী যে 'অন্যপন্থা' (other method)-এর কথা বলেছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী সাহেব তার উপর প্রথমত বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। তাই নিরুদ্বেগেই তিনি ছিলেন। অবস্থা দেখে সেদিন আমার মনে হয়েছিল যে, অন্য পন্থার ঐটি প্রথম ধাপ মাত্র! লিয়াকৎ আলি সাহেব বিষয়টির গুরুত্ব না বুঝলেও কিন্তু বৃটিশের ও আমেরিকার ভারতে অবস্থিত দূতাবাসের (embassy) কর্মকর্তারা তার গুরুত্ব যথেষ্টই বুঝেছিলেন। শুনেছি, তাঁরাই নাকি পাকিস্তানে স্থিত তাঁদের সহকর্মীদের দ্বারা লিয়াকৎ আলি সাহেবকে সমস্ত খবর দিয়ে অবিলম্বে দিল্লীতে গিয়ে নেহরুজীর সাথে চুক্তি ক'রে আসন্ন যুদ্ধ পরিহার করানোর চেষ্টা করতে বলেন এবং সেই খবর পেয়েই, লিয়াকত আলি সাহেব তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের দিল্লীতে না যাওয়ার জন্য কাতর আবেদন সত্ত্বেও দিল্লীতে যান এবং বহু রদ বদলের পরে ৮ই এপ্রিল তারিখে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবেই "নেহরু-লিয়াকৎ-চুক্তি-টি" সম্পন্ন করেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের সব ঘটনা দেখে আমার যা' মনে হয়েছে, সেই কথাটা আমি পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি। একটি বিষধর সাপ, তার ফণা উত্তোলন ক'রে কোনও মানুষকে কামড়ানোর জন্য উদ্যত হয়েছে। সেই অবস্থায় সাপটি কোণও কারণে ফণা নামিয়ে নিয়ে ফিরে চলতে লাগলে আক্রান্ত ব্যক্তিটির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাই-তুলে ধরছি। আক্রান্ত ব্যক্তিটি হিন্দু হলে ধর্মীয় সংস্কারবশেই আক্রমণকারী সাপটিকে চলে যেতে দেয় কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তিটি যদি মুসলমান হন, তাহলে তাঁদেরও ঠিক ধর্মীয় সংস্কারবশেই সেই সাপকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেন। সাধারণত এটা আমি ব্যক্তিগত জীবনে বহুবারই দেখেছি। শুনেছি, মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মেই নাকি নির্দেশ আছে যে সাপ দেখলেই মারতে হবে—অন্তত তাকে মারবার জন্য একটা ঢিলও ছুঁড়তে হবে। হিন্দুর ধর্মে কী বলেছে তা অত্যন্ত তর্ক-সাপেক্ষ বিষয়; সুতরাং তার মধ্যে না গিয়ে হিন্দুর সংস্কারের বিষয়ই বলি। সেটি মুসলমানের সংস্কারের ঠিক উল্টো। সাপ হচ্ছে দেবী মনসার সন্তান এবং পূজ্য! রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই মনস্তত্ত্ব দেখতে পাই। নেহরু-লিয়াকৎ-চুক্তির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান নিজের শক্তি বাড়ানোর জন্যই সামরিক জোটে

যোগ দিয়ে "সিয়াটো" (SEATO) ও "সেন্টো" (CENTO) চুক্তি করেন এবং নিজের শক্তি বাড়ার সাথে সাথেই সেই চুক্তিপত্রকে আবর্জনার ঝুড়িতে (waste-paper basket) ফেলেই শুধু দেন না। তার পর থেকে সাপকে (ভারতকে) মারার জন্য নানা দেশের সাথে নানাভাবেই ষড়যন্ত্র ক'রে চলেন। ভারত কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র (হিন্দু রাষ্ট্র নয়) হওয়া সত্বেও হিন্দুর সংস্কার মতই চলছেন—তিনি পাকিস্তানের ক্রূরতা ও খলতা যে সাপের চেয়েও ভয়াবহ তা বহুবার বহুভাবে প্রমাণ পাওয়ার পরেও তা'কে (পাকিস্তানকে) আঘাত করার দিকে যাচ্ছেন না! উভয় দেশের মধ্যে রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ এইখানেই; ভারতের অনুসৃত এই আঘাত-না-করার নীতি যে খারাপ, সেকথা আমি বলি না বরং আমি বিশ্বাস করি যে সুদূর ভবিষ্যতে এই নীতিরই জয় অবশ্যই হবে, যদি আঘাতের জবাবে প্রত্যাঘাত করার শক্তি ও সামর্থও গড়ে ওঠে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী (Defence-Minister) শ্রীশরণ সিং অবশ্য ভারতীয় সংসদে জোর গলায়ই বলেছেন যে, তাঁরা যে-কোনও আক্রমণকারীই আসুন না কেন, তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ভারতকে রক্ষা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত! এই ঘোষণা যেদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সংসদে করলেন, তার পরদিনই, অর্থাৎ ২।৮।৭১ তারিখে 'রেডিও'র সংবাদে শুনলেম ও সংবাদপত্রেও দেখলেম যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনীর পুলিশের সাথে বিদ্রোহী মিজোদের এক সঙ্ঘর্ষে পুলিশবাহিনীর তিনজন মারা গিয়েছে এবং মিজোদের পক্ষে মারা গিয়েছে মাত্র একজন! এইটেই কি সম্পূর্ণ প্রস্তুতির লক্ষণ? সাধারণতই তাই. জনমানসে সন্দেহ জাগে। ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে বিদ্রোহী নাগা মিজো প্রভৃতিকে পাকিস্তান-সরকার সব রকমের সাহায্য ও উস্কানি দিয়ে চলেছেন কিন্তু ভারত সরকার আজ পর্যন্ত সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খানকে পাখতুনিস্থানের অহিংস সংগ্রামেও কোনরূপ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন বলে তো খবর শুনি নি। আজকে যাঁরা ভারতের শাসনক্ষমতায় আছেন, খান সাহেব একদিন তাঁদেরই শুধু সহযোদ্ধাই নন, একজন শ্রেষ্ঠ নেতাও ছিলেন; তবু কিন্তু তাঁর করুণ আবেদনেও সাড়া দিতে ভারত সরকারকে অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত দেখা যায়! ভারতের নাগরিকদের মধ্যে আমি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রেরণা দেখেছি, ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের ও ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সঙ্ঘর্ষের সময় তা'

যে-কোন প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন দেশের পক্ষেও গৌরবের জিনিস কিন্তু কথা হচ্ছে, নাগরিকরা যদি ক্রমাগতই দেখতে থাকেন যে ভারতীয় রাজ্যের কোন কোন অংশ শত্রুপক্ষ দখল ক'রে নেওয়া সত্ত্বেও সরকারের কর্তৃপক্ষ যতদিন পেরেছেন, ঘটনাটা জনসাধারণের কাছে গোপন করেই রেখেছেন এবং যখন একান্তই প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তখনই কেবলমাত্র স্বীকার করেছেন! প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর আমল থেকেই সকলেই দেখছেন যে যিনি যখনই প্রতিরক্ষামন্ত্রী থেকেছেন, তিনি-ই অত্যন্ত জোর গলায়ই ঘোষণা করেছেন যে কোন দেশকেই ভারতের এক ইঞ্চি জমিও দখল ক'রে নিতে দেবেন না, তবু কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে চীন ও পাকিস্তান ভারতীয় জমি দখল করেই রেখেছেন। আজই সকালের (৪।৮।৬৭ তারিখের) আকাশবাণীর খবরে শুনলেম যে আসামের লাটিটিলা-ডুমাবাড়ি অঞ্চলের চারখানি গ্রাম ১৯৫৯ সাল থেকে বে-আইনীভাবে জবরদখল ক'রে রেখেছেন! এইরূপ ঘটনার খবর অনবরত শুনতে শুনতে যদি ভারতবাসীরা তাঁদের সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতিশ্রুতির বা ঘোষণার উপর আস্থা হারান, তাহলে কি তাদের তার জন্য দোষ দেওয়া যায়? সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা একবার ভেঙে গেলে তা'র পরিণতিতে দেশের উপর যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে ও বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে, সে সম্পর্কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতাদের আজ বিশেষভাবেই ভেবে দেখা দরকার। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতের নেহরু সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করেছিলেন কিন্তু অবশেষে পাকিস্তান সরকারের অনুরোধেই দুই দেশই একটা চুক্তিতেও আবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল ঐ চুক্তি সম্পাদিত হয় দিল্লীতে বসেই দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদের স্বাক্ষরের মাধ্যমেই। ঐ চুক্তিকে 'দিল্লী-চুক্তি' বা 'নেহরু-লিয়াকৎ-চুক্তি' বলা হয়। ঐ চুক্তিটি যদি যথাযথভাবে রূপায়িত হয়ে চলতো, তাহলে যে দুইটি রাষ্ট্রের পক্ষেই মঙ্গল হতো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তা' কি হয়েছে? চুক্তির পরে কিছুকাল অবশ্য পাকিস্তান সরকার তার প্রতি মর্যাদা দিয়েছিলেন কিন্তু তা'র পরেই, অর্থাৎ যখনই পাকিস্তান সরকার সামরিক জোটের মাধ্যমে নিজেদের শক্তিশালী মনে করলেন, তখন থেকেই চুক্তিপত্রটিও আবর্জনার ঝুড়িতে টুকরো টুকরো ক'রে নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো। আমাদের যেসব কংগ্রেসী বিরোধী দলীয় সদস্য পূর্ববঙ্গ বিধানসভায় বা পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ছিলেন, তাঁরা সকলেই এই চুক্তিভঙ্গের কথা বহুবার

সংসদে তুলে ধরেছেন। ভারতের সংবাদপত্রসমূহেও তা' প্রকাশিত হয়েছে; তবু কিন্তু ভারত সরকারের মোহভঙ্গ হয় নি। এই অবস্থার প্রতিকার কি? যুদ্ধ? আমি বলি—"না"। আমার চিন্তাতে যা' এসেছে, তা আমি এই প্রবন্ধগুলোর শেষ পরিচ্ছেদে বলব। আপাতত এখানে শুধু এইটুকুই বলে রাখতে চাই যে পাকিস্তানে আজ যে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল বর্তমান আয়ুবী-সরকার-বিরোধী জাতীয়তাবাদী দল গড়ে উঠছে, তাঁদের সংগ্রামে ভারত সরকারের উচিত সব রকমে সাহায্য করা এবং তাঁদের আন্দোলন ও সংগ্রামের কথা জাতিপুঞ্জ পরিষদে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে তুলে ধরা। সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খানও সম্ভবত সেই রকম সাহায্যই চান। জানি না, কি কারণে ভারত সরকার সে পথে পা বাড়াতে এত দ্বিধাগ্রস্ত! ১৯৫০ সালের চুক্তি ব্যর্থ হয়েছে। তার পরেও বহু চুক্তিই হয়েছে। সর্বশেষে তাসখন্দ চুক্তি! একের পর এক চুক্তি হ'য়ে চলেছে এবং একের পর এক—সব চুক্তিই ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানের অ-মুসলমানদের আর পাক-ভারত কোনও চুক্তির উপরই আস্থা নেই। তাঁরা সকলেই বুঝেছেন যে পাকিস্তান তাঁর দেশ বিভাগের দ্বি-জাতিতত্ত্বের নীতিতেই এখনও আস্থাবান এবং সেই নীতিরই রূপায়ণ ক'রে চলেছেন এবং চলবেন। সেখানে ভারতের 'বুকের এক পাউণ্ড মাংস' ছাড়া কোনও চুক্তিরই স্থান নেই। তাই আজও পাকিস্তানের অ-মুসলমানরা ভারতে চলে আসছেন। চলে আসতে বাধ্য হবেন, কেউ থাকতে পারবেন না। কেন পারবেন না, সে কথা আমি একটু পরেই বলবো।

কৃষ্ণনগরে নদীর ধারে সৈন্যসমাবেশ দেখে আমি সেইদিনই রাত ৮টায় বহরমপুরে পৌঁছাই। বহরমপুরে কয়েকদিন থেকে সেখানকার রাজনীতিক নেতাদের মুখেও শুনি,—আগাগোড়া সীমান্ত (মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্ববঙ্গের সাথে একটি সীমান্ত জেলা) দিয়ে সৈন্য-সমাবেশ সব হয়ে গিয়েছে; জওয়ানরা সব প্রস্তুত হয়ে বসে আছে এখন কেবলমাত্র দিল্লীর হুকুমের প্রতীক্ষা! কিন্তু হুকুম আর এল না। ৮ই এপ্রিল দিল্লীতে 'নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি' হল।

সম্ভবত ১২ই এপ্রিল আমি আবার রাজসাহী যাওয়ার উদ্দেশ্যে বহরমপুর থেকে রওনা হই। ঈশ্বরদি স্টেশনে গিয়ে রাজসাহীর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি। রাজসাহীরই এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা। তিনি

সেইদিনই সন্ধ্যায় রাজসাহী ছেড়েছেন, কলকাতায় যাওয়ার জন্য। তিনি বলেন,—"রাজসাহীতে আপনি এখন যাবেন না। গেলেই আপনাকে 'এরেস্ট' করবে। সেখানে জোর গুজব, আপনার বিরুদ্ধে 'ওয়ারেন্ট' হয়েছে। আপনার জীবনও বিপন্ন হতে পারে।" তাঁর কথার উত্তরে আমি শুধু বলি,—"সেই জন্যই তো আমি চলেছি।।" যথাকালেই আমি রাজসাহীতে পৌছাই কিন্তু আমাকে 'এরেস্ট' করার জন্য তখনও কেউ-ই আসেন না ; পরেও কেউ-ই আসেন নি। মজিদ সাহেবই তখনও রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনিও আমাকে বন্দী করার জন্য তাঁর অন্তরে যথেষ্ট উৎসাহ পোষণ করলেও সেইদিকে অগ্রসর হ'তে পারেন নি। এই না-পারার মধ্যে সদ্য-সম্পাদিত নেহরু-লিয়াকৎ-চুক্তির অবশ্যই কিছু অবদান ছিল, তা' ছাড়া পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিসভারও যে কিছুটা হাত ছিল, তা' পুলিশ বিভাগের পদস্থ একজন কর্মচারীর কাছ থেকেই পরে শুনেছিলেম। ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেবের সেই ঐতিহাসিক পত্রই নাকি তার মূলে ছিল।

রাজসাহীতে পৌছে আবার কাজে মন দিই। সকালের দিকে বেলা ১২—১টা পর্যন্ত আমার আফিসে বসে কাজকর্ম করি এবং লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করি। বিকেলের দিকে ৫টা নাগাদ আবার শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রের, ওরফে বাগুর বাড়িতে আগের মতই যেতে আরম্ভ করি এবং রাত ১০টা পর্যন্ত সেখানে থেকে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথাবার্তা বলি। কয়েকদিন পর্যন্ত দেখি যে ১০টার সময় আমি যখন ওখান থেকে রওনা হই, তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের আমার দুই সহযোদ্ধা—চেরু ও বীরেন—কথা বলতে বলতে আমার বাড়ি পর্যন্ত চলে। প্রথম দিকে তাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারি নি কিন্তু প্রতিদিনই একই অবস্থা দেখে আমার সন্দেহ হয় যে তারা বোধ হয় আমার নিরাপত্তার জন্যই গল্প করার ছলে আমার বাড়ি পর্যন্ত পাহারা দিয়ে চলে। আমি তাদের আর পাহারা দেওয়ার জন্য না-আসতে বলি। ঘটনাটা খুবই সামান্য, তবু এখানে উল্লেখ করছি এই জন্যই যে দাঙ্গাকালে আমার বিরুদ্ধে রাজসাহী জেলায় যে কিরূপ ভীষণভাবে পাকিস্তানের শত্রু বলে প্রচার করা হয়েছিল, যার ফলে আমার বন্ধুরাও ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল আমার জীবন সম্পর্কে—সেইটাই দেখানোর উদ্দেশ্য।

তাই, আমি আমার নিজের স্বার্থেই হিন্দুদের এতদিন এ অঞ্চলে আগলিয়ে রেখেছিলেম। এবারের (১৯৫০ সালের) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন যখন সারা দেশ জুড়ে 'দাউ দাউ' করে জ্বলছে, তখন আমিই আমার মুসলমান লোকজন দিয়েই ওদের রক্ষা করেছি—ওদের উপরে কোনও অত্যাচার হতে দিই নি। ওরাও চারদিকের অবস্থার কথা শুনে ভয় পেলেও এখানে নিরুদ্বেগেই ছিল। এই ইউনিয়নে ২,১০০ ঘর লোকের বাস; তার মধ্যে ১,৫০০ ঘরই হিন্দু। সবই হয় রাজবংশী, না হয় মাহাতো শ্রেণীর হিন্দু। তারা নিরুদ্বেগেই ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলো না। পনের শো ঘর হিন্দুর মধ্যে চৌদ্দ শো ঘরই দেশত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছে। কে যে কোথায় ছিটকে পড়েছে, তার ঠিক-ঠিকানাও নেই। কেউ কারোই খবর জানে না। আমার জমিগুলোও পতিত পড়ে আছে এবং ঐ কিষাণরা ফিরে না এলে পতিতই পড়ে থাকবে।" তিনি আরো বলেন,—"দাঙ্গার সময় এই সব হিন্দুরা দেশত্যাগ করে নি। দাঙ্গার পরে, কার্শি পাড়ার বড় জোতদার জনাব মহম্মদ মুজাফফর রহমান চৌধুরী সাহেব তাঁর নিজস্ব হাতীর উপর তিনি নিজে ও ধামুরহাট থানার বড় দারোগা সরকারী পোষাক পরে, চড়ে ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে বাড়িতে গো-মাংস উপহার (!) স্বরূপ দিয়ে তাদের খেতে বলেন এবং জানান যে পাকিস্তানে থাকতে হলে তাদের ঐ মাংসও খেতে হবে এবং তাদের ধর্মও বদল করে ইসলাম—'কবুল' করতে হবে! দাঙ্গাও যে সব হিন্দুদের দেশত্যাগ করাতে পারে নি, পোষাক-পরা সরকারী কর্মচারী দারোগার ও চৌধুরী সাহেবের নির্দেশই তা সমাধা করলো! আপনাকে আমার কথার উপরই বিশ্বাস করতে বলছি না। আপনারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে হিন্দু-মুসলমান সকলের সাথে দেখা করেই আমার কথা যাচাই করে দেখুন। আমার কথা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এই দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন। সেই জন্যই আপনাকে আসতে এবং স্বচক্ষে সব দেখে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানানোর জন্য আমিই আমার বড় ছেলে 'এরসাদ'কে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেম। আপনি এসেছেন, সেজন্য আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।"

সব কথা শোনার পর আমরা সাত দিন মীর সাহেবের বাড়িতে থেকে ঐ অঞ্চলের অন্তত ২৫।৩০টি গ্রাম ঘুরেছি এবং হিন্দু-মুসলমান বহু লোকের সাথেই

দেখা করে তদন্ত করেছি। তদন্তে বৃদ্ধ মীর সাহেবের কথার সমর্থন সর্বত্রই পেয়েছি। এখানে একটি কথা জানাতে চাই যে, যে কাশিপাড়ার মঃ মুজাফফর চৌধুরী সাহেব ছিলেন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের একজন 'পাণ্ডা' ব্যক্তি এবং পূর্ববঙ্গ বিধানসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য। তাঁরই হল এই (অপ)-কীর্তি এবং তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন, থানার বড় দারোগা, যাঁর উপর লোকের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত! তদন্তে আমরা আরও জেনেছিলাম যে পলাতক হিন্দুদের বাড়ি-ঘরও 'লুঠ' করা হয়েছিল এবং ঘরের মেঝে খুঁড়ে বাড়ি বাড়ি থেকে লক্ষ টাকারও বেশি লুঠেরারা নিয়ে গিয়েছিল। রাজবংশী ও মাহাতোরা নোটের বদলে কাঁচা টাকা (ধাতুর) সংগ্রহ করে মেঝের পুঁতে রাখতো।

তদন্ত শেষ করে রাজসাহীতে ফিরি। আমি যে রীতির ও পদ্ধতির অনুসরণ করে এতদিন চলেছিলেম, সেই রীতি ও পদ্ধতি অনুসারেই আমার 'সফরের' রিপোর্ট তৈরি করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশসাহেব, বিভাগীয় কমিশনার সাহেব, পূর্ববঙ্গের মুখ্য সচিব ও মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখের কাছে পাঠাই। ফল যে তাতে বিশেষ কিছু হয়েছিল, তা' বুঝতে পারি নি। 'এসেম্বলির' পরবর্তী অধিবেশনের সময় আমার বক্তৃতায় ঐ ঘটনাগুলো তুলে ধরেছিলেম। আমার বক্তৃতার সময় ডাঃ এ এস মালেক সাহেব মহাশয় অতিথির আসনে বসে আমার ভাষণ শুনে আমাকে ডেকে নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রীর 'চেম্বারে'। ডাঃ মালেক তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলস্বরূপ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি আমাকে বলেন,—"ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করার জন্য আমার একটা কর্মসূচী (tour programme) করে দিন। ঐ সফরসূচীতে একটা রাত এনায়েতপুর গ্রামে শ্রীআশু খানের বাড়িতে কাটানোর ব্যবস্থা করে দেবেন। আশু আমার সহপাঠী বন্ধু। তাঁর বাড়িতে একটা রাত কাটাতে চাই। আপনি যদি আমার সাথে সফরে না যেতে পারেন, তাহলে আপনার একজন লোককে যাঁর ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁকে আমার সাথে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমি মালেক সাহেবের সফরসূচী ক'রে দিই এবং আমার বন্ধু শ্রীনীরেন দত্ত মহাশয়কে (যিনি আমার সাথে ভাতকুণ্ড গিয়ে সাত দিন থেকে আমার তদন্তের সাথী ছিলেন) আজ'ই টেলিগ্রাম ক'রে ডাঃ মালেকের সফর-সাথী হ'তে অনুরোধ জানাই। ডাঃ মালেক ও নীরেনবাবু এক সাথে ঘুরে সব ঘটনারই বিবরণ

নেন। পথিমধ্যে একদিন তাঁরা শ্রীআশু খানের বাড়িতে থাকেন। সেই আশু খান মহাশয়ও কিন্তু এখন সপরিবারে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়ে পশ্চিম দিনাজপুরে এসেছেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ মালেকের বন্ধুত্বও তাঁকে—ধন প্রাণ ও মান সম্পর্কে নিরাপত্তা দিতে পারে নি!

ডাঃ মালেক সাহেব ঐ 'সফর' শেষে রাজসাহী শহরে ফিরে ভুবনমোহন পার্কে একটি জনসভায় যখন বক্তৃতা করতে উদ্যত হন, তখন রাজসাহীর মুসলিম লীগ নেতা জনাব কছিরুদ্দিন মৃধা সাহেব ডাঃ মালেক সাহেবের আগেই বক্তৃতায় বলেন, "নেহরু-লিয়াকত চুক্তি হচ্ছে একটা চোথা কাগজ মাত্র! তার কোনই মূল্য নেই। সেই চোথা কাগজের বলেই মালেক সাহেব সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী হ'য়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন"......ইত্যাদি ইত্যাদি। মৃধা সাহেবের ঐ বক্তৃতায় বাধা দিয়ে ডাঃ মালেক তাঁকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দিয়ে যে বক্তৃতা তিনি নিজে দেন, তার কথা আগেই বলেছি; সুতরাং এখানে আর তার পুনরুল্লেখ করতে চাই না।

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরে আমার জেলায় ফিরে এসে আমার দেখা অভিজ্ঞতায় এইটিই প্রথম ঘটনা। এইবার দ্বিতীয় ঘটনাটির কথা বলি। প্রথমটি ঘটে নওগাঁ মহকুমায়। দ্বিতীয়টির স্থান হল, নবাবগঞ্জ মহকুমা। দেশ বিভাগের, তথা বাংলা বিভাগের পরে মালদহ জেলার ছয়টি থানা পাকিস্তানে পড়ে এবং সেই থানাগুলো রাজসাহী জেলার সাথে যুক্ত হয়। ঐ ছয়টি থানা নিয়ে রাজসাহী জেলায় নতুন একটি মহকুমা গঠিত হয়। সেই মহকুমার নাম—নবাবগঞ্জ। এখন যে ঘটনাটির কথা বলছি, সেটি নবাবগঞ্জ মহকুমার একটি সীমান্ত গ্রামের। রাজসাহী-মালদহ রেল লাইনের পাকিস্তানের শেষ রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে, রোহনপুর। তার পরেই পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার স্টেশন, সিংহাবাদ। এই দুই স্টেশনের মধ্য দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। আমি যে গ্রামটির কথা বলতে যাচ্ছি, তা' হল ঐ নদীরই ধারে এবং রোহনপুর স্টেশন থেকে—দুই মাইলের মধ্যেই। গ্রামটির ও ঘটনার নায়কের নাম এখন আমার মনে নেই। এই ঘটনা সম্পর্কিত সব দলিলপত্রই রাজসাহীতে আমার কাছে ছিল; আজ, এখানে আমার হাতে সে সব কিছুই নেই। তাই নামগুলো দিতে পারলেম না কিন্তু ঘটনাটির সম্পর্কে আমার সব কথাই সঠিক মনে আছে। আমি যা বলছি, তার মধ্যে এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নেই। এখন ঘটনাটির কথা বলি:

ঐ গ্রামের কয়েকটি লোক এসে একদিন আমাকে বলেন,—"তাঁরা তো আর গ্রামে বাস করতে পারছেন না। একটি মুসলমান ভদ্রলোকের অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে বহু হিন্দুই দেশ ছেড়ে যে যেদিকে পেয়েছেন চলে গিয়েছেন। তাঁরাও আর থাকতে পারছেন না। ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটি হচ্ছেন একজন হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিক গ্রাম্য ডাক্তার এবং মুসলিম লীগের একজন—মহাশক্তিশালী নেতা। তিনি ব'লে বেড়ান যে তিনি হচ্ছেন ঐ ছয়টি থানার ভারপ্রাপ্ত 'লাটসাহেব'। সেখানে তিনি যা' করবেন তা-ই হবে। তাতে বাধা দেওয়ার কারো অধিকার নেই। কেউ তাঁর কাজে বাধা দিতেও পারছেন না। এমন কি পুলিশও না। থানার দারোগা পুলিশরাও তাঁকে অত্যন্ত ভয় করেই চলেন। এই অবস্থায় আপনি যদি আমাদের রক্ষা না করেন, তাহলে আমাদের দেশত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। দয়া ক'রে আপনি একবার নিজে গিয়ে আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসুন।" তঁদের সব কথা শুনি। ঘটনার বিবরণ তদন্ত করার ও স্ব-নির্বাচিত সেই 'লাটসাহেবকে'-কে একবার দেখার আগ্রহ আমার মনেও জেগে ওঠে। আমি সেখানের উদ্দেশ্যে একদিন রওনা হই। আমার সাথে নিই অতীতের স্বাধীনতা-সংগ্রামী আমার সহকর্মী ও বন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ খাঁকে। আজ সে আর নেই—রাজসাহী শহরে এসেই কিছুকাল আগে হঠাৎ পরলোকগমন করেছে। তার ছিল অত্যন্ত উদার ও মহৎ প্রাণ। বহু ব্যাপারেই তার আমি অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছি। সে ছিল নাটোর মহকুমার খাজুরা গ্রামের এক জমিদার বংশের সন্তান। তার জীবন গড়ে উঠেছিল এক গৌরবময় স্বাধিনতা-সংগ্রামের পরিবেশে। তার বাবা ছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের রাজসাহী জেলার এক শ্রেষ্ঠ নায়ক। জমিদারের ছেলে ও ব্রাহ্মণকুলের শিরোমণি—কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ই স্বাধীনতা না হওয়া পর্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ব্রত নেন এবং নিজেই বলদ-চালিত লাঙলের 'মুঠা' ধ'রে জমি চাষ করেন। সে যুগে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে একটা ধর্মবিশ্বাস ছিল যে তাঁদের গরুচালিত 'হালের মুঠা' ধরতে নেই। শচীনের বাবা স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ খাঁ মহাশয় নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও 'হালের মুঠা' ধরে হিন্দুদের কু-সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এইরূপ বাবারই ছেলে ছিল শচীন। সে ছিল একজন নির্ভীক স্বাধীনতা-যোদ্ধা এবং চরম ক্লেশ-সহিষ্ণু।

তাকে নিয়েই আমি ঐ গ্রামে যাই। গ্রামটিতে দেখি, অনেক ঘর-বাড়ি তখনও খালিই পড়ে আছে। হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমি ঐ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদের ডাকিয়ে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা ক'রে দেখি, আমার কাছে যে অভিযোগ এসেছিল—তার প্রত্যেকটি কথা সত্য। এই ভদ্রলোক যে শুধু হিন্দুদের উপরই অত্যাচার করেছেন তা নয়। যে সব মুসলমান তাঁর দলে যোগ দেন নি বা তাঁর মত সমর্থন করেন নি বা হিন্দুদের তাড়ানোর ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা করেছেন, তাঁদেরও তিনি শাস্তি দিয়েছেন এবং সে শাস্তি, আর্থিক এবং কায়িকও। কায়িক শাস্তি যা দিয়েছেন, তার নির্মমতার একটা চূড়ান্ত রূপ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। থানার পুলিশরাও তার কোন প্রতিকার করতে পারেন নি। কয়েকবার তাঁরা অবশ্য ভদ্রলোককে বিভিন্ন ধারায় 'গ্রেপ্তার'ও করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকবারই তিনি উচ্চ রাজনীতিক মহলের হস্তক্ষেপে সগৌরবে মুক্তি পেয়েছেন এবং তার পরেই তাঁর অত্যাচারের মাত্রাও আরও বেড়ে গিয়েছে। ঐ ডাক্তার সাহেব হয়তো আমাকে সকলের সামনে তাচ্ছিল্য করার মনোভাব নিয়েই আমার সাথেও দেখা করেন এবং সব ঘটনাই স্বীকার করে বলেন যে ঐ অঞ্চলের সমস্ত দায়িত্বভারই মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা তাঁর উপরেই দিয়েছেন। তাঁর ক্ষমতা যে কতদূর সেটা আমাকে বোঝানর জন্যই হয়তো তিনি এও আমাকে বললেন যে পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল গুলাম মহম্মদ সাহেব ঢাকায় এলে তিনিই তাঁকে বলেছিলেন যে নাজিমুদ্দিন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করতে এবং গুলাম মহম্মদ সাহেব তা-ই করলেনও! তিনি ঐরূপ অনেক বড় বড় কথা বলে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছ থেকেই তাদের কাজ করে দেবেন ব'লে বহু টাকাও চাঁদা হিসাবে তুলেছেন। এই সব ঘটনার কথা পুলিশও সবই জানেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁরাও অত্যন্ত অসহায়—কিছু করতে পারেন না।

আমি নিজে সবই দেখলেম ও শুনলেম। সেখান থেকে ফিরেই আমার সফরের রিপোর্ট তৈরী ক'রে যথারীতিই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সাহেব প্রমুখকে পাঠাই। তখন সম্ভবত রাজসাহীতে পুলিশ সাহেব ছিলেন খন্দকার এন, হোসেন সাহেব। আমার রিপোর্ট পেয়েই তিনি তাঁর পুলিশ বিভাগের দ্বারা তদন্ত করিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি ক'রে আমার কাছেও

পাঠিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টে পুলিশসাহেবের সইও ছিল। তিনি তাঁর রিপোর্টে আমার রিপোর্টের সব কথাই স্বীকার ক'রে নিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা ঐ ব্যক্তিকে পাঁচ-ছয় বার ধরে জেলেও পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে জেলে রাখা যায় নি! ঐ ব্যক্তি যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার ক'রে বহু হিন্দুকেই দেশ থেকে তাড়িয়েছেন, তা-ও পুলিশ সাহেবের রিপোর্টে ছিল।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সামরিক শাসন-কালের একটি ঘটনার অল্প কিছুটা আপাতত এখানে তুলে ধরছি, ঐ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ—যথাকালে দেব। জনাব আয়ুব খান সাহেব ক্ষমতা দখল ক'রে সামরিক শাসন প্রবর্তন ক'রে পাকিস্তানের উভয় অংশেরই প্রথম শ্রেণীর বহু রাজনীতিক নেতার বিরুদ্ধে তাঁরই (আয়ুবের) প্রবর্তিত "এব্‌ডো" (EBDO) আইনে মামলা করেন। ঐ মামলার আওতার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহু মুসলমান নেতা তো ছিলেনই, পূর্ব পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক প্রথম সারির হিন্দু-নেতাও ছিলেন। আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল যে আমি হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করতে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করেছি! সেই অভিযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলি যে আমি বা আমাদের দলের কোন নেতাই হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত মোটেই করেন নি—সরকারী-নীতিই হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। প্রমাণস্বরূপ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি সাহেবের কাছে আমার দেওয়া বিবরণী ও রাজসাহীর পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট খন্দকার সাহেবের উল্লিখিত রিপোর্টটি—আক্রাম-ট্রাইবুনালের বিচারমণ্ডলীর কাছে তুলে ধরি কিন্তু তাঁরা কোনও যুক্তিই শোনেন না। তাঁরা তো বিচার করতে বসেন না—তাঁর, আয়ুব খান সাহেবের নির্দেশে বিচারের একটা প্রহসন ক'রে তাঁর জয়যাত্রার পথ পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন! সময়-বিশেষজ্ঞ কৌশলী রাজনীতিক খেলোয়াড় আয়ুব খান সাহেব চেয়েছিলেন ফাঁকা মাঠে গোল দিতে। তাই প্রথম শ্রেণীর সব রাজনীতিক নেতাকেই 'এব্‌ডো' আইনে ছয় বছরের জন্য রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করানোর তাঁর দরকার পড়েছিল। আক্রাম সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত 'ট্রাইবুন্যাল' সেই কাজই সু-সম্পাদিত (!) করেছিলেন।

এখন সাধারণত-ই প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, যেখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

আগে যে দেশ-বিভাগ করতে রাজী হ'য়েই পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আনলেন, সেখানে আবার পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিতাড়নই বা কেন, এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই বা কেন ? সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে মুসলিম লীগ অনুসৃত নীতির মধ্যে, যে নীতির কথা আমি আগেই বলেছি। মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিতেই দেশ ভাগ করেছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোক-বিনিময়েরও প্রস্তাব ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের কাছে করেছিলেন কিন্তু 'কংগ্রেস' তাতে রাজী না-হওয়ায় সেটা হতে পারেনি কিন্তু মুসলিম লীগ তার নীতি থেকে সরে যায় নি। যা' আপোষে হয় নি, তা-ই করতে চেয়েছেন এবং করেছেন নানা রকমের কৌশলের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানে চোদ্দ বছর থেকে আমি যা দেখেছি ও জেনেছি এবং তাতে যা' বুঝেছি, তা-ই আমি এযাবৎ তুলে ধরেছি এবং আরও অনেক কিছুই বলার ইচ্ছা আছে।

আমার ব্যক্তিগত মতামত ছাড়াও বাংলা দেশের আর একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতার, যাঁর পাকিস্তান সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁর মতও এখানে তুলে ধরছি। এই বিপ্লবী নেতা ও আমার বন্ধুটি আর কেউ নন তিনি হলেন ভূতপূর্ব বিপ্লবী সংস্থা যুগান্তর দলের একজন প্রবীণ নেতা শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়। তিনি পাকিস্তান-পার্লামেন্টের ও পরবর্তীকালে, পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভারও সদস্য ছিলেন; সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত মতও বিশেষ গুরুত্বেরই দাবি রাখে। ভারত সরকার পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তত্যাগের কারণ নির্ধারণের জন্য যে বিচার বিভাগীয় "কাপুর-কমিশন" গড়েছিলেন, সেই কমিশনের কাছে ভূপেন্দ্রবাবু যে বিবৃতি দেন, সেই বিবৃতি থেকে পাকিস্তানের নীতি সম্পর্কিত অংশের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি। সেই নীতিটুকুর কথাটা ভালভাবে মনে রাখলেই পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘটিত সব ঘটনারই সব প্রশ্নেরই—মীমাংসার সূত্রও তার মধ্যেই পাওয়া যাবে। 'কাপুর-কমিশনের' কাছে ভূপেনবাবু বলেছিলেন :

"...I could not do better than referring here to some inking of the Official policy, pursued in East Bengal since partition. About 1951, I became exceptionally intimate with one of the Central Ministers. He thoroughly disapproved of the policies pursued but was helpless. I cannot divulge

his identity. I am quoting him almost word for word to say that the first (or only) Secretary General of Pakistan, supported by the—then Prime Minister was responsible for formulating the two policies :

(1) Sooner or later, East Pakistan is going to walkout of Pakistan. It is therefore useless straining to develop East Pakistan beyond a nominal routine measure. It would be wiser to develop that West, where necessary and possible without arousing suspicion, at the cost of the East.

(2) the minorities particularly those of the middle classes can never prove friendly to Pakistan. Every means should, therefore, be sought to get rid of them. But, for obvious reasons, the process must be gradual and circumspect. The political leaders have mostly left. Others will find little support if their immediate followers coming from the middle classes are squeezed out of employment-prospects. This should be effectuated in the name of the poorer Muslim Community. The process must be slow. But if there are upheavels in any area on the part of the masses, the forces must not be allowed to get out of control. But no serious notice need be taken of the subsequent hue and cry, nor of complaints by the minorities or their representatives…"

ভূপেন্দ্রবাবু তাঁর বিবৃতিতে যা বলেছেন তা'র মর্মার্থ দিচ্ছি :—তিনি বলেছেন, ১৯৫১ সালে তিনি, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রীর ('তাঁ'র নাম প্রকাশ করা স্বাভাবিক কারণেই তিনি সঙ্গত মনে করেন নি) বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। সেই বন্ধুটি তাঁকে যা' বলেছিলেন, তা-ই তিনি এখানে হুবুহু তুলে ধরছেন। সেই মন্ত্রী বন্ধুটি বলেছিলেন যে, পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে দুটি নীতি নির্ধারণ করেন। সেই নীতি দুটি হচ্ছে—

(১) দু'দিন আগে হোক, বা পরে হোক, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বের হয়ে যাবেই; সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু খরচ না করে, শুধু যতটুকু না-করলেই নয়, ততটুকুই কেবল করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য খরচা কম করে তাই দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তা'তে যেন সেদিকে সন্দেহের উদ্রেক না হয়।

(২) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কখনই পাকিস্তানের বন্ধু (বা অনুরক্ত নাগরিক) হবে না; সুতরাং তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সর্ব প্রযত্নেই চালিয়ে যেতে হবে। তবে, বিশেষ কারণেই এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে যে, ঐ সরিয়ে দেওয়ার কাজটা যেন ধীরে ধীরে হয়। হঠাৎ ব্যাপকাকারে দেখা না দেয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারাই দেশত্যাগ করে গিয়েছেন। আজও যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থকদের যদি চাকরি-বাকরি থেকে ক্রমশ সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই সব নেতারাও সমর্থকহারা হীনবল হয়ে পড়বেন। দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের দোহাই দিয়ে এই কাজ ধীরে ধীরে চালিয়ে যেতে হবে। যদি হঠাৎ কোন অঞ্চলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জনতা উত্তেজিত হয়ে ব্যাপকভাবে কিছু করতে আরম্ভ করে, তাহলে লক্ষ রাখতে হবে যে সেই জনতা যেন শাসনের বাইরে একদম চলে না যেতে পারে। ঘটনা হয়ে যাওয়ার পরে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা তাঁদের নেতারা যতই চীৎকার করুন না কেন, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার দরকার নেই।...

এটাই হল পাকিস্তানের নীতি। যাঁরা এখনও পাকিস্তানে আছেন বা ছিলেন, তাঁরা এই নীতির প্রয়োগ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন ও করেছেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যই এই যে দেশ-বিভাগের, তথা স্বাধীনতার সাথে সাথেই তদানীন্তন কালের প্রধানমন্ত্রী ও সেক্রেটারী জেনারেল মিলে যে নীতির ছক কেটে রেখেছেন এবং যা' কায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌রও আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিল, সেই নীতিরই প্রয়োগ করে চলেছেন সব গভর্নমেণ্টই। ছকের বাইরে কোনও মুসলিম লীগ সরকারই —লিয়াকত আলি সাহেবের মুসলিম লীগ থেকে আরম্ভ ক'রে আজকের আয়ুব সাহেবের মুসলিম লীগ সরকার পর্যন্ত—কেউই যান নি। সেদিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে গেলে ভারত সরকারের নীতিকেই বন্ধ্যা বা দেউলিয়া

নীতি বলতে হয়। তাই শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ভারত সরকারের মন্ত্রীদের সম্পর্কে গভীর খেদেই বলেছিলেন যে—"Prisoners of in decision" বা সিদ্ধান্ত-সঙ্কটের অক্ষম বন্দী! ভারতে জওহরলাল নেহরুজী ও পাকিস্তানে লিয়াকত আলি খান সাহেব নিজেদের ব্যক্তিত্বের দাপটে প্রধানমন্ত্রিত্ব করে গিয়েছেন—সেখানে আমলারা মাথা তুলতে পারেন নি। তারপর থেকে দুই দেশেই দেখছি, পুরোপুরি আমলাতন্ত্র চলছে—মন্ত্রীরা নিজেরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন বলে মনে হয় না। পূর্ব পাকিস্তানে তো তা-ই দেখেছি। সেটা দেখেই আমাদের বন্ধু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন যে, "I Pity Nurul Amin. He is nothing but a prisoner of the Centre." (নুরুল আমিন সাহেবের জন্য আমার দুঃখ হয়। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বন্দী ছাড়া আর কিছুই নন!) আমি নিজেও তাই মনে করি। ১৯৫০ সালের ব্যাপক দাঙ্গা, হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ ও লুণ্ঠনের পেছনে যে পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীদের কোনও হাত ছিল তা' আমার মনে হয় না। ১৯৫০ সালের দাঙ্গা হঠাৎ একদিনে হয় নি। দেশ বিভাগের পর থেকেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অতি ধীরে ধীরে ১৯৫০ সালের ব্যাপক দাঙ্গার পটভূমি তৈরী করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি, নানা রকমের ছোট-খাট অত্যাচার-উৎপীড়ন-জবরদখল-নারীহরণ প্রভৃতির মাধ্যমে হিন্দুদের মনোবল একেবারে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ছিলেন, তাঁদেরও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আবু হোসেন সরকারের হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে ও মৌলানা আহ্‌মেদ আলি সাহেবকে খুনী আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে দিয়ে। এই সব ঘটনাগুলো নিয়ে নিরপেক্ষ মনে বিচার করে দেখলে শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভূপেন্দ্রবাবু যে নীতি দুটির কথা বলেছেন, তারই যথার্থ বর্ণে বর্ণে প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও সেক্রেটারী-জেনারেল সাহেব মিলে রাষ্ট্রপরিচালনার যে নীতির ছক কেটে রেখেছিলেন, তারই সার্থক রূপায়ণ করেছেন পূর্ববঙ্গে, তথা পূর্ব পাকিস্তানে, মুখ্যসচিব জনাব আজিজ আহ্‌মেদ সাহেব। মন্ত্রীদের মন্ত্রিত্বের ঠাট বজায় রাখতে আজিজ আহ্‌মেদ সাহেবকে বিশেষ সমীহ করেই চলতে হোত। জনাব হামিদুল হক্ সাহেবের 'প্রোডা' (PRODA) মামলার সময়েই আজিজ আহ্‌মেদ সাহেব তাঁর সাক্ষ্যতেই সে কথা বলেছেন। আগেই তা' বলেছি।

মন্ত্রীদের যে ১৯৫০ সালের ব্যাপক দাঙ্গায় পেছনে হাত ছিল না, তা মনে করার আমার যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রথমত দাঙ্গার প্রথম দিনেই যে আমাদের ঢাকার বাসাও আক্রান্ত হবে, এ-কথা শহরে বেশ রটে গিয়েছিল। মন্ত্রীরাও সম্ভবত শুনেছিলেন। তাই, আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যই মনে হয় তিনজন মন্ত্রী সশস্ত্র সিপাহী-সান্ত্রী নিয়ে সন্ধ্যার পরেই আমাদের বাসায় এসে রাত ১২টা পর্যন্ত কাটিয়ে যান। মনে হয়, এটা সমগ্র মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমেই হয়েছিল। সেই তিনজন মন্ত্রী আমাদের বিপন্ন হিন্দুদের উদ্ধার করার জন্য আমাদেরই প্রস্তাবমত পুলিশ সহ একখানি 'জীপ' গাড়ি দিতে চেয়েও যে দেন নি, সেটাও মনে হয় দিতে পারেন নি বলেই দেন নি। মুখ্য সচিব আজিজ আহ্‌মেদ সাহেবই প্রতিবন্ধক হয়েছেন। পরের ঘটনাতে প্রমাণ হয় যে সংখ্যালঘু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ মালেক সাহেব ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস-ডি-ও সহ আমাদের বন্ধু গণেন্দ্র ভট্টাচার্যের সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলোর ও স্থানীয় হিন্দুদের গৃহহীন অবস্থা দেখে নিজেই সরকার থেকে সাহায্য দেওয়ার আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট ও এস-ডি-ও সাহেবকে দেওয়া সত্বেও যে কোনরূপ সাহায্য ঐ দুস্থ লোকদের দেওয়া হয় নি, তারও মূলে হচ্ছে পাকিস্তানের সেই ছক্ কাটা নীতি ও তার রূপকার আজিজ আহ্‌মেদ সাহেব। মাত্র দুই-একটি ঘটনা নয়; আমি অনেক ঘটনাই জানি, যার ফলে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে মন্ত্রীদের কিন্তু ঘটনার কলকাঠি ঘুরিয়েছেন মুখ্য সচিব আজিজ আহ্‌মেদ সাহেব। সেসব ঘটনার কিছু কিছু পরে ক্রমশ বলব।

দেশ বিভাগের দিন থেকে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সামাজিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়, পাকিস্তানের সূঁচ-ফোটান নীতির প্রতিদিনের কাজের মধ্য দিয়ে তারই চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫০ সালের দাঙ্গায়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষ মরলোও অনেক। যারা বেঁচে থাকল, তাদেরও অনেকেই প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল পালালো। বহু ঘটনায় দেখেছি স্বামী পত্নীর কাছ থেকে, ছেলেমেয়ে বাপ-মা'র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের সকলেরই যে আজও পুনর্মিলন হয়েছে, তা বলা যায় না। নিজের বাড়িঘর পেছনে ফেলে এসে দেশান্তরী হয়ে কতজন যে সমাজ বিরোধীর ভূমিকা বা সমাজে পতিতের অথবা পতিতার বৃত্তি নিয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, তারও ঠিক-

ঠিকানা নেই। যিনি একদিন সমাজে ছিলেন নিজ দেশে মান্য-গণ্য-শ্রেষ্ঠ ও সৎব্যক্তি আজ হয়তো তিনিই হয়েছেন চরিত্রহীন সমাজ-বিরোধীর দালাল! পূর্ববঙ্গ, তথা পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই সামাজিক বিপর্যয়ের জন্ম দায়ী কে? আমি মনে করি, তার জন্ম দায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনার সেই ছক্ কাটা নীতি, যা' ভূপেনবাবু তাঁর বিবৃতিতে তুলে ধরেছেন এবং পূর্ববঙ্গে সেই নীতির রূপকার মুখ্য সচিব আজিজ আহ্মেদ সাহেব। মন্ত্রিত্বের মোহের পাশে বন্দী মন্ত্রীদের আমি তার জন্ম সম্পূর্ণভাবে দায়ী করি না—ভেতরের ঘটনার কিছু কিছু জানি বলেই তাঁদের পুরোপুরি দায়ী করতে পারি না। পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই একদিন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সাহেবকে অত্যন্ত ঘৃণিত লোক বলেই মনে করতেন, আজ যখন তিনি মন্ত্রিত্বের বা পদগৌরবের সেই মোহ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, তখন তাঁর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে একজন বাঙালীর ও দেশসেবকের। আমি জানি, আয়ুব খাঁ সাহেব বর্তমান গভর্নর মোমেন খাঁ সাহেবেরও আগে নুরুল আমিন সাহেবকেই গভর্নরের পদ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা' গ্রহণ করেন নি। গ্রহণ করলে তাঁকেও হয়তো মোমেন খাঁ সাহেবের ভূমিকাই অভিনয় করে চলতে হ'ত! পদ-গৌরবের মোহই তাঁদের ব্যক্তিত্বকে স্ব-প্রকাশ করতে বাধা দিয়েছে। সেই অক্ষমতার দোষে তাঁরাও অবশ্যই দুষ্ট এবং দোষের কিছুটা ভাগী। এটাই আমার মত। আবার মুসলিম লীগের কোনও কোনও নেতার মতে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার জন্ম আমিই মুখ্যত এবং কংগ্রেসদল গৌণত যৌথভাবে দায়ী এবং পূর্ববঙ্গ থেকে ক্রমাগত যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস্তত্যাগ করে চলেছেন, তার জন্মও নাকি আমরাই সকলে, অর্থাৎ অতীতের কংগ্রেসীরাই দায়ী! এখন এর মীমাংসা করবেন কে? পরস্পরবিরোধী দুই দলের এই মতের মধ্যে থেকে সত্যকে আবিষ্কার করার শক্তি আছে একমাত্র নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের। যদি কোনদিন কোনও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এই সত্য উদ্ঘাটন করতে অগ্রসর হ'য়ে আসেন, তবেই সত্য প্রকাশ পাবে। আমি কেবল এখানে সেই ভাবীকালের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই লিখে যাচ্ছি। তা-ই রেখে যেতে চাই।

পূর্বেই বলেছি যে, ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়—রাজসাহী জেলার ধামুরহাট থানার কয়েকটি হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের হিন্দুদের কে এবং কিভাবে বাস্তু ও স্থানচ্যুত করতে বাধ্য করেন, তা' আমি ও আমার বন্ধু শ্রীনীরেন দত্ত, বেশ ভালভাবে তদন্ত করে দেখে এসে আমি আমার গৃহীত বরাবরের নীতি অনুসারেই সকর-বিবরণী তৈরী করে যথারীতিই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব প্রভৃতিকে পাঠিয়েছিলেম। এইবার কিছুটা ফল ফলতে দেখা গেল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এমদাদ আলি আমাকে জানালেন যে, তিনি পুলিশ সাহেব—জনাব মহসীন সাহেবকে নিয়ে ধামুরহাট ও পত্নীতলা থানার হিন্দুদের অবস্থা দেখতে যাবেন এবং আমাকেও অনুরোধ করলেন তাঁদের সাথে যেতে। নির্দিষ্ট দিনে জেলার দুই প্রধানের সঙ্গে তাঁদেরই 'জীপ' গাড়িতে আমিও যাই। ৬।৭ দিন ধরে আমরা মহাদেবপুর, পত্নীতলা ও ধামুরহাট থানার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সব অবস্থা দেখি। আমিই উদ্যোগী হয়ে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কী অবস্থা হয়েছে, তা তাঁদের দেখাই। আমি আগে যে বিবরণী তাঁদের দিয়েছিলেম, যার ভিত্তিতেই তাঁরা আমার বিবরণের সত্যাসত্য যাচাই করতে গিয়েছিলেন, সে সবই তাঁদের দেখাই। কোনও কোনও স্থানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাস্তুত্যাগী মুসলমানগণ যে সকল বাড়ি জবর-দখল করেছিলেন, তারও কিছু কিছু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও পুলিশ সাহেব, উভয়ের চেষ্টাতে মুক্ত হয়। আর একটি কাজ হয়—ধামুরহাট থানায়। থানার বড় দারোগাকে, যিনি কার্সিপাড়ার বড় জোতদার মিঃ মুজাফ্ফর রহমান চৌধুরী, 'এম-এল-এ'র (মুসলিম লীগের) সঙ্গে তাঁরই হাতীতে চড়ে গিয়ে হিন্দুদের বাড়িতে বাড়িতে গো-মাংস উপহার (!) দিয়ে তাঁদের খাওয়ার জন্ম নির্দেশ দিয়েছিলেন, ডেকে আমার ও জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেই পুলিশ সাহেব খুব গালাগালি দিলেন এবং জানালেন যে তাঁকে অবিলম্বে জেলার বাইরে বদলি করা হবে। সেই দারোগাটির আর কোনও সাজা হয়েছিল কি না, জানি না; তবে, তিনি রাজসাহী জেলা থেকে বদলি হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু অভিনব পন্থায় হিন্দু-বিতাড়ন-কাজের নাটের গুরু যে মুজাফ্ফর চৌধুরী তাঁর কিছুই হয় নি। আর হবেই বা কেমন করে? তিনি হলেন মুসলিম লীগ দলের 'এম-এল-এ': সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সাহেবের আইনের হাতার ক্ষমতার বাইরে! আর, মুসলিম লীগ রাজনৈতিক সংস্থার কাছে তো তিনি বিনা রক্তপাতে

একেবারে অহিংস পন্থায় (!) মুসলিম লীগ নির্দিষ্ট সেই হিন্দু-বিতাড়নের মহৎ (!) কাজটি সম্পাদন করে একেবারে "পীর" হয়েছেন! সেই 'পীরের' বিরুদ্ধে 'সরকার'ও কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে একেবারে নারাজ। 'সরকার' বলতে পূর্ববঙ্গে তখন একটি মাত্র ব্যক্তিকেই বোঝায়। তিনি হলেন, জবরদস্ত মুখ্যসচিব জনাব আজিজ আহমেদ সাহেব। পাকিস্তান সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি ও তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল জনাব চৌধুরী মহম্মদ আলি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির ও কর্মধারার যে ছক কেটে রেখে যান—পূর্ববঙ্গে জনাব আজি আহমেদ তারই সার্থক রূপকার। মন্ত্রীদের সেখানে নাক-গলানোর কোন ক্ষমতাই ছিল না। তাঁরা ছিলেন, মন্ত্রিত্বের মোহ-পাশে আবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকারের, তথা মুখ্যসচিব আজিজ আহমেদের হাতে অক্ষম বন্দী! যদিও কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংবিধানগত ক্ষমতা ছিল মন্ত্রীদের ও মন্ত্রিসভার কিন্তু কার্যত তাঁদের চলতে হত, আজিজ আহমেদের নির্দেশ মত এবং সেজন্য, জনসাধারণের কাছে যত কিছু দুষ্কার্যের জন্য দায়ী হতে হত মন্ত্রীদেরই! পরবর্তী অনেক ঘটনাই সেই-সত্যই প্রকাশ করে। ক্রমশ তা' দেখাব। যা'ক, আজিজ আহমেদ সাহেবের ইচ্ছাই পূরণ করেছিলেন, জনাব মুস্তাক্ফর চৌধুরী সাহেব; সুতরাং, তাঁর গায়ে হাত দিতে পারে এমন ক্ষমতা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সাহেবের তো ছিলই না, মন্ত্রীদেরও ছিল না। সে কথার প্রমাণ পেয়েছি আমরা; নবাবগঞ্জ মহকুমার সেই স্বনামধন্য (!) অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকের বেলায়, যিনি নিজেকে ছোট্ট থানার (নবাবগঞ্জ মহকুমার) 'লাট-সাহেব' বলে জাহির করতেন এবং পুলিশ যাকে কয়েকবার গ্রেপ্তার করে 'জেলে' পাঠিয়েও যাঁকে 'জেলে' আবদ্ধ রাখতে পারেন নি? পুলিশ সাহেব জনাব খন্দকার সাহেব, তাঁর যে রিপোর্ট আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তা'তে সে কথা তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন। অদৃশ্য হস্তের নির্দেশে তিনি (ডাক্তারসাহেব) বার-বারই মুক্তি পেয়েছেন! সুতরাং, এ ক্ষেত্রেও মুস্তাক্ফর চৌধুরী সাহেবেরও কিছু শাস্তি হবে, তা' মনে করা মূর্খের স্বর্গবাসের পরিকল্পনার মতই একান্ত অর্থহীন। আমিও সে আশা করি নি। দারোগাটির যে শাস্তি হয়েছিল এবং যার ফলে থানায় পুলিশ-মহলে যে কিছুটা সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল তা'তেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তা' ছাড়া আর উপায় কী ছিল? ঐটুকু শাস্তি যে হতে

পেয়েছিল, তা-ও কেবল সদ্য-সম্পাদিত 'দিল্লী-চুক্তি' বা 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তির' ফলে। 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি'র যদি পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে পাকিস্তান সরকার সফল করে তুলতে চেষ্টা করতেন, তাহলে হয়তো সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের যে পঞ্চাশ লক্ষ লোক দেশত্যাগ করে ভারতে এ যাবৎ এসেছেন, তাঁদের অনেকেই যে আসতেন না সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা' হয় নি—হতে পারে নি। পাকিস্তান সরকার এ যাবৎ যত চুক্তিই করেছেন, তার সবই তাঁরা ভঙ্গ করেছেন। দেশ-বিভাগের অব্যবহিতপূর্বে ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি ও গভর্নর জেনারেল, লর্ড মাউন্টবেটনের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রথম একটি পবিত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের ভাবী কংগ্রেস সরকারের এবং পাকিস্তানের ভাবী মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ থেকে যথাক্রমে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সর্দার প্যাটেল এবং মিঃ এম এ জিন্না'হ ও নবাবজাদা লিয়াকত আলি সাহেব ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। নিচে সেই পবিত্র চুক্তিটাই হুবহু তুলে ধরছি :—

"Both the Congress and the Moslem League have undertaken to give fair and equitable treatment to the minorities after the transfer of Power. The two future Governments reaffirm these assurances. It is their intention to safeguard the legitimate interests of all citizens, irrespective of religion, caste or sex. In the exercise of their normal civic rights all citizens will be regarded as equal, and both the Governments will assure to all people within their territories the exercise of liberties such as freedom of speech, the right to form associations, the right to worship in their own way and the protection of their language and culture.

The guarantee of protection which both Governments give to the citizens of the respective countries implies that in no circumstances will violence be tolerated in any form in either territory. The two Governments wish to emphasise that they are united in this determination."

উপরের এই উক্তির ভাবার্থটা হচ্ছে, 'কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ' প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরে উভয়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও সমান মর্যাদাসম্পন্ন (সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে) ব্যবহার করবেন। ভাবীকালের দুটি 'সরকার'ই এই প্রতিশ্রুতি পুনরায় দৃঢ়তার সাথেই দিচ্ছেন। দুটি সরকারেরই আন্তরিক ইচ্ছা যে, সকল নাগরিকেরই ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ, স্ত্রী-পুরুষ এবং ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে রক্ষা করে চলবেন। নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ও নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে উভয় সরকারই তাঁদের নিজ নিজ দেশের সমস্ত নাগরিককেই সমান অধিকার-সম্পন্ন বলে গণ্য করবেন এবং তাঁদের সকলকেই স্বাধীন মতামত প্রকাশের ও নিজ নিজ ধর্মপালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন এবং তাঁদের সকলেরই নিজ নিজ ভাষা ও কৃষ্টি রক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

এই যে জনগণকে রক্ষা করার যে প্রতিশ্রুতি উভয় সরকারই দিচ্ছেন, তার উপরে লক্ষ্য রেখেই বিশেষভাবে তাঁরা ঘোষণা করছেন যে, ভাবীকালের দুটি সরকারই হিংসার পথকে কখনই বরদাস্ত করবেন না এবং এই সিদ্ধান্তে তাঁরা উভয়েই সঙ্কল্পবদ্ধ ও অটল থাকবেন।

উপরের ঐ পবিত্র ঘোষণার পবিত্রতা কিভাবে উভয়দেশের সরকার রক্ষা করেছেন। দেশ বিভাগের আগে বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে আমরা দেখেছি যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী পাটনায় এসে দাঙ্গাকারীদের উপর আকাশ থেকে বোমা ফেলার কথা দৃপ্তভাবে ঘোষণা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালেও ভারতে দেখেছি যে যেখানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীরা হিংসার পথ নিয়েছে, সেখানেই ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকার চরম কড়া ব্যবস্থা নিয়েই পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর লোকদের বেপরোয়াভাবে 'হত্যার জন্যই গুলী করতে' অর্ডার দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে থেকে সেখানে আমি কী দেখেছি? দেখেছি যে, রাজসাহী শহরেই ১৯৪৮ সালের সরস্বতী পূজার শোভাযাত্রা নিয়ে হিন্দুরা শহর প্রদক্ষিণ করে প্রতিমাগুলো পদ্মার ঘাটে বিসর্জন দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে বাধা পেয়ে প্রতিমাগুলো রাস্তার উপরে ফেলে রেখেই প্রাণভয়ে শোভাযাত্রাকারীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন বাধা দিয়েছিলেন কে? তথাকথিত শান্তিরক্ষাকারী অ-বাঙালী বন্দুকধারী পুলিশরাই সেদিন—শোভাযাত্রাকারীদের নিঃশব্দেও সাহেব বাজারের

মসজিদের কাছ দিয়ে যেতে দেন নি, যদিও শোভাযাত্রাকারীদের ঐ পথে যাওয়ার বৈধ 'লাইসেন্স' ছিল। শোভাযাত্রার সাথে যাওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটও সেদিন বন্দুকধারী পুলিশকে বহুভাবে বুঝিয়েও শান্ত করতে পারেন নি। তাঁরা রাস্তা ছেড়ে দেন নি; উপরন্তু, তাঁদের হাতের বন্দুক উঁচিয়ে গুলী করার জন্য শোভাযাত্রাকারীদের দিকে 'তাক্' করেছিলেন, যার ফলে শোভাযাত্রাকারীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি যে, রাজসাহী শহরের সরস্বতী পূজোর শোভাযাত্রা একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। শহরের সবগুলো প্রতিমা, প্রায় দেড়শো থেকে দু'শো, একত্রিত হয়ে এক সাথে শোভাযাত্রা করে চিরকালই শহর প্রদক্ষিণ করে অবশেষে প্রতিমাগুলো পদ্মা নদীতে বিসর্জন দিতেন। এই শোভাযাত্রা দেখার জন্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই বিস্তর লোক-সমাগম হত। ১৯৪৮ সালেও যথারীতিই হয়েছিল। কিন্তু প্রতিমা-বিসর্জন কেউই দেখতে পান নি। ঢাকাতে জন্মাষ্টমীর মিছিলও বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল। এই মিছিল দেখার জন্য সারা বাংলাদেশের বহু জেলা থেকেই লোকজন যেতেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে, হিন্দুরা সেই ঐতিহাসিক মিছিলটিও আর চালাতে পারেন নি—বন্ধ করে দিতে তাঁরা বাধ্য হন। সেখানেও বাধাদানকারীরা হিংসার আশ্রয়ই নেয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নাজিমুদ্দিন সাহেবের সামনেই সেই ঘটনাটি ঘটে। আরও কত ঘটনাই না দেখেছি! আমার জেলা রাজসাহীতে দেখেছি যে, বৈশাখমাসে সন্ধ্যার পরে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে হিন্দুরা যখন 'খোল' বাজিয়ে কীর্তন করে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন তাঁদের উপর আক্রমণ করে তাঁদের 'খোল' ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শুধু 'খোল'ই নয়—'খোলের' কীর্তনীয়ার মাথাও। এইরূপ একটি ঘটনায় সরজমে নিকটবর্তী ইসবপুর নামক একটি গ্রামে আমি স্বয়ং গিয়ে ঘটনাটি তদন্ত করে আসি এবং পরে সহকারী পুলিশ সাহেবকে নিয়ে গিয়ে সেই গ্রামে সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার জন্য একটা মুখরক্ষাকারী (!) আপোষ করে আসি। আমার জেলাতেই আমি এ-ও দেখেছি যে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার সময় নিজ বাড়িতে পূজো করতেও বাড়ির মালিক বাধা পেয়েছেন। মুসলমান জনতা এসে দাবি করেছেন যে সন্ধ্যায় আরতির সময় এবং সন্ধি-পূজোর সময়টা নমাজের সময় তাই পাড়ায় বাজনা বাজিয়ে পূজো করা চলবে না!

চলেও নি। হিন্দুদের নৈতিক মনোবল, হিংসার আশ্রয়ে প্রতিদিনকার নানাবিধ অত্যাচার-উৎপীড়নে সম্পূর্ণরূপেই ভেঙে পড়েছিল। কোনওরূপ প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়ার শক্তি আর তাঁদের মোটেই ছিল না। এটা যে শুধু আমার জেলা রাজসাহীতেই হয়েছে, তা' নয়। পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই ঐ একই অবস্থা। আরও অনেক দিন পরের একটি ঘটনার কথাও এই প্রসঙ্গে এখানেই বলে রাখছি। কুমিল্লা শহরই ছিল, ত্রিপুরা এস্টেটের জমিদারি। সেখানকার 'টাউন হল'টিও ত্রিপুরার মহারাজারই দান। এই 'হলের' চতুর্দিকের দেওয়ালে ভারত-বিখ্যাত বহু নেতার ও সাধু মহাপুরুষদের বড় বড় ছবি ছিল। একদিন মুসলমান জনতা গিয়ে ঐ ছবিগুলো জোর করেই নামিয়ে তাকে ভেঙে ফেলে। কলকাতার সংবাদপত্রে সেই খবরটি প্রকাশের পরে, কুমিল্লার তৎকালীন তিনজন নেতা মিলে একটি প্রতিবাদপত্র দিতে বাধ্য হন। আমি আমাদের কুমিল্লার জনৈক শ্রদ্ধের বন্ধুকে একদিন ঢাকায় ঐ বিষয়টির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলেছিলেন যে—"ঐরূপ প্রতিবাদপত্র দেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদের ডেকে নিয়ে তাঁর চেম্বারে বলেন যে, ঐ সংবাদটির প্রতিবাদ তাঁদের এখনই করতে হবে, নচেৎ কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড হবে। তিনি সেই জন্ম একটা প্রতিবাদপত্র 'টাইপ' করিয়েও রেখেছেন। টাইপ করা প্রতিবাদপত্রটি তিনি আমাদের দেখান। আমরা ওতে সই দিতে প্রথমত রাজি হই নি। যখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের 'চেম্বারে' আমাদের সাথে এই সব আলোচনা হচ্ছে, তখন প্রায় দশ হাজার মুসলমানের এক জনতা 'চেম্বারটি' ঘিরে ফেলে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে চিৎকার করতে থাকে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন যে, আপনারা যদি বিবৃতিটিতে সই না-দেন, তাহলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঠেকান যাবে না। তখন ঐ অবস্থা দেখে, আমাদের আর কী করার উপায় ছিল? আমাদের কাজের উপরে হাজার-হাজার হিন্দুর ধন-প্রাণ সবই নির্ভর করছিল; সুতরাং, আমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ঐ বিবৃতিতে বাধ্য হয়েই স্বাক্ষর করেছিলেম।" এইরূপ অবস্থাই পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই চলছিল। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই যে পবিত্র ঘোষণাটি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের নেতারা করেছিলেন সেই ঘোষণার পবিত্রতা যদি পাকিস্তান সরকার রক্ষা করে চলতেন, তাহলে ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির আর প্রয়োজন

হত না। তা' হয় নি; সুতরাং, আবারও আর একটি ঐতিহাসিক চুক্তি হল। সেই চুক্তিটিরও মুখবন্ধ সহ ২।১টি ধারার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

A. "The Governments of India and Pakistan Solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory, complete equality of Citizenship irrespective all religion a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship subject to law and morality. Members of the minorities shall have equal opportunity with members of the majority community to participate in the public life of the country to hold political or other office, and to serve in their country's civil and armed forces. Both Governments declare these rights to be fundamental and undertake to enforce them effectively. The Prime Minister of India has drawn attention to the fact that these rights are guaranteed to all minorities in India by its Constitution. The Prime Minister of Pakistan has pointed out that similar provision exists in the Objective Resolution adopted by the Constituent Assembly of Pakistan. It is the policy of both Governments that the enjoyment of these democratic rights shall be assured to all their nationals without distinction."

এটাই ছিল, ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিলের দিল্লী-চুক্তির (নেহরু-লিয়াকত চুক্তির) মুখবন্ধ (preamble)।

এখন 'B' (বি. অর্থাৎ "খ") ধারার ছয় নম্বর (V1) উপ-ধারাটি ও "C" (সি, অর্থাৎ "গ") ধারার ১ ও ২নং উপ-ধারাটি মাত্র, এখানে তুলে ধরছি:

B. (V1) That in the case of a migrant who decides not

to return, ownership of all his immovable property shall continue to vest in him and he shall have unrestricted right to dispose of it by sale, by exchange with an evacuee in the other country or other-wise··· ··

C. As regards the province of East Bengal and each of the states of West Bengal, Assam and Tripura respectively, the two Governments further agree that they shall :

(1) Contiune their efforts to restore normal conditions and shall take suitable measures to prevent recurrence of disorder.

(2) Punish all those who are found guilty of offences against persons and property and of other criminal offences. In view of their deterrent effect, collective fines shall he imposed where necessary. Special courts will, where necessary, lie appointed to ensure that wrong doers are promptly punished···

উপরে যে উদ্ধৃতগুলো তুলে ধরেছি, তার সারমর্ম দিচ্ছি :

"ক" ধারার মুখবন্ধে বলা হয়েছে :

"ভারত ও পাকিস্তান সরকারদ্বয় আন্তরিকতার সাথেই একমত হয়ে ঘোষণা করছেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমান মর্যাদাসম্পন্ন পূর্ণ নাগরিকত্ব দেবেন ; তাঁদের ধন-প্রাণ ও ব্যক্তিগত মান-সম্মান ও কৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ নিরাপত্তা, নিজ নিজ দেশে ইচ্ছামতভাবে চলে-ফিরে বেড়ানর ও নিজ নিজ ইচ্ছামত ব্যবসা-বাণিজ্য, পূজা-পার্বণ-উপাসনা প্রভৃতি করার ও ন্যায়-নীতি এবং আইনের মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের নিরাপত্তাও দেবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকের মত সমানভাবেই সাধারণ নাগরিক জীবনযাপনের, রাজনীতিক বা যে কোনও রূপই হোক না কেন সকলরকম পদেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং দেশের সামরিক ও অ-সামরিক সকলরকম কাজেই যোগ দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ পাবেন। উভয় সরকারই উপরে বর্ণিত ঐ সব অধিকারকেই নাগরিক জীবনের অত্যাবশ্যক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি

দেবেন এবং তা'র পরিপূর্ণভাবে রূপায়ণ করবেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানাচ্ছেন যে ঐ সব অধিকারই ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে ; পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও জানান যে, ঐ সমস্ত অধিকারই পাকিস্তানের সংবিধান-গঠনকারী সভা সংবিধানের আদর্শ হিসাবে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে আগেই ঘোষণা করেছেন, (তখনও পাকিস্তানের সংবিধান সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয় নি)। এই দুই সরকারেরই (ভারত ও পাকিস্তান) এটাই নীতি যে ঐ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের অধিকার নিজ নিজ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককেই কোনওরূপ তারতম্য না করেই দেওয়া হবে।"

উপরের ঐ পবিত্র (!) ঘোষণারই "খ" ধারার ৬নং উপ-ধারায় এবং "গ" ধারায় ১নং ও ২নং উপ-ধারায় যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তার মর্ম তুলে ধরছি :

"খ" (৬) : যে ব্যক্তি দেশ ছেড়ে বাস্তুত্যাগী হয়ে অপর দেশে চলে গিয়েছেন এবং আর ফিরে আসতে চান না, তাঁর স্থাবর সম্পতি যা' তাঁর পূর্বতন দেশে ফেলে গিয়েছেন তার উপরও তাঁর পূর্ণ স্বামীত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি যথেচ্ছ বিক্রি করার বা অপর দেশের বাস্তুত্যাগেচ্ছু লোকের ভূ-সম্পত্তির সাথে রেওয়াজ বদলের পূর্ণ অধিকার তাঁকে দেওয়া হবে।

"গ" ধারায় ১নং ও ২নং উপ-ধারায় ঘোষণা করা হয় যে :

"পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ, ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং ভবিষ্যতে যাতে আর ঐরূপ ঘটনা না ঘটতে পারে তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, উভয় সরকারই করবেন এবং যেখানেই দেখা যাবে যে, কোন ব্যক্তি অপর সম্প্রদায়ের লোকের ধন-সম্পত্তির উপর আক্রমণ করেছে, তাঁকেই শাস্তি দেওয়া হবে ; প্রয়োজন বোধে সেই অঞ্চলে পাইকারী কর ধার্য করা বা বিশেষ আদালত গঠন করে অপরাধীকে অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া হবে। এটাও উভয় সরকারই ঘোষণা করেছেন।"

এখন দেখা যাক, এই পবিত্র চুক্তির মর্যাদা ভারত ও পাকিস্তান সরকার কেমনভাবে রক্ষা করেছেন।

ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে সমান মর্যাদাই ভোগ করছেন এবং উচ্চস্তরের রাজনীতিক পদ-লাভেও তাঁদের পূর্ণ অধিকার আছে। এবং সেইরূপ পদও লাভ করছেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ

আছে এবং তা' দেওয়া যায়। সব তুলে ধরতে গেলে 'অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত' হয়ে যাবে; সুতরাং সেদিক দিয়ে না গিয়ে শুধু একটি মাত্র উদাহরণই এখানে তুলে ধরছি। সম্প্রতি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক পদের (ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের 'প্রেসিডেণ্টের' পদের) নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। ঐ পদের জন্য দুইজন প্রার্থী ছিলেন; একজন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একজন হিন্দু—শ্রীসুব্বা রাও, আর অপরজন ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। মুসলমান—ডঃ জাকির হোসেন। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডঃ জাকির হোসেন সাহেবই 'প্রেসিডেণ্ট' নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতের সংবিধানেও কোন বাধা হয় নি, জনমতও তাতে কোনও বিপরীত প্রভাব বিস্তার করে নি (যদিও ভোটারের সংখ্যা বিপুলভাবে অধিক সংখ্যকই ছিলেন হিন্দু)। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী ১০৫০ সালের ৮ই এপ্রিলের দিল্লী-চুক্তিতে যে কথা বলেছিলেন, ভারতের জনগণই সে কথার মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু পাকিস্তান? পাকিস্তান তার আদর্শবাদের প্রস্তাবকে নস্যাৎ করে দিয়ে তার সংবিধানে নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করেছে যে, কোনও অ-মুসলমানই রাষ্ট্রপ্রধান, অর্থাৎ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের 'প্রেসিডেণ্ট' হতে পারবেন না। মুসলিম লীগের আমলে ঐ সংবিধান তৈরী হয়েছিল। তার পরে, তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট জনাব ইস্কান্দার মীরজা সংবিধান বাতিল করে দেন। জনাব আয়ুব খাঁ সাহেবের সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয় এবং সর্বশেষে, একটা সংবিধানও আয়ুব খাঁ সাহেব ফরমায়েস মত করিয়েছেন এবং সেই সংবিধানানুযায়ী একটা আয়ুবী গণতন্ত্র (!)-ও (মৌলিক গণতন্ত্র!) তিনি করেছেন। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নায়ক বদল হয়েছে। সংবিধানও বদল হয়েছে কিন্তু অ-মুসলমান যে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না, সেটা কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধানে ঠিকই আছে। কোনও অ-মুসলমানই আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের "প্রেসিডেণ্ট" হনও নি—কখন হতেও পারবেন না। সংবিধানেরই বাধা। এটাই দিল্লী-চুক্তির ঘোষিত সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান অধিকারের পবিত্র ঘোষণা!

তার পরে ভারতে রাজনীতিক পদে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদায় সকল রকম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকই অনেকেই আছেন কিন্তু পাকিস্তানে পরবর্তীকালে মাত্র একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দু কর্মচারী বর্মায় রাষ্ট্রদূত

হয়েছেন। তা-ও সবে ধন নীলমণি! সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও রাজনীতিক নেতাই রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা পদ পান নি।

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্র-প্রধানই যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুসলমান, তা-ই শুধু নয়। প্রধানমন্ত্রীর পদের পরেই মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ হচ্ছে পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর। সেই পদটিতেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের-ই আর একজন বিশিষ্ট মুসলমান—জনাব এম. সি. চাগলা। প্রতিরক্ষা বিভাগেরও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হচ্ছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই আর একজন সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের নেতা সর্দার শরণ সিং। শাসন ব্যাপারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে শিল্পবিভাগ। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হচ্ছেন জনাব ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ। তিনিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই একজন মুসলমান বিশিষ্ট ব্যক্তি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে যে ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কার্যভার দেওয়া হয়েছে তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকারেরই যে পূর্ণ সমর্থন আছে, শুধু তা-ই নয়—যে দেশকে পাকিস্তান সরকার দেশ-বিদেশে "হিন্দুস্থান" বলে প্রচার করে বিদেশের জনমতকে বরাবর বিভ্রান্ত করতে হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছেন, সেই দেশেরই হিন্দু-প্রধান জনসাধারণেরও কিন্তু ঐসব নিয়োগের পেছনে সমর্থন তো আছেই—কোন কোনও ক্ষেত্রে জনসাধারণ এই নিয়োগ সম্পর্কে আন্তরিক অভিনন্দনও জানিয়েছেন, যেমন জনাব মহম্মদ করিম চাগলা সম্পর্কে।

এখন একবার পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিলের দিল্লী-চুক্তির (যাকে বলা হয়, নেহরু-লিয়াকত চুক্তি) পরেও কিন্তু বর্তমানের পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সাহেব মনোনীত মন্ত্রীসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তিকেই দেখা যায় না! যাঁরা ভেতরের খবর জানেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে আয়ুবী মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ না থাকলেও তাতে আছেন এমন সব মাননীয় (!) ব্যক্তি যাঁরা ভারত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে ভরপুর। আমি নিজে যাঁদের চিনি ও জানি, এখানে কয়েকজনের নাম মাত্র উল্লেখ করছি: (১) জনাব আবদুস সবুর খান, (২) জনাব সামসুদ্দোহা, (৩) খাজা সাহাবুদ্দিন। এই তিনটি নামের সাথে জনাব আলতাফ হোসেন সাহেবের নামও যোগ দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁকে আমি না জানলেও করাচির 'ডন' (Dawn) পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর সাথে অপ্রত্যক্ষ পরিচয় অন্তত আমার একটু

ভারতের আরও বহু অধিবাসীর আছে। জনাব সবুর খান সাহেবকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি ও জানি। তিনি মুসলিম লীগের আমলে পূর্ববঙ্গ বিধানসভার লীগ-দলীয় সদস্য ছিলেন। তাঁর একদিনের বিধানসভার একটি বক্তৃতার স্বর ও সুর আজও আমার কানে বাজছে। সেই বক্তৃতায় ভারত ও নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে তো তাঁর বল্গাহীন প্রচার চালিয়েছিলেনই, উপসংহারে তিনি দৃপ্ত সিংহ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের "চলো, চলো, দিল্লী চলো" —গর্জনের অক্ষম অনুকরণে "আওয়াজ" তুলেছিলেন! এই ভদ্রলোকই আয়ুবের সামরিক শাসনের আমলে একজন মাড়োয়ারী হিন্দুর বহু লক্ষ টাকার একটি ব্যবসাই শুধু গ্রাস করেন নি, সরকারকে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য হিসাবের সব খাতাপত্র পুকুরের জলে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর ঐ দুর্নীতিপূর্ণ কাজ ধরা পড়ে এবং বিচারে তাঁর ছয় মাসের কঠোর কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আয়ুব খাঁ সাহেবের 'নেকনজরে' পড়েন ও তাঁর মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করেন! আয়ুব খাঁ সাহেবের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবেই তিনি ১৯৬৪ সালের যশোর, খুলনা ও ঢাকা জেলায় ব্যাপক হিন্দু-হত্যার প্রধান 'পুরোহিতের' ভূমিকা নিয়ে-পাকিস্তানের হিন্দুর ও ভারতের জনসাধারণের কাছে কুখ্যাতি অর্জন করলেও, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর কাছে তাঁর যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ নিশ্চয়ই সুখ্যাতিই পেয়ে থাকবেন!

জনাব সামসুদ্দোহা সম্পর্কে সকলেই জানেন যে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সক্রিয় সংগ্রাম (Direct action) উদ্যোগে তাঁর একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার হিসাবে কলকাতার দাঙ্গায় কী ভূমিকা ছিল।

ঢাকার লোক মাত্রেই জানেন যে খাজা সাহাবুদ্দিন সাহেবের ঢাকার পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি কী ভূমিকা নিয়ে চলেছিলেন। তাঁর সাম্প্রতিককালের একটি কাজও তাঁকে রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত (!) করেছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার বা ভারতের কবিই নন, তিনি হচ্ছেন বিশ্বকবি।

সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গানও তিনি পাকিস্তান-রেডিও-তে নিষিদ্ধ করেছেন। বিশ্বকবিকে নিন্দিত ও বিকৃত করতে গিয়ে তিনি শুধু নিজেকেই বিশ্ববাসীর কাছে নিন্দিত ও বিকৃত করেন নি, একটা দেশের গৌরব-ও ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছেন।

এইসব লোক নিয়েই পাকিস্তান সরকার:দিল্লী-চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন! দিল্লী-চুক্তির "গ" ধারার ১নং উপ-ধারায় বলা হয়েছিল যে উভয় সরকার-ই (ভারত ও পাকিস্তান) "shall take suitable measures to prevent recurrence of disorder." অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা'তে উভয় দেশেই ঐরূপ অশান্তি আর ঘটতে না পারে তার জন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা উভয় সরকার-ই গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমরা দেখেছি ১৯৫২ সালে রাজসাহী জেলায় ব্যাপক ভাবে গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও হিন্দুহত্যা হয়েছে এবং ১৯৬৪ সালেও সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ১৯৫০ সালের-ই দাঙ্গার বৃহত্তর সংস্করণ করা হয়েছিল। এইসব ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবেই যথাস্থানে আলোচনা করব।

এতক্ষণ আমরা ভারত ও পাকিস্তানের মন্ত্রীপর্যায়ের আলোচনায় এই দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা-ই দেখাতে চেষ্টা করেছি। এইবার সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারী পর্যায়ে দেখা যাক, সেখানে কী অবস্থা।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারী পর্যায়ের মাত্র দু'টি ক্ষেত্রের কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি। একটি হচ্ছে দিল্লীর ও অপরটি পশ্চিম বাংলার শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে। দিল্লীর পররাষ্ট্র বিভাগের 'জয়েন্ট-সেক্রেটারী' হচ্ছেন জনাব আমজাদ হোসেন সাহেব। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই একজন সম্মানিত মুসলমান কর্মচারী। পাকিস্তানের দিল্লীস্থিত রাষ্ট্রদূত (হাই-কমিশনার) জনাব আরসাদ হোসেন সাহেবের তিনি ভাই। তবু কিন্তু ভারত সরকারের বা ভারতের জনসাধারণের কেউ-ই জনাব আমজাদ হোসেন সাহেবের ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় মোটেই বিরোধী হন নি; বরং হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক বা খৃষ্টান হোক—ভারতের নাগরিক মাত্রেই যে ভারতবাসী এবং সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, তারই সকল রূপায়ণ দেখে প্রত্যেক ভারতবাসীরই গর্ব বোধ করার যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে এবং করেন-ও। অপর দিকে পাকিস্তানে আমি দেখেছি যে রাজসাহীর বিখ্যাত উকিল ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীশরৎ মৈত্র

মহাশয়ের স্ত্রী কলকাতায় থাকেন বলে শ্রীমান সনৎ-এর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব লোপ পেয়েছে এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ-ও 'খারিজ' হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানে কেবলমাত্র হিন্দুর বেলাতেই আমি দেখেছি যে, সে দেশের নাগরিকত্বের মাপকাঠি-ই হল তাঁর নিকটতম আত্মীয় স্বজন সব পাকিস্তানেই থাকেন, না ভারতে? সেই বিচারের উপরই অনেকক্ষেত্রেই নাগরিকত্বের বিচার হতে দেখেছি। এখানে যে পাকিস্তানের পথ অনুসরণ করা হয় নি সেজন্য আমি ভারত সরকারকে ও ভারতের জনগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এইবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাটির নজির উপস্থিত করছি। জনাব মুরসেদ যে একজন সুযোগ্য কর্মচারী তা' সকলের কাছেই শুনেছি। তিনি যথাযোগ্য পদমর্যাদাও তাঁর যোগ্যতার জন্যই পেয়েছেন। তিনি এখন কলকাতার 'ট্রামওয়ে'র প্রধান প্রশাসক (Chief Administrator)। এখানে যোগ্যতারই উপযুক্ত বিচার হয়েছে—ধর্ম এখানে কোন বাধা সৃষ্টি করে নি।

এইবার পাকিস্তানের দিকে একবার তাকান যাক। পুলিশের ইন্সপেক্টার বর্মণবাবুর ও ঢাকার সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা আগেই বলেছি। আমি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে যে কয়েকটি ঘটনার কথা বিশেষ ভালভাবে জানি, তারই মধ্যে থেকে আরও কয়েকটির কথা এখানে তুলে ধরছি। রাজসাহী থেকে আর একজন 'সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' —শ্রী ডি. এন. মিত্রী (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্রী) মহাশয়কে জনাম ধন্য মজিদ সাহেব—ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচারেই চাকুরি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। আর একজন সরকারী কর্মচারী—রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরাখাল চক্রবর্তী মহাশয়কেও তাঁর সমস্ত পাওনা ত্যাগ করেই চাকুরি ছেড়ে ভারতে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি আজ পরলোকগত। আর একজন পদস্থ অফিসারকে-ও আমি জানতেম। তিনি হলেন, শ্রী এস. বি. দাস (তাঁর পুরো নাম সম্ভবত শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস)। জনাব আবু হোসেন সরকার যখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, তখন তিনিই ঐ ভদ্রলোককে রাজসাহী সদর মহকুমায় 'এস. ডি. ও' (S. D. O.) করে পাঠান। দাসবাবুর ঐ নিয়োগের বিরুদ্ধে সেই সময়কার যুক্তফ্রন্ট দলের ৪ জন মুসলমান 'এম-এল-এ' মুখ্যমন্ত্রী সরকার সাহেবের কাছে এক তারবার্তায়

মাধ্যমে সীমান্তবর্তী জেলায় একজন হিন্দুকে 'এস. ডি. ও' করে পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ঐসব সদস্যরা কিন্তু মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন যুক্তফ্রন্ট দলের অর্থাৎ তথাকথিত প্রগতিশীল দলেরই সদস্য। এই ঘটনাটিই প্রমাণ করে যে হিন্দুরা পাকিস্তানের মুসলমানদের কাছে কতখানি সন্দেহভাজন! জনাব আবুহোসেন সরকার সাহেব কিন্তু কারো কথাই শোনেন নি। দাসবাবু রাজসাহী সদরে 'এস. ডি. ও'ই থেকে গিয়েছিলেন। তিনি একজন তপশীল সম্প্রদায়েরও লোক ছিলেন। এই ভদ্রলোককে আমি রাজসাহীতে থাকাকালে "A. D. M., incharge of Collection" (খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট) দেখে এসেছিলেম। সম্প্রতি শুনলেম, তিনি সপরিবারে ভারতে এসে কৃষ্ণনগরে আছেন। সম্ভবত ১৯৬২ সালের রাজসাহীর ব্যাপক গৃহদাহ, লুঠ ও হত্যাকাণ্ডে 'সরকারে'র ভূমিকা দেখেই তাঁর 'পেটের পিলে' চমকে থাকবে! কী কারণে তিনি এসেছেন তা' সঠিক জানি না কিন্তু আমি বিশ্বস্তসূত্রেই শুনেছি যে তিনি এসেছেন এবং কৃষ্ণনগরে আছেন।

এইবার সর্বশেষে আর একজন অত্যন্ত পদস্থ সরকারী কর্মচারীর কথা বলছি। তাঁর সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবেই বলার প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি হলেন, শ্রীঅজিত দত্তচৌধুরী। পাকিস্তানের একজন 'সি. এস. পি' (C. S. P.) অফিসার। ভারতের "আই. এ. এস" (I. A. S.), আর পাকিস্তানের 'সি. এস. পি' (C. S. P.) একই গোত্রীয়—সমপর্যায়ভুক্ত কর্মচারী। ইংরেজ আমলের 'আই. সি. এস' (I. C. S.) জাতীয়। এই ভদ্রলোককে আমি বিশেষ ভালভাবেই চিনি ও জানি। তিনি পাকিস্তানের সিলেট জেলার লোক। আমাদের বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাস মহাশয়ের আত্মীয় কি-না, তা' আমি সঠিকভাবে জানি না তবে এইটে জানি যে তিনি স্বাভাবিক কারণেই বসন্তবাবুর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। দেশ বিভাগের আগে বসন্তবাবু আসাম এসেম্বলির স্পীকার ও পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। বসন্তবাবু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র:ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বে অধিষ্ঠান এবং উচ্চ পদ-:গৌরব, তাঁকে সর্বভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রেই একটা বিশিষ্ট মর্যাদার আসন দিয়েছিল। বসন্তবাবুর সেদিনের সম্মানে প্রত্যেক সিলেটবাসীরই গৌরব বোধ করা অত্যন্তই স্বাভাবিক ছিল। অজিতবাবুও যদি সিলেটবাসী হিসাবে বসন্তবাবুর প্রতি বিশেষ

শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকেন, তাহলে সেটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের কাছে সেইটাই দেখা দিয়েছিল অজিতবাবুর দিক থেকে মহা অপরাধরূপে! দেশ বিভাগের সময় অজিতবাবু একজন তরুণ যুবক ছিলেন। দেশ বিভাগ হওয়ার পরে পদস্থ হিন্দু সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সকলেই 'অপসান' দিয়ে ভারতে আসেন। আদর্শবাদী তরুণ যুবক শ্রীঅজিত দত্তচৌধুরী ভাবেন, দেশের সামনে আজ এক মহাদুর্দিন দেখা দিয়েছে। মুসলমানরা ভাবছেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁদের জয় হয়েছে, আর হিন্দুরা ভাবছেন—তাঁদের হয়েছে পরাজয়! পাকিস্তানের প্রধান এই দুইটি সম্প্রদায়ের মনোভাব বিপরীতমুখী হওয়ায় তিনি ভাবেন, ঐ অবস্থা চললে দেশে একটি রাষ্ট্রীয় জাতি (Nation) কিছুতেই গড়ে উঠতে পারবে না। তিনি মনে করেন, দেশকে সেবা করার সেইটাই উপযুক্ত সময়; তাই তিনি দেশেই বরাবর থেকে যাবেন এই মনোভাব নিয়েই থাকেন এবং পাকিস্তানের 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সাথেই তা'তেই উত্তীর্ণও হন। তারপরে, তিনি দেশে ও বিদেশে—বহু স্থানেই শাসন বিভাগের সমস্ত রকম কাজের শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিদেশে শিক্ষার জন্য তাঁকে পাকিস্তান সরকার-ই নানা দেশে পাঠিয়েছেন। তিনি আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, লেবানন, মালয়, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি বহু দেশেই 'সরকার' কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দেশেও তিনি সচিবালয়ে উচ্চপদে এবং ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বাখরগঞ্জ জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেছেন কিন্তু বোধ হয়, পাকিস্তান সরকারের কাছে তাঁর ধর্মই একটি প্রধান বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল; তাই কোথাও তিনি দীর্ঘকাল অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদের স্বাভাবিকভাবে একস্থানে স্থিতিকাল পর্যন্ত থাকতে পারেন নি। তাঁকে এক সময়ে সংখ্যালঘু দপ্তরের কাজকর্ম দেখার জন্য "বিশেষ অফিসার" হিসাবেও নিয়োগ করা হয়েছিল। বোধ হয়, সরকারের উদ্দেশ্য ছিল যে একজন পদস্থ হিন্দু কর্মচারীর মুখ দিয়ে বের করান যে হিন্দুরা পাকিস্তানে বেশ ভালই এবং সুখেই আছেন। আদর্শবাদী যুবক অজিত দত্তচৌধুরী অন্যায় ও অবিচারের সাথে আপোষ করে সত্যকে গোপন করতে পারেন নি। তিনি মুসলমান যেখানে অন্যায় করেছেন সেখানে তাঁদের বিরুদ্ধে যেমন তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন, তেমনিভাবে তিনি সময়ে সময়ে

প্রতিবাদ করেছেন আমাদেরও বিরুদ্ধে, যেখানে আমরা ভুল পথে পা বাড়িয়ে কোনরূপ অন্যায় করতে গিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, পূর্ব পাকিস্তান 'সরকার' তাঁর মধ্যে একজন চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী সরকারী কর্মচারীকেই দেখেছেন। সামরিক শাসনকালে যখন জনাব জাকির হোসেন সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের 'গভর্নর'—তখন তো তিনি অজিতবাবুকে সামনা-সামনিই বলেন যে, তিনি একজন অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী সরকারী কর্মচারী বলে তাঁকে —পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে জেলা জজ করে পাঠান হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব মুখ্যসচিব জনাব আজিজ আহমেদ এবং তাঁর ভায়রা-ভাই, জনাব আব্দুল মজিদ (যিনি রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) প্রমুখ কেউই জাকির হোসেন সাহেবের, তথা পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিতে—সাম্প্রদায়িকতাবাদী কর্মচারী নন। অজিতবাবুই একমাত্র কর্মচারী যিনি হলেন মহা 'সাম্প্রদায়িকতাবাদী'। পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি এটাই সুবিচারের নমুনা! অজিতবাবুকে লাহোরে বিচারবিভাগীয় পদে পাঠানোর পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু আরও গভীরে। গভর্নর জাকির হোসেন সাহেব মুখ্যসচিব আসফার সাহেব ও বিভাগীয় কমিশনার কাদ্রি সাহেব মিলে অজিতবাবুর বিরুদ্ধে গভীর এক ষড়যন্ত্র করেন। সামরিক শাসনকালে রাজনীতিক নেতাদের বিরুদ্ধে যখন "এবডো" (EBDO) মামলা হয়, তখন কংগ্রেস দলের নেতা বসন্তবাবুর বিরুদ্ধেও মামলা হয়। বসন্তবাবুর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে তিনি অজিত দত্তচৌধুরী মহাশয়ের মাধ্যমে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে গোপনপুলিশের রিপোর্ট সংগ্রহ করতেন! এই অপবাদের চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর কিছু নেই। অজিতবাবুর কাছ থেকে বসন্তবাবুর কোনও রিপোর্ট সংগ্রহ করাই দরকার হত না। তিনি নিজেও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজেও জানতেন, পাকিস্তানের গোপন-পুলিশ (আই বি পুলিশ) কেমন সব আজগুবি খবর হিন্দুদের সম্পর্কে দিয়ে থাকেন। আমিও জানি। আমার বিরুদ্ধে যখন "এবডো" (EBDO) মামলা হয় তখন আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দেওয়া হয় যে আমার না কি নিজস্ব একটা গোপন সামরিক সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য দল ছিল। সেই দলের মাধ্যমে আমি সেই সব সামরিক তথ্য সংগ্রহ করে ভারত সরকারের কাছে পাঠাতেম! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে আমি যখন সেই আদালতকে জিজ্ঞাসা করি যে কবে এবং কি উপায়ে ঐ মহান্ তথ্যটি সরকার আবিষ্কার করলেন, তখন আমাকে

সে সম্বন্ধে কিছুই জানান হল না। আমি যখন বলি যে, এত বড় গুরুতর অভিযোগ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাকে সেদিন পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার কোনও দিনই গ্রেপ্তার করলেন না কেন? হাজার হাজার রাজনীতিক কর্মীকে তো পাকিস্তান সরকার গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে জেলে আটক রেখেছিলেন, কিন্তু যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এত বড় গুরুতর অভিযোগ—তাকে কোন দিনই গ্রেপ্তার তো করাই হয় নি, তার বাড়িটাও খানাতল্লাসি করা হয় নি কেন? তার কোন উত্তর বিচার-প্রহসনের 'ট্রাইবুনালের' কাছ থেকে পাই নি।

আমি আরও জানি যে স্বাধীনতার একজন প্রসিদ্ধ সংগ্রামী নেতা শ্রীসতীন সেন মহাশয়ের এবং তাঁর সহকর্মী শ্রীপ্রাণকুমার সেন মহাশয়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের গোপন-পুলিশ বিভাগের কী রিপোর্ট ছিল। সে খবর আমাকে চেষ্টা করে সংগ্রহ করতে হয় নি। আমার মন্ত্রিত্বকালে পুলিশ বিভাগই মন্ত্রীর কাছে সেই রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এটাই রীতি। পনের দিন পর পর পুলিশের একটা গোপন রিপোর্ট মন্ত্রীদের কাছে দেওয়া হয়। সেই রিপোর্টের সব কথা আমি প্রকাশ করতে চাই না; তবে, শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে সেই রিপোর্টের সাথে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও ভারত সরকারও যুক্ত ছিলেন। আর ঐরূপ একটা অ-প্রকৃত হীন অভিযোগেরই দাম দিতে হয়েছে, একজন মহাপ্রাণ দেশনায়ককে জীবন দিয়ে! সতীনবাবুকে জেলে থাকা কালেই প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রাণকুমারবাবুও আজ পরলোকগত। তাঁরা উভয়েই আজ এমন এক দেশে গিয়েছেন যেখানে পাকিস্তানের 'নেকড়ে'রা আর তাঁদের অনুসরণ করতে পারবেন না! শৈশবের গল্পে সকলেই, 'মেষশাবক ও নেকড়ের' কাহিনী পড়েছেন। মেষশাবককে বধ করতে হবে; সুতরাং, একটা কাল্পনিক অভিযোগও তার জন্য সৃষ্টি করে নিতে হবে। পাকিস্তানও স্বাধীনতার সংগ্রামী নেতাদের বিরুদ্ধে সেই নেকড়ে-নীতিই অনুসরণ করে চলেন। তাই খান আব্দুল গফুর খান সাহেব বড় দুঃখেই কয়েকজন ভারতীয়কে বলেছিলেন—"আমাদের নেকড়ের মুখে ফেলে দিয়ে তোমরা আজ স্বাধীনতা ভোগ করছো এবং আমাদের ভুলে গিয়েছ!"

বসন্তবাবুর বিরুদ্ধেও সেই 'নেকড়ে'দের অভিযোগ ছিল এবং তার সাথেই যুক্ত হয়েছিলেন, অজিত দত্তচৌধুরী মহাশয়েরও নাম। তাঁকে লাহোরে বদলি করার পেছনের উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দূরে

সরিয়ে রেখে সাক্ষী তৈরি করে তাঁকে গ্রেপ্তার করা ও বিচারের একটা প্রহসন করে কয়েক বছরের জন্য জেলে পাঠান। অজিতবাবু, তাঁর কয়েকজন সহকর্মী মুসলমান অফিসারের কাছ থেকে ঐ সংবাদটি পেয়ে পাকিস্তান থেকে মাত্র একটি 'স্যুটকেশ' সম্বল করে ভারতে কেটে পড়েন। একজন আদর্শবাদী যুবকের এই হীন ষড়যন্ত্রের ফলেই পাকিস্তানের কর্মজীবন শেষ হয়ে যায়। ভারতের কংগ্রেস নেতারা বা রাজনীতিক নেতারা কি পাকিস্তানের হিন্দুদের এই সব দুঃখ-দুর্দশার খোঁজ-খবর কিছু রাখেন? শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের খোঁজ-খবর জানালেও কী তারা তার প্রতিকারের বা ঐ সব নিগৃহীত ব্যক্তিদের উপর সুবিচার করার চেষ্টা করেন? তাঁরা বোধ হয় পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও সমস্ত হিন্দুকেই স্বাধীনতার বলি হিসাবেই ধরে নিয়েছেন; তাই আর তাঁদের জন্য কারোরই কোন মাথাব্যথা নেই!

অজিতবাবু, এদিকে এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটা চাকরি পেয়েছেন মাত্র কিন্তু তাঁর শিক্ষার উপযুক্ত পদ ও পদমর্যাদা আজও পান নি?

এতক্ষণ পাকিস্তানের হিন্দু সরকারী কর্মচারীদের কথাই বললেম। এইবার আধা-সরকারী ও বে-সরকারী হিন্দু কর্মচারীদের সম্পর্কেও দু-একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান। সেখানে কী অবস্থা হয়েছে দেখা যাক। একদিন রাজসাহী থেকে আমি ঢাকায় যাচ্ছিলেম। রাজসাহী ষ্টেশনেই দেখা, আই এইচ জুবেরি (I. H. Zuberi) সাহেবের সাথে। জনাব জুবেরি সাহেব, একজন প্রবীণ ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্। তিনি তখন রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ। দুজনেই ট্রেনে একই কামরাতেই উঠি। সারা রাস্তা যতক্ষণ আমরা জেগেছিলেম ততক্ষণ পর্যন্ত নানা বিষয়েই আলোচনা করি। কথা প্রসঙ্গে জুবেরি সাহেব বলেন—"শিক্ষক ও শিক্ষার উৎকর্ষতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে গৌরবের বস্তু ছিল কিন্তু দেশ বিভাগের তথা স্বাধীনতার পরে শিক্ষা বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনীতিক নেতারা রাজনীতিক প্রভাব ও রাজনীতিক আমদানি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে পঙ্গু করে দিলেন! এই রাজনীতিরই ফলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমার্স বিভাগের নামকরা অধ্যাপক শ্রীঅজিলাল দাস মহাশয়কে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অপরাধ ছিল কি? ভারত

যখন প্রথমবার তাঁর টাকার মূল্যমান হ্রাস করেন, তখন তাঁর ছাত্রদের মূল্যমান হ্রাস করা হয় কেন, তা বোঝাতে গিয়ে ভারতের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে পাকিস্তান যদি মূল্যমান ভারতের সমপর্যায়ে না আনেন—তাহলে পাকিস্তান ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর যায় কোথায়? অধ্যাপক দ'সের সেই অপরাধে চাকুরিই গেল! সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ লাহিড়ীকে কোন-না-কোন অজুহাতে বিদায় করা হয়েছিল। আর ডাঃ পি সি চক্রবর্তী মহাশয়কে তো রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জেলেই পাঠান হয়েছিল। এই সব প্রথিতযশা নামকরা অধ্যাপকদের অবস্থা দেখেই আরও অনেকেই 'চাচা, আপন-প্রাণ বাঁচা'-নীতি অনুসরণ করে ক্রমশ কেটে পড়েছেন।"

পাকিস্তানের হিন্দু ছাত্রদের উপরও সরকারের হিন্দু-সম্পর্কিত নীতির প্রভাবও যথেষ্টই পড়েছে। ছাত্ররা দেখছেন যে তাঁরা লেখাপড়া শিখেও সরকারী বা আধা-সরকারী কোন বিভাগেই তাঁদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সুযোগ বা চাকরির স্থায়িত্ব মিলবে না; সুতরাং তাঁরাও কলেজী-শিক্ষার আওতায় আসার প্রাক্কালেই পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে যাচ্ছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখেই মুসলিম লীগ সরকারের আমলেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের 'বিল'টি বিধানসভায় এসেছিল, তখন আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রস্তাব তুলেছিলেম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, গভর্নর হতে পারবেন না; কারণ, গভর্নর সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার উপদেশ মতই কাজ করতে বাধ্য। মন্ত্রিসভা কোন-না-কোন রাজনীতিক দল দিয়েই গঠিত; সুতরাং তাঁরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করেই গভর্নরকে উপদেশ দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত রাখতে হলে আমার মতে, গভর্নরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে বাইরে রাখা দরকার। আমার সে প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয় নি; বিশ্ববিদ্যালয়ও রাজনীতিমুক্ত হতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে এখানে বলতে চাই যে, ভারতে এসে দেখেছি এদিকেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উপর যথেষ্ট রাজনীতিক প্রভাব পড়েছে। একদিন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য পুরুষ-সিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জবরদস্ত ইংরেজ শাসকদের কাছেও নতি স্বীকার করেন নি, আজ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অবস্থা দেখলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

বাংলাদেশে হিন্দুরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপর সম্প্রদায় থেকে অনেকটাই অগ্রসর ছিলেন এবং শিক্ষার জন্ত তাঁদের অনেকের দানেই বাংলায় অনেক কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলেরও গোড়াপত্তন হয়েছিল। শিক্ষকদের মধ্যেও হিন্দুই ছিলেন বেশি। এখন কিন্তু পাকিস্তানে চাকা উল্টো দিকে ঘুরেছে। কোন-না-কোন অজুহাতে সুযোগ পেলেই হিন্দু শিক্ষকদের সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে উপযুক্ততার মানে অনেক খাটো মুসলমানকেও উপরের চাপে নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা বিভাগের কথা মোটামুটি বললেম। এইবার বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কথা কিছুটা বলা দরকার মনে করি। আমি পাকিস্তানে থাকাকালেই দেখে এসেছি যে হিন্দু-পরিচালিত বে-সরকারী ব্যাঙ্কে ও কলকারখানা প্রভৃতিতে শতকরা হারে একটা সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়ে 'সরকার' থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ঐ সংখ্যায় 'পাকিস্তানী মুসলমান' নিয়োগ করতে হবে। এখানে মনে রাখা দরকার যে 'পাকিস্তানী' হলে চলবে না—'পাকিস্তানী মুসলমান' হতে হবে; সুতরাং সেজন্ত কিছু পাকিস্তানী হিন্দুকে বিদায় করতে হবে। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে সম্পাদিত নেহরু-লিয়াকত চুক্তি যাতে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের যে সমান অধিকারের স্বীকৃতি পায়, তারই রূপায়ণ কীভাবে হয়েছে, তা দেখানোর জন্তই এত কথা বলতে হল। উপরে এতক্ষণ আমি যে সব উদাহরণগুলো তুলে ধরেছি, সেগুলোর কথা স্মরণে রেখে এখন একবার আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের কাছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় জনৈক মন্ত্রী যা বলেছিলেন, সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সব বিষয়টি ভালভাবে বিচার করে দেখতে আমি সকলকে অনুরোধ জানাই। পাকিস্তানী মন্ত্রী মহাশয় ভূপেনবাবুকে যা বলেছিলেন, তা ভূপেনবাবুর উক্তি সহ আগেই বলেছি। তবু তার একটি অংশ সকলের সুবিধার জন্ত আবারও বলছি। ঐ অংশটি হচ্ছে,—"The minorities, particularly those of the middle classes can never prove friendly to Pakistan. Every means should, therefore, be sought to get rid of them...." অর্থাৎ "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়—বিশেষত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যালঘুরা কখনই পাকিস্তানের বন্ধু হতে পারে না। সুতরাং 'যেন-তেন-প্রকারেণ'ই তাদের সরাতেই হবে..." পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও সেক্রেটারী-

জেনারেল উভয়ে পরামর্শ করে এই নীতিরই 'ছক' সেদিন কেটে রেখেছিলেন। সেই ছকে পা মিলিয়েই আজও পাকিস্তান সরকার চলছেন; সেই জন্যই আজও পাকিস্তানী হিন্দুদের বাস্তত্যাগী হয়ে ভারতে আসা বন্ধ হয়নি বা ভারত-পাকিস্তানে বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে পারে নি। আমরা যাঁরা পাকিস্তানে ছিলেম তাঁরা জানি যে পাকিস্তান একটা নির্দিষ্ট ছক-কাটা নীতি নিয়ে চলছেন। সেই নীতির মধ্যেই আছে, ভারতের সাথে স্থায়িভাবে বিবাদ বাধিয়েই রাখা এবং ভারত, তাঁর সমস্ত নাগরিকদের নিয়ে একটা এক ও অখণ্ড জাতি (nation) গড়ে তুলতে না পারেন সেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এই নীতির ফলেই আমরা শুনেছি যে লিয়াকত আলি সাহেব তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের যে ঈদের ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও তিনি বলেছিলেন যে "ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমান আজ স্বাধীনতার মধ্যে তাঁদের পবিত্র ঈদ উদ্‌যাপন করতে পারছেন না।" পাকিস্তানের নীতি বুঝি কিন্তু ভারত সরকার যে কোন নীতি নিয়ে চলেছেন তাই ঠিক বুঝতে পারি না। দেশ বিভাগের পরে যখন পূর্ববঙ্গ থেকে বহু সংখ্যক হিন্দুই বাস্তত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন, তখন পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে তাঁর রাজ্যে কোনও বাস্তত্যাগীর সমস্যা নেই! আবার দেখেছি পশ্চিম বাংলার গভর্নর শ্রীকাটজু তিন দিনের জন্য প্রমোদসফরে সরকারীভাবে ঢাকায় গিয়ে সেখান থেকে ফিরেই বলেছেন,—"সংখ্যালঘুসম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে বেশ ভালভাবেই আছেন!" এই তথ্য তিনি কার কাছে সংগ্রহ করেছিলেন জানি না। আমরাও তখন ঢাকাতেই ছিলেম। তিনি আমাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে তো মনেও পড়ে না—জানিও না। ভারত যদি প্রথম থেকেই একটা নীতি নির্ধারণ করে চলতেন, তাহলে ভারতের কর্তৃস্থানীয় সব নেতাই একই সুরে কথা বলতেন, যেমন বলেন পাকিস্তান সরকারের নেতারা। আজও আমরা দেখছি, ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরাও এক-একজন ভিন্ন ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। পাকিস্তানে কিন্তু তা হয় নি—হতে পারে নি। দেশ বিভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরই মুসলিম লীগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কায়েদ-ই-আজম জনাব জিন্নাহ সাহেবের বাস্তববাদী নেতৃত্বে পাকিস্তান সরকার তাঁদের নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করেন। সেই নীতির উপর নির্ধারিত কর্মপন্থা আজও পাকিস্তান সরকার অনুসরণ করে চলছেন।

দেশ বিভাগ হল। মুসলিম লীগের দাবি 'পাকিস্তান'ও হল; কিন্তু জিন্নাহ সাহেব যে 'পাকিস্তান' দাবি করেছিলেন, সেই 'পাকিস্তান' হল না। যে 'পাকিস্তান' হল, জিন্নাহ সাহেব তাকে বললেন, পোকায়-খাওয়া কীটদষ্ট (moth eaten) পাকিস্তান। কিন্তু অবস্থার চাপে তাঁকে সেই পোকায়-খাওয়া পাকিস্তানই স্বীকার করে নিতে হল। তাই জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানের নেতারা তখনই পাকিস্তানের জন্য ভবিষ্যৎ একটা নীতি ও কর্মপন্থা ঠিক করেন। তাঁরা ঠিক করেন, পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রাম শেষ হয় নি। সেই সংগ্রাম চালিয়েই যেতে হবে; তবে সংগ্রামের পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবেই তাঁরা ঠিক করেন, একটা দ্বিমুখী নীতি। সেই নীতির মূল কথা হল, একটা সুস্থ-সবল পাকিস্তান অর্জন করার সংগ্রাম একদিকে যেমন চালাবেন, অপরদিকে আবার বিপাকে বা বে-কায়দায় পড়লেই একটা চুক্তি সম্পাদন করে নতুন শক্তি সংগ্রহের জন্য সাময়িকভাবে সংগ্রামের বিরতি ঘটাতে হবে। সেই বিরতিতে সংগ্রামের শেষ হবে না। এই দ্বিমুখী নীতি, পাকিস্তানের জন্মের সাথে সাথেই পাকিস্তান সরকার ঠিক করেন। সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পরেই ১৯৪৭ সালেরই ২২শে অক্টোবর তারিখে পাকিস্তান সরকার-ই সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় লোকদের দ্বারা পাকিস্তানের অধীন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করার সুযোগ করে দেন। ঐ আক্রমণকারীদের যুদ্ধাস্ত্র ও যানবাহন দিয়ে ও পাকিস্তান সরকার সক্রিয় সাহায্য দান করেন। এই আক্রমণ উপলক্ষেই ভারত সরকারের সাথে আক্রমণকারীদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে যখন আক্রমণকারীদের, তথা পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ আর কয়েকদিন যুদ্ধ চললেই আক্রমণকারীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং কাশ্মীর রাজ্যের অধিকৃত অঞ্চল মুক্ত হয়। তখন-ই পাকিস্তানের 'মুরুব্বি'দের চেষ্টায় একটা যুদ্ধবিরতি হয়। আজও সেই যুদ্ধ বিরতিই আছে। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিচুক্তি বা যুদ্ধ-নয় চুক্তি হয়তো নেই-ই, পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে আবারও সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করে পর্যুদস্ত হওয়ার মুখে আবারও তাসখন্দ চুক্তি করেছেন। এই চুক্তিও শান্তি স্থাপনের জন্য হয় নি। মাত্র একটু 'দম' নেওয়ার জন্যই হয়েছে।

পাকিস্তানের এই দু'মুখো নীতির ফলেই ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে ভারত যখন তাঁর সৈন্য সমাবেশ করে প্রস্তুত, তখন অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি খান নিজের জীবন বিপন্ন করেও ছুটেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর পদপ্রান্তে! ৮ই এপ্রিল দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীরা মিলে একটা চুক্তিতে সই-ও করলেন। সেই চুক্তি-ই হল দিল্লী চুক্তি বা নেহরু লিয়াকত চুক্তি। এই চুক্তির মর্যাদাই বা কেমনভাবে রক্ষিত হয়েছে, ত'-ই বলছি। দিল্লীর ঐ চুক্তিতে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা যদি আন্তরিকতার সাথে পাকিস্তান রূপায়ণ করতেন, তা' হলে হয়তো পাক ভারতের মধ্যে একটা স্থায়ী শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারত, কিন্তু পাকিস্তানের স্বিরীকৃত নীতিই ছিল তার সম্পূর্ণ পরিপন্থি তাই তা' হয় নি—হতে পারে নি। পাকিস্তান সরকার যে তা' করতে চান নি, তার অকাট্য প্রমাণ একটু পরেই তুলে ধরেছি। তবে, একথা আমি স্বীকার করি যে ঐ চুক্তি-সম্পাদনের পর কিছু দিন পর্যন্ত—প্রায় বছরখানেককাল চুক্তির ফলে কিছু কিছু কাজ হয়েছে! হয়েছে বলেই আমি দেখেছি যে ধামুরহাট থানার দারোগার শাস্তি কিছুটা অন্তত হতে পেরেছিল। কিছু কিছু জবরদখল করা জমি ও বাড়িঘর এবং অন্যান্য ভূ-সম্পত্তিও জবরদখলকারী মুসলমানের হাত থেকে মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। নারিহরণের ১০।১২টি অভিযোগ আমার কাছে যা এসেছিল, তার অনেকগুলো সম্পর্কেই আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে নিজে তদন্ত করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমি যে রিপোর্ট দিই, তার কোন কোন ক্ষেত্রে ফলও কিছু হয়েছিল। পুঠিয়া থেকে তাহেরপুর যাওয়ার পথে একটি গ্রামে শ্রীঅন্নদা সরকারের মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমি নিজে তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেম, তার ভিত্তিতেই মেয়েটিকে উদ্ধার করাও হয়েছিল এবং আসামী মুসলমান যুবকের 'জেল'-ও হয়েছিল। রাজসাহী শহরের শ্রীশান্তি সেনের মেয়েকেও অপহরণকারীর কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেম। সরদহের কাছে একটি চাই-মণ্ডলের মেয়ের উপরও পাশবিক অত্যাচার করা হয়। সেই মেয়েটির ক্ষত-বিক্ষত দেহ আমি দেখেছি। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে ঘটনাটির বিবরণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিই এবং তিনি একটা মামলাও দায়ের করেছিলেন। কিন্তু আবেদনকারী মেয়েটি গ্রামের লোকের

ভয় দেখানোর ফলে পদ্মা পার হয়ে পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদে চলে আসে। এখন কোথায় আছে, জানি না। নারীহরণ সম্পর্কে তদন্ত করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে বলতে পারি যে, যখন নারীহরণ সম্পর্কে থানায় 'এজেহার' দেওয়া হয় তখন তখনই যদি সেই অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করার জন্ম আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হয়, তাহলে হিন্দুর মনে আস্থা ফিরে আসতে পারে কিন্তু তা' হয় নি। মাসের পর মাস যায়, অপহৃতা নারীকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারে না বা করে না। তারপরে যখন 'খাঁচার পাখী' সম্পূর্ণভাবে পোষ মেনে শেখান বুলি বলতে থাকে তখন সে কোর্টে হাজির হয়ে বলে যে সে স্বেচ্ছায় 'ইসলাম-কবুল' করেছে! ব্যস্, সেখানেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়। ডাক্তারের সার্টিফিকেটেও দেখান যায় (!) যে নারীটি প্রাপ্তবয়স্কা! এই অবস্থাই পাকিস্তানে চলতে আমি দেখেছি। তবু আবারও বলি, চুক্তির ফলে প্রথমদিকে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। এখানে গভীর দুঃখের সাথেই একটা কথা জানাই যে আমাদের-ই সহকর্মী পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার একজন কংগ্রেসদলের 'ভূতপূর্ব' সদস্য ও মৈমনসিংহ জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডের সদস্য শ্রীসুধাংশুকুমার সাহা, একটি নারীহরণ ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গুলীতে নিহত হন। আততায়ী ধরা পড়ে না। ঘটনাটি ঘটে আয়ুবী মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে! পাকিস্তানের দায়িত্বশীল হিন্দু নেতাদের এইসব বিপদের ঝুঁকি নিয়েই সেখানে কাজ করতে হয়; অথচ, সে কথাটা ভারতের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বন্ধুরা মোটেই একবারও ভেবে দেখেন বলে মনে হয় না। অজিত দত্তচৌধুরীর ব্যাপার ও অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করে আমার ধারণা হয়েছে যে পাকিস্তানের হিন্দুরা 'ঘরেরও না, ঘাটেরও না।' পাকিস্তানে তাঁরা সন্দেহভাজন ভারতের চর; আর ভারতে তাঁরা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি! এই তো অবস্থা।

দিল্লী চুক্তির আর একটি ধারার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। "খ" ধারার ৬ নং উপ-ধারায় বলা হয়েছিল যে বাস্তত্যাগী যদি নিজ দেশে আর ফিরে না যায়; তাহলেও তার স্থাবর সম্পত্তির উপর তার স্বত্ব-স্বামীত্ব হারাবেন না। তিনি ইচ্ছামত তাঁর সম্পত্তি বিক্রয় বা বদল করতে পারবেন। এই ধারাটিও যেমন মেনে চলা হয় নি, তেমনি মুসলিম লীগ সরকার-ই আইন করেছিলেন যে কোনও ব্যক্তি-ই দশ বিঘার বেশি

জমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিনা আদেশে বিক্রি করতে পারবেন না। গোপন সার্কুলারে ছিল হিন্দুর বেলায় যেন ঐ আদেশ পারতপক্ষে না দেওয়া হয়। মুসলিম লীগের তবু তো একটু চক্ষুলজ্জা ছিল, তাই ঐ আইন লোক-দেখান হিসাবে শুধু হিন্দুর জন্যেই করেন নি। আইন ছিল সকলের জন্যই কিন্তু গোপন সার্কুলারে শুধু হিন্দুরই বেলায় ঐ আইন প্রযোজ্য হল। বর্তমানের আয়ুবী সরকারের সেই চক্ষুলজ্জাও নেই। তাঁরা সরাসরিই আইন করেছেন যে কোন হিন্দুরই তাঁর স্থাবর বা অস্থাবর কোন সম্পত্তিই বিক্রি করতে পারবেন না—করলে ক্রেতা বা বিক্রেতা উভয়েই আইনত দণ্ডনীয় হবে।

আগেই বলেছি যে দিল্লী-চুক্তির প্রথম দিকে কিছু কিছু কাজ হয়েছিল কিন্তু পরে আর তেমন কিছু হতে পারে নি। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগপত্র উপস্থিত করলেই তিনি বলতেন—"এটা তো দেওয়ানী মামলার বা কোনটার সম্পর্কে বলতেন যে সেটা ফৌজদারী মামলার আওতায় পড়ে; সুতরাং কোর্টে মামলা দায়ের করে যেন।" কোর্টের বিচার হয় সাক্ষীর উপর কিন্তু হিন্দু মামলা করলে তার সাক্ষী দেবে কে? হিন্দু ভয়ে সাক্ষী দেবে না; আর মুসলমান, এমনিতেই দেবে না। সুতরাং অভিযোগকারী হিন্দু মামলা-ও করে না; হয় নিশব্দে সবকিছু সহ্য করে যায়, অথবা না পারলে দেশত্যাগ করে। এটাই হয়েছিল পাকিস্তানে হিন্দুর অবস্থা। এই অবস্থা দেখেই আমি এসেছি। এইটেই হওয়া খুবই স্বাভাবিক; কারণ, পাকিস্তানের সংগ্রাম তো শেষ হয় নি। পাকিস্তানের নেতাদের অভিরুচি অনুযায়ী সুস্থ ও সবল 'পাকিস্তান' অর্জন করতে-ই হবে; তাই যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরতি তাঁদের নীতির-ই আঙ্গিক। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিলের দিল্লী-চুক্তিতে স্থায়ী-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হয় নি—হয়েছিল একটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি হিসাবেই। তার অকাট্য প্রমাণ আমরা সম্প্রতি পেয়েছি আয়ুব খান সাহেবের লেখা সদ্য-প্রকাশিত তাঁরই জীবনীর তথ্যে। তিনি লিখেছেন—"In 1951 he (Ayub Khan) restrained Mr, Liaquat Ali and other politicians and even members of the Army; who were itching for a fight with India (Statesman). অর্থাৎ ১৯৫১ সালে তিনি (অর্থাৎ আয়ুব খান সাহেব) মিঃ লিয়াকত আলি খান ও কতিপয় রাজনীতিক নেতা এবং সৈন্যবাহিনীর লোকজনের উপর

তাঁর প্রভাব বিস্তার করে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখেন। লিয়াকত আলি সাহেব, রাজনীতিক নেতারা ও সৈন্যবাহিনীর লোকেরা নাকি ১৯৫১ সালেই ভারেতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এক-পাঁয়ে খাড়া হয়েছিলেন! এটা অসম্ভব নয়। গল্প না-ও হতে পারে। সকলে মনে রাখবেন যে ঐ লিয়াকত আলি সাহেবই ৮ই এপ্রিলের চুক্তি করার জন্য দিল্লীতে ছুটে গিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত, সকলে ভেবে দেখলেই পাকিস্তানের নীতির কথা সম্যক বুঝবেন।

পূর্ববঙ্গের ১৯৫০ সালের সম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা আংশিকভাবে আগেই বলেছি। সব কথা বলা হয় নি। প্রথমত আমার একার পক্ষে পূর্ববঙ্গের সতেরটি জেলার সব 'খুঁটিনাটি' খবর জানাও সম্ভবপর নয়। যা-ও বা কিছু জানতেম, তা-ও আজ তার অনেকগুলোই বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে গিয়েছে। অনেক জেলার অনেক লিখিত বিবরণীও, যা' আমার কাছে ছিল, তার সবই পূর্ব পাকিস্তানে আমার বাসাতেই ফেলে এসেছি। সঙ্গে করে আনি নি। আগেই বলেছি যে আমি পাকিস্তান ছেড়ে যে চিরদিনের মত চলে আসব, তা' মনে করে পশ্চিমবঙ্গ (ভারতে) আসি নি। কথায় আছে, মানুষ ভাবে এক, আর ভগবান করেন আর এক! আমার বেলায় অন্তত এক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল। আমার আর ফিরে যাওয়া হয় নি। নানা কারণেই যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, আমি যা' জানতেম তার কিছু কিছু কথা আজ আর এতদিন পরে ঠিকমত মনে করে উঠতে পারছি না এবং যেসব বিবরণী আমার কাছে ছিল, তা-ও ফেলে আসায় তার সঠিক বিবরণ দেওয়ার আজ আর আমার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। তবু সাপ্তাহিক বসুমতীর মাননীয়া সম্পাদিকা মহাশয়ার অনুগ্রহে তাঁর বহুল প্রচারিত পত্রিকায় লেখার সুযোগ পাওয়ায় বাস্তত্যাগী বসুমতীর অনেক পাঠকই নানা ধরণের নানা কথা ও তাঁদের মধ্যেকার কারো কারো নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আমাকে

লিখে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে থেকে দুই-একখানি পত্রের অংশবিশেষ আমি পরে উদ্ধৃত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরবো। যাঁরা এইভাবে পত্র লিখে আমি যে কাজে হাত দিয়েছি তাতে সাহায্য করছেন, তাঁদের সকলকেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যে কাজে হাত দিয়েছি, সে কাজটা আমার একার কোনও ব্যক্তিগত কাজ নয়। পূর্ব-পাকিস্তানবাসী বা পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকলেরই কাজ। এদিকে ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষের ও খণ্ডিত ভারতের আদি নাগরিকদের মধ্যে অনেকেরই পূর্ব-পাকিস্তানের আসল স্বরূপ সম্পর্কে অনেক কিছুই অ-জানা আছে; সুতরাং, কিছু কিছু ভুল ধারণাও। আমি মনে করি, আজ আসল অবস্থার স্বরূপ শুধু ভারতে ভারতবাসীর কাছেই নয়, বিশ্ববাসীর কাছেও তুলে ধরা একান্ত দরকার। এইদিক দিয়ে ভারতে জনমতকে যদি উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহলে তাঁরাই ভারতের গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তৃপক্ষের উপর চাপ-সৃষ্টি করে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতের দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে আসল সত্য প্রকাশ করতে তাঁদের বাধ্য করতে পারবেন। পাকিস্তান সরকার মিথ্যার বেসাতি নিয়ে বিশ্বের বাজারে ক্রমাগত বিক্রি করে চলেছেন, আর ভারত কি আসল সত্যটাও পাশাপাশি তুলে ধরবেন না? তাঁরা না তুলতে চাইলে, তাঁদের বাধ্য করতে হবে এবং সরকারকে সেই বাধ্য করানোর কাজ, গণতান্ত্রিক দেশে একমাত্র জনমতই করতে পারে। সেজন্য চাই জনগণকে সম্যক অবহিত করা। আমার ইচ্ছা সেই কাজই করা কিন্তু আমার শক্তি অত্যন্ত সীমিত; তাই আজ আমি নতুনভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগী জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে এবং সাধারণ মানুষের কাছেও তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই।

১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে হঠাৎ একদিনে হয় নি, সে কথাও আগেই বলেছি। এই ব্যাপক দাঙ্গার পটভূমি, দেশ বিভাগের দিন থেকেই সু-পরিকল্পিতভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ীই (according to the plan) সুরু হয়। মুসলিম লীগ দলের সাহায্যে মুসলিম লীগ সরকারের কর্তৃপক্ষ অ-মুসলমান সম্প্রদায়কে সবদিক দিয়েই যুগপৎ আক্রমণ করতে আরম্ভ করেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয়—কোনও দিকই সেই আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। হিন্দুদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোও সেই আক্রমণের আওতা থেকে বাদ যায় না। সেইসব

আক্রমণের কিছু কিছু উদাহরণ আগেই দিয়েছি। সিলেটের ও রাজসাহীর সংস্কৃত কলেজ দুটির বাড়ি ও রাজসাহীর "ভোলানাথ বিশেশ্বর হিন্দু একাডেমির নিজস্ব বাড়ি ও ছাত্রাবাসটির হুকুম-দখল করে নেওয়ার কথা আগেই বলেছি। রাজসাহীর ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানের বাড়ি আজ পর্যন্তও পাকিস্তান সরকার ছাড়েন নি। ১৯৪৮ সালে রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ বাড়ি দুটি 'রিকুইজিশন' করে নেন, আর আজ ১৯৬৭ সাল! এ পর্যন্ত তাদের 'রাহু-মুক্তি' হয় নি। কোনও দিনই আর হবে বলেও মনে করতে পারি না। পূর্ববঙ্গের 'এসেম্বলি'তে বহুবারই ঐ বিষয় তুলে ধরেছিলেম কিন্তু কোনও ফলই তাতে হয় নি। রাজসাহীর হিন্দুদের ঐ দুটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান দুটো হুকুম-দখল করেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেব সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি আরও একটি সাংস্কৃতিক গবেষণাগারও হুকুম-দখল করে নেওয়ার হীন চক্রান্ত করেছিলেন কিন্তু সেটা আর শেষ পর্যন্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। কেন হয় নি, সে কথা ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত এক বন্ধুর কাছ থেকে সম্প্রতি পাওয়া চিঠিটা উদ্ধৃত করলেই সকলে বুঝতে পারবেন। যে প্রতিষ্ঠানটি নেওয়ার ষড়যন্ত্র মজিদ সাহেব করেছিলেন, তার নাম—"বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি" এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু রাজসাহীরই গৌরব ছিল না—এটি ছিল, অখণ্ড ভারতবর্ষেরই গৌরবের বস্তু এবং বিশ্বের ও বহু দেশের সাংস্কৃতিক গবেষণাকারীদের কাছেও অতি সমাদরের ও গৌরবের বস্তু। সাম্প্রতিককালে সাপ্তাহিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় "পাক ভারতের রূপরেখা" পড়ে যে বন্ধুটি আমাকে পত্র লিখে ঐ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নাম—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার। তিনি ছিলেন রাজসাহী শহরের একজন "এম এ, বি এল" উকিল এবং "বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি"র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এখন তাঁর পত্রখানির কিছু অংশ হুবহু উদ্ধৃত করছি :

"...সাপ্তাহিক বসুমতি ২১শে আষাঢ় ও ২৪শে শ্রাবণ; ১৩৭৪ সংখ্যার আপনার 'পাক-ভারতের রূপরেখা' হঠাৎ হাতে পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে পড়ে অশেষ প্রীতি লাভ করলেম—সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। রাজসাহীতে ১৯৪৯—৫০সালে পাঞ্জাবী রাজপুরুষ আবদুল মজিদ সাহেবের ইসলামিক আদর্শের নানা অপকীর্তির কাহিনী সবাই হাড়ে হাড়ে অনুভব তখন আমরা করেছিলাম। হিন্দুর অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে আপনার

অনবদ্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে; এই প্রসঙ্গে যুক্ত বাংলার মূল্যবান কৃষ্টি-সংস্কৃতির কেন্দ্র 'বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি' ও তার সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত হিন্দু-দেবদেবীর ভাস্কর্যের ও শিল্পকলার নিদর্শন কী অভিনব পদ্ধতিতে মজিদ সাহেব ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, তার আনুপূর্বিক বর্ণনায় আর একটি 'মহাভারত' সৃষ্টি হবে। তবে এ ব্যাপারে আপনার পাদপূরণ করা প্রয়োজন—নতুবা তথ্যপূর্ণ আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। (ক্ষিতীশ-বাবুর দেওয়া এই ব্যাপারটির বিষয়ও আমি খুব ভালভাবেই জানতেম। কিন্তু অনেক ঘটনার মত এই ঘটনাটাও আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। ক্ষিতিশবাবু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি তুলে ধরায় আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এবং হিন্দু-মুসলমান সমগ্র বাঙালী জাতিই তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হয়ে থাকলেম।)

মজিদ সাহেব ও তাঁর তত্ত্বধারক তখন Assistant Director of Public Health—Dr. Jabbar (ডাঃ জব্বার)-এর উদ্দেশ্য—মিউজিয়ামের দুইটি মূল অট্টালিকা ও সুবৃহৎ Hall ঘরটি নবপ্রতিষ্ঠিত Unaffiliated Medical Institute-এর জন্য হুকুম-দখল করে নিয়ে মড়া কাটার ঘর করার, যার পূতিগন্ধে মানুষ তো দূরের কথা, ভূতও পালিয়ে যেত! অনেকেই জানেন, রাজসাহীর দিঘাপাতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার রায়ের অর্থানুকূল্যে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের ও অন্যান্য ইতিহাসবেত্তার সহায়তা ও প্রেরণায় এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯১০ সালে স্থাপিত হয়ে প্রায় ত্রিশ সংখ্যার বেশি গভীর গবেষণামূলক গ্রন্থ আন্তর্জাতিক সুধিজনের চিত্ত আকর্ষণ করেছে। আমি নগণ্য হলেও পরলোকগত অক্ষয়কুমারের প্রেরণায় যুবক বয়সেই ১৯২১ সাল থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত কর্মী ছিলেম এবং বৃদ্ধাবস্থায় ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত নানাভাবে রাজসাহীতে যুক্ত ছিলেম। বহুদিন Honorary Secretary ভাবে সম্পাদকতা করায়, আইনের খুঁটিনাটি ও এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সব বিষয়ের সাথেই পরিচিত হওয়ায় এবং শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে ও উচ্চস্তরের কোন কোনও ব্যক্তির সহায়তায় মজিদ সাহেবকে একটু বে-কায়দায় ফেলা হয়। সে অনেক কথা। সেই সময়কার মজিদ সাহেবের রক্তচক্ষু ও সাবধানবাণী স্মরণ করে হাসি পায়। যাক, তবুও সংক্ষিপ্তভাবে যদি চান বা উৎসাহ থাকে, তাহলে এ সম্পর্কে আরও একটু আলোকপাত করতে পারব।"

হিন্দুর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উন্নতির পথে যে সংগ্রাম মুসলিম লীগ সরকার শুরু করেছিলেন, তা' আজও পূর্ব পাকিস্তানে অব্যাহত গতিতেই চলছে। গভর্নমেন্ট (সরকার) বদল হয়েছে। আগের মুসলিম লীগ সরকার আর নেই। তার জায়গায় সামরিক শাসনের অবসানের পর—পরবর্তীকালে, আগের দিনের মুসলিম লীগের 'ভস্মরাশি'র মধ্য থেকে আয়ুব খান সাহেবের নতুন এক কনভেনশনপন্থী মুসলিম লীগ গজিয়ে উঠে এখন পাকিস্তানের শাসন চালাচ্ছেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সেই জেহাদী নীতি বদলায় নি; বরং, অতীতের মুসলিম লীগের চেয়ে আরও উগ্রতা নিয়ে আয়ুবী-লীগ তার স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। আগের দিনের মুসলিম লীগ যা' করেন নি বা ক'রে উঠতে পারেন নি, তা' করেছেন আয়ুবের মুসলিম লীগ। তার একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি :

কুমিল্লার (পূর্ব পাকিস্তান) পরলোকগত দরিদ্র বান্ধব কর্মযোগী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম বাংলাদেশে সর্বজনবিদিত। তিনি নিজে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায় ও উত্তমে সৌভাগ্যের উচ্চ-শিখরে উঠেছিলেন। কিন্তু দরিদ্রকে কখনও ভোলেন নি। তাঁদের জন্য তাঁর অন্তরে ছিল এক অতি কোমল স্থান। তিনি দাতা ছিলেন। দান করতেন, দেশ ও জাতি গঠনের কাজে। দরিদ্র অথচ মেধাবী হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাই তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে 'ঈশ্বর পাঠশালা' নামে একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, 'রাম-মালা' নামে একটি ছাত্রাবাস ও সুবৃহৎ একটি পাঠাগার (লাইব্রেরী) এবং 'নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয়' (গার্লস স্কুল) কুমিল্লা শহরে স্থাপন করে যান। ১৯১৮ সালে স্কুলটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বিশেষ যোগ্যতার ও পারদর্শিতার সাথেই দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত চলে আসছিল। স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া হত এবং স্কুলটি তাঁর বসতবাড়ির প্রাঙ্গণের মধ্যেই ছিল। স্কুল সংলগ্ন একটি স্থানে একটি হিন্দু-দেব-মন্দিরও ছিল। ঐ মন্দিরে প্রতিদিন ভোগ-পূজা প্রভৃতিও যথারীতিই হত। কয়েক বছর আগে, মুসলিম লীগের শাসনকালে 'রাম-মালা' ছাত্রাবাসটির উপর মুসলমানদের প্রথম আক্রমণ হয়। ঐ ছাত্রাবাসে একশত জন দরিদ্র ছাত্র, বিনা-খরচায় থেকে ও খেয়ে স্কুলে পড়তো। এখানকার ছাত্রদের, নিজেদের সব কাজই—এমন কি বাজার করা, পাক করা ও থালা-বাসন প্রভৃতি ধোয়া পর্যন্ত নিজেদের করতে হত। এখানকার শিক্ষাই ছিল এই যে প্রত্যেকটি

ছাত্রকেই আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার উপর গড়ে উঠতে হবে। এইভাবেই এখান থেকে আগামীদিনের স্বাধীন দেশের উপযোগী নাগরিক গড়ে তোলার কাজ নিঃশব্দে এগিয়ে চলছিল। এই ছাত্রাবাসের অনেক প্রাক্তন ছাত্রই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশেষ অবদান জুগিয়েছিলেন। স্বাধীন দেশের উপযোগী জাতীয় চরিত্রকে গড়ে তোলার কাজকে বানচাল করার জন্যই সম্ভবত মুসলিম লীগ সরকার 'রামমালা-ছাত্রাবাস' ও 'রামমালা পুস্তকাগার' দুটি তার প্রাঙ্গণ-সহ হুকুম-দখল (রিকুইজিশন) করে নেন। ফলে, ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানকে বসতবাড়িতে স্থানান্তরিত করতে হয়। মুসলিম লীগ সরকার এই হুকুম-দখল করেই ক্ষান্ত হন না। 'সরকার' রামমালা ছাত্রাবাসটি বে-আইনীভাবে একেবারে দখলই করে নেন। ৺মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীঃহরষচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপর তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের নির্দেশ মত ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো যথারীতি চালিয়ে যাওয়ার ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে অবস্থা বে-গতিক দেখে মাননীয় ঢাকা হাইকোর্টে একটি 'রিট' আবেদন করে মামলা দায়ের করেন এবং ঢাকা হাইকোর্টেও ঐ হুকুম-দখল ও দখল বে-আইনী বলে নাকচ করে দেন। কিন্তু হাইকোর্ট আদেশ দিলে কি হবে? 'সরকার' ঐ আদেশকে 'অষ্টরম্ভা' দেখিয়ে দখল ছাড়েন না! এই অবস্থায় প্রতিকার কি? হিন্দুরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা আর করেন কীভাবে? ভারতসরকার ও ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের, বিশেষ করে ভারতের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 'কংগ্রেস' দলের অনেক নেতাকেই বলতে শুনেছি যে, পাকিস্থান থেকে হিন্দুরা চলে আসেন কেন? তাঁদের ঐ পরাজিতের মনোভাব কেন? বিপদসঙ্কুল ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনেকই ভাল-ভাল কথা বলা যায় এবং নিরাপদে থেকে যাঁরা সে সব কথা শোনেন, তাঁরাও হয়তো 'ভালই' বলেন। কিন্তু কেবলমাত্র ভুক্তভোগীই জানেন—'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?' যাঁকে বিষধর সাপে কেটেছে তিনিই শুধু বোঝেন সাপের বিষের যাতনাটা কত তীব্র। এই প্রসঙ্গে একজন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন নেতার কথা আজ মনে পড়ে। সেই নেতা ছিলেন, শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মহাশয়। বর্তমানে তিনি পরলোকগত। তিনি দেশ বিভাগের পরে একদিন আমাকে বলেছিলেন,—"প্রভাসবাবু, পাকিস্তানে শেষ পর্যন্ত কোনও হিন্দুই হিন্দু হিসাবে থাকতে পারবে না। আপনি এখুনি চলে

আসুন।" আমি তাঁকে সেদিন বলেছিলেম,—"আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কিছুই নেই। আমার এক কাঠা জমিও নেই; সুতরাং আমার কিছুই হারানোর ভয়ও নেই। আমি সেখানে থাকতে চাই শুধু এই জন্তই যে, যে সব অন্যায় অত্যাচার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সেদিকে হবে, সেগুলোকে তো কর্তৃপক্ষের তথা জগদ্বাসীদের কাছে তুলে ধরতে পারবো; ফলে হয়তো একদিন পাকিস্তানে একটা সুষ্ঠু জাতীয়তাবোধ জেগে উঠে একটা "জাতি" গড়ে উঠতে পারবে। আমরা সবাই যদি চলে আসি, তাহলে তো সে পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।"

কিরণবাবু তখন বন্ধুভাবে আমাকে বলেছিলেন, "থাকতে চান, থাকুন; তবে একটা কথা মনে রাখবেন যে, যারা এসে পাকিস্তানে থাকবে, না ভারতে চলে আসবে, সে সম্বন্ধে আপনার মত জানতে চাইবেন, তাঁদের অন্তত বলবেন যে আপনি আছেন ও থাকবেন। কিন্তু তাঁরা থাকবে, না ভারতে যাবে তা' তাদেরই ভেবে ঠিক করতে হবে। আপনি কাউকেই থাকতেও বলবেন না, পাকিস্তান ছেড়ে যেতেও বলবেন না। থাকতে বললে সেখানে কোনও দুর্ঘটনায় তাদের কোনও ক্ষতি হলে তারা আপনার উপরেই দোষারোপ করে বলবে যে, আপনার কথায় থেকেই তো আমার এই সর্বনাশ হল; আবার এদিকে এসে, এদিকের সরকারের কোনও সাহায্য না পেয়ে অনাহারে অ-চিকিৎসায় তাদের আত্মীয়-স্বজনের কেউ মারা গেলে তখন আবার আপনার উপরেই দোষারোপ করে তারাই বলবে যে, দেশে থাকলে তো এই অবস্থায় পড়তে হত না—অন্তত বাড়িতে একটা ঘরের ভেতর থেকেই মরতে পারতেম—গাছতলায় বা রেল-স্টেশনের 'প্লাটফরমে' পড়ে মরতে হত না।"

আমি তাঁর যুক্তির সারবত্তা অন্তরে অন্তরে বুঝি; সত্যিই তো, আমি যাদের রক্ষা করতে পারব না, তাকে থাকতে বলার আমার কী অধিকার থাকতে পারে?

পাকিস্তানে আমরা যে কয়জন কংগ্রেসী হিন্দু নেতা ছিলেম, এই সমস্যা আমাদের প্রায় সকলের কাছেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। দুই-একজন নেতা হয়ত এই দিকটার দিকে বিশেষ 'নজর' দেন নি। পাকিস্তানে থেকে যে কীভাবে আমাদের সেখানে কাজ করতে হয়েছে, সেটা সম্যক বুঝবেন কেবল তাঁরাই যাঁরা অন্তরের দরদ দিয়ে সমস্ত বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করবেন। কিছুতেই বুঝবেন না বা বুঝতে চাইবেন না, সেই সব নেতাই যাঁরা মনে

করেন, পাকিস্তানের এক কোটি ত্রিশ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোককে 'বলি' দিয়েই খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা তাঁরা পেয়েছেন।

পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বিচার পেয়ে থাকেন তার কথা বলতে গিয়েই অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তেই এই কথাগুলো বলতে হল।

যাক, আদি ও অকৃত্রিম মুসলিম লীগ সরকারের তবু কিছুটা চক্ষুলজ্জা ছিল—হয়তো বা তাঁরাও বাঙালী বলেই পূর্ব বাংলার হিন্দুদের উপর একটু দরদও ছিল। কিন্তু বর্তমানের কনভেনশন-পন্থী আয়ুবী-লীগের সে 'বালাই' মোটেই নেই। আদি মুসলিম লীগ সরকার যা' করতে পারেন নি, বা করতে লজ্জা বোধ করেছেন তা' বর্তমানের আয়ুবী-লীগ সরকার বিনা সঙ্কোচেই করেছেন! এর বহু নমুনাই পরে যথাস্থানে তুলে ধরব। বর্তমানে শুধু কুমিল্লার মহেশ-প্রাঙ্গণস্থিত ঈশ্বর পাঠশালা ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাটিরই বাকী অংশই আপাতত তুলে ধরছি। ১৯৬১ সালের ৮ই জুলাই তারিখে, প্রায় শতাধিক মুসলমান বাস্তুত্যাগী জোর করে ঈশ্বর-পাঠশালা প্রাঙ্গণে ঢুকে পাঠশালাটি (স্কুলের) দক্ষিণের অংশ জবর দখল করে। তার পরে, ক্রমশই ঐ সব ভারত থেকে বিতাড়িত পাকিস্তানী মুসলমানরা, যাদের সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার "ভারতীয় মুসলমান" বলে দাবি জানান, ঈশ্বর পাঠশালার ছাত্রাবাস, শরীর চর্চার আখড়া, মন্দিরের সম্মুখের 'নাটমন্দির' দখল করে নেয়। প্রথমে যে জবর-দখলকারীদের সংখ্যা ছিল একশত, তা' বেড়ে এখন দাঁড়ায় পাঁচশো'তে। ১৯৬৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর প্রায় শতখানেক বাস্তুত্যাগী মুসলমান লাঠি-সোটা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র সহ বেশ সুসংহত-ভাবে রামমালা ছাত্রাবাস ও রামমালা ছাত্রীনিবাস দু'টি দখল করে নিতে চেষ্টা করে কিন্তু এবারে ঐ বে-আইনী জবরদখলের চেষ্টায় বাধা আসে ছাত্রাবাসের ও ছাত্রদের এবং শহরের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে; ফলে তাঁরা নির্দয়ভাবে প্রহৃত হয়ে অনেকেই গুরুতররূপে আহত হন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ও ঈশ্বর-পাঠশালার ব্যবস্থাপক কমিটির সভাপতি—শ্রীমণীন্দ্র দেব মহাশয়ের তো প্রহারের চোটে হাড়ই ভেঙে যায়। যখন এই অবস্থা চলছিল তখন "টেলিফোনে" পুনঃপুন থানায় ও পুলিশ সাহেবের আফিসে খবর দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ঘটনার সময় কোনও পুলিশের-ই সাহায্য পাওয়া যায় না। দুর্ঘটনা নির্বিবাদে শেষ হওয়ার

পরে পুলিশ দেখা দেন। ঐ দুর্ঘটনা সম্পর্কে কুমিল্লার ডেপুটি কমিশনার (পূর্বেকার ভাষায়, ম্যাজিস্ট্রেট) বিভাগীয় কমিশনার, শিক্ষামন্ত্রী ও গভর্নরের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করে ও প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে সব ঘটনার বিবরণ জানিয়েও কোন ফল পাওয়া যায় না। মনে হয়, হিন্দু-কৃষ্টির ও হিন্দু-শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটিকে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধায় ফেলে গভর্নমেন্ট বন্ধই করে দিতে চান, যেমন তাঁরা করেছেন, রাজসাহী শহরের "বি, বি, হিন্দু একাডেমী"-কে ও মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজকে। শহরে তো আরও অনেকই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় বড় বাড়ি ছিল, কিন্তু তাদের উপর হামলা না করে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য নির্দিষ্ট সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরই হামলা হয় কেন? এই কথাটাই আজ ভারত-সরকারকে ও ভারতের জনগণকে একবার গভীর-ভাবে ভেবে দেখতে আমি অনুরোধ জানাই। আরও একটি কথা-ও তাঁদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি যে, একটি জেলা-শহরের বুকের ওপর অবস্থিত 'মহেশ-প্রাঙ্গণে'-র মত একটা প্রসিদ্ধ স্থানেই যখন ঐরূপ ঘটনা ঘটতে পারে, তারই যখন কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায় না, তখন গ্রাম-দেশের লোকের নিরাপত্তার কি নিশ্চয়তা দেওয়া যায়? আমরা দেখেছি, গ্রামের লোকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করতে ব্যর্থ হয়েছি তাই, দেশ বিভাগের দিন থেকে পাকিস্তান থেকে হিন্দুর যে বাস্তুত্যাগ শুরু হয়েছে, আজও তার শেষ হয় নি। ভারতে যেসব লোক বাস্তুত্যাগী হয়ে এসেছেন, তাঁদেরও বাড়ি-ঘর ছিল, অনেকের জোত-জমাও ছিল, তাঁদেরও অনেকেই তাঁদের বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত গেলে তাঁরা যথারীতি মর্যাদার সাথেই তাঁদের অভ্যর্থনা করতেন, সেইসব লোকই আজ ভিখারীর বেশে ভারতে এসে কেউ বা 'ফুটপাতে', কেউ বা গাছতলায় আশ্রয় নিচ্ছেন! অন্তরের দরদ দিয়ে আমি এ-দিকের জনগণের ও ভারত সরকারের কাছে আবারও আমার ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ তুলে আবেদন জানিয়ে তাঁদের একবার ঐ সব হতভাগ্যদের অবস্থার কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আজও দেখছি, পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যখন ভারতের সীমান্ত দ্বার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ তখনও পূর্ব পাকিস্তান থেকে হাজার থেকে এগার শো লোক প্রতি মাসে আসাম ও ত্রিপুরায় চলে আসছেন। যাঁরা আসছেন, তাঁরা কি এদিকের সরকারের ও জনগণের আর্থিক অবস্থার কথা শোনেন নি? এদিকে ভারতের দুরবস্থা একটু কিছু

হলেও পাকিস্তানে তার দশগুণ বাড়িয়েই সেখানকার সরকার তা প্রচার করেন। সেসব শুনেও তাঁরা আসছেন। নিশ্চয়ই বিরাট একটা সুখভোগের পরিকল্পনা নিয়ে আসছেন না। তাঁরা আসছেন জীবনের ও 'ইজ্জতের' একটু নিরাপত্তার আশাতেই। খবরে দেখেছি, ভারতের আসাম সরকার ঐ সব বাস্তুত্যাগীদের সেই আশাতেও বাদ সেধেছেন। তাঁরা বাস্তুত্যাগীদের মুখের সামনে তাঁদের রাজ্যের সীমান্তের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ তো দিয়েছেন-ই; তা' দিয়েই তাঁরা নিরস্ত হন নি। ত্রিপুরা সরকারকেও তাঁরা নাকি অনুরোধ জানিয়েছেন যে তাঁরাও যেন তাঁদের রাজ্যে কাউকে ঢুকতে না দেন! এই স্বাধীনতাই পাকিস্তানের হিন্দুরা, তাঁদের তপ্ত-তাজা রক্তের বিনিময়ে পেয়েছেন! তাদের পক্ষে দেখছি, 'জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ।' এখন তাঁদের পক্ষে 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?' বলে ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানানো ছাড়া আর পথ কি? ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র সিংহকে একদিন বলতে শুনেছিলেম যে—"আমি স্বাধীনতার সৈনিক হিসাবে যখন ইংরেজ আমলে 'ফেরারী' অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে কুমিল্লা ও নোয়াখালির বন্ধু বান্ধবদের কাছে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছি, তখন তাঁরা সব বিপদের ঝুঁকি মাথা পেতে নিয়েও আমাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছেন, আর আজ সেইসব লোকই প্রাণের দায়ে আমার কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছেন ও আসছেন, আমি তাঁদের ফেরাই কেমন করে, বা আমার রাজ্যের দরজা তাদের মুখের সামনে বন্ধ করে দিই কেমন করে?" তিনি আজও অতীতের উপকারী বন্ধুদের দান ভোলেন নি। কিন্তু জানি না, আর কতজন ভারতীয় নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীরা পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতাসংগ্রামের দান আজও মনে করেন? আসাম সরকার যে মনে রাখেন নি, তার নমুনা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। আসাম সরকারের এই অখণ্ড জাতীয়তা-বিরোধী মনোভাব আজ নতুন হয়ে দেখা দেয় নি। ৺গোপীনাথ বরদলুই মন্ত্রিত্বের আমলের অনুসৃত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সিলেটকে একরকম জোর করেই পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। একটু আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলেই সিলেটের গণভোটের ফল অন্য রকম হতো এবং সিলেট আসামেরই অঙ্গ হিসাবেই ভারতের মধ্যেই থাকত। তা' হয় নি। হতে দেওয়া হয় নি। আসামের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবসন্তকুমার দাস মহাশয়ের কাছেই আমি সেকথা শুনেছিলেম। তার বিবর

আগেই বলেছি। তারপর ভাষার প্রশ্ন নিয়ে আসামে বাঙালী-নিধনের সংবাদ আজ আর কারোই অজ্ঞাত নয়। আসামের পার্বত্য অঞ্চলেরও ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি আসাম সরকার প্রথম অবস্থায় কোনও আমল-ই দেন নি, ফলে আজ তাঁদের দাবি অনেক উপরে উঠেছে। কোন কোন পার্বত্য জাতি তো ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবি নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামই শুরু করেছেন। আমি মনে করি, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রথম থেকেই সচেতন হয়ে একটু দৃঢ় মনোভাব নিতেন, তাহলে আর আজকের এই পরিস্থিতি দেখা দিত না। কেন্দ্রীয় সরকারও তা' করেন নি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান-ও, যে প্রতিষ্ঠান আজও ভারত-সরকার চালাচ্ছেন তা' করেন নি। এখনও যদি তাঁরা জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী যেসব শক্তি কাজ করছে, তা' কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই হোক, বা বাইরেই হোক, তাদের শক্তহাতে শাসনে আনেন, তাহলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়তো হতে পারে। আজ অত্যন্ত দুঃখের সাথেই লক্ষ্য করছি যে 'সরকারের' ও সরকার-পরিচালক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ তাঁদের ভেতরের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। এই না-পারার জন্যই তাঁরা না পারছেন তাঁদের অন্তরের দরদ নিয়ে এসে কোনও আভ্যন্তরীণ বা বহিঃরাজ্য সম্পর্কে কোনও বলিষ্ঠ নীতি নিয়ে সম্মুখীন হতে। পাকিস্তানের সম্পর্কে ভারতের নীতি তারই একটা নিদর্শন মাত্র। সেই দুর্বলতার জন্যই খান আব্দুল গফুর খান, তাঁর পাখ্‌তুনিস্তানের সংগ্রামে ভারতের কোন সাহায্য পাচ্ছেন না। ছোট একটা দেশ আফগানিস্তান। সে দেশের রাজা জাহির শাহ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিয়েই সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা পাখ্‌তুনিস্তানের সংগ্রামে পুরো 'মদৎ' দেবেন। অতি বৃহৎ ভারত কিন্তু তা' দিতে পারেন নি। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদেরও তাঁদের দেশে নিরাপত্তায় বাস করার কোনও বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না, যদিও দেশ বিভাগের অব্যবহিত আগে থেকেই দুই দেশের মধ্যে বহু চুক্তি ও পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। সেসব কথা আগেই কিছু কিছু বলেছি। ভারত সরকারের ও ভারতের রাজনীতিক সব দলগুলোর-ই দরদভরা মন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের কথা আর একবার ভেবে দেখা দরকার। তাঁদের জেনে রাখা উচিত যে আদি মুসলিম লীগ ও বর্তমানের আয়ুবী মুসলিম লীগ পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেশ বিভাগের দিন থেকেই একটা সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। হিন্দুর

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের 'জেহাদের' সামান্য একটু নমুনা ওপরে তুলে ধরেছি। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঐ সরকারের সর্বাত্মক সংগ্রামের ফলেই পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন আজ বিপর্যস্ত, অর্থনীতিক জীবন পঙ্গু, রাজনীতিক জীবনে আজ তাঁরা 'পারিয়া' বা অন্ত্যজ, বর্তমানের আয়ুব সরকারের মৌলিক গণতন্ত্রের মহিমায় পাকিস্তানের পার্লামেণ্টে (ন্যাশনাল এসেম্বলিতে) একজনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নেই, পূর্ব পাকিস্তানের ১৫০ জন সদস্যের প্রাদেশিক বিধানসভায় মাত্র তিনজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'জে'-হুকুম' সদস্য রাষ্ট্রিক জীবনে অ-মুসলমান সম্প্রদায় আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক! এই অবস্থাটা যদি ভারত সরকার ও ভারতের রাজনীতিক নেতারা মনে রেখে চলেন, তাহলে আমার বিশ্বাস পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানেরও সূত্র খুঁজে তাঁরা পাবেন। আমি সেই সম্পর্কেই ক্রমশ বলব। বলব, কিভাবে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঐ অবস্থা হল এবং কি-ই বা তার প্রতিকারের পথ; অবশ্য, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে।

যাই হোক, ১৯৫০ সালের ব্যাপক দাঙ্গার পরে দিল্লী-চুক্তি হওয়ার সাময়িক কালের জন্য হলেও একটা শান্তির বাতাবরণ আবার সৃষ্টি হওয়ার পথে চলতে শুরু করেছিল। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীসতীন সেন মহাশয় তো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান নেতাদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন বরিশালের বাস্তুত্যাগীদের আবার নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাস্তুত্যাগীরা কেউ ফিরে গিয়েছিলেন কি-না এবং গেলেও কতজন গিয়েছিলেন, তা' আমি সঠিক জানি না। তবে আমার জেলা রাজসাহীতে ধামুরহাট ও পত্নীতলা থানার বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে কিছু কিছু যে স্বেচ্ছায়ই ফিরে এসেছিলেন তা' আমি জানি। আমার জেলায় যাঁরা ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের সকলেই তাঁদের বাড়ি-ঘর ও জোত-জমাও ফিরে পান নি। তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্যই তখন আমাকে অনবরত কর্তৃপক্ষমহলে রাজসাহীতে ও ঢাকায় ঘোরাফেরা করতে হয়। আমার বিশ্বাস পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জেলাতেই কংগ্রেসী হিন্দু জনপ্রতিনিধিগণকে একই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। তারপরেও আর একটি উপসর্গ দেখা দেয়। ঘা-খাওয়া লোক একটুতেই ঘাবড়িয়ে পড়েন। ১৯৫০ সালের প্রচণ্ড ঘা

খাওয়ার পরে সর্বত্রই হিন্দুদেরও সেই অবস্থাই হয়েছিল। তাই, অভিযোগের দরখাস্তও দিন দিন বেড়েই যেতে থাকে। হিন্দুর এই দুর্বল মনোবলেরও পূর্ণ সুযোগ কিছু কিছু সমাজবিরোধী মুসলমানও নিয়েছিল; ফলে ছোট-খাট 'সুঁচ-ফোটান' ঘটনাও চলছিল। এই তো গেল একটা দিক; আবার এও দেখেছি যে হিন্দুর উপরে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোন কোন মুসলমানপ্রধান-ই অত্যাচারিত অভিযোক্তা হিন্দুকেই আমার কাছে নিয়ে এসে তার দরখাস্ত দাখিল করে গিয়েছেন; সুতরাং এইসব কাজ নিয়েই আরও বছর দেড়েক এমনিভাবেই কাটে। হিন্দুদের মধ্যে আবার নতুনভাবে একটা মনোবল ক্রমশ ফিরে আসতে শুরু করে কিন্তু তা' বেশিদিন টিকে থেকে স্থায়িত্বলাভ করতে পারে না।

১৯৫২ সালেই আবার নতুন সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে এসেম্বলির অধিবেশনের 'নোটিশ' পাই। সেই উদ্দেশ্যে ঢাকায় ২।১ দিন আগেই রওনা হয়ে যাই। সেখানে গিয়ে কি নতুন সঙ্কটের সম্মুখীন আমাদের সকলকেই এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীকেই যে হতে হয়, তাই বলছি।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সাল। আজ থেকে পূর্ববঙ্গ বিধানসভায় (এসেম্বলিতে) ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। এই অধিবেশনের প্রথম দিনটিতেই ঢাকার ছাত্ররা 'হরতাল' আহ্বান করেছেন। তাঁরা আরও ঘোষণা করেছেন যে, 'এসেম্বলি'-র অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই তাঁরা বিধানসভাকে 'ঘেরাও' করে 'বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা' করতে হবে এই দাবি তুলবেন। ছাত্রসমাজের মধ্যেও যেমন তোড়জোড় চলেছে, সরকার পক্ষও তাকে প্রতিরোধ করার জন্য সমানেই তোড়জোড় করেছেন। 'এসেম্বলি হাউসের' চতুর্দিকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে

এবং রাস্তায় অবাঞ্ছিত লোকদের চলাচলে বাধা সৃষ্টির জন্য শালকাঠের খুঁটির সাথে কাঁটাতারের ঘেরা রাস্তা-আটকানোর বেড়া (road-block) নিয়ে এসে বিভিন্ন দিকের রাস্তায় বসিয়েছেন ও বিরাট পুলিশবাহিনী রাস্তায় রাস্তায় মোতায়েন করেছেন। উভয় পক্ষই সমানে প্রস্তুত। ছাত্ররাও প্রস্তুত, তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে যেতে এবং সরকারপক্ষও সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত, ছাত্রদের ঘোষিত 'ঘেরাও'-কে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ ও ব্যর্থ করতে। সারা সহরে সকাল থেকেই একটা থমথমে ভাব দেখা দিয়েছে। বিকেল তিনটের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কথা। আমাদের বাসা 'এসেম্বলি হাউস' থেকে অনেকটা দূরে। আমরা থাকি বাংলা-বাজারের ডাল-পট্টিতে, আর 'এসেম্বলি হাউস' হচ্ছে রমনার প্রায় শেষ প্রান্তে। দুয়ের মধ্যের দূরত্ব অন্তত দুই মাইলের বেশি ছাড়া কম হবে না। কুমিল্লার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আমি একটি রিক্সা নিয়ে বেলা দুটোর পরই এসেম্বলি হাউসের উদ্দেশ্যে রওনা হই। রাস্তায় কোথাও বাধা পাই নি। বাধা পাই এসেম্বলি হাউসের কাছাকাছি গিয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে। ছাত্ররা তখনও রাস্তায় নামেন নি। মেডিকেল কলেজের 'গেটে'-র মধ্যেই অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের রিক্সায় যেতে দেখে তাঁরা আমাদের রিক্সা থেকে নামতে বলেন। আমরা সাথে সাথেই নেমে পড়ি। নামার উদ্যোগ করতেই পুলিশের ডি-আই-জি জনাব ওবেদুল্লা সাহেব ছুটে এসে আমাদের বলেন,—"নামবেন না, স্যর। আপনারা চলে যান।" ধীরেনবাবু তার উত্তরে ওবেদুল্লা সাহেবের পিঠে সস্নেহে হাত দিয়ে বলেন,—"Let us obey the boys first"—(ছেলেদের হুকুমই আগে তামিল করি)। এর মধ্যে দুটি ছেলে এগিয়ে এসে আমাদের হাত ধরে বেশ অভ্যর্থনা সহকারেই আমাদের কলেজের প্রাঙ্গণে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দেখি শত শত ছাত্ররা অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় জমায়েত হয়ে আছেন। সেই উত্তেজিত ছাত্রের দলের মধ্যে থেকে একটি ছাত্র বলে ওঠেন—"এঁদের বেঁধে রাখ। যেতে দিও না।"

ধীরেনবাবু ছাত্রদের সম্বোধন করে বলেন,—"My dear boys, you don't know, who am I. It was I—Dhiren Dutt—who first raised the claim of Bengali as one of our State-languages in the pakistan Constituent Assembly. It was I who set the

ball rolling. অর্থাৎ আমার প্রিয় ছেলেরা, তোমরা জান না যে আমি কে? আমি-ই সেই ধীরেন দত্ত যিনি পাকিস্তানের সংবিধান-সংসদে সর্বপ্রথমে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বলে দাবি উঠিয়েছিলেন। আমি—ধীরেন দত্ত-ই এই আন্দোলনের সূত্রপাত করি।"

এইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছে, তখন একটি ছেলে আমার পাশে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি প্রভাস লাহিড়ী কি না! আমি তার উত্তরে 'হাঁ', বলায় তিনি বলেন,—"আপনারা ফরিদপুর জেলায় সফরে গিয়ে যখন 'ভাঙ্গা'য় গিয়েছিলেন, তখন আমি ভাঙ্গা স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তেম এবং আপনাদের সাথে আমাদের কয়েকজনের আলাপও হয়েছিল।" আমারও তখন মনে পড়ে যায় যে সেই কয়েকটি ছাত্রই আমাদের মালপত্র নিজেরাই বয়ে আমাদের লঞ্চে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন যাঁকে স্কুলের ছাত্র দেখেছিলেম, তিনি-ই এখন মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র। এই ছাত্রটি আমার পরিচয় পাওয়ার পরে তাঁর ছাত্র-বন্ধুদের বলেন, 'এঁদের দোষ কি? এঁরা তো হিন্দু কংগ্রেসী এম-এল-এ। এঁদের কথা কি মুসলিম লীগ সরকার শোনেন?" এই কথা শোনার পরই হাওয়া পাল্টে যায়। তাঁরা আমাদের সঙ্গে তার পরে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহারই করেন। আমরা দেখি, ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা যথেষ্টই আছে এবং সেই উত্তেজনারও স্থায়সঙ্গত কারণই আছে। একটি ছাত্র এগিয়ে এসে একটি কাঁদুনে গ্যাসের খালি খোল (empty shell) ধীরেনবাবুর হাতে দিয়ে বলেন,—আপনারা দেখছেন তো, আমরা আমাদের প্রাঙ্গণের বাইরে রাস্তায় যাই নি। আমরা আমাদের প্রাঙ্গণেই সভা করছিলাম, তখন পুলিশবাহিনী আমাদের সীমানার ভেতরে ঢুকে কাঁদুনে গোলা ছুঁড়েছে। এই একটি খোল তার নমুনা হিসাবে আপনাকে দিচ্ছি। আপনি এসেম্বলিতে গিয়ে এই তথ্যটা প্রকাশ করবেন।" ধীরেনবাবু রাজী হয়ে খোলটি নেন। তখন ছাত্ররাই উদ্যোগী হয়ে আমাদের সদর ফটক দিয়ে যেতে না দিয়ে যেখানে পুলিশ-পাহারা নেই, একটি স্থান দিয়ে—কাঁটাতারের বেড়া ফাঁক করে ধরে বের করে দেন। সদর 'গেট' দিয়ে আমাদের যেতে দেন না, সম্ভবত এই কারণেই যে তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, পুলিশের কাঁদুনে গ্যাসের ঐ খালি খোলটি হয় তো আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন মনে করে। যেদিক দিয়ে আমরা তারের বেড়া পার হই, তার সামনের রাস্তাটা পার হলেই

'এসেম্বলি হাউস।' রাস্তা পার হয়ে আমরা এসেম্বলি হাউসে গিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট আসন নিয়ে বসি। সময় হয়ে গিয়েছিল। স্পীকার এসে তাঁর আসনে বসেন। তারপরে যথারীতি কোরান 'তেলাওৎ' করার পরে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হয়। প্রশ্নোত্তরের ঘণ্টা তখনও শেষ হয় নি। এমন সময় আমাদের দুইজন কংগ্রেসী বন্ধু—(১) শ্রীমনোরঞ্জন ধর ও (২) শ্রীগোবিন্দ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঝড়ের বেগে বিধানসভার মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ঢুকে যেন বোমার মত ফেটে পড়েন। মনোরঞ্জনবাবু বলেন,—'মেডিকেল কলেজের সীমানার মধ্যে পুলিশ গুলি চালিয়েছে এবং একটি ছাত্র নিহত হয়েছেন।' গোবিন্দবাবুও সেইটি সমর্থন করে বলেন যে তাঁরা উভয়েই নিহত ছাত্রটিকে দেখে এসেছেন। তদুত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সাহেব অনেক কথাই তখন বলেছিলেন। আমার সব কথা মনে নেই; তবে তাঁর একটি কথাই আজও যেন আমার কানে বাজে। সেই কথাটি হচ্ছে—"It is a phantastic story" অর্থাৎ এটা একটি অবিশ্বাস্য গল্প। আমাদের দলের নেতা তখন বলেন যে নুরুল আমিন সাহেবকে তাঁর বিশ্বস্ত কোনও এসেম্বলির সদস্যকে পাঠিয়ে সঠিক সংবাদ আনতে বলেন। এই কথা বলার সাথে সাথেই শাসক মুসলিম লীগ দলেরই একটি বৃহৎ অংশ মৌলানা আব্দুল রসিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে ফেটে পড়েন। তাঁরা বলেন,—"না, অন্য কেউ গিয়ে খবর আনবে না। নুরুল আমিন সাহেবকে স্বয়ং গিয়ে দেখে খবর নিয়ে আসতে হবে। তা' না-হলে আমরা এসেম্বলির কাজ কিছুতেই চালাতে দেব না।" তখন এসেম্বলির বাইরে ছাত্রদের মধ্যে যে উত্তেজনা চলছিল, সেই অবস্থায় নুরুল আমিন সাহেব খবর আনতে গেলে তাঁর আর ফিরে এসে সে খবর দেওয়ার সুযোগ মিলতো না! ছাত্ররা এসেম্বলির দিকে 'লাউড-স্পীকারের' চোঙার মুখ করে কেবল বলে চলেছেন, পুলিশের গুলিতে কতজন ছাত্র নিহত হয়েছেন। সে স্বর 'এসেম্বলি চেম্বারের' বন্ধ দরজার ভেতর দিয়েও ভেসে আসছে। সে এক কী করুণ অথচ উত্তেজনাকর যে অবস্থা আমাদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে, তা' আর আজ এতদিন পরে ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—হয়তো সেদিনও আমার অক্ষম ভাষার দৈন্য, আমাদের মনের তৎকালীন অবস্থা সম্যক প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোত। এইরূপ উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে কিছুক্ষণ বাক্-বিতণ্ডা চলার পরে আমাদের

নেতা বসন্তবাবু ঘোষণা করেন যে, "বিরোধী দলের আমরা—কংগ্রেসীরা ঐ অবস্থায় আর বিধানসভার কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারি না ; সুতরাং আমরা এসেম্বলি থেকে বের হয়ে যাচ্ছি।" আমরা বের হয়ে যাই। ঐ দিনের এসেম্বলি থেকে বের হয়ে যাওয়ার মধ্যে আমরাই শুধু একক দল ছিলেম না। আমরা ছিলেম পথ-প্রদর্শক। আমাদের দেখাদেখি তপশীলভুক্ত 'ফেডারেশনের' সদস্যরাও বের হন। মৌলানা তর্কবাগীশের নেতৃত্বে মুসলিম লীগেরও একটি অংশ আরও কিছুটা সময় হৈ-হল্লা, চিৎকার ও তর্কাতর্কির পর বেরিয়ে যান। শাসক দল মুসলিম লীগের মধ্যে এই সর্বপ্রথম একটু 'চিড়' দেখা দেয় ; অবশ্য ঐ চিড় তখনই একটা সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে ফেটে ভেঙে পড়ে না—আরও কিছুদিন পরে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় একেবারে ভেঙে ধ্বসে পড়ে। যাক সে পরের কথা। এখন ঐ ঘটনাকে উপলক্ষ করে বিরোধী দলের সব সদস্যই ও মুসলিম লীগেরও একটি অংশ বের হয়ে গেলে বিধানসভার অধিবেশনও বন্ধ হয়ে যায়।

বের হওয়ার পরে শ্রীধীরেন দত্ত মহাশয় ও আমি মেডিকেল কলেজের ভেতরে যাই। ফটক (গেট) দিয়ে ঢুকেই অল্প কিছুটা গিয়েই রাস্তার কাছেই ডানদিকে একখানি ছোট দো-চালা ঘর দেখি। ঘরটি ঢেউতোলা টিনের, কি খাপরার তা' ঠিক মনে পড়ছে না ; তবে তার মেজেটা সিমেন্ট করা বাঁধান ছিল। সেই ঘরের বারান্দার ওখানে বেশ কিছুটা ছাত্রদের ভিড় দেখে আমরাও সেদিকে এগিয়ে যাই। গিয়ে যে দৃশ্য দেখি, তা' জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। জীবনে মৃত্যু আমি অনেকই দেখেছি, হত্যাও কিছু কিছু দেখেছি কিন্তু একটি স্বাধীন দেশের পুলিশ, যাঁদের হাতে জন-জীবনের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার ন্যস্ত ; যাঁরা নাগরিকদেরই আপনজন, পরাধীন দেশের পুলিশের মত আজ আর যাঁরা শুধু বেতনভুক হুকুমবরদার ও বিদেশীর চাকর নন, তাঁরা যে এমন নৃশংসভাবে নিরীহ ও নিরস্ত্র তরুণ নাগরিকদের বাসস্থানে ঢুকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে, তা' কল্পনাও করতে পারি নি ; কিন্তু তা-ই দেখতে হল। দেখলেম। ব্রিটিশ আমলে আরও একবার এই ঢাকাতেই ১৯৪২ সালে ঢাকা জেলের ভেতরে নিরস্ত্র কয়েদীদের পুলিশকে হত্যা করতে দেখেছিলেম—সেদিন তারা প্রাণভয়ে যেসব কয়েদী গাছের উপর উঠে লুকিয়ে ছিল, তাদের পাখী শিকার করার মত করে গুলী করে হত্যা করেছিল এবং তাদের গুলীতে

আহত বা নিহত হয়ে যে কয়েদী গাছ থেকে মাটিতে পড়তো তার নিস্পন্দন দেহকে ঘিরে পুলিশের সেদিন তাণ্ডব নৃত্যও দেখেছি কিন্তু সেদিনের পুলিশ ছিল বেতনভুক্ বিদেশী সরকারের চাকর কিন্তু আজকের পুলিশ তো তা' নয়। তারা আমাদেরই আত্মীয়, আমাদেরই স্বজন, আমাদেরই একান্ত আপনজন! আমি ধারণা করেছিলেম, স্বাধীন দেশের পুলিশের কাজ হবে স্বেচ্ছাসেবকের কাজের মত জনসেবা কিন্তু সেদিনে যে অবস্থা দেখলেম তাতে আমার বহুদিনের সযত্নে পোষিত স্বাধীন দেশের পুলিশের কাজ সম্পর্কীয় ধারণা যে কত ভুল, তা বুঝলেম। বুঝলেম দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু লৌহ-কাঠামো যা' বিদেশী ইংরেজ সরকার রেখে গিয়েছিলেন, তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। সেই আমলাতন্ত্র আগেও যেমন চলছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তা-ই চলছে।

যাক, বারান্দায় গিয়ে আমরা একটি তরুণের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখি। ছেলেটির মাথার খুলির উপরের খানিকটা অংশ সম্পূর্ণভাবে উড়ে গিয়েছে। মাথার ভেতরের 'ঘিলু' সব ওখানেই গড়িয়ে পড়েছে। মাথার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। মৃতদেহটির অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে যে-কোনও ব্যক্তিই বলবেন যে ছেলেটিকে ওখানেই হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যু সব সময়েই বেদনাদায়ক, হত্যা আরও বেদনাদায়ক ও ভয়ঙ্কর; কিন্তু সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলেম, তা' আমার কাছে অত্যন্ত বীভৎসরূপে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছিল। আর দেখতে পারলেম না। ধীরেনবাবু ও আমি তারপরে যাই হাসপাতালের দোতলায়, যেখানে আরও সব আহত ছাত্ররা ছিলেন। প্রথমে যে 'হল' ঘরটিতে যাই, সেখানে ছিলেন প্রায় ২০।২২ জন গুরুতররূপে গুলীতে আহত ছাত্ররা। শুনলেম, তাঁরাই নাকি কম আহত! সেই কম আহতদের (!) কাতর আর্তনাদে ও চীৎকারে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। সেই ভারী বাতাসে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল; তাই সেখান থেকে পাশের অপর একটি 'হল' ঘরে যেখানে নাকি মুমূর্ষুভাবে আহতেরা ছিলেন যাই। সেখানেও দেখি ১৫।২০ জন আহত ছাত্র। একটিরও জ্ঞান নেই। চীৎকারও নেই। সকলকেই 'অক্সিজেন' দেওয়া হচ্ছে। দেখে আমার মনে হয়, ঐ আহতদের একজনও বোধ হয় বাঁচবেন না। কতজন যে বেঁচেছিলেন জানি না। সরকারী তথ্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে সেইদিনের গুলী চালনায় নাকি মাত্র তিনজন

মারা গিয়েছেন। সংবাদপত্রে দেখেছি মোট তেরজন। ছাত্রদের কাছ থেকে শুনেছি আরও অনেক বেশি। পুলিশ যখন গুলী করে জনসাধারণকে হত্যা করে তখন তার সঠিক খবর আগেও কোনও দিন পাওয়া যায় নি; আজও তা জানা যায় না। সুতরাং সেদিনকার গুলী চালনায় কতজন মারা গিয়েছিলেন তা' সঠিকভাবে আজ বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হাসপাতালে যখন আহতদের দেখছিলেম তখন অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আমি বোধ হয় কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সেখানকার হাসপাতালে গিয়েছি! সে দৃশ্য আর সহ্য করতে মোটেই পারছিলেম না। ধীরেনবাবুকে তাই বলি,—'চলুন, এখন আমরা বাসায় যাই।' ধীরেনবাবুর অবস্থা তো আমার চাইতেও খারাপ। তিনি তো ঘোরতর অহিংস গান্ধী-কংগ্রেসের রাজনীতিই বরাবর করে এসেছেন; সুতরাং তিনি আমার কথায় বিনা বাক্যব্যয়ে রাজী হন এবং আমাদের বাসার পথে হেঁটেই রওনা হই। সেইদিন গভীর রাতেই 'রেডিও'-তে ঘোষণা করা হয় যে এসেম্বলির অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। পরদিন সকালে 'রেডিও'-তে সেই সংবাদের সাথে সাথে আরও শুনি, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেবের বিবৃতি। তিনি ঘোষণা করেছেন যে,—ছাত্রদের ঐ ভাষা-আন্দোলনের উদ্যোক্তা আসলে নাকি ছাত্ররা ছিলেন না। তার প্রেরণা ও প্ররোচনা দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'কম্যুনিস্টরা' এসে এবং আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন হিন্দুরা মুসলমানের লুঙ্গি ও পায়জামা পরে ছদ্মবেশ ধরে! তখনও বুঝি নি যে ঐ ঘোষণার পেছনের গূঢ় উদ্দেশ্য কী ছিল এবং কে-ই বা নুরুল আমিন সাহেবের ঐ ঘোষণার পেছনে প্রেরণা ও প্ররোচনা জুগিয়ে-ছিলেন। পরে অবশ্য তা' ভালভাবেই জেনেছি। যাক, ঘোষণা তো হল কিন্তু তার সমর্থনে তো কিছু করা দরকার! করাও হল। প্রথম দিনেই দুই কংগ্রেস নেতা—শ্রীমনোরঞ্জন ধরকে ও শ্রীগোবিন্দলাল ব্যানার্জীকে পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে জেলে নেওয়া হল। এই মনোরঞ্জনবাবু ও গোবিন্দবাবুই এসেম্বলিতে সর্ব প্রথমে পুলিশের গুলীচালনায় ও একটি ছাত্রের তাতে নিহত হওয়ার কথা প্রকাশ করেছিলেন। তার পরের দিন অনেক ভেবে-চিন্তেই আর একজন কংগ্রেসের নেতা বরিশালের শ্রীসতীন সেন মহাশয়কেও গ্রেপ্তার করা হল। ভাবটা যেন এই যে ওঁরাই লুঙ্গি বা পায়জামা পরে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে মিশে গিয়ে আন্দোলনটি পরিচালনা করেছিলেন।

আসলে কিন্তু ঐ ভাষা-আন্দোলনের সাথে কংগ্রেসের তো নয়-ই—অন্য কোনও রাজনীতিক দলের নেতাদেরও কোনই সক্রিয় বা পরোক্ষ সংস্রব ছিল বলে ঢাকায় থেকেও আমরা কেউ-ই জানি না। নুরুল আমিন সাহেবের ঐ ঘোষণার পেছনে কোনও সত্য আদৌ ছিল বলে আমি মনে করি না। আমি মনে না করলে কি হবে? এই হাঙ্গামা ও আন্দোলনের পেছনে যে অদৃশ্য হাতের খেলা সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুসারে চলছিল, তার জন্যই প্রয়োজন, কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার ও ভারতের 'কম্যুনিস্ট'-দের ঘাড়ে ঐ আন্দোলনের সব দোষ ও দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া। কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার করে পরিকল্পনার পেছনের অদৃশ্য নায়ক 'এক ঢিলে দুই পাখি' মারতে চেয়েছিলেন। মনোরঞ্জনবাবু, গোবিন্দবাবু ও সতীনবাবুর মত নামকরা কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে একদিকে হিন্দুদের মনোবল আবার ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন এবং অপরদিকে দেশের মুসলমান জনসাধারনকে ও বিদেশী রাষ্ট্রসমূহকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী আগেও যেমন ছিলেন, ঘটনার চাপে পাকিস্তান সৃষ্টিতে রাজী হলেও এখনও পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কাজেই লিপ্ত আছেন! পাকিস্তান সরকারের পরিচালক রাজনীতিক নেতাদের মতে পাকিস্তানে যে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়েছে—"পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস"—সেই প্রতিষ্ঠানটি ছদ্মনামে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের"-ই একটি অংশ হিসাবেই কাজ করছেন! ভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশেই তাঁরা চলেন! এই হল আসল উদ্দেশ্য; তা ছাড়া আরও ব্যক্তিগত আক্রোশও ওঁদের উপর থাকা অসম্ভব নয়। মনোরঞ্জনবাবু ও গোবিন্দবাবু পুলিশের গুলীচালনার ও ছাত্রকে নিহত করার কথা প্রকাশ করে দেওয়াতেই এসেম্বলিতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে এসেম্বলির অধিবেশন বন্ধ করে দিতে হয়। সতীনবাবু, ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরে বরিশালের তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ফারুকি সাহেবকে বরিশালের 'হিন্দুমেধ যজ্ঞের' জন্য প্রকাশ্যভাবে দায়ী করেন; সুতরাং তাঁর উপরও আক্রোশ থাকা অসম্ভব নয়। এখন একটা কথা উঠতে পারে যে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে যে তিনজন কংগ্রেসের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদের চেয়েও কংগ্রেসে আরও উচ্চ স্তরের নেতা ছিলেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করলে তো কংগ্রেসীদের ঐ আন্দোলনের সাথে যোগাযোগের প্রমাণ আরও জোরদার হোত, কিন্তু তা' করলেন না কেন, 'সরকার?' * তার কারণ, উচ্চ স্তরের নেতা

বসন্তবাবু বা ধীরেনবাবুর গায়ে হাত দিলে ভারতে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তাতে ছিল। পাকিস্তানের নীতির কথা বলতে গিয়ে আগেই বলেছি যে তাঁদের নীতিই ছিল নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া, যা'তে ভারতে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়। "সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না।" সেইটাই বুদ্ধিমানের কাজ। পাকিস্তানও তাই করেছেন। কংগ্রেসের ঐ তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরে হিন্দুর যে মন একেবারে ভেঙে পড়েছিল, সেই ভাঙা মন আবার যখন ধীরে ধীরে নেহরু-লিয়াকত-চুক্তির পর জোড়া লাগতে শুরু করেছে, অর্থাৎ হিন্দু যখন আবার মনে করতে শুরু করেছেন যে এবারে হয়তো এখন থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিজের দেশে, নিজের বাড়িঘরে থাকতে পারবেন, তখনই আবার তাঁদের মনে আঘাত দিয়ে তাঁদের কোন রকমে জোড়া দেওয়া মনকে ভেঙে দেওয়া দরকার মনে করেছেন পাকিস্তানের উচ্চ স্তরের ছককাটা নীতির (যা'র কথা পূর্বেই বলেছি) পূর্ববঙ্গের সুষ্ঠু রূপকার মুখ্যসচিব মশায়। আমি পাকিস্তানে থেকে পুনঃপুনঃ দেখেছি যে যখনই এক-একটা ধাক্কার পরে অনেক হিন্দুই চলে যান এবং পরে আবার কিছু হিন্দু ফিরেও আসেন, অবস্থা একটু শান্ত হলেই নতুন আশা বুকে নিয়ে তখনই আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা এসে আরও অনেককে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করায়। এই লুকোচুরি খেলাই সেখানে এযাবৎ চলে আসছে। এই কথাটা ভারত-সরকার ও ভারতের নাগরিকরা যত শীঘ্র বোঝেন, ততই দেশের অখণ্ডতা ও অস্তিত্বের বজায় থাকার একটা পথ ও উপায় দেখা দেবে বলে আমি মনে করি।

পূর্ববঙ্গ সরকার তাঁর মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেবের মুখ দিয়ে এই আন্দোলন সম্পর্কিত ঘোষণায় ভারত থেকে যে 'কম্যুনিস্ট'-দের আমদানি করেছিলেন, তার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে পাসপোর্ট প্রথা চালু করে আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা অ-মুসলমান সম্প্রদায়কে দেওয়া। সে সম্পর্কে একটু পরেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

যা'ক, এসেম্বলির অধিবেশন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। ঢাকায় বসে থেকে আর কি করবো? তাই ঢাকা থেকে রাজশাহীতেই রওনা হই। যাওয়ার পথে ঢাকা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত প্রতি রেল স্টেশনেই দেখি, ছাত্রদের শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভপ্রদর্শন। প্রতি স্টেশনেই সেদিন বিক্ষোভকারীদের মুখে শুনেছি শুধু একটি আওয়াজ একটিই ধ্বনি। সে ধ্বনি ছিল—"নুরুল

নুরুল আমিনের রক্ত চাই।" রেলগাড়ির কামরায় কামরায়ও ঐ একটি 'স্লোগান'ই লেখা দেখেছি। ঘটনাক্রমে নুরুল আমিন সাহেব খুনী হলেন কিন্তু সত্যিই কি তিনি খুনী ছিলেন? ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে মেলা-মেশা করে কিন্তু আমার তাঁকে অতটা খারাপ লোক বলে মনে হয় নি। আসল খুনী যিনি ছিলেন তিনি পরোক্ষে অদৃশ্য! গণতন্ত্রে আমলারা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসেন না। তাঁদের সব দুষ্কর্মের জন্য দায়ী হতে হয় মন্ত্রীদের। মন্ত্রীরা যদি ব্যক্তিত্বহীন হন তাহলেই তাঁদের আমলাতন্ত্রের জাঁতা-কলে পড়তে হয়। মন্ত্রীদের ব্যক্তিত্ব তখনই লোপ পায়, যখন তাঁদের মধ্যে দেখা দেয়—লোভ। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—"লোভ থেকেই আসে মোহ, মোহ থেকেই পাপ, পাপ থেকেই বুদ্ধি-ভ্রংশ এবং বুদ্ধি-ভ্রংশ হলেই মৃত্যু।" আমার মতে নুরুল আমিন সাহেবের মধ্যেও সেই দোষই দেখা দিয়েছিল এবং সেই দোষে তিনি দুষ্ট অবশ্যই হয়েছিলেন। প্রথমে এসেছিল মুখ্যমন্ত্রিত্বের লোভ; সেই লোভ থেকেই দেখা দিয়েছিল, গদি-রক্ষার মোহ; সেই মোহের মধ্য দিয়েই তাঁর শরীরে ঢুকেছিল পাপ; আর ঐ পাপ থেকেই তাঁর ঘটেছিল বুদ্ধি-ভ্রংশ এবং সেই বুদ্ধি-ভ্রংশের ফলেই তিনি হয়েছিলেন জনসাধারণের কাছে খুনী এবং তার ফলেই তাঁর ও তাঁর দল মুসলিম লীগের হয়েছিল রাজনীতিক জীবনের অপমৃত্যু। আজ নুরুল আমিন সাহেব সেই লোভ কাটিয়ে উঠেছেন, তাই মোহ আর তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এখন তাই তিনি রাজনীতিক জীবনে আবার নবজন্ম লাভ করে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে অংশ নিতে চলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এসে এখানেও আমি সেই একই দৃশ্য দেখলেম। তাই আমার অতীত দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বন্ধু এবং বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রের একজন শ্রেষ্ঠ কর্মী শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয়কেও দেখলেম, যে তিনিও নুরুল সাহেবের মতই রাজনীতিক মৃত্যু বা অপমৃত্যু বরণ করে নিতে বাধ্য হলেন। এমনিভাবেই রাজনীতিক নেতাদের ও দলের উত্থান ও পতন সর্বত্রই হয়ে চলেছে। যতদিন মানুষ লোভমুক্ত থাকেন, ততদিন তাঁর উত্থানের গতি সমানেই চলতে থাকে; আবার যখন দেখা দেয়, তাঁর মধ্যে লোভ তখনই পতন আর কিছুতেই ঠেকান যায় না। নুরুল আমিন সাহেবেরও যায় নি, প্রফুল্লবাবুরও পতন ঠেকান যায় নি।

যাক, রাজসাহীতে গিয়ে তো পৌঁছলেম। কিছুদিন পরেই একজন অতি

উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী—রাজসাহী বিভাগের পুলিশের ডি আই জি (D.I.G) জনাব এক আর খন্দকার আসেন রাজসাহীতে। তাঁকে আমি বহুদিন আগে থেকেই জানতেম। তিনি ছিলেন বৃটিশ আমলের আই পি এস (I. P .S.) কর্মচারী। পরাধীনতার যুগে আমি পুলিশকে যে চোখে দেখতেম, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমার দৃষ্টি-ভঙ্গির আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আমার ধারণা, স্বাধীন দেশের পুলিশ হবে স্বেচ্ছাসেবকের মত সেবাপরায়ণ। তা' অবশ্য আজও হয় নি; তবু তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমি তাঁদের বন্ধুভাবেই দেখতে চেষ্টা করি এবং এখনও আশা রাখি যে, আজও পুলিশের মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে—আজও বৃটিশের শেখান যে শোষণ ও দাম্ভিকতার প্রবৃত্তির রেশ তাঁদের অনেকের মধ্যেই আছে তা' একদিন অবশ্যই সংশোধিত হবে। খন্দকার সাহেবের মধ্যে এই দুর্নীতির প্রবৃত্তি আমি দেখি নি। সর্বোপরি তাঁর মধ্যে আমি সাম্প্রদায়িকতারও কোন চিহ্ন দেখি নি; তাই তিনি যখনই রাজসাহীতে আসেন, তখনই আমাকে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠান এবং আমিও ডাক পেলেই দেখা করতে যাই ও বন্ধু-ভাবেই আলাপ-আলোচনাও করি। এবারেও খন্দকার সাহেব এসেই আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমিও দেখা করতে যাই। একজন অত্যন্ত দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসাবেই তিনি যখন যে জেলাতেই যান বা যেখানেই থাকেন, সেখানেই তাঁকে দেখেছি তিনি স্থানীয় জননেতাদের অর্থাৎ যাঁদের সাথে জনসাধারণের যোগাযোগ আছে তাঁদের সাথে দেখা করে আলাপ-আলোচনা করেন। ঢাকাতে যখন তিনি পুলিশের আই বি (I. B.) বিভাগের ডি আই জি তখনও তাঁকে দেখেছি, বাংলার প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা "মহারাজ"কে (শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে) ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক দিনই নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। রাজসাহীতে এসে এবারে আমার সাথে যে কথাবার্তা হয়, তার যতটা আজ এতদিন পরেও মনে পড়ে তাই এখানে তুলে ধরছি:

খন্দকার—ঢাকাতে এবারে কি দেখে এলেন?

আমি—যা' দেখে এলেম, তাতে একটা আশার আলোই দেখলেম। আপনার অর্থাৎ পুলিশের লোকেরা গুলী চালালেন, ছাত্ররা মরলেনও, তবু যে আবার তাঁরা গুলীর সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়ালেন, এটাতেই আমি আশার আলো দেখেছি।

খঃ—আপনার সাথে আমি একমত হতে এখনও পারছি না। কেন যে পারছি না, তা' বলার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আচ্ছা আপনাকে যদি এই ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হতো, তা' হলে আপনি মুক্তি পাওয়ার জন্ম কোনও 'বণ্ড' (bond) দিতেন কি ?

আঃ—না, কিছুতেই দিতেম না।

খঃ—তা' আমি জানি। আপনি জানেন, বৃটিশ আমলে আমি কলকাতায় কেন্দ্রীয় আই বি অাফিসেও ছিলেম। আপনাদের 'ফাইল'গুলোও আমি দেখেছি। তার ভেতর দিয়ে আপনাদের যে অটুট সঙ্কল্পের পরিচয় পেয়েছি, তাতেই জানি যে আপনারা গ্রেপ্তার হলে মুক্তির জন্ম 'বণ্ড' দিতেন না। কিন্তু এখানেই দেখেন, আপনাদের একজন সহকর্মী মুসলিম লীগের এম এল এ মাদার বক্স সাহেব গ্রেপ্তার হওয়ার পনের দিনের মধ্যেই 'বণ্ড' দিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। জেলখানায় তাঁর তো কোনও অসুবিধাই ছিল না। জেলখানার পাশেই তাঁর বাড়ি। বাড়ি থেকেই প্রতিদিন দুই বেলা তাঁর খাবার জেলখানায় যেত ; তবু তিনি 'বণ্ড' দিলেন ! তাতেই বুঝবেন, আপনাদের সেই অটুট সঙ্কল্প পেতে মুসলমানদের এখনও বহু—বহুদিন লাগবে ; আরও পঞ্চাশ বছরও লাগতে পারে।

আঃ—আপনি 'নজির' দেখালেন, সেই দলের একজন নেতার, যে দল কখনও রাজনীতিক কারণ উপলক্ষে অর্থাৎ তাঁদের প্রার্থিত 'পাকিস্তান' অর্জনের জন্ম কখনও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তৎকালীন বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন নি। তাঁরা যে সংগ্রাম করেছেন, তা' হচ্ছে—ভাই-এর বিরুদ্ধে ভাই-এর সংগ্রাম—হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের সংগ্রাম। তাঁদের ভাবটা যেন এই ছিল যে, হিন্দুরাই দেশটা দখল করে রেখেছেন ! তাঁদের নিজেদের শক্তির উপর যদি বিশ্বাস থাকতো, তাহলে তাঁরা সর্বপ্রথমে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি নিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতেন এবং দেশকে স্বাধীন করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যদি হিন্দুরা মুসলমানকে বঞ্চিত করে তাঁদের দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন, তখন তাঁরা হিন্দুর বিরুদ্ধেও আবার সংগ্রাম চালাতেন। আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন জাতি তাই করে থাকেন।

তাঁদের সে বিশ্বাস ছিল না। বাদার বক্স সাহেব সেই সংগ্রাম-শঙ্কিত মুসলিম লীগ দলেরই একজন নায়ক। তাঁর কাছ থেকে মুক্তির জন্য 'বণ্ড' দেওয়ার বেশি আর কী আশা করা যায়? কিন্তু সংগ্রামমুখী যে ছাত্রদলকে ঢাকায় দেখে এলেম, তাঁরা তো তা' নন। তাঁরা একটা অদম্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেমেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম একটা নতুন দৃষ্টান্ত নয় কি? আমার বিশ্বাস, এঁরা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা জাতি (nation) ও তার একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছেন।

আজ যে চলার পথে তাঁরা যাত্রা করলেন, সে চলা তাঁদের স্তব্ধ হবে না। চলতি পথে তাঁদের সামনে অনেক বাধাবিপত্তিও আসবে, সময়ে সময়ে তাঁরা দিক্‌ভ্রান্তও হবেন, তবু আবার ঠিক পথের সন্ধান নিয়ে এগিয়ে চলবেন। কায়দ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেব, স্বাধীনতার পরমুহূর্তে সংবিধান সংসদের (Constituent Assembly) প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কথা একদিন হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, অর্থাৎ তিনি যে বলেছিলেন—'রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারে হিন্দুও আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমানও আর মুসলমান থাকবে না—ধর্ম থাকবে তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার; রাষ্ট্র-শাসনে সব জাতি মিলে একটা নতুন 'জাতি' হবে এবং সেটা হবে, 'পাকিস্তানী-জাতি', এই ছেলের দলই দেখবেন একদিন জিন্নাহ সাহেবের সেই বাণীর সফল রূপায়ণ করবেন।'

এমনি ধরণের আরও অনেক কথাই সেদিন আলোচনা করেছিলেম। সব কথা আজ আর মনে নেই। আমার সেই দিনের সেই বিশ্বাস আজও পরিপূর্ণভাবে সফল হয় নি ঠিকই, তবু আমার বিশ্বাস আজও তেমনি অটুটই আছে। পাকিস্তানে আজ যা চলছে, দূরে থেকে তার যে খবর পাচ্ছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে, পাকিস্তানেই—বিশেষ করে, পূর্ব পাকিস্তানে একটা বিপ্লব আসছে। ভৌগোলিক দিক থেকে একটা অখণ্ড দেশকে ভেঙে রাজনীতিক ক্ষেত্রে দুটো দেশ করা যেতে পারে—করা হয়েছেও কিন্তু তার ভাষা, তার সংস্কৃতি ভেঙে আলাদা করা যায় না। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা,

দুটো পৃথক রাষ্ট্র আজ হলেও, একের প্রভাব অন্যের উপর পড়বেই। কেউ তা' রোধ করতে পারবেন না। ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে যদি অর্থনীতিক বিপ্লব আগে হয়, তবে তার প্রভাব পাকিস্তানে ও পূর্ব পাকিস্তানে পড়বেই পড়বে—সেখানেও বিপ্লব হবে ; আবার পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবের প্রভাব, পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের উপরও অবশ্যই পড়বে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিপ্লবটা আগে হবে কোথায়? একদিন বাংলাদেশ ভারতকে নেতৃত্ব দিতেন। মহামতি গোখলে একদিন বলেছিলেন, 'বাংলা আজ যা ভাবেন, অবশিষ্ট ভারত কাল তাই ভাবেন'। এমনি ছিল ভারতে বাংলার নেতৃত্ব ; আর সেই নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের দানও অকিঞ্চিৎকর ছিল না। দেশ বিভাগ হওয়ার পরে, আগেকার বাংলার ভারতীয় অংশ পশ্চিম বাংলায় ভারতের রাজনীতিতে আজ আর সেই নেতৃত্ব নেই। অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছে বাংলার পূর্বতন নেতৃত্ব আজ পূর্ব বাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আজ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। পূর্ব বাংলার ছাত্ররা মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রাণ দিয়ে সে দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, পূর্ব বাংলার নেতারা সাধারণ নির্বাচনের আগেই এক সম্মিলিত 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করেছিলেন, যা ভারতে আজও হয় নি—পশ্চিম বাংলাতেও না। এখানে যে সব 'যুক্তফ্রন্ট' সরকার হয়েছে, তা' সাধারণ নির্বাচনের পরে, তাই ভারতে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিক দল—কংগ্রেস-এর অস্তিত্ব একেবারে মুছে যায় নি। কিন্তু পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগেই সেখানকার নেতারা 'যুক্তফ্রন্ট' গড়েই নির্বাচন চালিয়েছিলেন এবং শাসক দল মুসলিম লীগকে—পূর্ব পাকিস্তান থেকে একদম মুছে দিয়েছিলেন ; তাই আমার মনে হয় পূর্ব পাকিস্তানেই হয়তো বিপ্লব আগে আসবে এবং তারই প্রবল ধাক্কা এসে লাগবে পশ্চিম বাংলায় ও ভারতে। এই কথাই সেদিন আমার চিন্তাধারায় দেখা দিয়েছিল এবং তাই ছাত্রদের ভাষা-আন্দোলন দেখে আমি অতটা আশান্বিত হয়েছিলেম। সেই আশা নিয়েই—আজও আমি দিন গুণছি। এই কাজটিকে আরও ত্বরান্বিত করা যায়, যদি ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটু অবহিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে সেই পথে পা বাড়ান। কিন্তু তাঁরা কি তা' করবেন? কোনও কোনও নেতার বর্তমান চলাফেরা ও মতিগতি দেখে আমার আশঙ্কা হয়;

ভারতে হয়তো দুই এক মাসের মধ্যেই একটা বিরাট পরিবর্তন হবে এবং সে পরিবর্তনে, দেশের অগ্রগতি না-হয়ে হয়তো পশ্চাদগতিই হতে পারে। সেই দুর্ভাগ্য যদি আসে তাহলে, পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবের ধাক্কা ভারতকে 'তছনছ' করে দিতে পারে। ভারতের বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব চাগলার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের মধ্যে আমি সেই আশঙ্কারই বীজ দেখতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারা অমূলক হলে আমিই সব চেয়ে বেশি খুশি হব। প্রার্থনা করি ভগবান যেন তাই করেন।

সেদিনের আমার চিন্তাধারার কথা বলতে গিয়ে ভবিষ্যতের চিন্তাধারা এসেও একটা 'জট' পাকিয়ে ফেলায় এই কথাগুলো এসে পড়েছে। এখন আমাদের আগেকার আখ্যায়িকাতেই আবার ফিরে যাই।

ভাষা-আন্দোলন সেদিন যে ছাত্ররা করেছিলেন, তাঁদের সেদিনের নেতৃত্বও তাঁদের মধ্যে থেকেই এসেছিল। বাইরের কারোরই কোনও হাত ছিল না। নুরুল আমিন সাহেব যে ঐ আন্দোলনের সাথে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট বা হিন্দুদের জড়িয়ে ছিলেন তার পেছনে কোন সত্য ছিল না। উনি ঐ সব কথা বলেছিলেন বা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, রাজনীতিক কারণেই। সেদিনের ছাত্র-হত্যার পরই ছাত্ররাই সারারাত ধরে ইট, সিমেণ্ট প্রভৃতি দিয়ে মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণের মধ্যেই রাস্তার ধারে একটা শহীদ-স্তম্ভ গড়ে তোলেন। তার পেছনেও বাইরের কোন দলের বা নেতার নেতৃত্ব ছিল না। সমস্ত আন্দোলনের নেতৃত্বই ছিল ছাত্রদেরই হাতে। পুলিশ দিয়ে পরদিনই কিন্তু ঐ শহীদ-স্তম্ভ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেদিনে যা' ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, আজ সেখানে সেই শহীদ-স্তম্ভই বিরাট আকারে বিরাজ করছে এবং বড় বড় রাজনীতিক নেতারাও প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সেখানে গিয়ে শহীদের উদ্দেশ্যে মালা দিয়ে আসছেন। এইভাবেই ইতিহাস রচনা হয়। পূর্ব পাকিস্তানেও হচ্ছে।

যাক, এর পরে মার্চ মাস শেষ হওয়ার কয়েকদিন আগে ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট পাশ করার জন্য আবার এসেম্বলির অধিবেশন ডাকা হয়। মার্চের মধ্যেই বাজেট তো পাশ করতেই হবে। হলোও—কোনও রকমে 'নমো নমো' করে, অর্থাৎ বিশেষ কোন বিষয়েই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার সময় ও সুযোগ মিললো না। ঐ বাজেট-আলোচনায় মধ্যেই একবার পুলিশের গুলী চালনার বিষয় উঠেছিল। সেই বিতর্কের উত্তর দেওয়ার সময়

মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সাহেব কলকাতার তৎকালীন কম্যুনিষ্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র—'স্বাধীনতা' পত্রিকা থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি দাবি করছেন যে ঐ আন্দোলন নাকি তাঁরাই তাঁদের নেতৃত্বে চালিয়েছিলেন। 'স্বাধীনতা', পূর্ব পাকিস্তানে ছিল নিষিদ্ধ পত্রিকা। আমরা সে পত্রিকা পড়ি নি; তাতে কী ছিল, তা' আমরা দেখি নি। নুরুল আমিন সাহেব পড়েছিলেন। তাই শুনেছি মাত্র। সত্যাসত্যের কথা কিছু বলতে পারবো না। পরে দেখেছি নুরুল আমিন সাহেবের সরকার ঐ স্বাধীনতা পত্রিকার তথাকথিত মন্তব্যটি তাঁর সরকারের রাজনীতিক উদ্দেশ্যে লাগিয়েছিলেন। ঐ অজুহাতেই ঐ ১৯৫২ সালেই কয়েক মাস পরেই পাক-ভারতে যাতায়াত করার জন্য পাশপোর্ট প্রথা চালু করা হল। এটাই ছিল, হিন্দু-বিতাড়নের মুখ্যসচিব আজিজ আহমেদ সাহেবের শেষ ব্রহ্মাস্ত্র! আজিজ আহমেদ সাহেবের সেই বহু পুরনো ছক-কাটা নীতির শেষ প্রয়োগ।

পূর্ববঙ্গের ভাষা-আন্দোলন অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' করতে হবে, এই দাবি নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলন উপলক্ষে পুলিশের গুলীচালনায় যে অনেক ছাত্র নিহত ও আহত হন, সে কথা আগেই বলেছি। বলা হয় নি, আর একজন অতি নামী ব্যক্তির নিহত হওয়ার কথা। ইনিও ঐ ভাষা-আন্দোলন উপলক্ষেই নিহত হন। তাঁর মৃত্যুকে আমি 'নিহত' হওয়াই বলতে চাই এবং কেন বলতে চাই সে কথা বলার আগে একটি কথা বলতে চাই যে ঐ ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন ভাষা-আন্দোলনের অনেক পরে এবং বাইরের লোকের অনেকেই তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্যক জানেন না কিন্তু আমি কিছু কিছু জানি। পুলিশের গুলী ছাত্রদের দেহকে বিদ্ধ করেছিল কিন্তু এঁর দেহকে বিদ্ধ না করে, করেছিল মর্মস্থলকে গভীরভাবে বিদ্ধ। মর্মাহত হয়ে সেই যে তিনি চিত্তের ও মস্তিষ্কের স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, তা' থেকে আর তিনি আরোগ্যলাভ করতে পারেন নি। তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ইনিই হচ্ছেন,

"বাহার সাহেব" নামে সর্বসাধারণের কাছে সমধিক পরিচিত। তাঁর পুরো নাম—মহম্মদ হবিবুল্লা চৌধুরী। তিনি ছিলেন জনাব নুরুল আমিন সাহেবের তৎকালীন মন্ত্রিসভারও সদস্য এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি নিজে এবং তাঁর ভগ্নী সামসুন্নাহার সাহেবা ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী ও কবি ও সাহিত্যিক নজরুল ইসলাম সাহেবের অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্য। 'বাহার' সাহেব স্বাস্থ্যদপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি নিজে হাসপাতালে গিয়ে আহত ছাত্রদের দেখেছেন এবং নিহতদেরও সম্পর্কে সম্যক সঠিক তথ্য নেওয়ার তাঁর সুযোগ ছিল এবং সে সুযোগ তিনি নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার একজন ঐকান্তিক সমর্থক 'বাহার' সাহেব একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী থেকেও বাংলা ভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁদেরই পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের উপরে যে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন, তা' ঠেকাতে পারেন নি। এইটেই তাঁর মনের উপর ভীষণ এক প্রতিক্রিয়া আনে এবং তারই ফলে তাঁর মানসিক বিপর্যয় ঘটে। এই ভাষা-আন্দোলন উপলক্ষেই আর একবার প্রমাণ হয় যে গণতন্ত্রের নামে যে আমলাতান্ত্রিক সরকার তখন পূর্ববঙ্গে চলছিল তাতে মন্ত্রীরা 'রবার-স্ট্যাম্প' ছাড়া আর কিছুই নন। আসল ক্ষমতার মালিক মুখ্যসচিব জনাব আজিজ আহমেদ সাহেব ও তাঁর অধীনস্থ প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা। তাঁরা যা' করবেন, তাই হবে এবং তাঁদের কৃতকার্যের সব দায়িত্ব মন্ত্রীরা নিজের ঘাড়ে নিয়ে জনসাধারণের কাছে নিমিত্তের ভাগী হবেন। আজিজ আহমেদ সাহেবের অপকর্মে নুরুল আমিন সাহেবও তাঁর মন্ত্রিসভার 'রবার-স্ট্যাম্প' হিসাবে 'সীল' দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। দিয়েছিলেনও। এই দেওয়াটাই 'বাহার' সাহেবের বিবেককে যে পীড়া অনবরত দিতে থাকে, তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে, তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ও অবশেষে তাতেই মৃত্যু। সেদিনের সেই গুলীচালনার পরেই তিনি যে নির্বাক হয়ে যান, তার পর থেকে সদা হাস্যময় অতি মুখর 'বাহার' সাহেবকে তাঁর পূর্বাবস্থায় আর কেউ দেখেছেন কি না জানি না। কিন্তু আমরা যাঁরা এসেম্বলিতে বিরোধীদলীয় তাঁর সহকর্মী ছিলেম, তাঁরা কেউই তাঁকে তাঁর মনের পূর্বাবস্থায় আর দেখি নি। তার পর থেকে খুব কমই তিনি এসেম্বলিতে উপস্থিত হতেন। যা' দুই-একদিন তাঁকে এসেম্বলিতে দেখেছি তখন তাঁকে মনমরা অবস্থাতেই দেখে'ছি, সুতরাং, আমার বিশ্বাস যে সেদিন পুলিশের গুলী ছাত্রদের দেহ বিদ্ধ করেছিল, আর করেছিল বাহার সাহেবের মর্মভেদ এবং তার ফলে

তাঁর মৃত্যু। সেই জন্যই আমি তাঁকেও মনে করি নিহত ছাত্রদের মতই তিনিও একজন বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার আন্দোলনের শহীদ। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার সংগ্রামে পূর্ব বাংলার যে সব বীর সন্তান তাঁদের বুকের তপ্ত-তাজা রক্ত-মূল্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে আজ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন, সেই সব শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অতীতের বাংলার অন্য আর এক প্রান্ত—পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও 'সেলাম' জানাই। যাঁরা মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন তাঁরা পূর্ববাংলার বাঙালীদের সামনে এক নতুন আদর্শ রেখে গিয়েছেন। সেই আদর্শ হচ্ছে, মাতৃভাষার মত মাতৃভূমিরও সম্মান রক্ষার আদর্শ। আজ পূর্ববাংলার বাঙালীদের উপর সেই আদর্শ রূপায়ণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসেছে। আমি বিশ্বাস করি সেই দায়িত্ব পূর্ববাংলার সন্তানেরা পরিপূর্ণ সফলতার সাথেই রূপায়ণ করবেন এবং সকল সাম্প্রদায়কে নিয়ে সম্মিলিত একটি নতুন পাকিস্তানী জাতি গড়ে তুলবেন। পূর্ববাংলার লোকের মধ্যে দেশাত্মবোধ যতই জেগে উঠবে, ততই তাঁরা বুঝবেন যে পূর্ববাংলার স্বার্থেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতেই হবে। শত্রুতার পথে পূর্ববঙ্গ ক্রমশই রাজনীতিক ও অর্থনীতিক দিক থেকে দুর্বলই হয়ে পড়বেন। এ কথাটা তাঁরা এখনই বুঝতে শুরু করেছেন যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই হল, পূর্ববঙ্গকে শক্তিহীন ও দুর্বল ক'রে রাখা এবং আয়ুব সরকার সেই কাজটিই জনকয়েক তাঁবেদার বাঙালী মন্ত্রী ও সুবিধা-ভোগীদের সাহায্যে চালিয়ে যাচ্ছেন। তা' চিরদিন চলতে পারে না—কিছুতেই চলবেও না। আয়ুবের তরবারির শাসন ব্যর্থ হয়ে যাবেই। সেদিন আর খুব বেশি দূরেও নয়। বাঙালীর স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তাবোধকে এককালের মহাশক্তিশালী ইংরেজ সরকারও দাবিয়ে রাখতে পারে নি। ইংরেজ যা পারে নি তাদেরই বহু পুরাতন ভৃত্য তাঁবেদাররাও তা পারবেন না। পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ সেই ইঙ্গিতই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালীর সামনে রেখে গিয়েছেন।

পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলনকে উপলক্ষ করে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে আমরা বিভিন্ন জেলায় দেখেছি, তা ব্যাপকতার দিক দিয়ে

'পাকিস্তান-আন্দোলনের' মতই ব্যাপক। বিভিন্ন জেলায় জেলায় দূর-দূরান্তরেও এমন কোনও গ্রাম ছিল না যেখানে আন্দোলন ও বিক্ষোভ-মিছিল না হয়েছে। সর্বত্রই মিছিলে মিছিলে আওয়াজ উঠেছে,—'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ', 'মুসলিম লীগ বরবাদ', 'নুরুল আমিনের রক্ত চাই।' এই আন্দোলন ও মিছিলের মধ্য দিয়ে সেদিন পূর্ববাংলায় যে জনমত গড়ে উঠেছিল, সেই জনমতই পরবর্তী ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পূর্ববঙ্গ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছিল। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা যথাকালে করবো।

পূর্ববাংলার এই আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে যদি কোনও রাজনীতিক নেতা বা দল ঐ আন্দোলনের সৃষ্টির কৃতিত্ব নিজেরা নিতে চান, তাহলে আমি দুঃখের সাথে জানাতে চাই যে আমি তাঁদের সেই দাবির সাথে একমত হ'তে পারছি না। আমি মনে করি, ভাষা-আন্দোলন ছাত্রদেরই আন্দোলন ছিল এবং তার নায়কও ছিলেন ছাত্ররাই। ভাষা-আন্দোলনের প্রথম 'আওয়াজ' ওঠে ছাত্রদেরই এক সভায়, যেখানে 'কায়েদ-ই-আজম' জিন্নাহ সাহেব ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাস। পূর্ববঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রি জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেব ঢাকায় বিধানসভার প্রথম অধিবেশন ডাকিয়েছেন ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট পাশ করানোর জন্য। 'জগন্নাথ হলে' অধিবেশন বসেছে। নাজিমুদ্দিন সাহেব তিন দিন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতার জন্য মুখেই খুলতে পারেন না। যাই বলতে যান, তাতেই চতুর্দিক থেকে 'হৈ হৈ'। এই বিরোধিতা কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধী দলের সদস্যরা করছেন না। তখন পর্যন্ত বিধানসভায় একমাত্র কংগ্রেস দলই বিরোধী দল। তাঁরা সকলেই হিন্দু বা তৎকালীন সংবিধান মতে অ-মুসলমান সম্প্রদায়। মুসলমান সদস্যেরা তখন পর্যন্ত সকলেই মুসলিম লীগের সদস্য। এই মুসলিম লীগের সদস্যদের এক অংশ সেদিনে খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা আরম্ভ করেছিলেন, তাতে তাঁরা আমাদেরও তিনদিন পর্যন্ত কিছু বলতে দেন নি। আমরাও দেখে যাচ্ছিলাম, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। নাজিমুদ্দিন সাহেব অবস্থা বেগতিক দেখে কায়েদ-ই-আজমের কাছে অবিলম্বে ঢাকায় আসার জন্য S.O.S. (জরুরী আহ্বান) জানান। কায়েদ-ই-আজম আসেন এবং কয়েকদিনের আলাপ-আলোচনার পর তিনজনকে মন্ত্রী ও একজনকে

বার্মায় রাষ্ট্রদূত করার ব্যবস্থা করে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। সে কথা আগেই বলেছি। তারপরে বিজয়ী কায়েদ-ই-আজম গিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জমায়েত ছাত্রদের সভায় ভাষণ দিতে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভাষার প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন,—"Urdu—and nothing but Urdu, shall be the State language of Pakistan." অর্থাৎ একমাত্র উর্দু-ই এবং উর্দু ছাড়া আর কোন ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে না। বলার সাথে সাথেই ছাত্রদের মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক ছাত্র 'আওয়াজ' তোলেন,—"কায়েদ-ই-আজম জিন্দাবাদ", "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" ও "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি হঠাৎই জিন্নাহ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় তোলেন। ছাত্ররাও সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে যান নি সুতরাং তারা যে কোনও রাজনীতিক দলের বা নেতার সাথে পরামর্শ করে সেদিন সেখানে যান নি তা' সহজেই অনুমান করা যায়। জিন্নাহ সাহেবের ভাষণে রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্ন হঠাৎই সেদিন ছাত্র-শ্রোতাদের কাছে এসেছিল এবং ছাত্রদের এক অংশও সাথে সাথেই তার জবাব দিয়েছিলেন। তাঁরা সেদিন জিন্নাহ সাহেবের প্রতি কোনরূপই অসম্মান তো দেখান-ই নি, তাঁর এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের "জিন্দাবাদ" ধ্বনিই দিয়েছিলেন, কিন্তু সাথে সাথেই তাঁরা তাঁদের বলিষ্ঠ দাবির—"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"—কথাও অত্যন্ত জোরের সাথেই তুলে ধরেছিলেন। যখন তাঁরা এই দাবির কথা তুলে ধরেন, তখনও সংবিধান তৈরি গণ-পরিষদে ভাষার প্রশ্ন ওঠে নি এবং কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও গণ-পরিষদে বাংলা ভাষার দাবি তুলে ধরেন নি। পরে অবশ্য গণ-পরিষদে ধীরেনবাবু যুক্তিতর্ক সহ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। যুক্তিতর্ক ঐ দাবির পেছনে যতই থাক না কেন, সেদিন গণ-পরিষদে ভোটের জোরে ধীরেনবাবুর দাবি নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"—এই দাবি ছাত্রদের মুখ থেকেই সর্ব প্রথমে ওঠে এবং তার সমর্থন পূর্ববাংলার প্রবীণ রাজনীতিক নেতারাও করেছেন, তা' দেখেছি। পূর্ববঙ্গ বিধানসভাও দেখেছি বিধানসভার নিয়ম লঙ্ঘন করেই যেন জনাব ফজলুল হক্, জনাব মহম্মদ আলি (বগুড়ার), জনাব তফাজ্জল আলি, জনাব হবিবুল্লা বাহার, ডাঃ মালেক প্রমুখের মত নেতারাও বিধানসভায় কয়েকদিন বাংলাতে বক্তৃতা করেছেন। বিধানসভার নিয়ম হচ্ছে, যেসব সদস্য ইংরাজি জানেন ও বলতে পারেন, তাঁদের

ইংরাজিতেই বক্তৃতা দিতে হবে। এই নিয়ম থাকা সত্বেও কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত ঐ সব নেতারা যাঁদের প্রত্যেকেই ইংরাজি ভাষায় ভাল বক্তা ছিলেন তাঁরা সকলেই ছাত্রদের দাবি সমর্থন করেই যেন বাংলাতেই বক্তৃতা করেন। এই ঘটনার পর থেকেই পূর্ববাংলার জেলায় জেলায় একটা জনমতও বাংলা ভাষার স্বপক্ষে গ'ড়ে উঠতে থাকে। এই জনমত গ'ড়ে ওঠার পেছনে যুক্তিও ছিল অকাট্য এবং এই ভাষার প্রশ্নের সাথেই জড়িত ছিল ভাবীকালের বাঙালী তরুণদের অর্থনীতিক সমস্যাও। যুক্তির দিক দিয়ে প্রধান যুক্তিই হল পাকিস্তানের যা' জনসংখ্যা তার অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। বাঙালীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে যদি ভাষার প্রশ্ন সমাধান ভোটের মাধ্যমে করা হয় তাহলে বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হয়। কিন্তু অ-বাঙালী মুসলিম লীগ নেতারা তা' করতে রাজী নন। মুসলিম লীগের প্রসাদভোজী ক্ষমতালোভী দুই-চার জন বাঙালী রাজনীতিক নেতাদেরও অ-বাঙালী নেতারা তাঁদের দলে ভেড়ান। মুসলিম লীগ নেতাদের বরাবরের আশঙ্কা পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের সাথে শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, চাল চলন ও পোশাক-পরিচ্ছদে এতই ঘনিষ্ঠভাবে একীভূত যে তা' ভাঙতে না পারলে পূর্ববঙ্গ দু' দিন আগে বা পরে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। সেই মিলন ভাঙার প্রথম ও প্রধান কাজ হিসেবেই তাঁরা পূর্ববঙ্গের ভাষার (বাংলার) প্রাধান্য দিতে চান না। সেদিনও চান নি, আজও চাইছেন না; তাই নানা ফিকির-ফন্দিই তাঁরা নিচ্ছেন পূর্ববাংলার ভাষার রূপ বদলিয়ে দিতে। কিন্তু কোনও ফিকির-ফন্দিই আজকের রাজনীতিক সচেতন বাঙালীর কাছে পাত্তা পাচ্ছে না। সেদিনও পায় নি। তরুণ ছাত্ররাই সেদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কায়েদ-ই-আজমের সেই স্মরণীয় বক্তৃতার পর তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে সুরু সেদিন ছাত্রদের মুখ থেকেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল, তা' বাইরে থেকে দেখে মনে হোত যে সেটা ছিল সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত একটি ধ্বনি এবং সে ধ্বনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আসলে কিন্তু তা হয় নি। বাইরে তার প্রকাশ ছিল না কিন্তু ভেতরে ভেতরে অন্তঃসলিলা 'ফল্গু'-র মত তা' বয়ে গিয়ে পূর্ববঙ্গের সমস্ত শহর ও গ্রামগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আসে কেমন করে? বাঙালী বুঝেছিলেন যে ঐ দাবির সাথে বাঙালী তরুণদের সরকারী ও

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিযোগিতামূলক চাকুরী প্রাপ্তির বিষয়টি বিশেষ-ভাবে জড়িত ; সুতরাং গণতান্ত্রিক ও অর্থনীতিক দিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে বাঙালী ছাত্ররা ঠিক করেছিলেন যে তাঁদের দাবির সার্থক রূপায়ণ তাঁদের করতেই হবে। সেই উদ্দেশ্যেই জনমত তৈরির কাজটি নিঃশব্দে ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি সাহেব নিহত হন, এবং খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব গভর্নর জেনারেলের গদি ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ১৯৫১ সালের একেবারে শেষভাগে অথবা ১৯৫২ সালের প্রথম ভাগে (আমার ঠিক মনে নেই) ঢাকায় আসেন। নাজিমুদ্দিন সাহেব উর্দুভাষী বাঙালী। বাংলা দেশে এইরূপ কিছু কিছু পরিবার বরাবরই আছেন। পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদেও এইরূপ পরিবার অনেকই দেখেছি। যাক, নাজিমুদ্দিন সাহেব ঢাকায় এসেছেন। তিনি ঢাকারই লোক এবং তাঁর উপরে পাকিস্তান রাষ্ট্রতরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ণধার প্রথম বাঙালী প্রধানমন্ত্রী ; সুতরাং ঢাকায় তাঁর জয়-জয়কার পড়ে যায়। পল্টন ময়দানে বিরাট সভার আয়োজন হয়েছে। দলে দলে কাতারে কাতারে শ্রোতারা এসে বিরাট মাঠকে ভরে ফেলেছেন। নাজিমুদ্দিন সাহেব বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। আর যায় কোথায়? ময়দানে সমবেত বিরাট জনতা ছাত্রদের নেতৃত্বে সমস্বরে সেদিন 'ধ্বনি' (শ্লোগান) দিয়ে উঠে-ছিলেন—"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" সে ধ্বনিতে ঢাকার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবের ও মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেবের 'সরকারের' মুখ্য স্তম্ভ যথাক্রমে চৌধুরী মহম্মদ আলি সাহেবের ও জনাব আজিজ আহমেদ সাহেবের বুক সেদিন মোটেই কাঁপে নি ; সুতরাং নাজিমুদ্দিন সাহেবেরও 'না', নুরুল আমিন সাহেবেরও 'না'। এই ঘটনার পরই পূর্ববঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে (১৯৫২ সালের)। শহরে গুজব রটেছে বিধানসভার অধিবেশনে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে। তারই প্রতিবাদে বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম দিনেই ছাত্ররা 'হরতাল' ডেকেছেন এবং পরিকল্পনা করেছেন যে বিধানসভার সামনে তাঁরা এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যাবেন। সরকারপক্ষ ও মুখ্যসচিব আজিজ আহমেদ সাহেবের নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে

প্রস্তুত হয়েছেন তাকে প্রতিরোধ করতে। তাঁরা 'এসেম্বলি হাউসের' চতুষ্পার্শ্বে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন, রাস্তায় রাস্তায় কাঁটাতারের বেড়া ও যথেষ্ট পরিমাণে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করেছেন। সেকথা আগেই বলেছি। এ-ও আগেই বলেছি যে নুরুল আমিন সাহেব নাকি প্রথমে ১৪৪ ধারা জারি করতে নারাজ ছিলেন কিন্তু ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব ও সর্বোপরি মুখ্যসচিব আজিজ আহমেদ সাহেব যখন প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁরা আইনভঙ্গকারীদের উপর অস্ত্রের সাহায্যে কোনরূপ বলপ্রয়োগ করবেন না ; যদি ছাত্ররা আইনভঙ্গ করে নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করেন তাহলে নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে মোটর ট্রাকে করে নিয়ে গিয়ে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসবেন। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরেই আমি যতটা শুনেছি তাতে জেনেছি যে নুরুল আমিন সাহেব তাঁদের প্রস্তাবে মত দেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখা গেল পুলিশ তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন-ই-নি তাঁরাই অগ্রণী হয়ে মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকে গিয়ে 'কাঁদুনে গ্যাস' এবং অবশেষে গুলী পর্যন্ত চালিয়েছেন।

বিশেষ তথ্যানুসন্ধানের পর আমি যতটা শুনেছি তাতে জেনেছি যে এটাই ছিল সেদিনের ভাষা-আন্দোলন শুরু হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এরই সাথে কংগ্রেসের বা কোনও হিন্দুরই কোনরূপই যোগাযোগ তো ছিলই না, অন্য কোন রাজনীতিক দলের বা অন্য কোন রাজনীতিক নেতাদেরও কোনরূপ যোগাযোগ ছিল বলে আমি মনে করি না। এটাই সত্য ঘটনা। ঘটনার সত্যতা যা-ই হোক না কেন, আজিজ আহমেদ সাহেবের তথা পাকিস্তানের ছক-কাটা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ তো করতেই হবে! তাই নুরুল আমিন সাহেব বললেন বা বলতে বাধ্য হলেন যে ঐ আন্দোলন আসলে নিছক ছাত্রদেরই আন্দোলন ছিল না ; তার সাথে যুক্ত ছিল হিন্দুরা ও পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্টরা! নুরুল আমিন সাহেব বলেছিলেন হিন্দুরা লুঙি, পায়জামা প্রভৃতি পরে মুসলমানের ছদ্মবেশে এবং কম্যুনিস্টরাই ঐ আন্দোলন পরিচালনা করেন! শুধু 'কম্যুনিস্ট' হলেই তো আসল উদ্দেশ্যের রূপায়ণ করা যায় না। তাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানি করতেই হবে ; তাহলেই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের একটা অজুহাত খাড়া করা যাবে! তা-ই করা হল। অনেক হিন্দুকেই বিভিন্ন জেলায় জেলায় গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেস নেতা ও বিধানসভার সদস্যরাও গ্রেপ্তার থেকে বাদ যান নি। কংগ্রেস দলের স্থানীয়

শ্রীসতীন সেন, শ্রীমনোরঞ্জন ধর ও শ্রীগোবিন্দলাল ব্যানার্জি প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শুধু এই কারণেই যে ভারতে ও বিশ্বের কাছে প্রচার করা যে কংগ্রেসও ঐ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন ! সরকারপক্ষ কিন্তু একটা কথা ভুলে গিয়েছিলেন যে 'কংগ্রেস' একটা সঙ্ঘবদ্ধ নিয়মানুবর্তী অতি সুশৃঙ্খল (welldisciplined) রাজনীতিক দল। সেই দলের কোনও সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে দলের নির্দেশ ছাড়া কোনও রাজনীতিক আন্দোলনেই যোগ দিতে পারেন না। যদি দলের-ই নির্দেশ থেকে থাকে ঐ আন্দোলন পরিচালনা করার তাহলে দলের নেতা ও সহকারী নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাসকে ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল নাকি ? তা' করা হয় নি ; কারণ তাঁদের ধরলে তা' নিয়ে একটা 'তোলপাড়' হতে পারে। সুতরাং সে পথে না গিয়ে এমন পথ ধরতে হবে যাতে সাপও মরে কিন্তু লাঠিও না ভাঙে ! সেই পথই বুদ্ধিমান মুখ্যসচিব বেছে নিয়েছিলেন। আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে কম্যুনিস্ট আমদানি করার উদ্দেশ্য ছিল সরকারী পরিকল্পনার পরবর্তী পর্যায়ের অবশিষ্ট কাজটুকু শেষ করার একটা অজুহাত সৃষ্টি করার জন্য। সে কাজটা আর কিছু নয়—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বচ্ছন্দগতিতে লোকচলাচলে, যা দেশ বিভাগের পরও এতদিন চলে আসছিল তাতে বাধা সৃষ্টি করা মাত্র। দেশ বিভাগের পর থেকে ক্রমাগত নানা রকমের অত্যাচারে ও দফায় দফায় ছোট-বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ও হাঙ্গামায় হিন্দুর মন এমনিতেই ভেঙে পড়েছিল—তাঁরা ভাবতে শুরু করেছিলেন যে নিজ দেশে ও নিজ গৃহে বোধ হয় আর তাঁরা সসম্মানে বসবাস করতে পারবেন না ; তাই কিছু কিছু হিন্দু আগেই দেশ ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিলেন এবং আসছিলেন ; তবু বহুসংখ্যক হিন্দুই দো-মনা মন নিয়েই পূর্ববঙ্গেই ছিলেন এই ভেবে যে তাঁরা থাকতেই চেষ্টা করবেন কিন্তু কোনও কারণে যদি আর থাকতে না-ই পারেন তখন দেশ ছেড়ে যাবেন। যাওয়া তো যখন খুশি তখনই যাওয়া যাবে—কোনও বাধা নেই। এই মনোভাব নিয়েই বেশির ভাগ হিন্দুই নিজ দেশে নিজ ঘরে ছিলেন। এইবার আঘাত এল এই শ্রেণীর দোদুল্যমান চিত্তের লোকদের উপরে। পাকিস্তান সরকার জেদ ধরেছেন যে তাঁরা ভারত-পাকিস্তানে যাতায়াতে 'পাশপোর্ট ও ভিসা' প্রথা প্রবর্তন করতে চান। ভারত সরকার যুক্তিতর্ক দিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই পাকিস্তানের মত পরিবর্তন করতে পারলেন না, তখন তাঁদেরও রাজী-ই হতে হল। ভাবা-

আন্দোলন হয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করলেন যে ঐ ১৯৫২ সালেরই ১৫ই অক্টোবর থেকে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতে 'পাশপোর্ট' ও 'ভিসা' চালু হবে। ঐ তারিখ থেকে বিনা পাশপোর্টে ও ভিসায় দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত চলবে না বলে ভারত ও পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর যেন বাঁধ ভেঙে গেল —বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত হিন্দুরা যিনি যেদিক দিয়ে পারেন সেই দিক দিয়েই সীমান্তের পরপারে ভারতে আসার পথে পা বাড়ালেন। যেসব হিন্দু তখন পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকা যাবে কি-না—এই সংশয়ে দোদুল্যমান চিত্ত ছিলেন তাঁদের মনের ধৈর্য একদমই ভেঙে গেল। তাঁরা মনে করলেন যে এইবার পাকিস্তান সরকার তাঁদের বেঁধে রেখে মারবেন। অবস্থা বেগতিক দেখলে আর চলে যাওয়া যাবে না। এই মনোভাব ব্যাপকভাবে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দেওয়ায় যখন প্রতিদিন হাজার হাজার লোক সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে আসছেন, তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব ছুটে যান ঢাকায়। তার সরকারেরও ভয় যে ব্যাপকভাবে একই সময়ে যদি হিন্দুরা বাস্তুত্যাগ করে যান, তাহলে বিশ্বে পাকিস্তানের দুর্নামই শুধু ঘটবে না, ভারত থেকেও ঐ সব বাস্তুত্যাগীদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে ভারতের মুসলমানগণও চলে আসতে বাধ্য হতে পারেন; তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন বাস্তুত্যাগীদের দ্বিমুখী অভিযান হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে, পূর্বাঞ্চলেও হয়তো সেই অবস্থাই দেখা দেবে। পাকিস্তান সরকার সে অবস্থা চান না। তাঁরা হিন্দুদের তাড়াতে চাইলেও ভারত থেকে যে মুসলমান পাকিস্তানে যান তা' চান না। ভারত সরকার ও ভারতের প্রধান প্রধান রাজনীতিক দলগুলো ও নাগরিকদের বৃহৎ অংশই তা' চান না। সেরূপ যাঁরা চান, তাঁদের মত আমি আগেও কোনদিন সমর্থন করতে পারি নি—আজও করি না শুধু নয়, সেই মনোভাব যদি কোনও দলের বা তাঁদের সমর্থক কোন নাগরিকের থাকে, তার আমি ঘোরতর বিরোধী এবং ঐ মতবাদের আমি অত্যন্ত তীব্রভাবেই প্রতিবাদ করি। আমি সারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি যে ঐ পথে পাক-ভারতের সমাধান হবে না, হবে না। আমার অভিজ্ঞতায় ও চিন্তায় আমি যে পথে সমস্যা সমাধানের সূত্র দেখতে পাচ্ছি, তার পথ আলাদা এবং সে পথের কথা বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করব। এখন শুধু সংক্ষেপে এই কথাটাই বলে রাখতে চাই যে ভারতে পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্রের

প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। সমাজতন্ত্রে সাধারণ মানুষের জীবনের মান বেড়ে যাবে—কোনও সাম্প্রদায়িকতাই তার মধ্যে থাকবে না। হিন্দু-মুসলমানের এক নতুন ভারত গ'ড়ে উঠবে যার প্রভাব পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপরও অবশ্যই পড়বে, রাজনীতিক কারণে একটা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকক্ষেত্রে অখণ্ড দেশকে ভাগ করা যেতে পারে কিন্তু একের ওপর অপরের প্রভাব ঠেকান যায় না—এক্ষেত্রেও যাবে না। পাকিস্তান সরকার এই প্রভাব থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য আজ পর্যন্ত নানাভাবেই চেষ্টা করে চলেছেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারেন নি। পাক-রেডিও-তে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করার আদেশ দেওয়ার পরেও তা' স্থায়িভাবে বন্ধ করতে পারলেন না; বাংলা ভাষাকে 'ইসলামি তমদ্দুনের' নামে বিকৃত করার চেষ্টা করেও করতে পারেন নি। আজ সকালের (১৬-৯-৬৭ তারিখের) 'পাক-রেডিও'-র খবরে শুনলেম পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খাঁ সাহেব তাঁর মাস-পয়লা বেতার ভাষণে বলেছেন যে '১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের শত্রুদেশ (অর্থাৎ তাঁদের ভাষায়—'হিন্দুস্থান') পশ্চিম পাকিস্তানে সশস্ত্র আক্রমণ করে ব্যর্থ হওয়ায় এখন তাঁরা যুদ্ধের পদ্ধতি পরিবর্তন করে পূর্ব-পাকিস্তানে সংস্কৃতির নামে এক সংগ্রাম শুরু করেছেন।' তিনি পূর্ব-পাকিস্তানবাসিগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন,—"এই যে সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।" মোনেম খাঁ সাহেবের এই উক্তির মধ্যেই পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা যথাকালে করব। এখন শুধু কথা প্রসঙ্গেই এইটুকু বলে রাখছি।

যাক, যা' বলছিলেম তাতেই আবার ফিরে যাই। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব ঢাকায় এসে কংগ্রেসের বিধানসভার সদস্যদের সাথে এক সভায় মিলিত হয়ে তিনি আমাদের অনুরোধ জানালেন যে আমরা যেন আমাদের প্রভাব বিস্তার করে আতঙ্কিত হিন্দু নর-নারীর ঐ বাস্তুত্যাগ বন্ধ করি। তিনি বলেন যে "পাশপোর্ট"টা কিছুই নয়—ওটা কেবল নাগরিকত্বের চিহ্ন। যিনি পাশপোর্টের দরখাস্ত করবেন, তিনিই পাশপোর্ট পাবেন; আর পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা ব্যবস্থা হয়েছে যে পাশপোর্টধারীরা বছরে ৮ (আটবার) যাতায়াতের জন্য 'ভিসা' পাবেন এবং এইসব অঞ্চলের জন্য পাশপোর্টও পাঁচ বছরের জন্য দেওয়া হবে। এই পবিত্র প্রতিশ্রুতিই সেদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আমাদের

কাছে দিয়েছিলেন কিন্তু অন্যান্য অনেক পবিত্র চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির মতই এই প্রতিশ্রুতিটিও পাক সরকার নস্যাৎ করে দিয়েছেন। স্বাধীনতার একজন শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নেতা "মহারাজ" (শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী) আজ অশীতিপর বৃদ্ধ ও রুগ্ন। তিনি তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসার পাশপোর্টের দরখাস্ত করেও পাশপোর্ট পাচ্ছেন না। ঐ সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ও তাঁর সরকারের বিশেষ অনুরোধও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সাহেবের অন্তরে সাড়া জাগাতে পারে নি। আমি আমার আরও অনেক বন্ধুরই নাম জানি, যাঁরা পাশপোর্টের দরখাস্ত করেও পাশপোর্ট পান নি। তাঁদের নাম আর আমি বলতে চাই না। কেন বলতে চাই না তা' সহজেই অনুমেয়। পাঠকরা বুঝে নেবেন।

পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব আজিজ আহমেদ সাহেবের হাতের এই শেষ অস্ত্র—পাশপোর্ট প্রথা—চালু করার জন্যই জনাব নুরুল আমিন সাহেবকে ভাষা-আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'কম্যুনিস্ট' আমদানি করতে হয়েছিল।

এইভাবেই ১৯৫২ সাল শেষ হয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শুধু পাকিস্তানের ইতিহাসেই নয়—পাক-ভারত উপ-মহাদেশের ইতিহাসেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এইদিন পাকিস্তানে যে বিপ্লব তরুণ মুসলমান ছাত্র-সমাজ সেদিন শুরু করেছেন, সেই বিপ্লবের জয়যাত্রা কেউই রুখতে পারবেন না, যেমন সেদিন পারেন নি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে রুখতে। আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই সেইসব তরুণ বিপ্লবীদের। তাঁরা দীর্ঘজীবী হোন, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

পাশপোর্ট প্রথা চালু হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের 'হাই কমিশনার' ডঃ মোহন সিং মেহতা একবার রাজসাহীতে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই যাওয়া উপলক্ষে রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হিন্দু ও মুসলমান নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে কয়েক জনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ডঃ মেহতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলাপ-আলোচনা করতে। মুসলমান নেতৃস্থানীয় বন্ধুদের সাথে হিন্দুদের তরফ থেকে আমিও গিয়েছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি সেদিন ডঃ মেহতাকে পাশপোর্ট প্রথা চালু হওয়ার হিন্দুদের মধ্যে যে নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য বলেছিলেন—"আপনি জানেন হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আছে আবার প্রত্যেক জাতির মধ্যেই অনেক ছোট ছোট গণ্ডী আছে।

যেমন ধরুন যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে; আবার ঐ সব শ্রেণীর মধ্যেও বিভিন্ন গোত্র ও সামাজিক হিসাবে ছোট-বড় আছে। কাপ, কুলীন, শ্রোত্রীয় প্রভৃতি সামাজিক মর্যাদায় ছোট-বড় আছে। স্বগোত্র এবং এক গণ্ডীর ছেলেমেয়ের সাথে অপর গণ্ডীর ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় না। সেই জন্য দেশ বিভাগের আগেই এক গণ্ডীর ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্য সারা বাংলা দেশে ও বাংলার বাইরেও যোটক খুঁজতে হোত। এখন পাশপোর্ট প্রথা চালু হওয়ায় পাশপোর্টধারী বছরে ৮ বার মাত্র নিজ দেশের বাইরে যেতে পারেন। ছেলেরা তো অধিকাংশই পড়া উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছেন; কারণ এখানে তাদের পাশ করার পরও বিশেষ কোন ভবিষ্যৎ নেই দেখে। সুতরাং একজনের মেয়ের বিয়ে দিতে হলে তাঁকে অনেকবারই যেতে হতে পারে। তা' যদি তাঁদের যেতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমি আশঙ্কা করি আরও অনেক হিন্দুই ভারতে চলে যাবেন।" আমি যেদিন ঐ কথা ডঃ মেহতাকে বলেছিলেম তারও অনেকদিন পর পর্যন্ত আমি পূর্ব-পাকিস্তানে ছিলেম। আমি সেখানে থাকতেই দেখে এসেছি 'পাশপোর্ট' দেওয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ না হলেও খুব কম লোককেই—সংখ্যায় তাকে নগণ্যই বলা যায়—পাশপোর্ট দেওয়া শুরু হয়েছিল আজ তো প্রায় মোটেই দেওয়া হচ্ছে না। পূর্ববঙ্গে এইরূপ কত যে সমস্যার সম্মুখীন সেখানকার হিন্দুদের হতে হয়েছে এবং তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তার প্রতিকারের জন্য কতই যে বেগ পেতে হয়েছে তা' তাঁরাই জানেন যাঁরা সেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছিলেন।

ঝড় আসে, আবার ঝড় থেমেও যায়; কিন্তু রেখে যায় তার ক্ষতচিহ্ন। মানুষের অন্তরে ও বাইরে। ঝড়ে বাইরে যে ক্ষতচিহ্ন রেখে যায় তা'তে দেখা যায়—গাছ-পালা ভেঙে পড়েছে, বাড়ি-ঘর উড়ে গিয়েছে, মানুষকেও উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, কে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ফরিদপুর জেলায় একটা ঝড়ের খবর একবার সংবাদপত্রে পড়েছিলেম যে

মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গাছের ডালে তুলেছিল। সেখানে তার মৃতদেহ ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। সেটা ছিল একটা প্রাকৃতিক ঝড়। রাজনীতিক ঝড়ের ফলও দেখা গিয়েছে, একই রূপ হয়েছে। এই ঝড়ে কত যে বাড়িঘর উড়ে (পুড়ে) গিয়েছে, কত টাকার সম্পত্তি যে বিনষ্ট হয়েছে, কত মানুষ যে মরেছেন এবং কতজন যে এধার-ওধারে ছিটকে পড়েছেন, তার কোনও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না—পাওয়া সম্ভবপর হয় নি। গতকাল রাতে (১৮-৯-৬৭) এই মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির এক বন্ধু—শ্রীগোবিন্দ ঘটক মহাশয়—কথা-প্রসঙ্গে ছিটকে-পড়া একটি ছেলের কথা বললেন। তিনি বললেন,—"বেশ কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। একদিন একটি ফুটফুটে সুন্দর চেহারার ৭।৮ বছরের ছেলে তাঁদের বাড়িতে এসে পড়ে এবং তার জীবনের করুণ কাহিনী বলে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করে। তারা ছিল পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের বাসিন্দা। বেশ ভালভাবেই তাদের দিন চলে যাচ্ছিল। তার পরে একদিন সেখানে দেখা দেয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড। প্রাণের ভয়ে তাদের পরিবারের সকলেই পালিয়ে যান। কে যে কোথায় ছিটকে পড়েছে, তার বাবা-মা আজও বেঁচে আছেন কি না তা' আর ছেলেটি জানে না। তার কথা শুনে গোবিন্দবাবুর দাদা ছেলেটাকে আশ্রয় তো দেনই, তিনি তাঁর ছেলেদের সাথে তাকেও স্কুলে ভর্তি করে দেন। পাঁচ-ছয় বছর কাল ছেলেটি তাঁদের বাড়িতে ছিল। ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলেও উঠেছিল। এই সময়ে তার বাবা-মা ছেলের খোঁজ করতে করতে কোথা থেকে খোঁজ পেয়ে একদিন তাঁদের বাড়িতে আসেন। বাপ-মাও ছেলেকে দেখেই চেনেন এবং ছেলেও তাঁদের চেনে। এইভাবেই তাঁদের সুখের পুনর্মিলন হয় এবং ছেলেকে নিয়ে তার বাবা-মা চলে যান।" এটা তো হ'ল, একটা সুখের পুনর্মিলনের ঘটনা; কিন্তু পুনর্মিলন আর হয় নি, কোনও দিনই আর হবেও না, এমন আরও কত যে ঘটনা আছে তার খবর কে রাখে? হয়তো বা অনেক ছোট শিশু গুণ্ডাদের হাতে পড়েছে। তাদের দিয়ে ভিক্ষা-ব্যবসা চালানোর জন্য গুণ্ডারা হয়তো তাদের হাত-পা ভেঙে চিরতরে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে, কত শিশুর হয়তো চোখ উপড়ে ফেলে চিরদিনের জন্য অন্ধ-আতুর করে দিয়েছে, তার ঠিক কি? এই সবই ঝড়ের বাইরের চিহ্ন। দেশ বিভাগের ফলে দুই দেশেরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই এইরূপ পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনীতিক বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর থেকে আমি পূর্ববঙ্গে, আবা

পূর্ব পাকিস্তানে দেখে এসেছি যে কখন দমকা হাওয়া, কখন বা ঝড়, কখন প্রবল ঝড়, কখনও বা ঘূর্ণিঝড় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। ভারতেও যে কিছু কিছু না হয়েছে তা' নয়। এই তো সেদিন রাঁচিতে হয়ে গেল; তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই সব রাজনীতিক ঝড়ের উৎপত্তি ও তার প্রতিরোধ-ব্যবস্থার মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য দেখা যায়। ভারতের উপর দিয়ে যে ঝড় (দাঙ্গা) বয়ে যায়, তা' করে একদল সাম্প্রদায়িকতাবাদী নাগরিক, এখানে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ একেবারেই নেই, তা' নয়—কিছু কিছু লোকের মধ্যে এখনও তা' আছে তবে তাদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে; তবু যারা আছে—ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের সংখ্যা খুব কম হলেও তাদের অনিষ্ট করার বা ক্ষয়ক্ষতি করার শক্তি একেবারে লোপ পায় নি। তারা তা' আজও করতে পারে এবং করে; কিন্তু "সরকার" এদের কঠোর হাতে দমন করতে একটুও দ্বিধা করেন না। ১৯৬৪ সালে কলকাতার দাঙ্গাতে এবং ১৯৬৭ সালে রাঁচির দাঙ্গায় তা' দেখা গিয়েছে। ভারতের 'সরকার' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীদের কঠোর হাতে দমন করেন ঠিকই; তবু আমি বলতে চাই, দেশ স্বাধীন হওয়ার ২০ বছর পরেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতেই থাকে, তাহলে তা' ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষে গৌরবের তো মোটেই নয় বরং, আমি মনে করি, ভবিষ্যৎ রাজনীতিক বিপদেরই সূচনা করে। স্বাধীনতাও তা'তে বিপন্ন হওয়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে। পাকিস্তানে চৌদ্দ বছর থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা'তে আমি বলতে পারি—অত্যন্ত জোরের সাথেই বলতে পারি যে, যে সব লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন যোগাবেন, তাঁরা ভারতের তো অমঙ্গল করবেনই, পাকিস্তানের হিন্দুদেরও মঙ্গল করবেন না। তাঁদেরও বিপন্ন করবেন। সাম্প্রতিক কালের রাঁচির দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে আমি এখানে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়েরই নাগরিকদের উদ্দেশ্যে একটা সাবধানবাণী বলতে চাই। ভারতে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান, পাকিস্তানের মহা পরিকল্পনারই কথাটা সকলে জেনে রাখবেন। সুতরাং অ মুসলমানরা যদি মুসলমানের উপর আক্রমণকারী হন, তাহলে তাঁরা পাকিস্তানের মহা:-পরিকল্পনার ফাঁদেই পা দেবেন। প্রয়োজনের তাগিদে পাকিস্তান নিজেই তাঁদের চর দিয়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবেন। সেই দিক থেকে বিচার করে, আমি ভারতের সরকারপক্ষকেও 'হুঁশিয়ারি' দিতে চাই।

'সরকার' যেন সদা-জাগ্রত প্রহরীর মত সতর্ক দৃষ্টি এই অবস্থার উপর রাখেন। সাম্প্রদায়িক অপরাধের মনোবৃত্তির সামান্যতম ফুলকি দেখা দিতেই যেন তাকে কঠোর হাতে দমন করেন। এখানে অপরাধীর ধর্মের বিচার করে কঠোর বা কোমল হওয়া মোটেই উচিত নয় বলে আমি মনে করি। অপরাধী অপরাধীই। সে হিন্দু, কি মুসলমান সে বিচার সম্পূর্ণ নিরর্থক। পাকিস্তানে থাকতে আমি দেখেছি যে দুই-একটি হিন্দু পুলিশ বা অন্য রকমের সরকারী কর্মচারী, এমনি একটা মানসিক ব্যাধিতে (Complex) ভোগেন যে সেখানে মুসলমান অপরাধী হ'লে তার সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভরসা পান না, সৎ মুসলমান অফিসারগণ কিন্তু ঐরূপ মানসিক ব্যাধিতে ভোগেন না। এখানেও দেখেছি, ভারত সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী জনাব মহম্মদ করিম চাগলা ধর্মনিরপেক্ষতার উপর অটলভাবে দাঁড়িয়ে যা' বলার সাহস দেখিয়েছেন, সেই সাহস ভারতের প্রধানমন্ত্রীও দেখাতে পারেন নি। তাঁরা হিন্দু হওয়াতেই এবং ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু হওয়াতেই বোধ হয় নির্বাচনে ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরাও বোধ হয় সেই একই মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। সরকার পক্ষ যদি ধর্মের বিচার না করে প্রথমেই অপরাধীর যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তাহলে অপর সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিজের হাতে শাস্তি বিধানের দায়িত্ব তুলে নিতে হয় না এবং তা'তে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষও এড়িয়ে যাওয়া যায়। আমি এদিকে এসে এই মুর্শিদাবাদ জেলাতেই দেখেছি যে রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য স্থানীয় পুলিশ হিন্দুকেও যেমন সময়ে সময়ে গ্রেপ্তার করেছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমানকেও গ্রেপ্তার করেছেন কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস পক্ষ থেকে মুসলমানের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মন্ত্রীদের কাছে তাঁদের তদ্বির করেছেন। এই জেলারই একজন মুসলমান কংগ্রেস 'এম এল এ'-কে পুলিশ রাষ্ট্রবিরোধিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করায় তাঁর সম্পর্কে কংগ্রেস পক্ষ থেকে বিশেষ তদ্বির করা হয়; ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ফেঁসে যায়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষের কিছু আগে সেই ভদ্রলোক যে পাকিস্তানে চলে যান, আজও বোধহয় আর ফেরেন নি; অন্তত আমি জানি যে বহুদিন পর্যন্ত তিনি ফেরেন নি। আজকে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতারা বলছেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশকে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙে দেওয়া হয়েছে!

পুলিশের মনোবল ভাঙায় প্রথম দায়িত্ব কংগ্রেস সরকারের ঘাড়েই পড়ে কি না, আমি সকলকে একবার নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করে দেখতে অনুরোধ জানাই। প্রথম একটি 'সরকার' যদি তাঁর দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেন, তাই বলেই যে সেই অজুহাতে পরবর্তী সরকারও সেই নীতিই অনুসরণ করে চলবেন, তারও কোনও মানেই হয় না, সুতরাং কোন্ 'সরকার' ভাল করেছেন, আর কোন্ 'সরকার' মন্দ করছেন, সে কথা এখানে আমি মোটেই তুলতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে যখন যে 'সরকারই' গদিতে থাকুন না কেন, তাঁরই নিরপেক্ষ মন নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলা বিশেষ দরকার, বিশেষত বর্তমানের বিস্ফোরণমুখী সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে।

এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি সর্বশেষে ভারতীয় মুসলমানগণের কাছেও একটি নিবেদন করতে চাই। পাকিস্তানকে যতই একটি ইসলামী রাষ্ট্ররূপে জাহির করা হোক না কেন এবং সেই ইসলামী রাষ্ট্রের বর্তমান অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান সাহেব যতই ধর্মের একত্বের কথা বলে বন্ধুত্বের জিগির তুলুন না কেন, ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয় না যে ধর্ম এক হওয়াতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরকাল বজায় থাকে। ইউরোপের দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একই খৃষ্টধর্ম থাকা সত্বেও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ অতীতেও হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার আশঙ্কা আছে। মুসলমানের ইতিহাসেও সেই একই কথা বলেছে। ধর্মের উচ্চমার্গের মনোরম কথাও রাজনীতিক স্বার্থকে ছাপিয়ে উপরে উঠতে পারে নি। এমন কি, পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান আয়ুব খান সাহেবও ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পরেই তাঁর রাজনীতিক স্বার্থেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও বেলুচিস্তানের পাঠানদের উপর কী অমানুষিক নির্যাতন না করেছেন। ঐ পাঠানরাও কিন্তু শুধু মুসলমানই ছিলেন না, বরং আয়ুব খানের স্বগোত্রই ছিলেন। আয়ুব খান সাহেবও একজন পাঠান। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান রাজনীতিক কর্মীদের উপরও তিনি কম দমনমূলক ব্যবস্থা নেন নি। আজও তার সাক্ষ্য পূর্ব পাকিস্তান জেলখানাগুলোতে দেখতে পাওয়া যাবে। সুতরাং ধর্মের ধুঁওতা দিয়ে আয়ুব খান সাহেব যতই উভয় দেশের মুসলমানের মধ্যে একত্বের ও বন্ধুত্বের বুলি কপচান না কেন, আসলে কিন্তু তার পেছনে আছে বিরাট

একটা রাজনীতিক চাল। তাঁর রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তিনি চান ভারতের কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে পূর্ব সীমান্তের আসাম পর্যন্ত ভারতের সর্বত্রই একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাক। সেই দাঙ্গায় ২।৪ লক্ষ মুসলমান মলেও তিনি অন্তরে কোনও ব্যথা অনুভব করবেন বলে আমি মনে করি না; তবে সেই অবস্থা ঘটলে, তিনি হাপুস-নয়নে কেঁদে বিশ্বের দরবারে এবং বিশ্ববাসীর কাছে ভারতে মুসলমানদের উপর কী অত্যাচার হচ্ছে তা' বলে তাঁর রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এক পা এগুতে পারবেন। সুতরাং মুসলমান নাগরিকদের কাছেও আমি নিবেদন করতে চাই যে তাঁরা যেন পাকিস্তানের প্রচারে বিভ্রান্ত না হন।

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়েই ভারত সরকারের ও ভারতীয় নাগরিকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এত কথা বললেম। এইবার আমরা একবার পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখি। সেখানে কী হচ্ছে? আমি দেখেছি সেখানে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হয়েছে, তার পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানি ও সাহায্য করেছেন, সেখানকার "সরকার"ই। কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে হজরতের পবিত্র কেশ হারানো উপলক্ষে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান সাহেব স্বয়ংই ইঙ্গিত করলেন যে ঐ দুষ্কার্যের নায়ক হলেন হিন্দুরাই! আর অমনি তাঁরই একজন মন্ত্রী জনাব সবুর খান যশোর ও খুলনায় দাঙ্গা শুরু করিয়ে দিলেন এবং সেই দাঙ্গাই ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়লো ঢাকায় ও সারা পূর্ব পাকিস্তানে। বৃটিশ আমলেও দেখেছি, পাকিস্তান সৃষ্টির পটভূমি তৈরি করার জন্য ঢাকায় পুনঃ পুনঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। ২।৩ দিন যাবৎ বেশ জোরেই চলেছে। তার পরে একদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যখন মহল্লা-সরদারগণকে ডেকে বলেন,—"ব্যস, বন্ধ করো।" আর সাথে সাথেই দাঙ্গা বন্ধও হয়ে যায়। ইংরেজ সরকার পাকিস্তানের পটভূমি সৃষ্টি করতে যে নীতি, যে ঐতিহ্য রেখে গিয়েছেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও পাক-সরকার সেই নীতিরই অনুসরণ করে চলেছেন। তাই আজও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হয় নি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধানের জন্যই দেশ বিভাগ করা হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি, তাঁরা তপ্ত-তেলের কড়াই থেকে একেবারে আগুনে পড়েছেন (from frying pan to fire)। দেশ

বিভাগের আগেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে কিন্তু বাস্তত্যাগ করে ভিখারীর বেশে অন্যত্র যাওয়ার কথা কেউ তো তখন কল্পনাও করেন নি। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

এই যে অবস্থা আজ দেখতে পাই, তা' সবই হল আগে যে ঝড়ের কথা বলেছি, সেই ঝড়ের পরে রেখে-যাওয়া বাইরের ক্ষতচিহ্ন! এই ক্ষতচিহ্নেরও কিছু কিছু সময়ে ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে। ভাঙা ঘর আগলে যাঁরা পড়েই থাকেন, তাঁরা ভাঙা ঘরও আবার খাড়া করেন; কিন্তু ঝড়ে (দাঙ্গায়) বিধ্বস্ত মানুষের মনে যে ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়, তা' তো সহসা মুছে যায় না। মনের মধ্যে তুঁষের আগুনের মত তা' অনেক কাল পর্যন্তই ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। ঐ আগুনের ফুলকি বুকে নিয়ে যাঁরা দেশত্যাগ করেন—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যান, তাঁদেরই মনের আগুনের ফুলকিই একদিন তাঁদের যাওয়া নতুন দেশেও আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে। ভারতের কোনও কোনও রাজ্য এই অবস্থাকে রোধ করার জন্য বাস্তত্যাগীদের মুখের উপর সীমান্তের দরজা বন্ধ করে দেন। সম্প্রতি আসাম সরকার দিয়েছেন। সীমান্তের দরজা বন্ধ করে দেওয়াটা সমস্যার কোন সমাধানই নয়; বরং আমি মনে করি পরিস্থিতিকে আরও বিস্ফোরণমুখী করে তোলা হয়। এই অবস্থার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, কর্তৃপক্ষমহলের বাস্তত্যাগীদের সম্পর্কে একটা সুবন্দোবস্ত করা। ভারত সরকার অর্থ খরচ করেছেন ঠিকই, তা' পুরোপুরি সফল হয় নি, দরদী মনের অভাবে। এই দিক দিয়ে বিচার করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের এবং তাঁর সরকারের মুখ্যসচিব শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেন, (আই. সি. এস) মহাশয়ের সংবেদনশীল মনের ও গঠনমূলক কাজের আমরা পরিচয় পাই। তাঁদেরই উদ্যোগে ভারত সরকারেরই অর্থে পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে ও দুর্গাপুরে দুইটি বড় কারখানা স্থাপিত হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার যুবকদের ও বাস্তত্যাগীদেরও অনেকের কাজের সংস্থান তাঁরা করেছিলেন। তাঁদেরই চেষ্টায় এই মুর্শিদাবাদ জেলায়ও মণীন্দ্র মিলসের (কাপড়ের কল) কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্র থেকে কয়েক লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে ঐ মিলসের সাথেই নতুন একটা সুতা কল (বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলস) করার ব্যবস্থা করে দেন। শর্ত ছিল, বাস্তত্যাগীদের কাজে লাগাতে হবে। কাজে লাগানও হয়েছিল কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য ও বাস্তত্যাগীদেরও চরম দুর্ভাগ্য যে বাংলার ঐ দুই পুরুষসিংহই আজ

পরলোকগত। তাঁদের তিরোধানের পর, পশ্চিম বাংলার দায়িত্বতার যাঁদের হাতে আসে, তাঁরা কেন্দ্রের উপর প্রভাব এমন কিছু খাটাতে পারেন নি যে যাতে অনিচ্ছুক কেন্দ্রকে কাজে লাগান যায়; ফলে দীর্ঘকাল ধরে মণীন্দ্র মিলস বন্ধ হয়ে আছে। বি টি মিলসও বন্ধ হয়েছিল। প্রায় ৭।৮ শত বাস্তুত্যাগী কর্মচ্যুত হয়ে আবার বেকার হয়ে পড়েছে। শ্রীঅমল রায় এম. এল. এ এইজন্তে তিন সপ্তাহ কাল অনশন ক'রে ছিলেন। শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এম. পি'ও অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু মণীন্দ্র মিলস আর চালু হয় নি; ফলে কর্মচ্যুত বাস্তুত্যাগীদের অনেকেরই ব্যবসা হয়েছে, চালের চোরাকারবার। বাস্তুত্যাগীরা জীবনরক্ষার তাগিদেই বাড়ি-ঘর-দেশ ছেড়ে অনির্দিষ্টের পথে একদিন পা বাড়িয়েছিলেন, আবার আজ তাঁদেরই সেই জীবনরক্ষার তাগিদেই সমাজবিরোধী কাজও করতে হচ্ছে! দেশপ্রেমের দিক দিয়ে এঁদেরও দেশপ্রেম একদিন এদিকের কারো চেয়ে কম ছিল না। এটাই কি অদৃষ্টলিপি, না, নেতাদেরই ঔদাসীন্ম ও দরদহীনতার ফল! ভারত সরকার বাস্তুত্যাগীদের জন্ম পরিকল্পনা অনেকই করেছেন, সরকারের টাকা খরচও কম হয় নি কিন্তু সে সব টাকার অধিকাংশই "বারভূতে" খেয়েছে; কাজ বিশেষ কিছুই হয় নি। 'সরকার' বিরাট দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা করে কাজও আরম্ভ করেছিলেন। অনেক বাস্তুত্যাগীদের সেখানে নিয়েও গিয়েছিলেন কিন্তু যাঁদের হাতে ঐ পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার ছিল, তাঁদের দায়িত্বহীনতার ও হৃদয়হীনতার জন্ম সে পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত সফল হয়ে উঠতে পারে নি। বাস্তুত্যাগীদের অনেকেই সেখান থেকে ফিরে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। সেই অবস্থায় বাংলার একজন অবসরপ্রাপ্ত 'আই. সি. এস.' অফিসার—শ্রদ্ধেয় শ্রীশৈবাল গুপ্ত মহাশয়কে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্ম সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীযুত গুপ্ত মহাশয়ের নির্ভীক স্বাধীনচেতা বিচারক হিসাবে ইংরাজ আমলেও সারা দেশে যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি গিয়েছিলেন; অত্যন্ত দরদভরা মন নিয়েই গিয়েছিলেন। শুনেছি, তিনি যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথেই কাজও আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীও একজন সমাজসেবিকা। শুনেছি, তিনি ও শ্রীগুপ্ত মহাশয় বাস্তুত্যাগীদের কুটিরে কুটিরে ঘুরে তাঁদের নির্জীব দেহে আবার প্রাণের এবং আশাহত মনে আবার নতুন আসার সঞ্চার করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা আবার নতুন প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে সাহসে বুক বেঁধে কাজে মন দিতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা ছিল, তা' জানি না; তবে

অবস্থা দেখে মনে হয় একদল কর্তাস্থানীয় মানুষের বোধহয় সেটা ইচ্ছা ছিল না! সৎ ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভীক কর্মচারী শৈবালবাবুর কাজ তাঁদের পছন্দ হ'ল না। শৈবালবাবু সব অবস্থা দেখে কর্তৃপক্ষকে জানান যে কিভাবে কত টাকা কে বা কারা অপচয় অথবা অপব্যবহার করেছেন! এই নিয়েই তাঁর সাথে কর্তৃপক্ষের অ-বনিবনাও হয় এবং তিনি আর ঐ সব ত্রুটি ও দুর্নীতিপূর্ণ শাসনব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকতে চান না। তিনি কাজ ছেড়ে চলে আসেন। বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা আবার আগেও যেমন ছিল, তেমনই অবস্থায় ফিরে যায়। ভারত সরকার আবার নতুনভাবে কাজ আরম্ভ করেছেন বলে শুনেছি। দেখা যাক, এবারে কতদূর কি হয়! কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংবেদনশীল মন দেখা না দিলে, বিশেষ কিছু হবে বলে আমি আমি আশা করতে পারি না। যাই হোক ভারত সরকার বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের একটা চেষ্টা সরকারী অর্থব্যয় করেই এযাবৎ চালিয়ে আসছেন। কিন্তু পাকিস্তান? পাকিস্তান ভারত থেকে সে দেশে যাওয়া বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে কী ব্যবস্থা করেছেন? বিশেষ কিছুই—বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে আগত বাস্তুত্যাগীদের জন্য করেছেন বলে আমি জানি না ও দেখি নি। তাঁরা অবশ্য বাস্তুত্যাগীদের উপলক্ষ করে দেশ বিভাগের কিছুকাল পর থেকেই বাস্তুত্যাগীদের জন্য একটা 'ট্যাক্স' আদায় ক'রে চলেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ট্রেনে, বাসে যেখানেই কেউ যাবেন, তাঁকেই তাঁর টিকেট কাটার সাথে সাথেই 'রিফিউজি-ট্যাক্স'-ও দিতে হবে। এইভাবে আদায়ীকৃত ট্যাক্সের পরিমাণও কয়েক শো কোটি টাকাই হবে। সঠিক কত জানি না; কারণ, ঐ 'ট্যাক্স' কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে আগত বাস্তুত্যাগীদের ভাগ্যে তার ছিটেফোঁটাও পড়ে নি। জেলায় জেলায় কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অঙ্গুলি-নির্দেশে তাঁদের দেখিয়ে দিয়েছেন, হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, হিন্দুদের জোত-জমা এবং পরোক্ষে জানিয়েছেন,—তোমরা তোমাদের অভাব নিজেদের চেষ্টাতেই (!) পূরণ করে নাও। আমরা নীরব আছি, নীরবই থাকবো! তারই ফলে পূর্ব পাকিস্তানে কখন দেখা দিয়েছে ঝড়ো দমকা হাওয়া, কখন ঝড়, কখনও প্রবল ঝড়, আবার কখনও বা ঘূর্ণি ঝড়। ১৯৫০ সালে এইভাবেই দেখা দেয় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জীবনে এক ঘূর্ণি ঝড়। সেই ঘূর্ণির জের কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালেই আবার ভাষা-আন্দোলনকে উপলক্ষ করেই ঐ সালেরই অক্টোবর মাসেই পাসপোর্ট প্রথা চালু করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে তোলেন, আবার এক প্রবল ঝড়!

এমনিভাবেই ১৯৫২ সাল কেটে যায়। দেখা দেয় ১৯৫৩ সাল। ১৯৫৩ সালের বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুইটি রাষ্ট্র হয়েছে। বৃটিশ-ভারতের শেষ সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তার পরে ভারতের সংবিধান তৈরি হওয়ার পরে ১৯৫২ সালে নতুন সংবিধান অনুসারে 'প্রজাতন্ত্র ভারতের' প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধান তখনও তৈরী শেষ হয় নি; তাই ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত 'এসেম্বলি'কেই টানতে টানতে এতদূর আনা হয়েছে। আরও টানতে গেলে দেশে ও বিদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে; তাই নুরুল আমিন সাহেবের সরকার ঠিক করলেন, ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারীতেই পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন শেষ করতে হবে। অমনি মুসলিম লীগের ভাঙা ঢোল— "আজাদ" পত্রিকায় কাঠি পড়লো। বেজে উঠলো নির্বাচনের বাজনা। 'আজাদ' পত্রিকা ২।৩টি প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধই লিখে ফেললেন, যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করে! তখন তাঁরা ভেবেছিলেন যে হিন্দুদের তাহলে খুব বে-কায়দায় ফেলা হবে। মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ভোটে হিন্দু কেউই নির্বাচিত হতেই পারবেন না। যুক্তির দিক দিয়ে যে ঐ ধারণার মধ্যে সত্য ছিল না, তা' বলা যায় না; বরং তার মধ্যে যথেষ্টই সত্য ছিল। আমরাও তা' জানতেম। তা' সত্বেও আমরা কয়েক বন্ধুই কুমিল্লার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে ঠিক করি যে, তবুও আমরা যৌথ নির্বাচনই দাবি করবো। নির্বাচনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সবগুলো দলের মধ্যেই একটা নতুনভাবে ভাঙা-গড়ার মনোভাব দেখা দেয়। সরকারী দল, মুসলিম লীগের ও বিরোধী কংগ্রেস দলের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়। ধীরেনবাবু পাকিস্তানের সংবিধান গঠনকারী সংসদেরও সদস্য ছিলেন। তিনি করাচিতে সীমান্তগান্ধী খান আব্দুল গফুর খান সাহেবের সাথেও 'কংগ্রেস' সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছেন। দেশ বিভাগের আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'কংগ্রেস'ই ছিল সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং মন্ত্রিত্বও ছিল কংগ্রেসেরই হাতে। দেশ বিভাগের পরে গফুর খান সাহেব ঠিক করেন যে কংগ্রেসের গান্ধীবাদী আদর্শ ঠিক রেখেই তিনি দলের নাম পরিবর্তন করবেন। তিনি করলেনও তাই। তাঁর দলের নাম রাখলেন—'পিপলস পার্টি' (Peoples' Party) ধীরেনবাবুর কাছে সব কথা শুনে, শ্রদ্ধেয় শ্রীহারান ঘোষচৌধুরী (বর্তমানে পরলোকগত)

আমি ও ধীরেনবাবু সাব্যস্ত করি যে, আমরাও 'কংগ্রেস' নামের মোহ ত্যাগ করে কংগ্রেসের সেবা ও ত্যাগের আদর্শকে আঁকড়ে রেখে খান সাহেবের "পিপলস পার্টি"র বাংলা তর্জমার দলের নাম রাখবো—"গণসমিতি।" কংগ্রেসের অন্যান্য বন্ধুদের কাছে আমাদের প্রস্তাব দিই কিন্তু তাঁরা "কংগ্রেস" নাম ত্যাগ করতে রাজী হন না। আমাদের যুক্তি ছিল যে, নুরুল আমিন সাহেব যেরূপ মত প্রকাশ করেছেন, তাতে মুসলিম লীগ যৌথ নির্বাচনপ্রথা কিছুতেই প্রবর্তন করবেন না, 'আজাদ' পত্রিকা যতই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখুন না কেন। পৃথক নির্বাচন প্রথাই যদি চালু হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে 'কংগ্রেস' নামের মোহ ত্যাগ করে আমাদের মনকে এমনভাবে গড়তে হবে যে যা'তে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যখন অ-সাম্প্রদায়িক দল গড়ে উঠবে তখন তাঁদের সাথে যাতে সম্পূর্ণভাবে মিলে যেতে পারি, নচেৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে আমরা তো চিরকালই সংসদে ও বিধানসভায়ও সংখ্যালঘু দল হয়েই থাকবো। সে অবস্থায় আমাদের পক্ষে কখনও শাসন ক্ষমতা ও শাসন-যন্ত্র দখল করা সম্ভবপর হবে না। সংখ্যালঘু দল থেকে আমরা না পারবো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও উপকার করতে, না পারবো সংখ্যাগুরু দলকে প্রভাবিত করে আমাদের আদর্শ রূপায়ণ করতে।

আমাদের এই যুক্তি নিয়ে তৎকালীন 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস'-এর অর্থাৎ (তখনও) আমাদের দলের সম্পাদক-বন্ধু শ্রীমনোরঞ্জন ধরের সাথেও আমি আলাপ করি। তিনি আমার মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, পৃথক নির্বাচনই যদি হয়, তবে হিন্দুদের মধ্যে 'কংগ্রেস' নামের প্রভাব খুবই বেশি আছে এবং সেজন্য কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে আমরা যাঁদের দাঁড় করাব তাঁরাই নির্বাচিত হবেন! আমি সে কথা মেনে নিতে পারি না এবং বলি যে খান আব্দুল গফুর খান সাহেব তো আজ আর কংগ্রেসের সদস্যও নন; তাই বলে কি কেউ তাঁকে 'কংগ্রেস' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন? তিনি অতীতেও আদর্শবাদী কংগ্রেস নেতা ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমাদের সম্বন্ধেও জনসাধারণ বেশ ভালভাবেই জানেন যে আমরা কংগ্রেসেরই লোক। যে দলের নামেই আমরা দাঁড়াই না কেন, দেশের লোকও আমাদেরই কংগ্রেসী হিসাবে ভোট দেবেন। আমার যুক্তি মনোরঞ্জনবাবু গ্রহণ করতে পারলেন না; সুতরাং আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল।

মুসলিম লীগের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়। জনাব ফজলুল হক সাহেব আবার তাঁর কৃষক-প্রজা দল গড়েন। জনাব সুরাবর্দী ও মৌলানা ভাসানি একত্রিত হয়ে "আওয়ামী মুসলিম লীগ দল" গঠন করেন এবং ঐ তিন প্রধান পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন, যাতে তাঁদের দুই দল মিলে একটা "যুক্তফ্রন্ট" দল গড়া যায়।

যখন আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল-ই ; তখন শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীকামিনী-কুমার দত্ত মহাশয় ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ই প্রধান উদ্যোগী হয়ে কুমিল্লা শহরে একটা সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান কামিনীবাবু নির্বাচিত হন এবং ঢাকার বন্ধু শ্রীগণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। যথাকালে সম্মেলন হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে "গণসমিতি" জন্ম গ্রহণ করে। কলকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐ নতুন দল গঠনের খুব সুখ্যাতি করেন। আমি সেই সম্মেলনে যেতে পারি নি ; তবে আমার পূর্ণ সম্মতি ঐ দল-গঠনে ছিল।

দল তো হল। এখন নির্বাচন-প্রথা নিয়ে আবার সব হিন্দু বন্ধুদের সাথেই আলাপ-আলোচনা চলল 'কংগ্রেস' ও 'গণসমিতি' যৌথ নির্বাচন প্রথা দাবি করেই তাঁদের দলের সভায় প্রস্তাব পাশ করেন। সমস্যা দেখা দেয়, তপশিলী সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে। তাঁদের একটা নিজস্ব দল—"সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডারেশন (Scheduled Caste Federation) নামে।" তাঁরা কিছুতেই যৌথ নির্বাচনে প্রথমে রাজী হতে চান না। বাহাদুর ধীরেনবাবু। তিনি তাঁর যুক্তিতর্কের সাথে তাঁর অমায়িক ব্যবহার দিয়ে এবং কামিনীবাবু তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব দিয়ে বন্ধুদের মত অবশেষে পাল্টালেন। তাঁরাও তাঁদের দলের সভায় যৌথ নির্বাচনই দাবি করলেন ; ফলে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল সদস্যই যৌথ নির্বাচন দাবি করলেন। এইবার 'আজাদ' পত্রিকাও তাঁর সুর বদলালেন! আজাদে আবার হিন্দুদের গভীর ষড়যন্ত্রের কাহিনী কল্পনা করে নিয়ে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করা শুরু করলেন!

ধীরেনবাবু, যৌথ নির্বাচনের দাবিদার সদস্যদের দাবির ভিত্তিতে সই নিয়ে করাচীতে ছুটলেন, গণপরিষদের সভায় যোগ দিতে। সেখানে গিয়ে তিনি অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল দলেরই যৌথ নির্বাচনের দাবি তুলে ধরেন কিন্তু

'ভাব তাতে ভোলে না।' অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলিম লীগের দরদ উথলিয়ে ওঠে। তাঁরা ইংরাজ আমলের সংবিধানে যে অ-মুসলমান বলে একটিমাত্র বিভাগ ছিল তাকে ভেঙে তার মধ্যে (১) বর্ণ হিন্দু, (২) তপশিলী হিন্দু, (৩) বৌদ্ধ ও (৪) খৃষ্টান—এই চারটি ভাগ করে তাঁদের ন্যায় বিচারের (!) পরাকাষ্ঠা দেখালেন। অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচকমণ্ডলী এইভাবেই পাকিস্তান-সংবিধান গঠন পরিষদ ঠিক করলেন।

আদি মুসলিম লীগের কার্যকাল এখানেই শেষ করছি।

দ্বিতীয় পর্ব

সাধারণ নির্বাচন

১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের বাজনা বেজে উঠেছে। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ মাসেই সাধারণ নির্বাচন সুরু হবে। বাজনা বাজতেই, রাজনীতিক দলগুলোর ভাঙা-গড়া ও নতুন নতুন দল গড়ে ওঠার তোড়জোড় আরম্ভ হয়। ১৯৫৪ সাল, যথা নিয়মেই আসে। সাথে করে আনে, রাজনীতিক কর্মচাঞ্চল্য। এতদিন 'মুসলিম লীগ' দল ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কোনও রাজনীতিক দল ছিল না। জনাব ফজলুল হক সাহেব অবশ্য ১৯৩৭ সালের ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জনাব জিন্নাহ্ সাহেবের ও তাঁর পরিচালিত মুসলিম লীগ দলের বিরোধিতা করেই নির্বাচনে গৌরবের সাথেই জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারেই দেখা যায়, জয়ের পরে তিনি তাঁর পরিচালিত মুসলিম লীগ-বিরোধী দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারেন নি। তিনি অবশেষে মুসলিম লীগ দলেই যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর জনাব ফজলুল হকের 'কৃষক-প্রজা' পার্টির যে সদস্যরা মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের সাথে যদি 'কংগ্রেস' দলের নির্বাচিত সদস্যরা মিলিত হতে পারতেন, তাহলে ঐ দুই দলের সদস্য সংখ্যাই বাংলার বিধানসভায় (বেঙ্গল এসেম্বলিতে) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতেন এবং বাংলার সরকার-পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরা অনায়াসেই নিয়ে মন্ত্রিসভা গড়তে পারতেন। তা' যদি হত, তাহলে, বাংলায় জিন্নাহ্ সাহেবের শত চেষ্টাতেও মুসলিম লীগ দল শক্তিশালী কোনও রাজনীতিক দল হিসাবে কখনই গড়ে উঠতে পারত না; আর, বাংলাদেশে মুসলিম লীগ দল যদি একটা শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে গড়ে না উঠতো, তাহলে সারা ভারতবর্ষেই ঐ দল কোনও শক্তিশালী রাজনীতিক দল হতে পারত না। বাংলাদেশ ছিল মুসলমান-প্রধান দেশ। এখানে মুসলিম লীগ দলের চারাগাছটি যদি শেকড় গাড়তে না-পারত, তাহলে ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশেই মুসলিম লীগ দলের গাছটি জমি থেকে রস-সংগ্রহ করে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হত না। ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশ ও পশ্চিম সীমান্তে

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এই দুইটিই ছিল, মুসলমান-প্রধান অঞ্চল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হয় কংগ্রেস সরকার। 'মুসলিম লীগ' সেখানে কংগ্রেস নেতা ডাঃ খাঁন সাহেব ও তাঁর ভাই খান আব্দুল গফুর খাঁনের নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস দলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়। পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগ দল, হিন্দু-শিখ-মুসলমানের সম্মিলিত অ-সাম্প্রদায়িক 'ইউনিয়নিস্ট' দলের কাছে পরাভূত হয়। সেখানেও হয়, 'ইউনিয়নিস্ট' দলের সরকার। সেই অবস্থায় বাংলা-দেশে যদি "কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেস" দলের যৌথ সরকার গড়ে উঠতে পারত, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র কিছুতেই হত না। অখণ্ড ভারতবর্ষই একদিন স্বাধীন হত। কিন্তু তা' হল না। হতে পারল না। কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ অন্য কোনও দলের সাথে যুক্ত হয়ে যৌথ দায়িত্বে কোথাও 'সরকার' গঠনের অনুমতি দিলেন না। বাংলার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত কংগ্রেস দলও, জনাব ফজলুল হক সাহেবের পরিচালিত মুসলিম লীগ-বিরোধী মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐ রাজনীতিক দলের সাথে যৌথ দায়িত্ব নিয়ে 'সরকার' গঠন করতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই জনাব হক সাহেব, তাঁর দলবল নিয়ে মুসলিম-লীগের সাথেই হাত-মিলিয়ে মন্ত্রিসভা গড়লেন! এই-ই কি ছিল, দেব-ভূমি ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাতার ইচ্ছা, না, মানুষের ষড়যন্ত্রই সেদিন বিধাতার ইচ্ছাকেও বানচাল করে দিয়েছিল? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার মত একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে দেওয়ার চেষ্টা হয়তো বাতুলতা বা ধৃষ্টতা হবে; তাই, আমি নিজে তার উত্তর দিতে চেষ্টা না-করে, শ্রদ্ধেয় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মত ঐতিহাসিক গবেষক সুধীজনের কাছ থেকেই এর সঠিক উত্তরের জন্য তাঁদের কাছেই প্রশ্নটি তুলে ধরছি। কেবলমাত্র তাঁরাই পারেন এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগের সাথে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভা গড়েন এবং অবশেষে যখন তিনি মুসলিম লীগেরই সদস্য হয়ে যান, তখন তাঁর কৃষক-প্রজা দলও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। কৃষক-প্রজা দলে, কংগ্রেসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এমন কিছু মুসলমান সদস্যও ছিলেন। ফজলুল হক সাহেব, মুসলিম লীগে যোগ দিলেও তাঁরা মুসলিম লীগে যোগ দিলেন না। কৃষক-প্রজা দলের সাধারণ সম্পাদক কংগ্রেসপন্থী হুমায়ুন

জনাব সামসুদ্দিন আহমেদ ও রংপুরের গাইবান্ধা শহরের জনাব আবু হোসেন সরকার প্রমুখ কৃষক-প্রজা-দল হিসাবেই সরকার-বিরোধী দলে থেকে যান।

পরে কিন্তু জনাব হক সাহেবও শেষ পর্যন্ত জনাব জিন্নাহ সাহেবের একনায়কত্ব আর সহ্য করতে পারেন না। এই সময়েই বিরোধী দলের দলপতি শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য হক সাহেবকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দলের সদস্যদের নিয়ে হিন্দু মুসলমানের এক মিলিত সরকার গঠনের জন্য রাজী করান। কথা ছিল, সেই সরকারে শরৎবাবুও থাকবেন কিন্তু ইংরেজ সরকার তো তা' চান না। তাঁরা চান, মুসলিম লীগকেই শক্তিশালী করে গড়ে তাঁদের দ্বারাই ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার দাবি তোলাতে; সুতরাং হক সাহেব যখন নতুন মন্ত্রিসভা গড়বেন ঠিক করেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে শরৎবাবুকে আকস্মিক-ভাবে গ্রেপ্তার করে বাংলার বাইরে পাঠান হয়। দূরদর্শী রাজনীতিক নেতা তাঁর গ্রেপ্তারের সময়ই তাঁর অনুবর্তীদের নির্দেশ দিয়ে যান যে তাঁরা যেন পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁকে (শরৎবাবুকে) ছাড়াই নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যান। তা-ই হল, ফলে নতুন যে মন্ত্রিসভা গড়ে ওঠে তাকে মুসলিম লীগের জয়ঢাক —"আজাদ" পত্রিকা 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা আখ্যা দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে হক-বিরোধী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা আরম্ভ করে। বাংলাদেশের মুসলমানকে হক-বিরোধী করা 'আজাদ' পত্রিকা কেন, খোদ জিন্নাহ সাহেবেরও ক্ষমতার বাইরে, কারণ, মুসলমানদের মধ্যে হক সাহেবের প্রভাব অতুলনীয়। বাংলার মুসলমানসমাজ জানেন যে বাংলার মুসলমানের যদি কেউ কোনও উপকার করে থাকেন, তাঁদের কেউ যদি অর্থনীতিক ও রাজনীতিক দিক থেকে অধঃপতনের গভীর গহ্বর থেকে তুলে থাকেন, তবে তা করেছেন হক সাহেব-ই; জিন্নাহ সাহেবও নয়, মুসলিম লীগ দলও নয়। তার উপর হক সাহেবের সাধারণ মানুষের পর্যায় থেকে এসে তাঁদের ছেঁড়া চাটাইয়ে বসে তাঁদের দেওয়া 'সান্‌কি'-তে তাঁদেরই সাথে খাওয়া-দাওয়া করে তাঁদের সাথে একদম সম্পূর্ণভাবে মিশে যাওয়া আর অন্য কোন নেতার পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। জিন্নাহ সাহেবের তো নয়-ই, নাজিমুদ্দিন সাহেবের বা সুরাবর্দী সাহেবের পক্ষেও তা' সম্ভবপর ছিল না। ফজলুল হক সাহেবকে সবাই মনে করতেন তিনি গরীবের 'বাপ-মা', দরিদ্রের অকৃত্রিম বন্ধু। এই গরীবের-দরিদ্রের দলে মুসলমানই যে ছিলেন তাই নয়। তাঁদের মধ্যে হিন্দুও ছিল।

আমি যতটা হক সাহেবকে দেখেছি, জেনেছি তা'তে আমার মনে হয়েছে আসলে কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি সাম্প্রাদায়িকতাবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ও বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতই সর্বভারতীয় নেতা হয়েও একজন খাঁটি বাঙালী। তাঁদের-ই মত জনাব হক সাহেবও বাংলাদেশকে ও বাঙালীকে প্রাণ দিয়েও ভাল বাসতেন। আমি দেখেছি, বাংলাদেশের বিভাগকেও তিনি মনে-প্রাণে কোনদিন মেনে নিতে শেষ পর্যন্ত পারেন নি। তাঁর সামনে বাংলা বিভাগের কথা উঠলেই তাঁর দু' চোখ থেকে অশ্রুধারা নেমে এসে তাঁর বিশাল বক্ষ ভাসিয়ে দিত। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। তাই আমার মনে হয়, জনাব হক সাহেব কখনই সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না; তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ রাজনীতিক নেতা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও ভাবপ্রবণ রাজনীতিক নেতা ছিলেন কিন্তু হক সাহেব বোধ হয় পাক-ভারত উপ-মহাদেশের সবচেয়ে বেশি ভাব-প্রবণ নেতা ছিলেন; সেই জন্যই তাঁর ভাবের মণিকোঠায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গরীবের দুঃখ-দৈন্য ও বেদনা যেমন আঘাত করত, তেমনই তাঁর কোনরূপ বিরূপ সমালোচনাও তাঁকে একেবারে ক্ষিপ্ত করে তুলত। এই ভাবপ্রবণতার জন্যই দরিদ্রের দুঃখে তাঁর নীরব দানও অনেকই ছিল বলে শুনেছি এবং সেই দানের মধ্যে জাতি ও ধর্মের কোনও পার্থক্য তিনি করতেন না; আবার সেই অ-সাম্প্রদায়িক লোকই আবার তাঁর বিরূপ সমালোচনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কখনও হাজার জওহরলালকে তাঁর পকেটে পুরতেন (!) এবং কোনও হিন্দুকেই বিশ্বাস করা যায় না এমন কথাও বলতেন!

১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে সেখানে তিনি-ই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' তুলেছিলেন, সেই সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন যাকে সেই সময়কার বাংলার অনেক পত্র-পত্রিকায় হক সাহেবের "সাতানা" বক্তৃতা বলে বক্রোক্তি করেছিলেন, তা ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণায় বিষে ভরপুর। তিনি অতিরিক্ত রকমের ভাবপ্রবণ ছিলেন বলেই কোনও রাজনীতিক দলেই দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেন নি। তাঁর রাজনীতিক জীবন শুরু হয় তখনকার দিনের সর্বভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয়বাদের বেদী-মূলে এবং তিনি সেই সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ পর্যন্ত পেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস ছাড়েন। মুসলিম লীগে যোগ দেন

কিন্তু মুসলিম লীগেও তিনি অনেকবারই যোগ দিয়েছেন, আবার ছেড়েছেনও। তাঁর নিজের হাতে গড়া 'কৃষক-প্রজা' দলেও তাঁর অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্যই ভাঙন ধরেছিল যখন তিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগে যোগ দেন। তাঁর ভাবপ্রবণতা তাঁর চিত্তকে সর্বদাই অস্থির করে রেখেছিল কিন্তু একটি জায়গায় মাত্র তাঁর চিত্তের স্থিরতা কখনই বিপর্যস্ত হয় নি, সেই জায়গাটি হচ্ছে দরিদ্র জনসাধারণের ও বন্ধুদের জন্য তাঁর বাড়ির দরজা-সর্বদাই খোলা থাকত এবং অতি নিম্ন অবস্থার সাধারণ মানুষের সাথে তিনি আহারে-বিহারে, চাল-চলনে ও ব্যবহারে একেবারে মিশে যেতে পারতেন, যা আর কোনও নেতাই পারতেন না। এই জন্যই তিনি ছিলেন বাংলার মুসলমান জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রিয়—সকলেই মনে করতেন তাঁকে আপন জন। এ ছাড়াও তাঁর অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তি ছিল। বাংলা, ইংরাজি ও উর্দুতে সমান দখল—সমানভাবেই অত্যন্ত জোরালো হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করতে পারতেন্। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে দেখেছি ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে তিনি যখন চার-সদস্যের একটা কাঠামো (Skeleton) মন্ত্রিসভা পূর্ব-পাকিস্তানে করেছিলেন, সেই সময় ইরানের "শাহ্" করাচিতে (তখন পাকিস্তানের রাজধানী ছিল) এলে জনাব হক সাহেব ও তাঁর মন্ত্রিসভার অপর তিন সদস্য (জনাব আবুহোসেন সকার, জনাব আস্রাফুদ্দিন চৌধুরী ও জনাব আজিজুল হক ওয়কে নান্না মিঞা) মহামান্য অতিথি 'শাহের' সাথে দেখা করতে যান এবং হক সাহেব আরবীতে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং "শাহ্" তাঁদের তরবারি উপহার দেন। এটা পরবর্তীকালের ঘটনা; তবু এখানে তুলেছি এই জন্যই যে হক সাহেব যে নানা ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তা-ই দেখানোর জন্য। এত গুণের অধিকারী যে ব্যক্তি সেই হক সাহেবের বিরুদ্ধে "আজাদ" পত্রিকায় দিনের পর দিন "শ্যামা-হক" মন্ত্রিসভার বিষয় কুৎসা প্রচার করা সত্ত্বেও কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে হক সাহেবের জনপ্রিয়তা খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হয় না; তবু কিন্তু তথাকথিত "শ্যামা-হক" মন্ত্রিসভা বেশিদিন টিকতে পারল না। কেন যে পারল না, সে কথাটা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি।

১৯৪২ সাল। হিজলী বন্দীশালা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বন্ধ করে দিতে হওয়ায় ঐ বন্দীশালায় আমরা ১০৫ জন বন্দী ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে যেতে বাধ্য হই। বন্দীদের মধ্যে দুইজন তৎকালীন বাংলা বিধানসভায় (এসেম্বলির)

সদস্যও ছিলেন। একজন হলেন ঢাকার শ্রীপ্রতুল গাঙ্গুলী (বর্তমান পরলোকগত) ও অপরজন মৈমনসিংহের শ্রীজ্ঞান মজুমদার (বর্তমানে মৈমনসিংহে আছেন। পাশপোর্ট না পাওয়ায় তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে দেখতেও আসতে পারছেন না)। জ্ঞানবাবু আমাদের দলের সাথেই ঢাকায় যান; আর প্রতুলবাবু যান মেদিনীপুরে। আমরা ঢাকা জেলে থাকাকালে আমাদের চোখের সামনেই জেলসুপার (সাহেব)-এর হুকুমে 'গুণ্ডা এ্যাক্টে' যেসব লোককে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক করে রাখা হয়েছিল তাদের উপরে অকারণে বা অতি তুচ্ছ কারণে পুলিশ গুলী চালায় এবং অন্তত ২৫ জনকে নিহত ও বহু বন্দীকেই আহত করে। আমরা সে ঘটনার আদ্যপান্তই দেখেছি। সেই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড দেখে মর্মাহত হয়েছি কিন্তু আমরা তো নিরুপায়—আমরাও নিরাপত্তা বন্দী। অন্য কিছু করতে না পেরে আমাদের সকলের অনুরোধ জানিয়ে বিধানসভার সদস্য জ্ঞানবাবু মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেবকে ও অপর অত্যন্ত প্রভাবশালী জন-দরদী মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মহাশয়কে অবিলম্বে ঢাকা জেলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। জনাব হক সাহেব ডঃ শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাদের সেই তারবার্তা পাওয়ার সাথে সাথে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে পৌছান। তখন আমরা দুই নেতাকেই ঐ গুলীচালনা করার ঘটনার বিশদ বিবরণ দিই এবং কোথা থেকে কিভাবে গুলী চালিয়েছিল এবং নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা করেছিল পুলিশে তা' বলি। আমাদের কাছে সব শুনে হক সাহেবকে সেদিন শিশুর মত কাঁদতে দেখেছি। তিনি আমাদের 'বাঘের বাচ্চা বাঘ' ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে সব বলতে বলেন। তিনিও সবই শোনেন। এই ঘটনাটি হয় বেঙ্গল এসেম্বলির অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে। এসেম্বলির অধিবেশন আরম্ভ হলে মুখ্যমন্ত্রী জনাব হক সাহেব ঢাকা জেলের হত্যাকাণ্ডের একটা বিবরণ দিয়ে ঘোষণা করেন যে ঐ ব্যাপারের বিচার-বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। এই তদন্ত করার ঘোষণায় ইংরেজ সরকার একেবারে মহাকুপিত হয়ে ওঠে এবং ইংরেজ শাসক দলের প্রতিনিধি বাংলাদেশের গভর্নর (সম্ভবত তাঁর নাম স্যার জন হার্বার্ট) জনাব ফজলুল হক সাহেবকে 'গভর্নমেন্ট হাউসে' ডাকিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর 'রিভলভার' রেখে হক সাহেবকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশমত কাজ করতে হক সাহেবকে বাধ্য করেন। এটাই "শ্যামা-হক" মন্ত্রিসভার পতনের কারণ। 'শ্যামা-হক'

মন্ত্রিসভার পতন হোল। হক সাহেব আগেই মুসলিম লীগ দল ছেড়েই ঐ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন।

এই সবই হল ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরের ঘটনা। এইসব ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়েই জনাব ফজলুল হক সাহেবের ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তিনি জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তা-ও কিছু কিছু বলতে হয়েছে। না বললে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ হ'ত না বা অসম্পূর্ণ থাকত।

যাক এই জনপ্রিয়তাকে সম্বল করেই হক সাহেব আবার ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল-বল নিয়ে নির্বাচনপ্রার্থী হন। ক্ষমতাসীন বিদেশী সরকারের অনুকম্পায় মুসলিম লীগ দল ইতিমধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে হক সাহেব দুইটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে উভয় স্থান থেকেই মুসলিম লীগের চূড়ান্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও সসম্মানে নির্বাচিত হন কিন্তু তাঁর দলের আর বিশেষ কোনও সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন নি। মুসলিম লীগ দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচিত হল এবং ঐ দলের নেতা জনাব সুরাবর্দী সাহেব তাঁর মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গড়েন। হক সাহেব বেঙ্গল এসেম্বলিতে একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে থাকেন। তিনি কচিৎ কখনও এসেম্বলিতে গিয়ে ১০।১৫ মিনিটকাল মাত্র থাকতেন। মুসলিম লীগ দল তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। তিনিও নিঃশব্দেই আসতেন আবার নিঃশব্দেই চলেও যেতেন। এই অবস্থাই চলছিল। এই অবস্থায় মুসলিম লীগ দল "ডাইরেক্ট অ্যাকশন" (সম্মুখ সমর। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়—হিন্দুর বিরুদ্ধে) ঘোষণা করে কাজে রূপায়িত করলেন। কলকাতার রাস্তায় রক্তের গঙ্গা বয়ে গেল, বহু বস্তী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, বাড়িও অনেক-ই পুড়ল। সমস্ত রাত্রি ধরেই আমরা "আল্লা-হো-আকবর" ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি কয়েকদিন ধরেই শুনলেম। আমি তখন শশিভূষণ দে স্ট্রীটে 'স্যাভয় হোটেলে' থাকতেম। এসেম্বলির অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেল। পরে যখন আবার 'এসেম্বলি' ডাকা হয় তখন বিরোধী কংগ্রেসপক্ষ থেকে সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা (no confidence) প্রস্তাব আনা হয়। সেইদিন দেখি এক অভিনব অবস্থা! জনাব ফজলুল হক সাহেব যাঁর পাদক্ষেপে 'এসেম্বলি হাউসে' ঢুকতেই মুসলিম লীগ দলের কয়েকজন শাণ্ডাস্থানীয় ব্যক্তি ছুটে গিয়ে হক সাহেবকে ধরে নিয়ে গিয়ে

আসে। হক সাহেব আবারও মুসলিম লীগের বিরোধীর ভূমিকায়-ই দলবল নিয়ে নির্বাচনে নামেন কিন্তু তিনি ও তাঁর দুই একটি সহকর্মী ছাড়া আর তাঁর দলের বিশেষ কেউই নির্বাচিত হতে পারেন নি। সর্বত্র মুসলিম লীগেরই জয়-জয়কার হয়। নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগের আর একটি স্তম্ভ ও নায়ক—জনাব সুরাবর্দী সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গড়েন। জনাব সুরাবর্দী সাহেবের প্রেরণায় মুসলিম লীগের উদ্দাম ও উন্মত্ত যৌবন রক্ত-পাগল হয়ে দাঁড়ায়। তারই ফলে হয় মুসলিম লীগ-.বাষিত সক্রিয় সম্মুখ সমর (ডাইরেক্ট অ্যাকশন। বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে নয়, অ-মুসলমানের বিরুদ্ধে) উপলক্ষে কলকাতায় হয় রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতায় সুবিধা করতে না পেরে ভেদ-বুদ্ধিসম্পন্ন মোল্লা-প্রধান নোয়াখালি জেলায় সুরাবর্দী সাহেব পাকা পরিকল্পনা করে সংগ্রামক্ষেত্র পরিবর্তন করেন। সেখানকার বীভৎস ও নৃশংস অত্যাচারের নায়ক হয় মৌলভি গোলাম সারওয়ার সাহেব। তারই নির্দেশে জমিদার শ্রীরাজেন্দ্র রায়ের বাড়ি আক্রান্ত হয় এবং রায় মহাশয় বীরের মত সেই সংগ্রামের সম্মুখীন হন এবং জনৈক ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ দিতে বাধ্য হন। রায় মহাশয়ের মাথা কেটে নিয়ে একটা থালার উপরে সাজিয়ে নিয়ে তা নাকি সংগ্রামের নায়ক সারওয়ার সাহেবকে উপহার দেওয়া হয়! তৎকালের সংবাদপত্রে এইরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। সারা ভারতবর্ষে ঐ লোমহর্ষক বীভৎসতার কথা প্রচার হয়ে পড়লে বিহারে তার পাল্টা জবাব হিসাবে হিন্দুরা মুসলমানের উপর ততোধিক বীভৎসতায় ও নৃশংসতায় স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু, বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে ২৫।৩০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। দেশবিভাগ তথা পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের গোড়ায় আছে এইরূপ তথাকথিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গৃহদাহ, সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারীহরণ ও নারী-ধর্ষণ প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজ। 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' পরিকল্পনা করে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান এবং তার পৈশাচিকভাবে বাংলাদেশে রূপায়ণ করেন শহীদ সুরাবর্দী সাহেব; আর এইটেই কংগ্রেস নেতাদের কাছে দেশ-বিভাগ করে স্বাধীনতা লাভের তথা সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। আমি এই মনোভাবকে কংগ্রেস নেতাদের একটা 'অজুহাত'-ই বলতে চাই। কারণ ইংরেজ শাসকদের ভারত ছেড়ে

যেতেই হত এবং তাঁরা যাবেনও ঠিক করেছিলেন। তার পেছনের প্রধান কারণ ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকারের বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য দেশসেবক বীরের মত প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম। আজাদ হিন্দ বাহিনী সেদিন যুদ্ধে জেতেন নি ঠিকই, কিন্তু তাঁরা যে মরণজয়ী আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছিলেন তা' ভারতবর্ষের নৌ-স্থল ও বিমানবাহিনীর সৈন্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে পড়েছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে সারা ভারতবর্ষের জনসাধারণ বিদেশী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন—তাঁরা আর এদেশে ইংরেজ সরকারকে চান না। তবু ইংরেজ সরকার টিকে ছিলেন তাঁদের অধীনের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর ভরসার উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে স্থানে স্থানে পুলিশ (বিহারে পুলিশের তৎকালীন হাবিলদার শ্রীরামানন্দ তেওয়ারীর নেতৃত্বে পুলিশ দল। আজ সেই তেওয়ারীজী-ই বিহার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী!) ও সৈন্যবাহিনী (বোম্বাইয়ে নৌবাহিনী) ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্বদেশপ্রেম একটা প্রকাণ্ড নাড়া দিয়েছে। তাঁরা কেউ-ই আর বিদেশী সরকারকে চান না; সুতরাং ইংরেজের ভারত ত্যাগ করা ছাড়া আর পথ নেই। তাঁরা ভারত ছেড়ে যাওয়াই স্থির করলেও শেষ চেষ্টা করে যান যে ভারতকে বিভাগ করে দুর্বল করে রাখা যায় কিনা! সেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা যে ফাঁদ পেতেছিলেন, তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা ভারতবর্ষকে বিভাগ করে স্বাধীন ভারতের কর্তৃত্বে বসার অতি আগ্রহে সেই ফাঁদেই পা দিলেন। ইংরেজের পাতা ফাঁদে পা দিলেন বটে, কিন্তু দেশের সম্মুখে 'অজুহাত' দেখালেন—'সাম্প্রদায়িক শান্তি'! ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ-ই ছিল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাণ; আর সেই প্রাণকেই ছোরা মেরে হত্যা করা হলো দেশ-বিভাগ করে, আজ তাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে ক্রমশই যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ছে। দূরদর্শী রাজনীতিক গান্ধীজী এই অবস্থা যে আসবে, তা' অনুমান করেই তাঁর নিহত হওয়ার মাত্র ৪ ঘণ্টা আগে যে তাঁর শেষ নির্দেশ লিখে রেখে গিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেসকে বিলোপ করে তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে।

তা হয় নি। আজ সারা দেশই তার জন্য ভোগ করছেন। এই সব দুর্ভোগের মূলে কে? মুসলিম লীগের জাতীয়তা-বিরোধী দ্বিজাতিতত্ত্ব নীতি ও তার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার জনাব শহীদ সুহ্রাবর্দী। কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেব মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারণ করেছিলেন; আর বাংলাদেশে জনাব সুহ্রাবর্দী সাহেব সারা বাংলায় রক্ত ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে তার সার্থক রূপায়ণ করেছিলেন; তাই তিনি মুসলিম লীগের-ই শুধু একটি স্তম্ভ ছিলেন না, 'পাকিস্তান' সৃষ্টিরও তিনি ছিলেন অন্যতম মহানায়ক। আমার মতে জনাব জিন্নাহ সাহেব ছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে 'এটর্নি-জেনারেল' আর শহীদ সুহ্রাবর্দী সাহেব ছিলেন সংগ্রামের 'ফিল্ড মার্শাল'। জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে নীতি নির্ধারণ করেছেন, দেশে-বিদেশে যুক্তি-তর্ক দিয়ে তার পক্ষে 'সাওয়াল' করেছেন; আর জনাব সুহ্রাবর্দী সাহেব করেছেন সংগ্রাম পরিচালনা। এই দুই নেতার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হতে পারত কি না সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রেও ভাবীকালের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের উপর-ই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তুলে ধরছি।

যাক, আমি বলতে চাই যে জনাব ফজলুল হকের পরে বাংলার মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে জনাব সুহ্রাবর্দী সাহেব ছিলেন দ্বিতীয় স্তম্ভ। কিন্তু এই দুই নেতার ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতালের ব্যবধান। পরস্পর উভয়েই উভয়ের ছিলেন বিপরীতধর্মী। হক সাহেব অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ও হৃদয়বান; আর সুহ্রাবর্দী সাহেব, কঠোর বাস্তববাদী ও হৃদয়হীন। শুনেছি তাঁর হৃদয়হীনতার স্বাক্ষর তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনেও রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর রাজনীতিক জীবনে আমি একাধিকবার তাঁর হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়েছি। দেশবাসী সকলেই অল্প-বিস্তর কিছু কিছু পেয়েছেন। তাঁর কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে গিয়ে অনেক সময়ই আমার মনে হয়েছে, তাঁর রক্তের মধ্যেই হয়তো অপরাধপ্রবণতা মিশে ছিল। কেন যে এমন হয়েছিল, সেইটে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি নি। তিনি ছিলেন, বাংলাদেশের এক অতি সম্ভ্রান্ত এবং অত্যন্ত উচ্চ-শিক্ষিত এক মুসলমান পরিবারের সন্তান। এই পরিবারের সকলেই বাংলাদেশে তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও গৌরবের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত এবং জনাব সুহ্রাবর্দী সাহেবও অতি-শিক্ষিত। তিনি ছিলেন একজন বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার; তবু যে

সুরাবর্দী সাহেবের চরিত্রে ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা কীভাবে এসেছিল, তা' গবেষণার বস্তু। তরুণ ব্যারিস্টার সুরাবর্দী সাহেব এক সময়ে আইন-কলেজে অধ্যাপকের কাজও করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে অনেকেই আইন ব্যবসায়ে বিশেষ খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারো কারো কাছে শুনেছি যে, তিনি ছাত্রমহলে বিশেষভাবে তখন জনপ্রিয় ছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তাঁর সব ছাত্ররাই নাকি তাঁর অমায়িক ব্যবহারে বিশেষভাবেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এহেন সুরাবর্দী সাহেব অবশেষে একদিন রাজনীতিতে এসে যোগ দেন। যে প্রতিষ্ঠানে সেদিন তিনি যোগ দিয়েছিলেন, "কংগ্রেস"ই ছিল সেই প্রতিষ্ঠান এবং দেশবন্ধু শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ই তাঁকে কংগ্রেসে এনেছিলেন।

"দেশবন্ধু" তখনকার দিনের দুইজন তরুণ কর্মীকে তাঁর পার্শ্বচর হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই দুইজনকেই মহাশক্তিধর নেতারূপে দেশবাসী সকলেই ও আমরাও দেখেছি। এই দুইজনের একজন ছিলেন, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়, যিনি পরবর্তীকালে "নেতাজী" নামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক ও রূপকার রূপে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন, আর অপরজন ছিলেন, জনাব শহীদ সুরাবর্দী। এই দুইজনের মধ্যেই ছিল জলন্ত আগুন। এক-একজন যেন এক-একটি আগ্নেয়গিরি। কিন্তু দুইজনের ভেতরের আগুন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুই বিপরীতধর্মী ক্রিয়া প্রকাশ করেছে। সুভাষচন্দ্রের ভেতরের আগুন, বিদেশী ইংরেজ-শাসনের বুনিয়াদ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আর সুরাবর্দী সাহেবের ভেতরের আগুন, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে ভস্ম করে দিয়ে অতীতের বিদেশী শাসকদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সভ্য মানুষের হাতে আগুন পড়লে, তা' সমাজের বহু উপকারই করে; আবার অসভ্য সমাজ-বিরোধীর হাতে সেই আগুনই তাণ্ডব সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের হাতের আগুন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে; আর সুরাবর্দী সাহেবের হাতের আগুন দেশকে খণ্ডিত করেছে।

সেদিনের সেই দুই তরুণ দৃঢ়চেতা নেতাই ছিলেন সঙ্কল্পে অটুট। সঙ্কল্প-সিদ্ধির পথে কোন বাধাকেই তাঁরা বাধা বলে মনে করতেন না—চলার পথে তাঁরা উভয়েই দেখিয়েছেন তাঁদের দুর্জয় সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য তাঁদের ইস্পাতকঠিন মন। কিন্তু এই সব গুণের অধিকারী হয়েও দুই নেতার কাজ

বিপরীতমুখী ও বিপরীতধর্মী পথেই গিয়েছে। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; আর সুরাবর্দী সাহেব চেয়েছিলেন আগে ভারত-ভাগ, পরে স্বাধীনতা। 'কংগ্রেস' ও 'মুসলিম লীগের' এই বিপরীতমুখী আদর্শই তাঁরা রূপায়ণ করতে চেয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের আদর্শ অর্থাৎ কংগ্রেসের আদর্শ আমরা—কংগ্রেস-সেবকরা ও নেতারা—সম্যক রূপায়ণ করতে পারি নি, 'যেন তেন প্রকারেণ' এবং যে প্রকারেরই হোক না কেন, স্বাধীনতালাভের জন্য আমাদের অতি উগ্র ও অধীর আগ্রহের জন্যই। সুরাবর্দীর নেতৃত্বে মুসলিম-লীগের দেশ-বিভাগের আদর্শ রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু সুরাবর্দী সাহেব এত করে পাকিস্তান সৃষ্টি করেও কিন্তু ভারতবর্ষের খণ্ডিত অংশ, অর্থাৎ পাকিস্তানে মুসলিম লীগের শ্রেষ্ঠ নেতা কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহর আমলে তাঁর কাছে মোটেই পাত্তা পান নি! এটাই তাঁর ছিল অদৃষ্টলিপি বা কর্মফল! কোনও একনায়ক শাসকই (Dictator) তাঁর অধস্তন কোনও কর্মীকেই অত্যধিক ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয় হতে দেখলেই তাঁকে দমিত করেন। সুরাবর্দী সাহেবের মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রিয়তা ও তাঁর বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তার আভাষ পেয়েই তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখেন, কোনও-রূপই পাত্তা দেন না। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব আয়ুব খান সাহেবও তাঁর সহকর্মী ও সামরিক অভিযানের সাথী—লেঃ জেনারেল আজম খান সাহেবকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসাবে অত্যধিক জনপ্রিয় হতে দেখেই তাঁকেও দূরে ঠেলে ফেলেছেন! একনায়ক শাসক সর্বদাই হন বাস্তববাদী। তাঁদের কাছে ভাবপ্রবণতার স্থান থাকে না। জিন্নাহ সাহেব ও আয়ুব খান সাহেব উভয়েই বাস্তববাদী রাজনীতিক; সুতরাং জিন্নাহ সাহেবও সুরাবর্দীকে এবং আয়ুব খান সাহেবও আজম খান সাহেবকে দূরেই ঠেলে ফেলেন। সুরাবর্দী সাহেব তাঁর এই অপমান ও তাচ্ছিল্য ভুলতে পারেন নি। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি তাঁর অন্তরের ক্ষোভ অন্তরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন। মুসলিম লীগের অনন্যসাধারণ নেতা কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেবের কাছে কারোরই মাথা তোলার ক্ষমতা ছিল না। সুরাবর্দী সাহেবও পারেন নি। তিনি সময়ে সময়ে যে এক-আধটুকু প্রতিবাদ করেছেন, তা জিন্নাহ সাহেবের সম্পর্কে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনমনে তাঁর জীবিতকালে বিশেষ কোনওরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে নি। কেন যে পারে নি, সে সম্বন্ধে একটা কথা

বলি। জনাব মহম্মদ আলি সাহেবকে (বগুড়ার) যখন বার্মায় রাষ্ট্রদূত করে জিন্নাহ সাহেব পাঠান, তখন আমি তাঁকে দেশের বাইরে না যেতে বলায় তিনি, তার উত্তরে আমাকে যা বলেছিলেন, তার মধ্যেই ঐ "কেন"র উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি (মহম্মদ আলি সাহেব) বলেছিলেন,—"আপনারা যাঁরা কংগ্রেসের লোক, তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতার জন্ম সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের সাথে একটা যোগসূত্র গড়ে তুলেছিলেন। আপনাদের মূলধন ছিল, ত্যাগ ও দেশের জন্ম দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেওয়া কিন্তু আমাদের তো ত্যাগও নেই, কোন দুঃখ-কষ্টও আমরা বরণ করি নি। আমরা যে এসেম্বলির সদস্য হয়েছি, মুসলিম লীগের নামের জোরে আর, মুসলিম লীগ মানেই জিন্নাহ সাহেব। জিন্নাহ সাহেবই লীগের প্রাণ। সেই জিন্নাহ সাহেবের মতের বিরুদ্ধে গেলে আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।" মহম্মদ আলি সাহেবের ঐ কথা একেবারে খাঁটি সত্য ছিল, সুতরাং সুরাবর্দী সাহেবও জিন্নাহ সাহেবের জীবিতকালে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। কেবল মনে মনে গুমরিয়েছেন—ক্ষোভ পোষণ করেছেন। এইভাবেই কয়েক বছর তাঁকে সুযোগের প্রতীক্ষায় কাটাতে হয়। তিনি নিঃশব্দে কাটানও। বাস্তববাদী নেতার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ঐখানে। তাঁরা কখনই তাঁদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে চলতে অধৈর্য হয়ে পড়েন না, যেমনটি হন ভাববিলাসী নেতারা। ভাবপ্রবণ নেহরু অধৈর্য হয়েই খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুরাবর্দী-চরিত্র ছিল ঠিক এর বিপরীতধর্মী। তিনি সুবিধাবাদকে সামনে রেখেই পরিণাম চিন্তা করতেন এবং নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে এগিয়ে যেতেন। এই চলার পথে তিনি ইতিহাসও সৃষ্টি করতেন। "দেশবন্ধু" চিত্তরঞ্জনের দুই পার্শ্বচরই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সুভাষচন্দ্র করেছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস ; আর সুরাবর্দী করেছেন ভারতবর্ষের বহুযত্নে বহু আয়াসে গড়া জাতীয়তাবাদের অপঘাত মৃত্যুর ইতিহাস। সুরাবর্দী সাহেব যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তা অপকীর্তির ইতিহাস। বহু ঘটনাকে উপলক্ষ করেই তিনি জীবনে অনেকই অপকীর্তির ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন। আমার জানা কিছু কিছু ঘটনার ইতিহাস আমি ক্রমশ বলবো। আপাতত এখানে তাঁর রাজনীতিক্ষেত্রে আসার পর থেকে দেশ-বিভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেকার দুইটি ঘটনার মাত্র উল্লেখ করছি।

"দেশবন্ধু" আনলেন, সুরাবর্দী সাহেবকে কংগ্রেসে। ১৯২৪ সালে

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল কলকাতা কর্পোরেশন দখল করেন এবং "দেশবন্ধু" তার প্রথম মেয়র ও জনাব সুরাবর্দী সাহেব প্রথম ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁদের ঐ জয়ের গর্বে সারা বাংলাদেশ—শুধু বাংলাদেশই বা কেন, সারা ভারতবর্ষই আনন্দে মাতোয়ারা হন। বাংলাদেশের তো কোনও কথাই নেই! মুসলমানসমাজের অতি সদ্বংশের শিক্ষিত একজন সন্তান জনাব সুরাবর্দী সাহেব ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই ধন্য ধন্য রব পড়ে যায়—সকলেই খুব খুশি। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি এক ইতিহাস সৃষ্টি করে বসলেন। রাজনীতিক জীবনে নেমে এইটেই তাঁর প্রথম কীর্তি বা অপকীর্তি। কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালিত "মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে" (তখন হগ্ সাহেবের বাজার বলে পরিচিত ছিল) একজন "পীর" মারা গেলে (এন্তেকাল করলে) ডেপুটি মেয়র হিসাবে তিনি, তাঁর প্রধানকে অর্থাৎ মেয়রকে না জানিয়েই ঐ মার্কেটের মধ্যেই পীরের দেহকে কবরস্থ করার আদেশ দেন এবং তাঁকে ঐখানেই 'কবর' দেওয়া হয়। সুরাবর্দী সাহেবের সেই কীর্তিস্তম্ভ আজও 'মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে' থেকে তাঁর জয় ঘোষণা করছে! সেকালের কলকাতার সব সংবাদ-পত্রই সুরাবর্দী সাহেবের ঐ অপকীর্তির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। সুরাবর্দী সাহেব ঐ একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। এর পরে তিনি ক্রমশ "কংগ্রেস" থেকে দূরে সরে যেতে যেতে একদিন দেখা যায় তিনি নিঃশব্দেই 'কংগ্রেস' ছেড়ে 'মুসলিম লীগে' গিয়ে ভিড়েছেন।

মুসলিম লীগে এসে তিনি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর শাসনকালে বাংলাদেশের শহর-বন্দরে ও গ্রামে গ্রামে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বদা একটা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। সেদিনের অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে আজও যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরাই জানেন যে, কিভাবে তখন তাঁদের দিন কেটেছে। সুরাবর্দী সাহেবের রাজশক্তির দাপটে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোবল তখনই ভেঙে পড়েছিল। তারপরে আসে—"ডাইরেক্ট অ্যাকশন" (সক্রিয় সমর।) মুসলিম লীগ দলই অবশ্য তাঁদের নীতি হিসাবে "ডাইরেক্ট অ্যাকশন" ঘোষণা করেন। সুরাবর্দী সাহেব বাংলাদেশে তার স্বরূপ রূপায়ণ করলেন রক্ত ও অশ্রুর বন্যার মধ্য দিয়ে; সেদিনের সেই

দুঃখজনক স্মৃতি আজও অনেকের মনেই বিশেষভাবেই জাগরূক আছে। এবারেও তিনি এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এখানে তিনি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেন, তা হচ্ছে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার ইতিহাস। পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের বুনিয়াদ এখানেই গড়ে ওঠে। কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেবও সুরাবর্দী সাহেবের শক্তিমত্তার পূর্ব পরিচয় পান; তাই তাঁকে আর বাড়তে দেন না—তাঁকে দূরেই ঠেলে রাখেন।

এইবার এতদিনে সুযোগসন্ধানী সুরাবর্দী সাহেবের কাছে সুযোগ এসেছে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। এখন আর জিন্নাহ সাহেব বা তাঁর একান্ত অনুগত মন্ত্রশিষ্য লিয়াকত আলি সাহেব নেই। তাঁরা উভয়েই পরলোকগত। তাই এইবার সুরাবর্দী সাহেব মুসলিম লীগকে একহাত দেখে নেওয়ার জন্য কোমর বাঁধতে লাগলেন।

বাংলাদেশে মুসলিম লীগ যে স্তম্ভগুলোর উপর গড়ে উঠেছিল, তার সর্বপ্রধান দুইটি স্তম্ভই টলায়মান হয়েছে। জনাব ফজলুল হক সাহেব তো আগেই মুসলিম লীগ দল ছেড়েছিলেন; আর তিনি তো ১৯৩৭ সালে ও ১৯৪৬ সালেও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধেই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন; সুতরাং তিনি যে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও 'লীগের' বিরুদ্ধেই দাঁড়াবেন, এটা তো মুসলিম লীগের পক্ষে একরূপ জানা কথাই ছিল কিন্তু সুরাবর্দী সাহেবের মনোভাবই এতকাল পর্যন্ত তাঁদের কাছে কতকটা অজ্ঞাত ছিল। এখন সেখানেও দেখা দিল ফাটল।

এখন বাকী থাকলো আর একটি স্তম্ভ। সেই স্তম্ভ হলেন, মৌলানা আব্দুল হামিদ খান। জনসাধারণের কাছে আজ তিনি সর্বত্র "মৌলানা ভাসানি" বা "ভাসানির মৌলানা" নামে সুপরিচিত। "ভাসানি" হল, আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি চরের নাম। এই চরে দেশবিভাগের আগে তিনি যে কীর্তি করেছিলেন, তার ফলেই তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়েছে ঐ 'ভাসানি' শব্দটি। চরটির নাম 'ভাসানি' কেন হয়েছিল, তার সঠিক ইতিহাস জানি না। আমার মনে হয়, বর্ষার জলে "চর ডুবে যায়, আবার জল কমলে তা ভেসে ওঠে। এই ভেসে-ওঠা থেকেই চরটির নাম ভাসানি হয়ে থাকতে পারে; অবশ্য এটা আমার অনুমান। এই ভাসানির চরের সাথে মৌলানা সাহেবের নাম কিভাবে যুক্ত হয়েছিল, সেই সম্পর্কে রংপুর জেলার অধিবাসী একজন পদস্থ মুসলমান সরকারী কর্মচারীর কাছে আমি

এখন প্রগতিবাদী 'কম্যুনিস্ট' হয়ে গিয়েছেন, তাই তাঁর ভেতরের সাম্প্রদায়িকতা আর নেই। তাঁর সাথে আমি গভীরভাবেই মিশেছি এবং সীমান্তগান্ধী খান আব্দুল গফুর খানের সাথেও মৌলানা ভাসানি সাহেবের সম্পর্কে আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত কোনও কম্যুনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সদস্য তিনি তখনও হন নি, এখনও হন নি। যদিও তাঁর দলে (ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টিতে) পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট দলের সদস্য বা সেই মতাবলম্বী সদস্যই সকলেই ছিলেন। তার কারণ পূর্ব পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ দল: সুতরাং সেই দলের সদস্যরা নিজ দলের নামে আইনত চলতে পারেন না। তাঁরা তাই মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে মৌলানা সাহেবের জনপ্রিয়তা ও তাঁর প্রগতিপন্থী মনোভাব দেখে তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য তাঁরা মৌলানা সাহেবের নেতৃত্বে আসেন, আর মৌলানা সাহেবও দেখেন, তাঁকে রাজনীতি করতে হলে তাঁরও একটা দল থাকা একান্ত দরকার। আমার ধারণা, উভয়-পক্ষই নিজ নিজ সুবিধাবাদের তাগিদেই একত্রে মিলিত হয়েছেন। আমার এই ধারণার কারণ, মৌলানা সাহেব নিজেই আমার কাছে তাঁর দলের সদস্য-দের সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তা কোন দলপতির পক্ষেই তার দলেরই সদস্যদের সম্পর্কে বলা মোটেই শোভনীয় নয়। মৌলানা সাহেব সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছে যে তিনি দুস্থ ও শোষিত লোকের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হওয়াতেই দেশ বিভাগের পূর্বে, দুস্থ ও শোষিত মুসলমান জনসাধারণের প্রতিই ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। হিন্দুরাই সেদিনে ছিলেন, শিক্ষায় দীক্ষায় ধনে ও মানে 'কুলীন'। মুসলমান অধিক সংখ্যকই ছিলেন অশিক্ষিত ও শোষিত; তাই তিনি সেদিন ছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী, আজ কিন্তু চাকা ঘুরে গিয়েছে। পাকিস্তানের হিন্দু আজ ভীত, সন্ত্রস্ত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। পাকিস্তানে হিন্দুর আজ আর প্রাক-স্বাধীনতাকালের হিন্দুর অবস্থা নেই। তাই সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিবর্ষী মৌলানাও আজ আর সাম্প্রদায়িক মন। তাঁর ভেতরে এখন তার সাম্প্রদায়িকতবাদ আছে বলে আমার মনে হয় না। যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে এখনও তাঁর ভেতরে কিছুটা সুবিধাবাদ থাকতে পারে। পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মির্জা ইস্কান্দার সাহেবের তাড়া খেয়ে তিনি কিছুকাল ভারতে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে সুরাবর্দী সাহেব তাঁকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার

পরে মৌলানা সাহেবকে দেখেছি, ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে; আবার আয়ুব খাঁর আমলে তাঁকে চীনদেশে সরকারী একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে ঘুরিয়ে আনার পরে, এখন দেখছি তিনি ঘোরতর চীনপন্থী! চীন সফর শেষ করে এসে তিনি বলেছিলেন যে—"বেহস্ত দেখে এলেম!" মৌলানা সাহেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করে এটাই আমার ধারণা হয়েছে। আমার ধারণা ভুল কি ঠিক তার বিচারক আমি হতে পারি না। বিচারক হবেন, জনসাধারণ ও এই লেখার পাঠকগণ। তাঁদের উপরেই আমি আপাতত বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে একটা সঠিক মীমাংসা মেনে নিতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত থাকবো।

মৌলানা সম্পর্কে আমার ধারণা যাই হোক, মুসলমান জনসাধারণের উপর মৌলানা সাহেবের দারুণ প্রভাব। এটা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি একে তো একজন "মৌলানা"—মুসলমান ধর্মের একজন 'উলেমা'। তার উপর তিনি 'বুজরুগ'ও। তিনি ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের 'ঝাড়-ফুঁক ও জলপড়া'ও দিয়ে থাকেন। অনেকের রোগমুক্তিও নিশ্চয়ই হয়, তা না হলে তিনি যেখানেই যান, শুনেছি ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত লোক বা তাঁদের আত্মীয়স্বজন পাত্রে জল নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মৌলানা সাহেব চলতে চলতে কোরাণের 'সুর' আওড়ান, আর সুদীর্ঘ 'ফুঁ' দিয়ে চলেন, লোকের এই বিশ্বাসই বা হবে কেন? তাঁর ভেতরে 'আল্লাহ'র মেহেরবাণী নিশ্চয়ই আছে, যে জন্য মুসলমান জনসাধারণ তাঁর একান্ত অনুরাগী এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্পন্ন।

এহেন শক্তিসম্পন্ন মৌলানা সাহেবও পূর্ব বাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগের একটি স্তম্ভ ছিলেন। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের বিরাট সৌধ দাঁড়িয়েছিল চারটি স্তম্ভের উপরে। মুসলিম লীগ দল নিজেই তার একটি স্তম্ভ এবং আর তিনটি স্তম্ভ হলেন—(১) জনাব ফজলুল হক্ সাহেব, (২) জনাব সুরাবর্দী সাহেব ও (৩) মৌলানা ভাসানি সাহেব। ইলেকশনের বাজনা বাজতেই শেষোক্ত তিনটি স্তম্ভই 'নড়বড়ে' হয় এবং অবশেষে একদিন মুসলিম লীগের বিরাট সৌধের তলদেশ থেকে একদমই ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ কোনও রকমে দাঁড়িয়ে থাকে, মাত্র একটি স্তম্ভের উপর। সেই সময়কার অবস্থা দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ যেন ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান! শূন্যের উপর ঝুলতে থাকে।

আগে সকল মুসলমানেরই একটি মাত্র রাজনীতিক দল ছিল। সেই দলটিই মুসলিম লীগ। এখন নির্বাচন আসতেই দেখা দিল নানা দল। 'হক্-সুরাবর্দী-ভাসানি' মুসলিম লীগ দল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আরও কিছু কিছু নতুন দল দেখা দিল। মৌলানা ভাসানি জনাব সুরাবর্দী সাহেব যে মুসলিম লীগ ছাড়লেন, তা কোনও আদর্শগত পার্থক্যের বা বিভেদের জন্য নয়। হক্ সাহেব তো আগেই মুসলিম লীগ ছেড়ে ছিলেন। সুরাবর্দী-ভাসানির মুসলিম লীগ ছাড়ার কারণ, আদর্শের সাথে বিরোধ নয়, নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধ। যেমনটি হয়েছে এবারে পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজয় মুখার্জির কংগ্রেস ছাড়ার মধ্যে। অজয়বাবু কংগ্রেস আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি—করেছেন, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সুরাবর্দী সাহেব ও ভাসানি সাহেবও প্রথমে তাই করেছিলেন। তাঁরা মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে এসেও তাঁদের দলের সেই সাম্প্রদায়িকতা-গন্ধী নামই রাখলেন অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের দলের নাম রাখলেন, "আওয়ামি মুসলিম লীগ"। দলের নামের সাথে 'মুসলিম' কথাটা তাঁরা প্রথমে যুক্তই রেখেছিলেন। পশ্চিম বাংলার শ্রীঅজয় মুখার্জির 'বাংলা কংগ্রেস' ও 'যুক্তফ্রন্ট' সরকার, পূর্ব পাকিস্তানের জনাব ফজলুল হকের 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারের অনুসরণ করে, আমার আশঙ্কা হয়, একই পরিণতির দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে!

দেশ-বিভাগের আগে জনাব ফজলুল হক সাহেবের যে 'কৃষক-প্রজা-পার্টি' ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেই আবার 'কৃষক-শ্রমিক-পার্টি' নামে নতুনভাবে রূপ নেয়! সরকার কর্তৃক জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করে জমিদারী দখলের পরে, আগেকার প্রজারা এখন 'সরকারের' অধীনে আসায় এখন আর তাঁদের সেই পূর্বাবস্থা নেই; সুতরাং পূর্বেকার সংজ্ঞা ও তাঁদের বদল হয়েছে। এবারে তাই, হক সাহেব তাঁর দলের নাম থেকে 'প্রজা' কথাটাকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে এনেছেন "শ্রমিক" কথাটা।

সুরাবর্দী ও মৌলানা ভাসানী সাহেবের যৌথ নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে স্থাপিত 'আওয়ামি মুসলিম লীগ পার্টি' ও ১৯৫২ সালে তাঁদের দলের নাম থেকে মুসলিম' কথাটা বাদ দিয়ে 'আওয়ামি লীগ পার্টি' নামে রূপ নেয়। দলের নাম থেকে 'মুসলিম' কথাটা বাদ দেওয়ার কৃতিত্ব বোল আনাই মৌলানা ভাসানি সাহেবের। আমাদের হিন্দু সদস্যদের—বিশেষ করে, কুমিল্লার প্রবীণ নেতৃদ্বয় শ্রীকামিনীকুমার দত্ত ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাদের যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিশেষভাবে মৌলানা সাহেবকে প্রভাবিত করাতেই তিনি রাজী হয়ে যান, কিন্তু সুরাবর্দী সাহেব, তাঁর আপত্তির কারণ দেখিয়েও, অবশেষে মৌলানা সাহেবের মতেই মত দিতে বাধ্য হন। এইভাবে গঠিত এই দলও এখন নির্বাচনের তোড়জোড়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

এই দুইটি দল ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে আরও একটি দল—'নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি' ও মুসলমান এক তরুণ যুবকের নেতৃত্বে অ-সাম্প্রদায়িক একটি দল—"গণতন্ত্রী দল" (Democratic Party) রূপ নেয়। প্রথম দলের নেতা ছিলেন, কিশোরগঞ্জের মৌলানা হাফিজ আতহার আলি সাহেব। এই দলে ব্যক্তিগতভাবে জনাব ফজলুল হক, জনাব সুরাবর্দী বা মৌলানা ভাসানির মত এককভাবে কেউই 'মুসলিম লীগের' কোন বিরাট স্তম্ভ না থাকলেও, সমষ্টিগত-ভাবে 'মুসলিম লীগ'কে শক্তিশালী করে গড়ে তোলায় পক্ষে এঁদের অবদান কম তো ছিলই না, বরং বেশ ভাল রকমই ছিল; কারণ, এই দলে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার মোল্লা-মৌলভীদের অনেকেই ছিলেন। তাঁরাই বাংলা দেশের শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে একদিন সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে মুসলিম লীগের প্রচার কাজ চালিয়ে তাকে মুসলমানদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এঁরা ছাড়াও এই দলে কয়েকজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অতি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকও যোগ দিয়েছিলেন! তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, জনাব ফরিদ আহমাদ। তাঁর জন্ম হয়, চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজারের ঢালির চরা গ্রামে ১৯২৩ সালে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় তাঁর বয়স মাত্র ৩০।৩১ বছর। তাঁকে তরুণ যুবকই বলা চলে কিন্তু বক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন একজন অতি সুদক্ষ সু-বক্তা। ইংরাজি ভাষাতেও অতি চমৎকার সাবলীল বক্তৃতা করতেন। শিক্ষায় তিনি ইংরাজি ভাষায় ১৯৪৬ সালে এম-এ এবং ১৯৪৭ সালে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উচ্চস্থান পেয়েই পাশ করেন। ইনি ছাড়া আর একজন ছিলেন, সৈয়দ কামরুল আহশান

সাহেব। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৯ সালে ইতিহাসে 'অনার্স' নিয়ে বিশেষ যোগ্যতার সাথেই 'বি-এ' পাশ করেছিলেন। তিনিও অত্যন্ত ভাল বক্তা ছিলেন। সুললিতভাবে ইংরাজিতে অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। এইরূপ সব শিক্ষিত যুবককে এই মোল্লার দলে দেখতে যে হবে তা' কোনও দিনই আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এঁদের 'নেজাম-ই-ইসলাম' দলে দেখে প্রথমত খুব বিস্ময়বোধই করেছিলেম কিন্তু তখনও জানতেম না যে আমার জন্য ততোধিক আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে! যেদিন শুনলেম যে আমার সহপাঠী বিশিষ্ট বন্ধু, কংগ্রেসেরও সহকর্মী এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে জেলখানারও সহকর্মী সাথী মৌলভী আশ্রাফুদ্দিন চৌধুরী সাহেবও 'নেজাম-ই-ইসলাম' দলে যোগ দিয়েছেন, সেদিন সত্যি সত্যিই বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেম! ছাত্রজীবনে চৌধুরী সাহেবকে দেখেছি, সাহেবী পোষাক-পরিচ্ছদে একজন পুরাদস্তুর সাহেব। কংগ্রেস-জীবনে দেখেছি অত্যন্ত সাদাসিধে পোষাকে। অধিকাংশ সময়ই তাঁকে দেখেছি খদ্দরের শাদা 'লুঙ্গি' ও পাঞ্জাবী পরে থাকতে, কখন কখনও লুঙ্গির পরিবর্তে খদ্দরেরই ঢোলা পায়জামা পরতেন। সুভাষচন্দ্র পরিচালিত বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। সুভাষবাবু ছিলেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপোষ-বিরোধী প্রগতিবাদী বামপন্থী দলের নেতা; আর আশ্রাফুদ্দিন চৌধুরী ছিলেন কংগ্রেসে তাঁরই ডান হাত। সেই চৌধুরী সাহেব কি না 'নেজাম-ই-ইসলাম' দলে! এ যে আমার পক্ষে সেদিনে ছিল, কল্পনাতীত, ধারণাতীত! কেন যে তাঁর রাজনীতিক মতবাদ সম্পর্কে আমার এত সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ধারণা হয়েছিল যার ফলে, আমি ধারণাই করতে পারি নি যে তিনি অ-সাম্প্রদায়িক কংগ্রেসের মতবাদ ত্যাগ করে 'নেজাম-ই-ইসলামের' মত একটা গোঁড়া মোল্লা-মৌলভীদের সাম্প্রদায়িক দলে যোগ দিতে পারেন না, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৯৩৮ সাল। নাটোরে বসেছে রাজসাহী জেলা কংগ্রেসের রাজনীতিক সম্মেলন। শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু মহাশয় সেই সম্মেলনের সভাপতি হ'য়ে এসেছেন। সুভাষবাবু তখন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। তিনিও এসেছেন। বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ-সম্পাদক—জনাব আশ্রাফুদ্দিন চৌধুরী সাহেবও এসেছেন। সেই সম্মেলনে চৌধুরী সাহেব যে বক্তৃতা করেছিলেন, তার সত্যতা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেম এবং তাঁর ঐ বক্তৃতা আমার মনের উপর একটা গভীর দাগ কেটেছিল। তিনি তাঁর

বক্তৃতায় বলেছিলেন যে হিন্দুরা যাঁরা কংগ্রেসের আওতায় থেকে দেশের জন্ম স্বাধীনতার সংগ্রাম করেন, তাঁদের লড়তে হয় শুধু ইংরেজ সরকারের এবং তার অধীনস্থ সরকারী বেতনভুক লোকদের সাথে। সরকারী কর্মচারীরাই তাঁদের 'জেল' দেন, সরকারী পুলিশই মেরে তাঁদের হাত-পা-মাথা ভাঙেন, নানাভাবে তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের উপর নির্যাতন করেন কিন্তু মুসলমান যাঁরা কংগ্রেস-সেবী বা কংগ্রেস করেন তাঁদের ঐ সব অত্যাচার-অবিচার তো সমানভাবেই সহ্য করতে হয়, উপরন্তু তাঁদের নিজের সম্প্রদায়ের কাছেও মারধোর খেতে ও নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করতে হয়। দেশের জন্য সংগ্রাম করে হিন্দুরা পান তাঁদের স্ব-সমাজের কাছ থেকে ফুলের মালা, আর মুসলমানরা তাঁদের সমাজের কাছ থেকে পান, অত্যাচার ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের জ্বালা। চৌধুরী সাহেবের ঐ উক্তির মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি ছিল না। আমি নিজ চোখে ময়মনসিংহের আব্দুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী সাহেবকে ও আরও দু'চারজনকে তাঁদের স্ব-সমাজের লোকের দ্বারা প্রহৃত হয়ে বিশেষভাবে যে আহত হয়েছিলেন, তা দেখেছি। আজ আর সকলের নাম আমার মনে নেই কিন্তু তাঁদের দুর্দশা আমার নিজের চোখে দেখা। যতদূর মনে পড়ে, সংবাদপত্রে যেন একবার দেখেছিলেম, নির্বাচনী-সভা করতে গিয়ে জনাব ফজলুল হক সাহেবের মত জনপ্রিয় নেতাকেও মুসলিম লীগের সমর্থকরা আক্রমণ করায় তাঁকেও ধানের ক্ষেতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। এই সব নেতাদের অনেকেরই অবশ্য কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না—কংগ্রেসের উপর তাঁদের কিছুটা সহানুভূতি ছিল মাত্র, তবে, তাঁরা মুসলিম লীগের মতবাদের বিরোধী ছিলেন। তাতেই তাঁদের ঐ অবস্থা। আর, যাঁরা কংগ্রেসের সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত, কংগ্রেসের সদস্য বিশেষ করে যাঁরা আশ্রাফুদ্দিন সাহেবের মত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, তাঁদের অবস্থা যে কী হতে পারে, তা সহজেই সকলে অনুমান করে নিতে পারেন। চৌধুরী সাহেব ছিলেন শুধু তাঁদের মধ্যেকার একজন নন, বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেসীদের মধ্যে পদগৌরবে সর্বশ্রেষ্ঠ একজন। তাঁকে, কংগ্রেস-নীতি অনুসরণ করে চলার ফলে বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের ও নিজ সমাজের লোকদের কাছ থেকেও অনেক লাঞ্ছনা-যাতনা সহ্য করতে হয়েছে। যে চৌধুরী সাহেব স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেমে একটা মতবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য এত দুঃখ-কষ্ট নীরবে সহ্য

করলেন, সেই চৌধুরী সাহেবই যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে 'নেজাম-ই-ইসলাম'-এর মত একটা চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী দলে যোগ দিতে পারেন, তা কী করে ধারণা করা যায়? আমিও পারি নি। 'ইসলাম' সম্পর্কে অনেক ইসলাম-সেবকের কাজ-কর্ম দেখে আমার মত অনেক হিন্দুরই ধারণা যে বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল না তা বলাই বাহুল্য। একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি। দেশ বিভাগের পরে খান আব্দুল গফুর খান গিয়েছেন রাজসাহী শহরে। তাঁকে নিয়ে গিয়েছি, শ্রীমান সত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রদের বাড়িতে। সে ঘটনার কথা আগেই বলেছি, তার আর পুনরুক্তি করতে চাই না। কেবল একটিমাত্র কথা এখানে আবারও বলতে চাই, "ইসলাম" কী এবং কেনই বা "ইসলামের' নামে হিন্দুরা এত ভয় পান, সেই কথাটাই সীমান্ত-গান্ধী গফুর খানের উক্তি দিয়েই তুলে ধরতে চাই। তাতেই বোঝা যাবে যে 'ইসলাম' কী এবং অপর সম্প্রদায়েরাই বা তাকে এত ভয় করেন কেন?

সীমান্ত-গান্ধীকে স্বাধীনতাসংগ্রামী আমাদেরই এক বন্ধু শ্রীবীরেন্দ্র সরকার (বর্তমানে রাজসাহীর প্রসিদ্ধ 'অ্যাডভোকেট') প্রশ্ন করেছিলেন,—"এই 'ইসলামী' রাষ্ট্রে আমরা হিন্দুরা কি থাকতে পারবো?" উত্তরে খান আব্দুল গফুর খান সাহেব যা বলেছিলেন, তাই এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন,—"দেখ, ইসলাম হ্যায় দো কিস্‌ম কা, এক, খোদা রসুল কা ইসলাম—উস্‌মেছে কিসিকা কুছ ডর নেহি হ্যায়, লেকিন, ঔর যে দুসরা কিস্‌ম কা 'ইসলাম' হ্যায়, উও তো ইস্ আদমী লোগন আপনা মর্জিমাফিক বানা লিয়া, উস্‌মেছে জরুর ডর হ্যায়," তিনি এই কথা বলে তার আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সেদিনে আমাদের বলেছিলেন যে 'ইসলাম', সব দেশের—সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে শান্তির বাণীই প্রচার করেছেন কিন্তু এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ মানুষ তাঁদের নিজ মতলব 'হাজেল' করবার জন্য তার অপব্যাখ্যা করে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধান। এটাই ছিল সেদিন গফুর খান সাহেবের কথা। একটু বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে চিন্তা করে দেখলে সে কথার সত্যতা যে আমরাও না-বুঝি তা নয়। একটা ধর্ম, যে ধর্ম বিশ্বের বহু দেশে বহু কোটি লোকই গ্রহণ করেছেন, তা একেবারে একটি মারমুখী কার্যধারার মধ্যে দিয়ে হয় নি—হতে পারে নি, এ তো গেল চিন্তা দ্বারা অনুভূতির কথা কিন্তু কার্যকালে বাস্তবক্ষেত্রে

দৈনন্দিন জীবনে আমরা কি দেখি? আমরা পাকিস্তানসৃষ্টির যে সংগ্রাম দেখেছি, তাতে দেখেছি যে ইসলামের নামে সেই মহান ধর্মের অনুসরণকারী যে সংগ্রাম-পদ্ধতি চালিয়েছিলেন, তার মূলে ছিল, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক হত্যা লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং আরও বহু রকমেরই সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ! তার ফলেই, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে 'ইসলাম' সম্পর্কেই একটা বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা যা দেখেছি, তাতে ঐরূপ বিরূপ ধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা খুব অ-স্বাভাবিক বোধহয় ছিল না। শ্রীমান বীরেন সরকারও সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে শুধু তার কথাই না, বহু হিন্দুরই মনের কথাই খান আব্দুল গফুর খান সাহেবের কাছে তুলে ধরেছিল। ইসলাম-সেবকদের মধ্যে আমরা খান সাহেবের মত নির্ভীক শান্তিবাদী লোকও দেখেছি, আবার সুরাবর্দী সাহেবের মত বে-পরোয়া কর্মচঞ্চল আত্মসর্বস্ব ও আত্মপরায়ণ লোককেও দেখেছি। খান সাহেবের মত লোক সংখ্যায় ছিলেন নিতান্ত স্বল্প কিন্তু সুরাবর্দী শ্রেণীর লোকই বেশি; তাই, ইসলামেতর ধর্মীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই গড়ে উঠেছে। হিন্দুর মধ্যে অনেকেই যেমন ইসলামের নামে মুসলিম লীগের অনুসৃত কার্যপ্রণালীর শিকার হয়ে বহুরকমের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, মুসলমানের মধ্যেও যাঁরা মুসলিম লীগের কর্মধারায় বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাও তাঁদের (মুসলিম লীগের অনুবর্তীদের) হাতে কম তো নিগৃহীত হন নি, বরং বেশিই হয়েছেন। চৌধুরী সাহেব নাটোরের রাজনৈতিক সম্মেলনে সেই কথাটাই বলেছিলেন; সুতরাং এ সবই তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানা থাকা সত্বেও তিনি 'নেজাম-ই-ইসলাম' দলে যে কেন যোগ দিয়েছিলেন, সেটা আমার কাছে বহুদিনই একটা প্রহেলিকার মত মনে হত। চৌধুরী সাহেবকে অবশ্য বরাবরই আমি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরূপেই দেখেছি। যখন তিনি কংগ্রেস করতেন তখন দেখেছি, তিনি যত কাজেই ব্যস্ত থাকুন না কেন, 'নমাজে'র সময় হলেই তিনি সব কাজ ফেলে রেখে 'নমাজ' পড়তে যেতেন। বকসা বন্দীশিবিরে তিনি ও আমি একই ঘরে একেবারে সামনাসামনি থেকে কয়েক বছর কাটিয়েছি। তখনও দেখেছি, তিনি 'রোজা'র মাসে ভোর থেকে সন্ধ্যার 'ইফ্‌তার' না খোলা পর্যন্ত কোন কথাই কারো সাথেই বলতেন না—সারা দিন মৌন থেকে কেবল 'জপ' করেই

চলতেন। তাঁকে আমি এইরূপ ধর্মপ্রবণই বরাবর দেখেছি। এই ধর্মপ্রবণতার জন্যই কি তিনি 'নেজাম-ই-ইসলাম' দলে যোগ দিয়েছিলেন? আমার মনের এই প্রশ্নের উত্তর আমি বহুদিন খুঁজে পাই নি—অনেক দিন পর্যন্ত এটা আমার কাছে একটা প্রহেলিকার মতই থেকেছে। এই প্রশ্নের মীমাংসার সূত্র খুঁজে বের করার জন্য আমি বহুদিন চৌধুরী সাহেবকে খোঁচা দিয়ে কিছু মন্তব্য করেছি। চৌধুরী সাহেব ছিলেন কুমিল্লার একটি বনেদী সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের সন্তান। তিনি কংগ্রেস করলেও তাঁর রক্তের সাথেই বোধহয় মিশেছিল; জমিদারসুলভ মনোভাবের কিছুটা তীক্ষ্ণতা। তাঁর মতের প্রতিবাদ কেউ করলে বা যা তিনি একবার ঠিক করে ফেলেছেন, তার কেউ বিরোধিতা তো দূরের কথা, কেউ সে সম্পর্কে তাঁকে কোনও প্রশ্ন করলেও তিনি তাতে অধৈর্য হয়ে উঠতেন; সেই জন্য পরবর্তীকালে দেখেছি মন্ত্রিপরিষদে তাঁর সহকর্মীরাও তাঁকে তাঁর কাজ সম্পর্কে ঘাঁটাতে সাহস করতেন না। এই ছিল তাঁর স্বভাব কিন্তু আমার বেলায় দেখেছি, তাঁর এই স্বভাবের বিশেষ ব্যতিক্রম। আমি ছিলেম তাঁর কলেজের সহপাঠি, কংগ্রেসের সহকর্মী এবং জেলেরও সাথী। জানি না, সেই জন্যই আমি তাঁর কাছে একটি ব্যতিক্রম হয়েছিলেম কি না! কারণ যা-ই থাক না কেন, আমি আমার প্রতি তাঁর ঐ মনোভাবের সুযোগ নিয়েছি; তাই অনেক সময়ই তাঁকে খোঁচা দিয়ে কথা বলতে সাহসী হয়েছি। আমি তাঁকে অনেকবারই বলেছি,—"তুমি দেশের যত ক্ষতি করেছ, এত ক্ষতি আর কেউ করে নি। কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল বামপন্থী নেতা সুভাষবাবুর তুমি ছিলে কংগ্রেসে তাঁর ডান হাত। তুমি ছিলে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিপন্থী; আর, আজ তুমি মোল্লার দল—নেজাম-ই-ইসলামের মত একটা সাম্প্রদায়িক দলে যোগ দিলে!" এইরূপ কথা অনেকদিনই অনেক বারই তাঁকে বলেছি। তিনি শুনেই গিয়েছেন। কোনও 'জবাব' দেন নি। অবশেষে একদিন তাঁর মনের বন্ধ কপাট খুলে যায়। তিনি বলেন,—"তুমি অনেকদিনই ঐ একই কথা আমাকে বহুবারই বলেছ। আমি কোনই উত্তর দিই-নি। আজ বল্‌ছি, শোন। কংগ্রেসে থাকতেও আমি সর্বত্রই সকল সভাতেই 'ইসলাম' ধর্মের শান্তির ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথাই বলেছি কিন্তু আমার কথা, মুসলমান্ সম্প্রদায় শোনেন নি; বরং আমাকে তাঁরা বলেছেন, কংগ্রেসের দালাল ও হিন্দুদের তাঁবেদার। 'নেজাম-ই-ইসলাম' পার্টি, ইসলামের ভিত্তিতে গড়া একটা রাজনীতিক দল; আর

এই দলে আছেন সারা পূর্ব পাকিস্তানের মোল্লা সাহেবরা। নোয়াখালি জেলার মোল্লা সাহেবেরা যে কতটা সাম্প্রদায়িক, তা' তো সকলেই জানেন। আমি এই দলে এসেছি। আজ আর মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ-ই আমাকে কংগ্রেসের দালাল বা হিন্দুদের তাঁবেদার বলেন না! মুসলমানরা এখন আমার কথা মন দিয়েই শোনেন! আমি এই দলে যোগ দিয়ে যেসব অতি উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী আছেন, তাঁদের কিছুটা তো সংযত রাখতে পেরেছি। তা' না হলে কি তোমরা—হিন্দুরা আজও টিকে থাকতে পারতে!"

যাক, খোঁচা দিতে দিতে এতদিনে আমার মনের একটা অশান্ত ও কঠিন প্রশ্নের উত্তর পেলেম। এটি অবশ্য অনেক দিন পরের ঘটনা। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে, চৌধুরী সাহেব তখন একজন মন্ত্রী। প্রথম প্রথম কিন্তু অনেকদিন পর্যন্তই আমি চৌধুরী সাহেবের ঐ দলে যোগ দেওয়ায় বেশ কিছুটা অশান্তিই ভোগ করেছি। জনাব কামরুল আহশান সাহেবকেও একদিন বলেছিলেম যে তাঁর মত একজন শিক্ষিত লোক কি করে এই দলে এসেছিলেন? তিনি বলেছিলেন যে মৌলানা আতহার আলি সাহেব আমাদের ধর্মীয় গুরু। আমি নির্বাচনে দাঁড়াব শুনে তিনিই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর দলের মনোনয়ন আমাকে দেন।

যাক, ব্যক্তিগতভাবে এই দলের কেউ-ই মুসলিম লীগের একটা স্তম্ভ না হলেও দলগতভাবে কিন্তু এঁরাও মুসলিম লীগের শক্তি সংগ্রহে কম সাহায্য করেন নি। আজ এই দলও নির্বাচনের মুখে মুসলিম লীগের প্রতি বিরূপ হলেন। তাঁরাও মুসলিম লীগ দল থেকে আলাদা হয়ে গেলেন।

উপরে বর্ণিত দলগুলো ছাড়াও মুসলিম লীগ দল ভেঙেই আরও একটি দল গড়ে ওঠে। সেই দলের নাম হ'ল, 'গণতন্ত্রীদল'—(Democratic Party)। এই দলের নেতা হলেন, একজন তরুণ যুবক। সমস্ত দলপতিদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের একজন তরুণ। নাম তাঁর—জনাব মাহমুদ আলি। সিলেটের সুনামগঞ্জের লোক। মাহমুদ আলি সত্যি সত্যিই একজন প্রগতিপন্থী একটা আদর্শের অনুসরণকারী এক যুবক। তাঁর দল বড় না হলেও দলের একটা আদর্শ ছিল এবং দলটির উপর কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক ছাপও ছিল না। এই দল গঠন করার আগেই মাহমুদ আলি সাহেব রাজসাহীতে আমার বাড়িতে গিয়ে আমাকেও তাঁর দলে যোগ দেওয়ার জন্ত অনুরোধ করেছিলেন। তখনও আমাদের দলের কোনও সভা ডেকে তাতে

কোন প্রস্তাব পাশ করা হয় নি; তবে, আমরা মনে মনে ঠিক করেছি যে মুসলমানের নেতৃত্বাধীনে কোনও প্রগতিপন্থী অসাম্প্রদায়িক দলে আমাদের যোগ দেওয়া দরকার। মাহমুদ আলি সাহেবের দলে আমরা যোগ না দিলেও এই দলের প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

মুসলিম লীগ দল ভেঙে পর পর এতগুলো দল গড়ে উঠলো এবং লীগের আওতার বাইরে বের হয়ে গেল। অবস্থা দেখে মনে হয়, মুসলিম লীগের পক্ষে এ যেন 'হারাধনের দশটি ছেলে'-র দশা হতে চলেছে!

এখন প্রশ্ন দাঁড়াল মুসলিম লীগ বিরোধী এই দলগুলোর একটিমাত্র "যুক্তফ্রন্ট" দল গড়ার। এই সব দল যদি নির্বাচনে প্রতি কেন্দ্রে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক প্রার্থী দাঁড় করান, তাহলে বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে মুসলিম লীগের প্রার্থীরও জয়ের সম্ভাবনা। সুতরাং, মুসলিম লীগবিরোধী সব দলগুলোকে একত্র সংহত করে একটামাত্র "যুক্তফ্রন্ট" দল গড়া একান্ত দরকার। 'দরকার' যে তা' সব দলই বোঝেন কিন্তু বুঝলেও তা' কাজে পরিণত করা তো খুব সহজ কথা নয়! সব দলেরই লক্ষ্য নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে কোন্ দল থেকে মুখ্যমন্ত্রী হবেন তারই সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব নিকাশ ভিত্তিক একটা ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা। তাই প্রত্যেকটি শরিক দলই—বিশেষ করে জনাব ফজলুল হক সাহেবের "কৃষক-শ্রমিক" দল ও ভাসানী-সুরাবর্দী সাহেবদ্বয়ের "আওয়ামী মুসলিম লীগ" দল—প্রধান এই দুটি দলের মধ্যে কোন্ দলের সদস্যসংখ্যা বেশি হবে তাই নিয়েই কথাবার্তা, যুক্তি তর্ক চলে কিন্তু কথার আর শেষ হয় না। "যুক্তফ্রন্ট" হয় হয় করেও কার্যত হয়ে উঠতে পারে না। যখন নেতারা কোনমতেই একমত হয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' গড়ে তুলতে পারেন না, তখন সেই অচল অবস্থাকে সচল করার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসেন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ও ছাত্রদল।

সব দেশেই সব সময়েই দেখেছি, জাতীয় জীবনে ছাত্র সমাজ একটি প্রবল শক্তি। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বিপ্লবী যুগ থেকে আরম্ভ করে গান্ধীজি পরিচালিত কংগ্রেস যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামেও ছাত্ররাই তাঁদের ত্যাগের দ্বারা, রাজশক্তির কাছ থেকে তাঁদের অশেষ নিগ্রহ স্বেচ্ছায় ভোগ করার মনোবলের দ্বারা, এমন কি তাঁদের বুকের তপ্ত তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে স্বাধীনতা দেবীর পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়েছেন—স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছেন। বিনা রক্তে শক্তির পূজা—শক্তির আরাধনা হয়

না; আর, শক্তিপূজায় ঐ সব উপকরণ দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে না-দিলে দেবী-শক্তিও সন্তুষ্ট হন না—শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভও হয় না। ছাত্ররা বরাবরই ঐসব উপকরণ দিয়ে শক্তি পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন। সিদ্ধিও তাঁরা লাভ করেছেন—জাতির সংগ্রামী জীবনে এইভাবে তাঁরা শক্তিও সঞ্চার করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯২১ সালের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ায় এখানে তা' বলছি। "দেশবন্ধু" গিয়েছেন রাজসাহী শহরে। সেখান থেকে অন্যত্র রওনা হওয়ার মুখে তিনি রাজসাহী জেলা কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি ও রাজসাহী উকিল সভার বিশিষ্ট নেতা—শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী (বহুদিন পূর্বে পরলোকগত হয়েছেন) মহাশয়ের হাত ধরে তাঁকে বলেছিলেন,—"সুদর্শনবাবু, আমাদের ত্যাগ কতটুকু! আমরা তিন মাসের জন্য মাত্র আদালত ছেড়েছি। তিন মাস পরে আবারও হয়তো আমরা আদালতে যাব—আবারও আমরা টাকা রোজগারও করবো, কিন্তু এই ছেলের দল? তারা আমাদের ডাকে ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, এদের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎটাই তো দেশের সেবার আহ্বানে বিসর্জন দিয়েছে। এরা সব কিছুই নাশ করে হয়েছে সন্ন্যাসী। আমাদের ত্যাগ, এদের ত্যাগের তুলনায় কতটুকু?" 'দেশবন্ধু' এই কথা অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন—এতখানি মহৎ তাঁর হৃদয় ছিল বলেই সেদিনের সেই শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, দেশের লোকের কাছে হতে পেরেছিলেন—"দেশবন্ধু"। কিন্তু হায়! আজ কংগ্রেসের নেতাদের অনেকেই ক্ষমতার আসনে বসে সেদিনের সেই সব ছাত্রদের ত্যাগের কথা ভুলে গিয়েছেন। আমি অনেকের কথাই জানি যে, তারা দেশ বিভাগের, তথা স্বাধীনতার পরে খণ্ডিত ভারতে এসে আজও কোনওরূপ সরকারী দাক্ষিণ্য পায় নি—আজও অনেকেই 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে! এই সব ছেলেরাই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে তাদের ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণভাবেই বিসর্জন দিয়ে—বলি দিয়ে, দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলতে শক্তি জুগিয়েছিল।

ভারতবর্ষ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান ছাত্রদলও তাদের ত্যাগের, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগের রাজশক্তির কাছ থেকে নিগ্রহ ভোগের মনোবলের এবং নিজেদের রক্ত-দানের ডালি সাজিয়ে ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলন উপলক্ষে শক্তির সাধনা করেছিল। দেবী সেদিন

তাদের ত্যাগ ও 'কোরবানি'-তে খুশি হয়েই তাদের 'বর' দিয়েছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে ছাত্ররাও একটা প্রবল শক্তি রূপেই দেখা দিয়েছিল। আগেই বলেছি, ভাষা-আন্দোলনে কোনও প্রবীণ রাজনীতিক নেতা বা কোন রাজনীতিক দলই সেদিন এগিয়ে গিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। যা' কিছু করার সবই করেছিল ছাত্ররাই এবং তাদের আন্দোলন, সারা পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে—এমন কি অতি দুর্গম সুদূর পল্লীতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যদি কোন রাজনীতিক দল সেদিনে ঐ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকতেন, তাহলে সেইদিনের সেই আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে একটা বিরাট রাজনীতিক সংস্থা গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু সেরূপ কোনও সংস্থা গড়ে না উঠলেও মুসলিম লীগ-বিরোধী একটা মনোভাব সর্বত্রই প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল। সেই মনোভাব, শুধু জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা' সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানে তার প্রমাণ স্বরূপ আমি মাত্র দুইটি উদাহরণ দিচ্ছি :

( ) ঢাকা থেকে সরকারী কাজ সেরে রাজসাহীতে ফিরে চলেছি। সিরাজগঞ্জ ঘাটে স্টীমার থেকে নেমে ট্রেনের কামরায় উঠে দেখি, একটি যুবক প্যাসেঞ্জার একটি 'বার্থ' নিয়ে শুয়ে আছেন। আর কোনও প্যাসেঞ্জার ছিল না। আমি অপর আর একটি 'বার্থে' বসি। ইতিমধ্যে, আর একজন প্যাসেঞ্জার এসে আমার পাশেই বসলেন। কথাবার্তায় জানা গেল, তিনি কোনও স্কুলের একজন শিক্ষক এবং মুসলিম লীগের সদস্য। ১৯৫৪ সালের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তিনি 'লীগের' প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়াবেন। এই কথা বলার সাথে সাথেই যিনি আমার আগেই এসে শুয়েছিলেন, তিনি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বসেই ভদ্রলোককে বলতে সুরু করেন—"মশায়, আপনার বলতে লজ্জা হচ্ছে না যে, আপনি "লীগের" প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াবেন? এদিকে বলছেন. আপনি একজন স্কুলের শিক্ষক, আবার বলছেন 'লীগের' প্রার্থী হবেন। ধন্য আপনি! তবে জেনে রাখুন শতকরা ৯০ জন সরকারী কর্মচারী আজ লীগ-বিরোধী! মুসলিম লীগ ডুবতে বসেছে এবং এই নির্বাচনেই ডুববে।" এই কথাগুলো বলেই ভদ্রলোকটি যেমনভাবে আগে ছিলেন, তেমনিভাবেই আবার শুয়ে পড়লেন। আমার পাশের ভদ্রলোকটি তো একেবারে "থ" বনে যান। তিনিও চুপ, আমিও চুপ। ইতিমধ্যে গাড়ি

এসে দাঁড়ায় সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনে। আমার পাশের ভদ্রলোকটি নেমে গেলেন। পরে আমি শায়িত ভদ্রলোকটির সাথে আলাপ-পরিচয়ে জানি, তিনি যাবেন রাজসাহীতেই এবং সেখানে তিনি "শিল্প বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার।"

এই তো গেল লীগ-সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীদের মনোভাবের পরিচয়। এইবার দেশের জনসাধারণের মনোভাবের একটু পরিচয় দিই।

(২) বর্ষাকাল। আমি গিয়েছি, আমার জেলা রাজসাহীর মান্দা থানার মধ্যে বিল অঞ্চলে সফরে। বিলের মধ্যে এক একটি ছোট ছোট গ্রাম। সমুদ্রের মাঝে দ্বীপের মত। এইরূপ একটি মুসলমান প্রধান গ্রামে গিয়েছি। হিন্দু মুসলমান অনেকেই খবর পেয়ে এসেছেন আমার সাথে দেখা করতে। তাঁদের সুখ-দুঃখের নানা কথাই তাঁরা বলছেন। এইরূপ কথা হতে হতেই কথা প্রসঙ্গে একজন অতি সাধারণ মুসলমান চাষী বলেন,—"বাবু, ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের আগে জিন্নাহ সাহেব বলেছিলেন যে, তিনি নির্বাচনে কলাগাছকে দাঁড় করালে, সেই কলাগাছেই মুসলমানদের ভোট দিতে হবে। আমরা দিয়েছিলেমও। ভেবেছিলেম কলাগাছেই ভোট দিলেম। কিন্তু এখন দেখছি, আমরা সেদিন কলাগাছেও ভোট দিই নি। কলাগাছে ভোট দিলে তো ৬ মাসে এক কাঁদি কলা পেতেম কিন্তু আজ ছয় বছরেও কিছুই পেলেম না।" এই একটি কথা থেকেই বোঝা যায়, মুসলিম লীগ সম্পর্কে জনসাধারণেরই বা কী ধারণা তখন জন্মেছিল। এ যেন ইংরেজ শাসকদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার অব্যবহিত আগের অবস্থা। দেশের লোক তাঁদের চান না, স্থল-নৌ-আকাশ বাহিনীর সৈন্যরা ও পুলিশবাহিনীর পুলিশরাও তাঁদের চান না। তাহলে তাঁরা থাকেন কার জোরে—কিসের জোরে? বুদ্ধিমান ইংরেজ শাসক অবস্থা বুঝেই স-সম্মানে এদেশ ছেড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতার পরে মুসলিম লীগেরও সেই একই অবস্থা হয়েছে; তবু তাঁরা স-সম্মানে সরে দাঁড়ান না—তাঁরা তখনও মনে করছেন, নির্বাচনে তাঁদেরই জয় অনিবার্য!

পূর্ব-পাকিস্তানে যে মুসলিম লীগের এই অবস্থা হয়েছিল, তার জন্য যোল আনা কৃতিত্বই ছাত্রদের প্রাপ্য। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে, ছাত্রদের উপর গুলীচালনার ফলে তাঁরা সারা দেশ জুড়ে যে বিক্ষোভ, যে প্রচারণা করেন, তাতেই গড়ে উঠেছিল দেশের মধ্যে লীগ-বিরোধী মনোভাব।

পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ-বিরোধী রাজনীতিক দলের প্রবীণ নেতারাও ছাত্রসমাজের এই শক্তির খবর রাখতেন। এই অবস্থার মধ্যেই ছাত্ররা এগিয়ে গিয়ে নেতাদের কাছে তাঁদের দাবি জানান যে, তাঁদের 'যুক্তফ্রন্ট' দল, নির্বাচনের আগেই করতে হবে, নচেৎ তাঁরা নিজেরাই প্রার্থী নির্বাচন করে দাঁড় করাবেন। সেই অবস্থায় মুসলিম লীগের পথেই লীগ-বিরোধী দলগুলোকেও যেতে হবে। ছাত্রদের এই চরমপত্র (মৌখিক) নেতাদের উপর মন্ত্রের মত কাজ করে। সকলেই নিজের নিজের অবস্থা বুঝে নির্বাচনের আগেই 'যুক্তফ্রন্ট' গড়েন—গড়তে বাধ্য হন। এখানেও দেখি, ভাষা-আন্দোলনেও যেমন ছাত্র-সমাজই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এবারে 'যুক্তফ্রন্ট' দল গড়তেও আবার তাঁরাই নেতৃত্ব দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সাথে পূর্ব-পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের নির্বাবচনের তফাৎই এইখানে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে সাধারণ নির্বাচন দেখেছি তা'তে রাজনীতিক দলের নেতারা নির্বাচনের আগে এমন সব দলের মিলিত শক্তি একত্রিত করে একটা 'যুক্তফ্রন্ট' দল গড়তে কিছুতেই পারলেন না। বাধা পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব-পাকিস্তানে একই রূপে দেখা দিয়েছিল। কোন্ দলের প্রার্থীর সংখ্যা কত হবে, সেইটাই প্রকাণ্ড বড় বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন রাজনীতিক দল নিয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' গড়তে গেলে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে প্রধান প্রধান দলগুলো, সকলেই চান তাঁদের সদস্য সংখ্যাই যা'তে বেশি হয়; ফলে 'যুক্তফ্রন্ট' গড়া আর হয়ে ওঠে না। পূর্ব-পাকিস্তানে এই অবস্থা দেখা দেওয়ায় ছাত্ররাই সেদিন এগিয়ে গিয়ে একটা প্রবল চাপ সৃষ্টি করে নেতাদের বাধ্য করেছিলেন 'যুক্তফ্রন্ট' গড়তে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে, পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তা' হতে পারে নি। এখানের রাজনীতিক দলগুলো অধিকাংশই চলছিল এক-একটা রাজনীতিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে; পূর্ব-পাকিস্তানে কিন্তু সে অবস্থা তখনও হয় নি। মুসলমানের মধ্যে দল কয়েকটা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে সব দলের বিশেষ কোনও রাজনীতিক মতবাদ ছিল বলে আমার জানা নেই। তাঁদের সকলেরই একমাত্র বিরোধিতা মুসলিম লীগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। কোনও রাজনীতিক মতবাদের ভিত্তিতে দল নয়। দলের ভিত্তি, একমাত্র মুসলিম লীগের বিরোধিতা। ঐ সব দলেরই আবার ছাত্রদের মধ্যেও সমর্থক দল হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কলেজের ইউনিয়নের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ছাত্র

সংস্থার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাও দেখেছি; তবু কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব-পাকিস্তানের সব ছাত্রদলই একটা সিদ্ধান্তে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ান যে মুসলিম লীগকে সারা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলতে হবে। এখানে কোনও বিভেদ নেই—কোন আপোষও নেই। তাই তাঁরা সেদিন তাঁদের সঙ্ঘশক্তি নিয়েই রাজনীতিক দলের প্রবীণ নেতাদের উপরও প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গে দেখলেম, ছাত্র-সম্প্রদায় এখানে তাঁদের রাজনীতিক মতবাদের জন্যই হোক, বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, নিজ নিজ দলের রাজনীতিক দলের নেতাদের দ্বারাই চালিত হয়েছেন। তাঁরা নেতাদের পরিচালিত করেন নি। সম্ভবত রাজনীতিক মতবাদই তার মূল কারণ। পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজের কাছে সেদিনে এক ধ্যান এক জ্ঞান, এক প্রতিজ্ঞা হয়ে দেখা দিয়েছিল রাজনীতিক ক্ষেত্র থেকে মুসলিম লীগের অপসারণ। তাঁদের শক্তি পরীক্ষার জন্যই বোধ হয় সেদিন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন সাহেবের বিরুদ্ধেও তাঁরা জনাব খালেক নেওয়াজ নামক একজন অজ্ঞাত অখ্যাত কর্মীকেই দাঁড় করিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ও যেমন তাঁর আরামবাগের নির্বাচনী কেন্দ্রটিকে নানাভাবে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর নির্বাচন-কেন্দ্র পাকাপোক্ত করেছিলেন জনাব নুরুল আমিন সাহেবও তাঁর মৈমনসিংহ জেলার নির্বাচন কেন্দ্রটিকে সেইরূপই তাঁর নির্বাচনের একটা শক্ত ঘাঁটি হিসাবেই গড়ে রেখেছিলেন। তবু কিন্তু নুরুল আমিন সাহেবও নির্বাচনে হেরেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্লবাবুও। এই দুই ক্ষেত্রে একটু তফাৎ এই যে, নুরুল আমিন সাহেব হেরেছিলেন একজন অখ্যাত ছাত্রকর্মীর কাছে; আর প্রফুল্লবাবু হেরেছিলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে একজন অতি সুপরিচিত কংগ্রেস নেতার কাছে। তা' সত্ত্বেও কিন্তু উভয় বঙ্গেই রাজনীতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি একই পথ ধরেই চলেছে। পূর্ব-পাকিস্তান যেন আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছেন, আর পশ্চিমবঙ্গ, সেই পথেই যেন পিছু পিছু চলেছেন। মাত্র কিছু কিছু হেরফের এখানে-ওখানে সামান্য হচ্ছে! তফাৎ শুধু এই 'সামান্য'-র।

অবস্থার গতি-প্রকৃতি দেখে, আমার মনে হয়, যে বাংলাদেশ একদিন সারা ভারতবর্ষে নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন, বাংলা-বিভাগের পর সেই গৌরবের অধিকারী আজ আর পশ্চিমবঙ্গের নেই। বাংলায় নেতৃত্ব

এখন গিয়েছে, পূর্ববঙ্গে তথা পূর্ব-পাকিস্তানে এবং সে নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছেন মুসলমান ছাত্র-সমাজ ও মুসলমান তরুণরা। শেখ মুজিবর রহমান হচ্ছেন তাঁদেরই মুখপাত্র ও প্রতীক। পূর্ব-পাকিস্তান আজ একটি বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তে সেই স্তূপে বিস্ফোরণ দেখা দিতে পারে। যখন সেই বিস্ফোরণ দেখা দেবে তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রে ও সমাজে যে বিপ্লব দেখা দেবে তা' পূর্ব-পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; তার গতিবেগ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতিকে তো ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই, সারা ভারতও সম্ভবত তা' থেকে বাদ পড়বে না। প্রবীণের হাত থেকে নেতৃত্ব গিয়ে পড়বে নবীনের হাতে। এটাই আমার রাজনীতিক অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা। আমার এই ধারণা ভুল কি সত্য তা' পরখ করার সময় এখনও আসে নি। আগামীকালের ভবিষ্যৎ দিনগুলোই তা' প্রমাণ করবে।

যাক, যা' বলছিলেম। তা'তেই আবার ফিরে যাই। ১৯৫৪ সালের পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে ছাত্র ও তরুণরাই প্রবীণ নেতাদের পথের দিশারী হিসাবেই পথ দেখিয়ে সেই পথে চলতে বাধ্য করেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচনের আগেই সেখানে মুসলিম লীগ-বিরোধী মুসলমানদের দলগুলোর মিলিত শক্তি নিয়েই "যুক্তফ্রন্ট" দল গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনেও, অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের এক যুগ পরেও তা' হতে পারে নি; ফলে পশ্চিমবঙ্গেও সাধারণ নির্বাচনের আগে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট থাকলেও তা' পুরোপুরি কাজে লাগান যায় নি। ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচনে মুসলিম লীগ দল পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে একেবারে মুছেই গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতে না পারলেও তাঁরা একক দল হিসাবে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবেই নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের পরে কিন্তু এখানেও (পশ্চিমবঙ্গে) একটি 'যুক্তফ্রন্ট' সরকার গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিও যে আবার পূর্ব-পাকিস্তানেরই পথ ধরেই চলছে তা' আমি ক্রমশ দেখাতে চেষ্টা করবো।

মুসলমানদের মধ্যে তো একটা সমঝোতা হয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' গড়ে উঠলো। "পাকিস্তান-জাতীয়-কংগ্রেস" কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত (এখন পরলোকগত) ও শ্রীমনোরঞ্জন ধর মহাশয়ের নেতৃত্বে একদল

"কংগ্রেস" নামই বজায় রেখে চললেন। কুমিল্লার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীকামিনীকুমার দত্ত (এখন পরলোকগত) মহাশয়ের নেতৃত্বে নোয়াখালির শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীহারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (তিনিও এখন পরলোকগত), আমরা কয়েকজন মিলে যে 'গণ-সমিতি' নাম দিয়ে নতুন একটি সংস্থা কুমিল্লা সম্মেলনে করেছিলেম, তা'র কথা আগেই বলেছি। নির্বাচনের মুখে সেই 'গণ-সমিতি', "সংখ্যালঘু যুক্তফ্রণ্ট" নাম নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ায়। এই নতুন নামকরণের উদ্দেশ্য ছিল যে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের যে সংস্থা শ্রীরসরাজ মণ্ডলের নেতৃত্বে ছিল, তাঁরাও তঁ'দের সংস্থার নাম বজায় রেখেই আমাদের সাথে এক 'যুক্তফ্রণ্ট' গড়ে তার শরিক হতে চেয়েছিলেন। আমরা যে 'কংগ্রেস' থেকে বের হয়ে এসেছিলেম, তা' কংগ্রেসের সাথে কোনও আদর্শবাদের বিরোধে নয়। আমাদের বিরোধ ছিল কাজের কৌশল নিয়ে। আমরা মনে করেছিলেম, 'পাকিস্তান' সৃষ্টি হওয়ার পরে, সেখানে 'কংগ্রেস' নামে কোনও প্রতিষ্ঠান বজায় রাখা ঠিক হবে না। আমরা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রেরণা পেয়েছিলেম, খান আব্দুল গফুর খান সাহেবের কাছে ও তাঁর নবগঠিত রাজনীতিক দল—"পিপলস-পার্টি" থেকে। সে কথাও আগেই বলেছি।

মনোরঞ্জন বাবুরা মনে করেন, পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচনে যখন পাকিস্তান সরকার পৃথক নির্বাচন-প্রথাই বহাল রাখলেন, তখন হিন্দুর মধ্যে 'কংগ্রেস' নামের যে জনপ্রিয়তা আছে, তার পূর্ণ সুযোগই তাঁদের পক্ষে নেওয়া উচিত। আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদের এটাই ছিল একমাত্র কারণ। কারণটা সম্পূর্ণই 'কৌশল'গত—'আদর্শ'গত মোটেই নয়। দুঃখের বিষয় যে আমরা যারা, দেশ-বিভাগের আগে অতীতে কংগ্রেস-সদস্যরূপে 'বেঙ্গল-এসেম্বলি'র সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেম, তারা দেশ-বিভাগের পরেও এই বিষয়ে একমত হতে পারলেম না। ১৯৬২ সালে আমি ভারতে এসে যা' দেখেছি ও শুনেছি, তা'তে দেখছি পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের মুসলমানরা কিন্তু আমাদের চেয়ে অধিকতর রাজনীতিক প্রজ্ঞার ও বাস্তব-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এদিকে এসে শুনেছি যে মুসলমান নেতা একদিন উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে মুসলমানদের বিরাট শোভাযাত্রা "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" ধ্বনি দিতে দিতে পরিচালনা করেছিলেন, তিনিই তাঁর 'সাঙ্গোপাঙ্গ' সকলকে নিয়েই কংগ্রেসে ভিড়ে পড়েছিলেন এবং কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীও হয়েছিলেন! আমি এটাও দেখেছি যে ঐ সব কংগ্রেসী মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ রাষ্ট্রবিরোধী

কার্যকলাপের জন্ত পুলিশ কর্তৃক নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তখন কংগ্রেসের হিন্দু নেতারাই তাঁদের প্রভাব বিস্তার করে ঐ সব মুসলমান-আটক-বন্দীদের জেল থেকে মুক্তও করেছিলেন। ঐ একই কাজের সন্দেহে ধৃত হিন্দু বন্দীরা কিন্তু জেলে থাকতেই বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের পক্ষে সুপারিশ করার কেউ ছিলেন না। যেখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিচার একান্তই অ-প্রাসঙ্গিকই শুধু নয়—দেশের পক্ষে মহা অনিষ্টকরও। কিন্তু তাও এদিকে হওয়া কোন কোনও ক্ষেত্রে যে সম্ভবপর হয়েছে, তা' কেবল দলের স্বার্থেই। এই কথা মনে করেই কি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব দেশ-বিভাগের পরে সীমান্ত-গান্ধী খান আব্দুল গফুর খানকে মুসলিম লীগে যোগ দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন? তাঁর মনে কি ছিল, তা' তিনিই জানতেন। আমি সে সম্পর্কে কিছু অনুমান করে বলতে চাই না। আমি শুধু এই কথাটাই সব কিছু দেখে ও শুনে অত্যন্ত জোরের সাথেই আবারও বলতে চাই যে, আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলে ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের আগেই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম অর্থাৎ 'কংগ্রেস'-নাম পরিহারের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম, সেই সিদ্ধান্তই সঠিক সিদ্ধান্ত সেদিনও ছিল এবং, আজও তা-ই আছে।

যাই হোক, আমাদের মধ্যেও আলাদা আলাদা ত্বটি দল হয়ে গেল। মুসলমানদের মধ্যে হল 'যুক্তফ্রন্ট' কিন্তু আমরা হলেম পৃথক! এইভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি-পর্ব গড়ে উঠলো।

১৯৫৪। সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ-বিরোধী দলগুলো নতুনভাবে ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা সু-সংহত আকার নেয় এবং লীগ-বিরোধী মুসলমান সম্প্রদায়ের দলগুলো যে একটা "যুক্তফ্রন্ট" দল গড়েন, সে কথা আগেই বলেছি। এটা গেল সাধারণ নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের কাজ। দ্বিতীয়-পর্যায়ের কাজ হচ্ছে, প্রার্থীদের মনোনয়ন দান। বিভিন্ন দল মিলে "যুক্তফ্রন্ট" দল হওয়ায় সে দল, বিভিন্ন দলের স্বার্থের বিরোধ থাকা সত্বেও 'একদল' হিসাবেই ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়ের চাপে কাজ করতে বাধ্য হন ও করেন। প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে, এক মতাবলম্বী একটি দলের মধ্যেও কিছু কিছু মতভেদ এবং মনোনয়ন যাঁরা পান নি তাঁদের মধ্যে কারো কারো মনে অসন্তোষ দেখা দিয়েই থাকে। মুসলিম লীগ এক মতাবলম্বী দল হওয়া সত্বেও তার মধ্যেও সেটা

যেমন দেখা দিয়েছিল, বিভিন্ন মতের ও স্বার্থের একত্রে সমাবেশে যে 'যুক্তফ্রন্ট' দল গড়ে উঠেছিল, তাতে তো তার মধ্যে সেটা দেখা দেওয়া আরও স্বাভাবিকই ছিল। দেখা দিয়েছিলও। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ দলের মনোনয়ন না পেয়ে নিজ নিজ দলপতিদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে ও পরোক্ষ সাহায্যপুষ্ট হয়ে 'স্বতন্ত্র' প্রার্থীরূপেও দাঁড়িয়েছিলেন। মুসলিম লীগের মধ্যেও সেইরূপ কিছু 'কাল-মেঘ' (black sheep) দেখা দিয়েছিল। সর্বত্রই দেখা দেয়। ভারতের মত একটা রাজনীতি-সচেতন সু-সংহত 'কংগ্রেস' দলেও দেখা দেয়, সুতরাং যুক্তফ্রন্টেও মনোনয়নের পর কিছু কিছু ঐরূপ 'কাল-মেঘ' স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছিল। তবু, যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদের মধ্যে যা কিছু মতভেদ, ঝগড়াঝাটি তা' 'যুক্তফ্রন্ট' গড়ার সময়ই হয়েছিল। 'যুক্তফ্রন্ট' গড়ে ওঠার পরে, বাহ্যত তাঁরা এক মতাবলম্বী একটি দলের মতই কাজ করতে বাধ্য হন ; কারণ. ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়, বর্ষীয়ান নেতাদের উপর সজাগ প্রহরীর মত সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ১৯৬৭ সালে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ও সংশ্লিষ্ট যুব-সম্প্রদায়ের যে ভূমিকা দেখেছি, তা'তে আমার ধারণা হয়েছে যে, এখানে এঁরা 'কংগ্রেসের' ঘোরতর বিরোধী মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজ নিজ দলীয় নেতাদের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করেন নি বা করতে পারেন নি ; ফলে, এখানে নির্বাচনের আগে সব কংগ্রেস-বিরোধী দলের মিলিত শক্তি নিয়ে একটি 'যুক্তফ্রন্ট' দল গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয় নি। ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায় নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট দলের নেতাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন, তাঁরা নেতাদের পরিচালনা করতে পারেন নি, যেমনটি করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের লীগ বিরোধী মুসলমান সম্প্রদায়ের দলগুলোর মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড মতাদর্শেরও ব্যবধান ছিল, যে জন্য হয়তো পূর্ব পাকিস্তানে যা সম্ভব হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তা' সম্ভবপর হয় নি। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ বিরোধী মুসলমান দলগুলোর মধ্যে প্রধানত মুসলিম লীগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই বিরোধ ছিল,—কোনও রাজনীতিক মতাদর্শের সাথে তখনও তাঁদের বিরোধ ছিল না ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলোর প্রত্যেকটিরই একটি স্বকীয় রাজনীতিক মতাদর্শ পৃথক পৃথক ছিল ; সেই জন্যই হয়তো তাঁরা একটি সু-সংহত বিরোধী 'যুক্তফ্রন্ট' গড়তে পারেন নি এবং তাঁদের অনুসরণ-

কারী ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ও দলীয় নেতাদের মতাদর্শেই পরিচালিত হয়েছেন—তাঁরা নেতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেন নি। এর পেছনে অবশ্যই যুক্তি আছে; তবু, আমি মনে করি, রাজনীতিক—কার্য-কৌশল (Political Strategy) হিসাবে যদি নেতারা এখানে 'যুক্তফ্রন্ট' দল নির্বাচনের আগেই গড়তেন, তাহলে পূর্ব-পাকিস্তানে যেমন নির্বাচনে মুসলিম লীগ দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, এখানেও কংগ্রেস দল প্রকাণ্ড একটা রাজনীতিক বিপর্যয়ের মধ্যেই পড়তেন। নির্বাচনে বিজয়ী কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা আরও অনেক—অনেক কমই হত। নির্বাচনের পরে রাজনীতিক মতাদর্শের বিরোধ সত্ত্বেও বিভিন্ন দলগুলো একত্রে মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' করে 'সরকার' (গভর্নমেণ্ট) গঠন করেছিলেন কিন্তু নির্বাচনের পূর্বে তা' সম্ভবপর হয় নি। যদি তা হ'ত, তাহলে আজ আর অন্য দলের সাথে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস দলের (Coalition Government) 'সরকার' গঠন করার চিন্তা করারও সুযোগ হ'ত না।

যাই হোক, পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচনের আগেই সেখানকার লীগ-বিরোধী মুসলিম দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নও হয়ে যায়। এই মনোনয়নের ফলে এখানে সেখানে কিছু কিছু লোকের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ দেখা দিলেও নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ প্রার্থী-মনোনয়ন পর্ব শেষ হয়ে যায়। মুসলিম লীগ দল এক মতাবলম্বী একটি দল হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দলের প্রার্থী-মনোনয়নও শেষ হয়! কিছু কিছু অসন্তোষ এবং তার ফলে কিছু কিছু লোকের স্বতন্ত্র প্রার্থী-রূপে নির্বাচনে দাঁড়ান সেখানেও চলে, যেমন চলছিল 'যুক্তফ্রন্ট' দলেও। পাক-ভারত উপ-মহাদেশে এটা নির্বাচনকালীন একটা 'রেওয়াজ' হয়েই দাঁড়িয়েছে, এটাই আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

যাক, এইবার হিন্দুদের—বিশেষ করে, কংগ্রেস দলের কথা বলছি। অতীতের কংগ্রেস দলেও যে ফাটল ধরেছিল সে কথা আগেই বলেছি। কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে দুটো দল গড়ে ওঠে। এখানেও আদর্শের মধ্যে কোনও বিভেদ ছিল না। ছিল, কাজের কৌশল (Political Strategy) নিয়েই বিভেদ। একদল মনে করেন, রাজনীতিক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচন-প্রথা যখন চালু থাকলোই, তখন তাঁদের 'কংগ্রেস' নাম বজায় রেখেই চলা সঙ্গত; কারণ তাতে হিন্দুদের মধ্যে যে 'কংগ্রেস' নামের উপর একটা মোহ আছে, নির্বাচনে তার পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া যাবে। আর

অপর দল মনে করেন যে, পৃথক নির্বাচন-প্রথাই যখন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমবেত বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার চালু রাখলেন—শুধু চালুই রাখলেন না, তাকে অতীতের ইংরেজ সরকারের চেয়েও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে আরও ছোট ছোট সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভাগ করলেন—তখন তাঁদের পক্ষে উচিত যে, কংগ্রেসের আদর্শ বজায় রেখেই তাঁদের 'কংগ্রেস' নামের মোহ ত্যাগ করে মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যে যাতে তাঁরা প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক যে কোন মুসলমান নেতাদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলে অনায়াসেই যোগ দিতে পারেন। এটাই ছিল সেদিনে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে কৌশলগত বিভেদের মূল কথা। কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রবীণ অনেক নেতাই, যথা সর্বশ্রী বসন্তকুমার দাস, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (বগুড়া), ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা), মনোরঞ্জন ধর (পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও অতীতের বিপ্লবী কর্মী), শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা প্রমুখ থাকলেন ; আর, অপর দলটির (তখনকার নাম হয়েছিল সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট) মধ্যে থাকলেন সর্বশ্রী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কামিনীকুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (উভয়েই কুমিল্লার)। নোয়াখালির প্রসিদ্ধ নেতা হারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী, রাজসাহীর প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (বর্তমান প্রবন্ধের লেখক) প্রমুখ। নির্বাচনের আগে এই দুই দলেই আরও নতুন নতুন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও যোগ দিলেন। কংগ্রেস দলে যথাক্রমে যশোহরের ও খুলনার প্রখ্যাত নেতা শ্রীবিজয়চন্দ্র রায় ও শ্রীক্ষেত্রনাথ মিত্র প্রমুখ যোগ দেন এবং সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট দলে যোগ দেন, ভারত-বিখ্যাত মৈমনসিংহের বিপ্লবী নেতা শ্রীত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী ('মহারাজ' নামে খ্যাত), মাদারিপুরের বিপ্লবী নেতা শ্রীফণী মজুমদার, ভাঙ্গার বিপ্লবী কর্মী শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, বরিশালের বিপ্লবী কর্মী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় ভূতপূর্ব আসামী), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা সম্পর্কে ধৃত ভূতপূর্ব রাজবন্দী অধ্যাপক—শ্রীপুলিন দে, কুমিল্লার 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলের নেতা শ্রীআশুতোষ সিংহ প্রমুখ।

এইভাবে দল তৈরি হওয়ার পর তাঁরা সকলেই নির্বাচনযুদ্ধে নামেন। কংগ্রেস দল হিন্দুদের মধ্যে প্রায় প্রতি কেন্দ্রেই প্রার্থী দাঁড় করান। সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট দলও সব কেন্দ্রে না-হলেও কয়েকটি প্রধান প্রধান কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করান। এই প্রার্থী দাঁড় করানোর ব্যাপারটার অনেকটাই

ছিল কৌশলগত কারণেই—নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদেই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অতীতের কংগ্রেস-সদস্যদের মধ্যে কৌশলগত কারণে মতভেদ থাকলেও তাঁদের কারো মধ্যেই তা'তে মন-ভেদ ঘটে নি বলেই আমার ধারণা ও বিশ্বাস। প্রধান প্রধান নেতৃস্থানীয় প্রার্থীদের তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনকেন্দ্রের মধ্যে আটকিয়ে রাখাই সম্ভবত এর প্রধান কারণ ছিল, অন্তত আমি জানি, ধীরেনবাবুর, হারানবাবুর ও আমার মধ্যে সেই ইচ্ছাই প্রবল ছিল। এই মনোভাব নিয়েই আমরা দুই দলই দুই দলের প্রধান প্রধান নেতাদের মধ্যে প্রার্থী দাঁড় করাই। 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' থেকে বর্ণ-হিন্দু-কেন্দ্রের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রের প্রার্থী দাঁড় করান। এখানে আমি, মাত্র কয়েকটি পরস্পর-বিরোধী প্রার্থীর উল্লেখ করছি :

আমাদের 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' দলের নেতা কুমিল্লার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে শ্রীঅপূর্বকাঞ্চন দত্তরায়কে নোয়াখালির অবিসম্বাদিত নেতা শ্রীহারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরীর বিরুদ্ধে শ্রীআশুনারায়ণ চৌধুরীকে এবং রাজসাহীর শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর (বর্তমান প্রবন্ধের লেখক) বিরুদ্ধে শ্রীনীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করান পাকিস্তান কংগ্রেস। যে তিনজন সদস্যের কথা বললেম তাঁরা সকলেই ছিলেন, বিধানসভার পুরনো সদস্য। দেশ বিভাগের পূর্বে ১৯৪৬ সালে নির্বাচিত বেঙ্গল এসেম্বলির সদস্য। এঁরা ছাড়াও যেসব নতুন প্রার্থী ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের দলের প্রার্থী হন, তাঁদের বিরুদ্ধেও—'পাকিস্তান কংগ্রেস' প্রার্থী দাঁড় করান। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম হচ্ছে; (১) ভারত-বর্ষের সু-বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ("মহারাজ" নামে খ্যাত) চক্রবর্তী মহাশয়, (২) ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গার বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, ও (৩) বরিশালের বরিশাল-ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব বিপ্লবী আসামী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়। এঁদের বিরুদ্ধে 'পাকিস্তান কংগ্রেস' দাঁড় করান, যথাক্রমে শ্রীদুর্গেশ পত্রনবিশকে, শ্রীশ্যামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে ও শ্রীঅবনীনাথ ঘোষ মহাশয়কে।

এইসব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। প্রার্থী হিসাবে কেউই অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। ধীরেনবাবুর বিরুদ্ধে যে অপূর্বকাঞ্চনবাবু দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরও কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে ধীরেনবাবুর সমান না হলেও কিছু দান অবশ্যই ছিল।

তিনিও 'জেল' খেটেছেন। হারানবাবুর বিরুদ্ধে যে আশুনারায়ণবাবু দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে ঐ একই কথা, যদিও হারানবাবুর সমকক্ষ তিনি ছিলেন না, আর রাজসাহীর শ্রীপ্রভাস লাহিড়ী মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে শ্রীনীরেন দত্ত মহাশয় দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে—মোটামুটি পরিচয় আগেই দিয়েছি। গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসের তিনি ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক খাদি ও কংগ্রেসকর্মী। ধনীর সন্তান হয়েও তিনি আহারে ও পোষাক-পরিচ্ছদে একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনই যাপন করতেন এবং এখনও করেন। খাদি-কর্মীদের মধ্যে আমি প্রায় সকলেরই দেখেছি যে অতীতের বিপ্লবীযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে একটা অহেতুক ঘৃণা ও বিদ্বেষ বা মানসিক তাচ্ছিল্যবোধ আছে। ভূতপূর্ব পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং আরো অনেক তথাকথিত গান্ধীবাদী নেতাদের মধ্যেই আমি এই মানসিক দৈন্যের ভাব লক্ষ্য করেছি। তাঁরা প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতায় ঐসব বিপ্লবীযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁদের প্রশংসায় মুখর হলেও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যখন তাঁরা কথাবার্তা বলেন, তখন তাঁদের মনের স্বরূপটি ফুটে বেরুতে আমি অনেকের মধ্যেই দেখেছি। নীরেনবাবুর মধ্যেও সেই ভাব বেশ কিছুটা ছিল। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে আমি কংগ্রেসের একজন সেবক হিসাবে কাজ করলেও আমার সাথে বিপ্লবী দলের তরুণ ও পুরনো কর্মীদেরও কিছুটা যোগাযোগ ছিল। যদিও আমি সক্রিয়ভাবে বিপ্লবীদলের সাথে কাজ করতাম না, তবু বিপ্লবী দলের কর্মীরা তাঁদের বিপদে-আপদে আমার কাছে নানারূপ পরামর্শের বা সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝেই আসতেন এবং আমিও তাঁদেরকে পরামর্শ বা সাহায্য দিতাম। এইটি নীরেনবাবু খুব ভাল চোখে দেখতেন না ; তবে মুখ-ফুটে কখনই কথায় আমার কাছে তাঁর এই বিরোধিতার কথা বলেন নি। তাঁর মুখের ভাবই তাঁর মনের কথা ফুটিয়ে তুলেছে, অন্তত আমার চোখে। এই প্রসঙ্গে যে কথাটা আগেও একবার বলেছি, সেই কথাটাই আবারও একবার বলতে চাই। 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের ডাকে যখন বিপ্লবী দলের নেতারা কংগ্রেসে যোগ দেন, তখন থেকেই অহিংসাবাদী কংগ্রেসের ও হিংসাবাদী বিপ্লবী দলের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যায়। বিপ্লবীযুগের কর্মীরাই বাংলাদেশে অন্তত কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে গড়ার পক্ষে যথেষ্ট

ব্লকের সদস্য এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। অধ্যাপক পুলিন দে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংশ্রবে ধৃত একজন ভূতপূর্ব রাজবন্দী এই দুই জনের বিরুদ্ধেও কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন কিন্তু আজ এতদিন পরে তাঁদের নাম আর মনে নেই।

এই তো গেল পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস থেকে আমাদের দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করানোর ব্যাপারে মাত্র কয়েকজনের কথা। আমরাও পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যেসব প্রার্থী দাঁড় করাই তার সম্পর্কেও কিছুটা বলা দরকার; নচেৎ যে বিবরণ তুলে ধরেছি তা নেহাতই 'একতরফা' হয়ে যায় এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্বও থাকে না।

আমরা যথাক্রমে দাঁড় করাই, (১) পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি বগুড়ার ত্যাগব্রতী প্রধান কংগ্রেস নেতা ও উকিল শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে নাটোর মহকুমার ডাঃ শৈলেশচন্দ্র নন্দীকে, (২) পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক মৈমনসিংহের উকিল শ্রীমনোরঞ্জন ধর মহাশয়ের বিরুদ্ধে (সম্ভবত) শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র কর মহাশয়কে, (৩) প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের, যাঁর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রচুর দান ছিল এবং যিনি জীবনের বহু বহু বছর জেলখানাতেই কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে শ্রীতুলসীদাস কুণ্ডু মহাশয়কে, (৪) পাবনার প্রবীণ মোক্তার কংগ্রেসসেবী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস (এখন পরলোকগত) মহাশয়ের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের উকিল শ্রীরমণীমোহন পাল মহাশয়কে (৫) বরিশালের শ্রীপ্রাণকুমার সেন মহাশয়ের (এখন পরলোকগত) বিরুদ্ধে শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখার্জী মহাশয়কে, (৬) গাইবান্ধার উকিল ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রীব্রজমাধব দাস মহাশয়ের বিরুদ্ধে শ্রীতুলসীরাম আগরওয়ালা মহাশয়কে, (৭) ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের সহকর্মী গান্ধীবাদী খাদি-কর্মী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিরুদ্ধে শ্রীনরেশচন্দ্র সিকদার মহাশয়কে এবং এইরূপ আরও অনেকের বিরুদ্ধে অনেককে, যাঁদের সকলের নাম আজ আর আমার মনে নেই। এইসব নামগুলো এখানে উল্লেখ করছি এই জন্যই যে ভোটদাতাগণ যে কিরূপ বিচক্ষণতা দেখিয়ে এইসব প্রার্থীদের মধ্যে থেকে প্রার্থী নির্বাচিত করেছিলেন, সেইটা দেখানোর জন্তই। সে বিষয়ে একটু পরে আলোচনা করব। আপাতত এইসব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে থেকে

কয়েকজনের পরিচয় সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু বলা দরকার মনে করি। প্রথমেই বলছি শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্পর্কে। শ্রীদাশগুপ্ত মহাশয় ছিলেন, খুলনা জেলার বিখ্যাত সেনহাটি গ্রামের অধিবাসী। তাঁর জন্ম হয় ১৮৮১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার সোলক গ্রামে। ১৯০৪ সালে তিনি 'বি-এ' পাশ করে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি শিক্ষকতা করেন। ১৯০৭ সালে তিনি ওকালতি পরীক্ষায় পাশ করে ১৯০৮ সালে বগুড়ায় গিয়ে 'ওকালতি' ব্যবসায় শুরু করেন এবং সেই থেকে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বগুড়াতেই ছিলেন। সকলে তাঁকে বগুড়ার লোক বলেই জানতেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন খুলনার বিশিষ্ট উকিল ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী কংগ্রেস নেতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বিদুষী কন্যাকে। সুরেশবাবু নিজে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকেও 'ব্যাকরণে' উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনিও উপাধি পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। ১৯০৮ সালেই তিনি বাংলা কংগ্রেসে যোগ দেন এবং সেই দিন থেকে তিনি আজীবন কংগ্রেসসেবীই ছিলেন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সংগ্রামী রূপ নিলে তিনিও কংগ্রেসের নির্দেশেই প্রথমত সমব্যবসায়ী আরও অনেকের মত 'দেশবন্ধুর'-র ডাকে আইন ব্যবসায় ছেড়ে দেন। অনেকেই আবার তিন মাস, ছয় মাস বা বছর পরে আইন ব্যবসায়ে ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু সুরেশবাবু আর ঐ ব্যবসায়ে কখনই ফিরে যান নি। একনিষ্ঠভাবে কংগ্রেসেরই সেবা করে গিয়েছেন। তার জন্য তাঁকে দুঃখ-কষ্টও কম ভোগ করতে হয় নি। পুনঃপুনঃ জেলে তো গিয়েছেন-ই, আর্থিক কষ্টও তাঁকে কম ভোগ করতে হয় নি। তাঁর কোন জায়গা-জমিও ছিল না, মজুত টাকাও ছিল না। এককথায় রাজনীতিক মতবাদে যাকে বলা হয় "সর্বহারা", তিনিও ছিলেন তাই-ই। আমরা শুনেছি যে 'কংগ্রেস' বগুড়ার জনসাধারণের কাছ থেকে যে 'মুষ্টিভিক্ষা' সংগ্রহ করতেন, তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ সেই ভিক্ষার চাল এবং আশেপাশের জংলা কচুশাক ও শাকপাতা কুড়িয়ে এনে তা-ই খেয়েও কোনও রকমে শরীরকে খাড়া রেখে দেশের সেবা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতেন। পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে তাঁকে ব্যবহার করতে দেখেছি, মোটা খদ্দরের ধুতি ও একখানা খদ্দরেরই চাদর। জামা ব্যবহার করতে তাঁকে আমি দেখি নি। এত দুঃখ-

দৈন্যের মধ্যেও যে তিনি অবিচল থেকে দেশসেবা করে যেতে পেরেছেন, তার পেছনে ছিল তাঁর স্ত্রীর প্রেরণা। তাঁর স্ত্রী যদি স্বামীর সহধর্মিণী না হয়ে বিপরীতধর্মী হতেন, তাহলে সুরেশবাবুর পক্ষে ঐভাবে দেশসেবা করা সম্ভবপর হত কি-না তা' ভগবানই জানেন! স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে তাঁদের গৃহটিকে যেন পৌরাণিক যুগের ঋষির একটি 'আশ্রম' বানিয়েছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় অত্যন্ত শক্তিশালী সুবক্তাও ছিলেন। এহেন সুরেশবাবুর বিরুদ্ধেও আমরা একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাতে বাধ্য হই। আমাদের আত্মরক্ষার জন্যই এই প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাতে হয়। সুরেশবাবু যদি বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হতেন, তাহলে তাঁর ত্যাগের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে তাঁর সুললিত ও সুমধুর বক্তৃতায় আমাদের আর সকলের অনেকখানি যে 'ঘায়েল' করতে পারতেন, সে সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কার অবশ্যই যথেষ্ট কারণ ছিল। তাই তাঁর মত লোকের বিরুদ্ধেও প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়েছিলেম; তবে প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেম এমন একজনকে যাঁকে আমি নিজে তো কখনই সুনজরে দেখি নি—যাঁকে রাজসাহীর ভূতপূর্ব হিন্দু-বিদ্বেষী ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেবের সাহায্যকারী-রূপেই দেখেছি এবং মনে করেছি, একজন আত্মসর্বস্ব ঘোরতর সুবিধাবাদী বলে। এমনি লোককেই আমরা দাঁড় করিয়েছিলেম সুরেশবাবুকে পরাজিত করার জন্য মোটেই নয়। তাঁকে তাঁর নিজের নির্বাচনের জন্য নিজ কেন্দ্রেই আটকিয়ে রাখার জন্যই। নির্বাচনের শেষে ফল প্রকাশ হলে দেখা যায় যে আমাদের প্রার্থী ডাঃ নন্দী, সুরেশবাবুর চেয়ে মাত্র ৫,০৩০ হাজার ভোট কম পেয়েছিলেন। সুরেশবাবু পেয়েছিলেন ১৫,০০০ হাজার ভোট; আর আমাদের প্রার্থী পেয়েছিলেন ১০,০০০ হাজার ভোট। এটা যে তিনি পেয়েছিলেন তা' কেবল আমাদের দলের কৌশলগত নীতির জনসমর্থনেই। রাজসাহী জেলায় আমার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবও কিছু ছিল। আমি যদি আমাদের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে বের হতেম, তাহলে কি হতো তা' বলা যায় না। আমি আমাদের প্রার্থীর জন্য এক নাটোর বার লাইব্রেরী ছাড়া আর কোথাও প্রচার অভিযানে যাই নি। অনেকে মনে করতে পারেন যে আমার পক্ষে আমাদের দলের প্রার্থী দাঁড় করিয়ে তাঁর জন্য প্রচারে সাহায্য না-করা অন্যায় হয়েছে। নীতিগত কারণে হয়তো অপরাধ হয়েছেও। অনেক সুধী ব্যক্তিই বলেছেন যে রাজনীতি নাকি অত্যন্ত 'নোংরা' জিনিষ। এটাও হয়তো আমাদের পক্ষে—বিশেষ করে আমার পক্ষে—নোংরামিই

হয়েছে। তা' হলেও আমাকে সেটা করতেই হয়েছে। সুরেশবাবুর মত একজন ত্যাগব্রতী দেশসেবক যদি নির্বাচনে পরাজিত হতেন, তাহলে আমার অন্তর-দেবতার কাছে আমি চিরকালই অপরাধী হয়ে থাকতেম। সুরেশবাবুর জয় হওয়ায় আমাকে ভগবান সেই অপরাধ থেকে রক্ষা করেছেন।

আর একজন স্নেহাস্পদ বন্ধুর কথাও মনে পড়ে। তিনি হলেন গাইবান্ধার শ্রীব্রজমাধব দাস। ব্রজমাধব নিজে তো একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলেন-ই; তিনি যে পরিবারে জন্মেছিলেন, সেই পরিবারের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশেষ দান ছিল। ব্রজমাধবের বাবা, ও তাঁর দুই ভাই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে 'জেল' খেটেছেন। এই ব্রজমাধবের বিরুদ্ধে আমাদের দলের নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, শ্রীতুলসীরাম আগরওয়ালাকে প্রার্থী দাঁড় করান। আমাদের দলের প্রার্থী দাঁড় করানোর ব্যাপারে ধীরেন্দ্রবাবুকে আমাদের দলের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া ছিল; সুতরাং তিনি যেসব প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন, তাতে আমাদের সকলেরই যে পূর্ণ দায়িত্ব ও সম্মতি ছিল তা' বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতা-সংগ্রামী ব্রজমাধবের বিরুদ্ধে যে তুলসীরামবাবুকে আমরা দাঁড় করিয়েছিলেম—তাঁর সংগ্রাম করে স্বাধীনতা পাওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম নির্বাচনে দাঁড়ানোর পক্ষে দেশসেবার কি মূলধন ছিল, তা' আমি ঠিক জানি না; তবে তাঁর অর্থের মূলধনের যে বিশেষ জোর ছিল, তা' জানি।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু আজীবনের স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পর্কেও সেই একই কথা। তাঁর বিরুদ্ধে আমরা দাঁড় করিয়েছিলেম শ্রীতুলসীদাস কুণ্ডু মহাশয়কে। স্বদেশসেবার মূলধন তাঁর যা-ই থাকুক না কেন, তাঁরও আর্থিক মূলধন বেশ ভালই ছিল। আমাদের সদ্য-সংগঠিত দলের কাউকেই কোনরূপ অর্থ সাহায্য করতে পারি নি, তাই আমাদের দেখতে হয়েছে যে প্রার্থী দাঁড় করানো হচ্ছে তাঁদের পক্ষে নিজব্যয়ে নির্বাচন চালান সম্ভবপর কি না! এই বিবেচনার সাথে আমরা আরও একটি বিষয় বিবেচনা করেছিলেম যে 'কংগ্রেস'দলের কর্মীরা যাতে পরাজিত না হন তা-ও দেখা। সেইজন্যই আমরা কংগ্রেস দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী প্রার্থী দাঁড় করাই নি বা সেরূপ প্রার্থীকে খুঁজে বের করতেও চেষ্টা করি নি। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল যে পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় আমরা যে "কংগ্রেস" নামের মোহ ত্যাগ করে প্রগতিশীল কোন

মুসলমান-পরিচালিত দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম, জনমত আমাদের সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন কি-না তা-ই নির্বাচনের মাধ্যমেই 'পরখ' করা মাত্র। সেই মনোভাব নিয়েই আমরা উভয় দলই মনোমালিন্য যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করেছি এবং নেতৃস্থানীয় বিশেষ সম্মানিত কংগ্রেসপ্রার্থীর উপর সম্মান দেখাতেও কার্পণ্য করি নি। সেইহেতুই আমরা পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা মহাশয়ার বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী-ই দাঁড় করাই নি। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায়-ই নির্বাচিতা হয়েছিলেন। আমরাও আশা করেছিলেম যে মৈমনসিংহের শ্রীবিনোদ চক্রবর্তী মহাশয় "মহারাজ"-এর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়াতে অস্বীকার করার পর 'কংগ্রেস' দলও হয়তো তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনও প্রার্থী দাঁড় করাবেন না; কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' হয় নি। 'মহারাজ' (শ্রীত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী)-র বিরুদ্ধে শ্রীদুর্গেশ পত্রনবিশ মহাশয়কে কংগ্রেস দল দাঁড় করিয়েছিলেন। এই প্রার্থী দাঁড় না করালেই আমরা খুশি হতেম এবং তা-ই বোধ হয় শোভনও হোত। তা' হয় নি। কংগ্রেস দল আমাদের দলের নেতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের, শ্রীহারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী মহাশয়ের ও আমার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রার্থীই দাঁড় করিয়েছিলেন। বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধে একজন শ্রেষ্ঠ ত্যাগী ও একনিষ্ঠ দেশসেবক যিনি আজ পর্যন্তও খাদিকর্মী হিসাবে রাজসাহী জেলাতেই থেকে সংগঠন কাজ করে চলেছেন, এমন একজন কর্মী—শ্রীনীরেন দত্ত মহাশয়কে দাঁড় করান। নীরেন-বাবুর পরিচয় আগেই দিয়েছি; সুতরাং আবার বলা নিষ্প্রয়োজন।

এইভাবে সব দলেরই প্রার্থী মনোনয়নের পর নির্বাচনপর্ব শেষ হয়ে যায়। নির্বাচনের ফল যখন প্রকাশ হয় তখন কংগ্রেস দলের একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী আমাদের বন্ধু খুলনার শ্রীগোবিন্দলাল ব্যানার্জী মহাশয়ের একজন অজ্ঞাতনামা (আমরা অবশ্য তার নাম আগে শুনিনি) কম্যুনিস্ট দলের সহযাত্রী (fellow traveller)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের কাছে পরাজিত হওয়ার সংবাদ পাই তখন আমরা সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছিলেম। গোবিন্দবাবু মুসলিম লীগ আমলেও ভাষা আন্দোলনের সময় 'জেলে' গিয়েছিলেন। তিনি সুবক্তা ও অত্যন্ত নির্ভীক একজন নেতা ছিলেন। তাঁর পরাজয় আমরা কল্পনাই করি নি। তবু তা-ই হল। তাঁদের দলের-ই তাঁর সহকর্মী বন্ধুদের কাছে, এই পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে যতটা শুনেছি, তা'তে জেনেছি যে খুলনার মুসলিম লীগ নেতা জনাব সবুর খান সাহেবের

(বর্তমানে আয়ুব মন্ত্রিসভার তিনি একজন সদস্য) অহেতুক গোবিন্দবাবুকে জনসভায় সমর্থন-ই নাকি ঐ বিপর্যয়ের মূল কারণ। সবুর খান সাহেব নাকি তাঁর সব নির্বাচনী সভাতেই বলেন যে হিন্দুরা যেন 'গোবিন্দদা'-কে ভোট দেন! এটা যদি সত্য হয় তাহলে এতেই সকলে বুঝবেন যে মুসলিম লীগ সম্পর্কে বর্ণহিন্দুদের মনোভাব কত কঠোর ছিল। মুসলিম লীগ সম্পর্কে হিন্দুদেরই যে মনোভাব কঠোর ছিল, তা-ই নয়। নির্বাচনের ফলে দেখা গেল মুসলমান সম্প্রদায়েরও মনোভাব কত কঠোর হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের এই নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র পেলেন ৯ (নয়টি) আসন। মুসলিম লীগ দল এই নির্বাচনের সময়ও শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিক দল। পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিক দলের নির্বাচনে এরূপ বিপর্যয় আর হয় নি। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যাঁদের অনেকেই বলেন 'অশিক্ষিত' এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁরাই কিন্তু সেদিনে বিশ্বের ইতিহাসে একটা নতুন "ইতিহাস" সৃষ্টি করেছিলেন। পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপতি জনাব আয়ুব খান সাহেব ও তাঁর মৌল গণতন্ত্র (!) (basic democracy)-র প্রবর্তন সম্পর্কে যুক্তি হিসাবে সেই একই কথা, অর্থাৎ অশিক্ষিত জনসাধারণ পশ্চিমী গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপযোগী নয়, কারণ অশিক্ষিত লোকে প্রার্থী বাছাই ঠিকমত করতে পারেন না—অত্যন্ত জোরের সাথেই বলেছেন এবং এখনও বলেন। সেই আয়ুব খান সাহেবই আবার কাশ্মীরের বেলায় গণভোটের দাবী তোলেন! পাকিস্তানের এটাই বিচিত্র রাজনীতি! যাই হোক, নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল, মুসলিম লীগ দল একেবারে ধরাশায়ী হয়েছেন।

নির্বাচনের ফল সম্পর্কে আমি পর্যালোচনা করে দেখেছি যে পূর্ব পাকিস্তানের ভোটাররা বিশেষ দক্ষতার ও বিচক্ষণতার সাথেই তাঁদের 'ভোট'-অস্ত্রের প্রয়োগ করেছেন। বর্ণহিন্দুদের নির্বাচনেও আমরা সেই একই অবস্থা দেখেছি। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ২৮টি আসনের মধ্যে আমাদের দল পান ১০টি আসন এবং কংগ্রেস দল পান ১১টি আসন। এইসব প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা জয়ী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই ছিলেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, যাঁদের নির্বাচনী হিসাবের খাতায় জমার ঘরে ছিল সংগ্রামে নির্যাতনের একটা মূলধন। ভোটার বা দলের নামের দিক দেখে বিচার করেন নি। তাঁরা

বিচার করেছেন প্রার্থীর গুণাগুণ। পূর্বেই বলেছি, ধীরেনবাবুর, হারানবাবুর ও আমার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল বেশ শক্তিশালী প্রার্থীই মনোনীত করেছিলেন; তবু কিন্তু ধীরেনবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়; হারানবাবুও বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন এবং আমার নির্বাচন কেন্দ্রে আমি পাই ২৭,৮০৭ ভোটেরও কিছু বেশি এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী নীরেনবাবু পান মাত্র ৭১০-এর কিছু বেশি! তিনটি বড় বড় মহকুমা (রাজসাহী সদর, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ মহকুমা) মিলে আমার বিরাট এলাকা জুড়ে নির্বাচন কেন্দ্র। আমার কোন অর্থই ছিল না নির্বাচন চালনা করার। নীরেনবাবু বেশ ভালই অর্থ খরচ করেছিলেন। তাঁর বেতনভোগী খাদিকর্মীরাই তাঁর পক্ষে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজও করেছেন। আমার জন্য কাজ করেছেন নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রতিটি গ্রামের জনসাধারণ। তাঁরাই সভা করে 'কমিটি' গড়েছেন, গ্রাম থেকে চাঁদা উঠিয়েছেন এবং ভোটের দিনে নিজেরাই ভোটারদের সংগ্রহ করে নিয়ে গরুর গাড়ি বা নৌকা ভাড়া করে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে এসেছেন। রাজসাহী জেলার লোকদের তাই আমি আজও ভুলতে পারি নি। তাঁরা যে সেদিনে এইভাবে ভোট দিয়েছিলেন তা'তে একদিকে আমার প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত আস্থাও যেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি প্রকাশ পেয়েছিল নির্বাচনোত্তর আমাদের পরিকল্পিত কৌশলগত নীতির (অর্থাৎ 'কংগ্রেস' নামের মোহ ত্যাগ করে হিন্দুদের উচিত প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক জাতীয়বাদী মুসলমানদের দলের সাথে মিশে যাওয়া, যেমন ভারতে মিশে গিয়েছেন অতীতের দেশ বিভাগকারী মুসলিম লীগ দল কংগ্রেসের সাথে) পক্ষেও জনমতের সমর্থন।

এই নির্বাচন-প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। কংগ্রেস দল যাঁদেরই মনোনয়ন দিয়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই 'কংগ্রেসের' নামেই দিয়েছিলেন। আমাদের সাথে তপশিলী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীরসরাজ মণ্ডল মহাশয়ের আগে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা'তে ঠিক হয়েছিল যে তপশিলী সম্প্রদায়ও আমাদের সাথে এক সাথেই যুক্তভাবে নির্বাচন চালাবেন। তাতেই আমাদের দলের নির্বাচনকালীন নাম হয়েছিল—"সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট"। শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীকামিনী দত্ত ও শ্রীধীরেন দত্ত মহাশয়ের সরলতা, মহত্ব ও উদারতার সুযোগ নিয়ে রসরাজবাবু ঐ দুই নেতাকে বোঝান যে তাঁরা 'তপশিলী ফেডারেশন' (Scheduled Caste Federation)-এর নামে প্রার্থী দাঁড় করালেই বেশি

সংখ্যক প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করতে পারবেন। রসরাজবাবুর কথার উপর নির্ভর করে তাঁরা আর যুক্তফ্রণ্টের নামে কোনও তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে দাঁড় করান নি। আমার জেলার দুইজন তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীকেই আমি কিন্তু আমাদের দলের নামেই দাঁড় করাই। তাঁদের একজন হলেন, (১) শ্রীসাগ্রাম মাঝি (সাঁওতাল) ও অপরজন (২) শ্রীঋষিরাজ রায়বর্মণ (রাজবংশী) এবং এঁরা উভয়েই নির্বাচিত হন। কামিনীবাবু ও ধীরেনবাবুও যদি আমাদের দলের নামেই প্রার্থী দাঁড় করাতেন, তাহলে তাঁরাও অবশ্যই কিছুসংখ্যক প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করতে পারতেন। রসরাজবাবুর কথা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ রাজসাহী জেলার দুইজন প্রার্থী-ই "সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের" নাম ছাড়াই যুক্তফ্রণ্টের নামেই নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং কংগ্রেস দলেও ৮।৯ জন তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থী কংগ্রেসের নামেই জয়যুক্ত হয়েছিলেন। কামিনীবাবু ও ধীরেনবাবু রসরাজবাবুর কথায় শুধু বিশ্বাস-ই করেন নি, তাঁদের নিজ 'পকেট' থেকেই—বিশেষভাবে কামিনীবাবু তাঁর 'পকেট' থেকে রসরাজবাবুকে নির্বাচন উপলক্ষে অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। নির্বাচনের ফল বের হলে কিন্তু শ্রীরসরাজ মণ্ডল মহাশয় আর আমাদের সাথে মিশলেন না—'পাশ' কাটিয়েই চললেন।

নির্বাচনের ফলে আমাদের দলে দাঁড়াল ১০ জন বর্ণহিন্দু, ২ জন তপশিলী হিন্দু এবং ১ জন বৌদ্ধ মিলে ১৩ জন; আর কংগ্রেস দলে হল ১৫ জন বর্ণহিন্দু, ১ জন বৌদ্ধ, ১ জন খৃস্টান ও ৮।৯ জন তপশিলী হিন্দু মিলে ২৫।২৬ জন।

এইভাবে নির্বাচনপর্ব শেষ হয়ে গেল। এখন জনাব ফজলুল হক সাহেব কর্তৃক প্রথম 'যুক্তফ্রন্ট সরকার' গঠনের কথা বলবো।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার

১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচন পর্ব নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল। নির্বাচন ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল, মুসলিম লীগের সব তোড়জোড়—সব চক্রান্তই একেবারে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে—মুসলিম লীগ দল সম্পূর্ণভাবেই পর্যুদস্ত হয়েছে। আগেই বলেছি যে ২৩৭ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছেন, মাত্র ৯টি আসন। ইংরেজ আমলে নির্বাচকমণ্ডীর মধ্যে যেখানে (১) মুসলমান ও (২) অ-মুসলমান—এই দুই শ্রেণী মাত্র ছিল, মুসলিম লীগ সরকার সেখানে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্বাচকমণ্ডলীকে ৪টি ভাগে ভাগ করেন। (১) বর্ণহিন্দু, (২) তপশিলী হিন্দু, (৩) বৌদ্ধ ও (৪) খৃস্টান। সে কথা আগেই বলেছি; তবু আবার বলছি এই জন্য যে এইরূপ ছোট ছোট গণ্ডীতে ভাগ করার পেছনে তাঁদের কি কু-মতলব ছিল সেইটাই আবারও বিশদভাবে বোঝানোর জন্য। উদ্দেশ্য ছিল, গণ্ডী ছোট ছোট হলেই, বিভিন্ন গণ্ডীর মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও তথাকথিত স্বার্থের বিরোধও থেকেই যাবে এবং সেই সুযোগে 'লীগ দল' রাজনীতিকক্ষেত্রে 'বানরের পিঠা ভাগের' নীতিও চালিয়ে যেতে পারবেন। অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিভেদ ও বিরোধের ফলে তাঁরা আর একমত হয়ে মুসলিম লীগের ভাবীকালের অনুসৃত আইনের মাধ্যমে বা অন্য নানারকম উপায়ে হিন্দু-বিতাড়ন নীতিতে একযোগে বাধা দিতে পারবেন না—তাঁরা নির্বিবাদেই তাঁদের নীতি অনুসরণ করে চলতে পারবেন। আসলে উদ্দেশ্য ছিল, এই-ই। তখনও তাঁরা ভাবতেই পারেন নি যে মুসলমানের মধ্যেই লীগ-বিরোধী দল এইরূপ প্রবল হবে এবং অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'লীগের' সমর্থক কেউ-ই থাকবে না। ৭২ জন অ-মুসলমান সদস্যের মধ্যে ৪টি ছাড়া সব কয়টি আসনই দখল করেন। (১) কংগ্রেস, (২) সংযুক্ত প্রগতিশীল দল (আমাদের দলের নির্বাচনোত্তর নাম হয়—"United Progressive Party" ও (৩) তপশিলী ফেডারেশন দল। ঐ ৪টি আসন লাভ করেন, কমিউনিস্টরা বা তাঁদের সহযাত্রীরা। এই ৭২ জন সদস্যের অ-মুসলমান দল, আবার

তাঁদের নিজ নিজ দলের সংখ্যার ভিত্তিতে তৎকালীন সংবিধানের আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংসদে (পার্লামেণ্টে) নিজ নিজ দলের প্রার্থী নির্বাচন করেন। নির্বাচিত সদস্যদের এই সংখ্যাতত্ত্ব এখানে তুলে ধরছি এই জন্য যে পরবর্তীকালে সংবিধান বাতিল করার পরে আয়ুব খান সাহেব ক্ষমতা দখল করে যে নতুন সংবিধান তৈরি করেন তাতে তাঁর অভিনব মৌলিক গণতন্ত্র (!) কী রূপ নিয়েছে, সেটাই দেখানোর জন্য। মৌলিক গণতন্ত্রের অধীন প্রথম নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বিধানসভায় নৈতিক মেরুদণ্ডহীন মাত্র তিনজন অ-মুসলমান 'জো হুজুর' সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদে (পার্লামেণ্টে) একজনও 'না', অথচ তখনও পূর্ব পাকিস্তানে এক কোটিরও বেশি অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন! এটাই হল, আয়ুবী গণতন্ত্রের নমুনা। মুসলিম লীগও যা' করতে সেদিনে পারেন নি, বর্তমানের আয়ুবী গণতন্ত্র (!) সেই কাজটিই এখন করছেন। তাই, আগেই বলেছি যে আয়ুবী গণতন্ত্র, মুসলিম লীগের হিন্দু-বিতাড়ন নীতির এক সংশোধিত সফল অতি উগ্র সংস্করণ মাত্র। ইচ্ছা থাকলেও ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে মুসলিম লীগ, তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ তো হয়েই যায়, তার নিজের অস্তিত্বও লোপ পাওয়ার পর্যায়ে আসে।

পূর্ব পাকিস্তানের ঐ নির্বাচন ফল প্রকাশের পর মুসলিম লীগের পতনে সেখানকার হিন্দু-মুসলমান জনতার মধ্যে যে একটা অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস দেখেছি, তা কখনও ভোলবার নয়। এই নির্বাচনের এক যুগ পরে ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কংগ্রেসের পতনে এখানে যা' আনন্দোচ্ছ্বাস দেখেছি, তা'তে বহিঃপ্রকাশ বেশি ছিল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বহিঃপ্রকাশ অতটা না হলেও সকলের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত একটা আনন্দের স্রোত যেন সারা দেশটাকেই ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের অ-মুসলমান জনসাধারণের তো কথাই নেই। তাঁরা আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। দেশ বিভাগের আগে থেকেই বাংলা দেশের উপর যে মুসলিম লীগের শাসন চলছিল, তার ফলে অ-মুসলমানদের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। তার পরে দেশ বিভাগের তথা স্বাধীনতার পরে তো অত্যাচারে জর্জরিত পূর্ব পাকিস্তানের অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 'পালাই, পালাই' রব স্বাভাবিকভাবেই উঠেছিল এবং অনেকেই দেশ ছেড়ে চলেও আসতে সুরু করেছিলেন। এখন সেই মুসলিম লীগ

১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচন পর্ব নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল। নির্বাচন ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল, মুসলিম লীগের সব তোড়জোড়—সব চক্রান্তই একেবারে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে—মুসলিম লীগ দল সম্পূর্ণভাবেই পর্যুদস্ত হয়েছে। আগেই বলেছি যে ২৩৭ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছেন, মাত্র ৯টি আসন। ইংরেজ আমলে নির্বাচকমণ্ডীর মধ্যে যেখানে (১) মুসলমান ও (২) অ-মুসলমান—এই দুই শ্রেণী মাত্র ছিল, মুসলিম লীগ সরকার সেখানে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্বাচকমণ্ডলীকে ৪টি ভাগে ভাগ করেন। (১) বর্ণহিন্দু, (২) তপশিলী হিন্দু, (৩) বৌদ্ধ ও (৪) খৃস্টান। সে কথা আগেই বলেছি; তবু আবার বলছি এই জন্য যে এইরূপ ছোট ছোট গণ্ডীতে ভাগ করার পেছনে তাঁদের কি কু-মতলব ছিল সেইটাই আবারও বিশদভাবে বোঝানোর জন্য। উদ্দেশ্য ছিল, গণ্ডী ছোট ছোট হলেই, বিভিন্ন গণ্ডীর মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও তথাকথিত স্বার্থের বিরোধও থেকেই যাবে এবং সেই সুযোগে 'লীগ দল' রাজনীতিকক্ষেত্রে 'বানরের পিঠা ভাগের' নীতিও চালিয়ে যেতে পারবেন। অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিভেদ ও বিরোধের ফলে তাঁরা আর একমত হয়ে মুসলিম লীগের ভাবীকালের অনুসৃত আইনের মাধ্যমে বা অন্য নানারকম উপায়ে হিন্দু-বিতাড়ন নীতিতে একযোগে বাধা দিতে পারবেন না—তাঁরা নির্বিবাদেই তাঁদের নীতি অনুসরণ করে চলতে পারবেন! আসলে উদ্দেশ্য ছিল, এই-ই। তখনও তাঁরা ভাবতেই পারেন নি যে মুসলমানের মধ্যেই লীগ-বিরোধী দল এইরূপ প্রবল হবে এবং অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'লীগের' সমর্থক কেউ-ই থাকবে না। ৭২ জন অ-মুসলমান সদস্যের মধ্যে ৪টি ছাড়া সব কয়টি আসনই দখল করেন। (১) কংগ্রেস, (২) সংযুক্ত প্রগতিশীল দল (আমাদের দলের নির্বাচনোত্তর নাম হয়—"United Progressive Party" ও (৩) তপশিলী ফেডারেশন দল। ঐ ৪টি আসন লাভ করেন, কমিউনিস্টরা বা তাঁদের সহযাত্রীরা। এই ৭২ জন সদস্যের অ-মুসলমান দল, আবার

তাঁদের নিজ নিজ দলের সংখ্যার ভিত্তিতে তৎকালীন সংবিধানের আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংসদে (পার্লামেণ্টে) নিজ নিজ দলের প্রার্থী নির্বাচন করেন। নির্বাচিত সদস্যদের এই সংখ্যাতত্ত্ব এখানে তুলে ধরছি এই জন্য যে পরবর্তীকালে সংবিধান বাতিল করার পরে আয়ুব খান সাহেব ক্ষমতা দখল করে যে নতুন সংবিধান তৈরি করেন তাতে তাঁর অভিনব মৌলিক গণতন্ত্র (!) কী রূপ নিয়েছে, সেটাই দেখানোর জন্য। মৌলিক গণতন্ত্রের অধীন প্রথম নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বিধানসভায় নৈতিক মেরুদণ্ডহীন মাত্র তিনজন অ-মুসলমান 'জো হুজুর' সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদে (পার্লামেণ্টে) একজনও 'না', অথচ তখনও পূর্ব পাকিস্তানে এক কোটিরও বেশি অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এটাই হল, আয়ুবী গণতন্ত্রের নমুনা। মুসলিম লীগও যা' করতে সেদিনে পারেন নি, বর্তমানের আয়ুবী গণতন্ত্র (!) সেই কাজটিই এখন করছেন। তাই, আগেই বলেছি যে আয়ুবী গণতন্ত্র, মুসলিম লীগের হিন্দু-বিতাড়ন নীতির এক সংশোধিত সফল অতি উগ্র সংস্করণ মাত্র। ইচ্ছা থাকলেও ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে মুসলিম লীগ, তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ তো হয়েই যায়, তার নিজের অস্তিত্বও লোপ পাওয়ার পর্যায়ে আসে।

পূর্ব পাকিস্তানের ঐ নির্বাচন ফল প্রকাশের পর মুসলিম লীগের পতনে সেখানকার হিন্দু-মুসলমান জনতার মধ্যে যে একটা অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস দেখেছি, তা কখনও ভোলবার নয়। এই নির্বাচনের এক যুগ পরে ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কংগ্রেসের পতনে এখানে যা' আনন্দোচ্ছ্বাস দেখেছি, তা'তে বহিঃপ্রকাশ বেশি ছিল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বহিঃপ্রকাশ অতটা না হলেও সকলের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত একটা আনন্দের স্রোত যেন সারা দেশটাকেই ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের অ-মুসলমান জনসাধারণের তো কথাই নেই। তাঁরা আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। দেশ বিভাগের আগে থেকেই বাংলা দেশের উপর যে মুসলিম লীগের শাসন চলছিল, তার ফলে অ-মুসলমানদের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। তার পরে দেশ বিভাগের তথা স্বাধীনতার পরে তো অত্যাচারে জর্জরিত পূর্ব পাকিস্তানের অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 'পালাই, পালাই' রব স্বাভাবিকভাবেই উঠেছিল এবং অনেকেই দেশ ছেড়ে চলেও আসতে সুরু করেছিলেন। এখন সেই মুসলিম লীগ

সরকারের পতন হওয়াতে তাঁদের মনে আবার এক নতুন আশার আলো দেখা দেয়—তাঁরা এবারে মনে করতে থাকেন যে আর বোধহয় তাঁদের দেশ ছেড়ে যেতে হবে না—নিজ নিজ বাসভূমেই তাঁরা পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে স-গৌরবেই আবারও বাস করতেই পারবেন। সেই সুদিনের আনন্দের আশায় তাঁদের সকলেরই হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলমান জনতার এই আনন্দ শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে না; পশ্চিমবঙ্গেও তার ঢেউ এসে লাগে। জনাব ফজলুল হক সাহেব ছিলেন, বাংলা দেশের একজন প্রবীণ রাজনীতিক নেতা—তাঁর সাথে সাক্ষাৎ পরিচয়ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক হিন্দু নেতারই ছিল। তিনি মুসলিম লীগের সদস্য হিসাবে কখনও কখনও উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রচার করলেও, হিন্দু নেতাদের অনেকেই বিশেষ ভালভাবেই জানতেন যে অন্তরে আসলে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালী—সেখানে কোনও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না; তাই, জনাব হক সাহেবই আবার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হবেন, সেই আশায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যেও বিরাট আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। তখনও কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের—নব-নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট দলের সদস্যদের কোনও নেতা নির্বাচিত হয় নি; তবু সকলেই ধরে রেখেছিলেন যে বর্ষীয়ান জননেতা জনাব হক সাহেব থাকতে নেতা আর কে হবেন? তিনিই যে 'নেতা' নির্বাচিত হবেন, তা একরূপ নিশ্চিত—এটাই সকলেই মনে করেছিলেন। অবশ্য হয়েছিলেনও তিনিই কিন্তু তার জন্য অনেক 'কাঠ-খড়ই তাঁকে পোড়াতে' হয়েছে। নির্বাচনে মৌলানা ভাসানি ও জনাব সুরাবর্দী সাহেবের দলের লোকসংখ্যাই একক দল হিসাবে যুক্তফ্রণ্টে বেশি ছিলেন এবং কাজেই, তাঁরাই নির্বাচিতও হয়েছিলেন, একক দল হিসাবে বেশি সংখ্যায়। এখন নেতা-নির্বাচনের বেলায় তাঁরা চাইলেন যে জনাব সুরাবর্দী সাহেব জনাব হক সাহেব অপেক্ষা বয়সে কম ও কর্মঠ, সুতরাং তাঁকেই নেতা নির্বাচিত করা উচিত। ফলে হক সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জনাব সুরাবর্দী সাহেবও 'আসরে' এলেন। নব-নির্বাচিত সদস্যদের কতক লোক তখনও মুসলিম লীগ শাসনের দাপটে 'জেগে' আছেন। সুতরাং সব সদস্যদের মধ্যে 'স্বাক্ষর-অভিযান' সুরু হয় এবং অবশেষে জনাব হক সাহেবই নেতা নির্বাচিত হন। নেতা নির্বাচনের পর সংবিধান অনুযায়ী গভর্নর (সম্ভবত জনাব খালিকুজ্জমান সাহেব) হক সাহেবকে ডাকেন, মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য।

একটিমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যেও নেতা নির্বাচনে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতে 'কংগ্রেস' দলের মত একটি অতি সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল দলেও আমরা দেখলাম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ও শ্রীমোরারজী দেশাই-এর মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রণ্টে তো সেই দ্বন্দ্ব দেখা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। সেখানেও তাই, আমরা দেখেছিলেম দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব মিটে গেলে তো নেতা নির্বাচিত হলেন কিন্তু এখন আবার দেখা দিল মন্ত্রিসভা গড়ার সঙ্কট। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাও যখন মন্ত্রিসভা গড়েন, তখন সেই দলের মধ্যেও সঙ্কট দেখা দেয়, অনেকের মধ্যেই 'মন কষাকষি'-ও হয়। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই তো দেখা যাচ্ছে, মন্ত্রিত্বের মর্যাদা না-পেয়ে বা মন্ত্রিত্বে স্থান পেয়েও আপন ইচ্ছামত 'দপ্তরের' ভার না-পেয়ে একেবারে দল ছাড়ার-ই ধুম পড়ে গিয়েছে! পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের নেতা জনাব ফজলুল হক সাহেবের সামনেও এই সমস্যা বেশ একটু উগ্র ভাবেই দেখা দিয়েছিল। তাই তিনি প্রথমেই পূর্ণাঙ্গ একটি মন্ত্রিসভা গড়তে পারেন নি; তিনি তাঁকে নিয়ে ৪ সদস্যের একটি অসম্পূর্ণ আংশিক মন্ত্রিসভা (Skeleton Cabinet) প্রথমে গড়েন। হক সাহেব ছাড়া তাঁর সেই অসম্পূর্ণ মন্ত্রিসভায় ছিলেন (১) আবু হোসেন সরকার, (২) সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিঞা) এবং (৩) জনাব আস্রফুদ্দিন চৌধুরী। প্রথম দুইজনই হক সাহেবেরই 'কৃষক-শ্রমিক' পার্টির সদস্য এবং তৃতীয় জন হলেন, মৌলানা আতহার আলি সাহেবের 'নেজাম-ই-ইসলাম' পার্টির সদস্য। জনাব সুরাবর্দী সাহেবের ও মৌলানা ভাসানি সাহেবের 'আওয়ামি মুসলিম লীগের' কোন সদস্যই ঐ আংশিক ও অসম্পূর্ণ মন্ত্রিসভায় ছিলেন না। এ ছাড়া বিধানসভায়ও 'স্পীকার' ও 'ডেপুটি স্পীকার' নির্বাচিত হন, যথাক্রমে জনাব আব্দুল হাকিম সাহেব ও জনাব সাহেদ আলি সাহেব। তাঁরাও উভয়েই ছিলেন হক সাহেবের "কৃষক-শ্রমিক" দলেরই সদস্য, সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই 'আওয়ামি মুসলিম লীগে'র মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে চলতে সুরু করে। এই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠবার জন্য হক সাহেবের দলের সাথে আওয়ামি মুসলিম লীগ দলের আপোষের আলোচনা কিন্তু চলতেই থাকে।

হক সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হয়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (অ-মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তাঁরাও পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের মতই

যা'ক, সেদিন হক সাহেবের কৈফিয়তে তাঁর 'ফাঁড়া' সাময়িকভাবে কাটলেও; মুসলিম লীগের শাসনকর্তাদের উচ্চ মহলের চক্রান্ত কিন্তু চলতেই থাকে। সে চক্রান্তের একটিই মাত্র লক্ষ্য ছিল তা' হল, কীভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বাতিল করা যায়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিক পরিবেশ সেদিন যা' ছিল তাতে অন্য দল থেকে সদস্য ভাঙিয়ে এনে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভায় ৩০৯ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগের সদস্য মাত্র ৯ জন ছিলেন। বর্তমানের অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার মত মোটেই নয়। পশ্চিমবঙ্গের ২৮৪ জন সদস্যের বিধানসভায় 'কংগ্রেস' দলের নিজস্ব সদস্য সংখ্যাই হচ্ছে ১৩০ জন। তার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে শাসনক্ষমতা হাতে পেতে আরও দরকার মাত্র ১৭ জন সদস্যের। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস দলের পক্ষে সেই চেষ্টা করে সফল হওয়া খুব বেশি শক্ত কাজ নয়। তাঁরা অনেক দূরই অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা ঐ পথে করায়ত্ত করা মুসলিম লীগের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর ছিল না; সুতরাং তাঁদের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে গদিচ্যুত করার জন্য অন্য পথের সন্ধান করতে হয় এবং তার জন্য দরকার হয় ষড়যন্ত্রমূলক চক্রান্ত। তাঁরা সেই পথই নেন।

আগেই বলেছি হক সাহেবের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা হওয়াতে পূর্ব পাকিস্তানেই যে কেবল আনন্দের হিল্লোল বয়ে গিয়েছিল তা নয়। পশ্চিম বাংলাও সেই আনন্দের হিল্লোলে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম বাংলার বহু নেতাই সেদিন জনাব ফজলুল হক সাহেবের বিজয়ে আনন্দে অধীর হয়ে তাঁর কাছে শুভেচ্ছার বাণী-ই যে শুধু পাঠিয়েছিলেন তা নয়—তাঁরা জনাব হক সাহেবকে কলকাতায় আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। হক সাহেবও বন্ধুদের সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং কলকাতা আসেন। আকাশপথে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে যেদিন হক সাহেবের 'প্লেন' কলকাতার দমদম হাওয়াই বন্দরে উপস্থিত হয় সেদিন সেখানে হয় এক অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার সমারোহ। হক সাহেব পান

রাজোচিত সম্বর্ধনা। অভূতপূর্ব, কল্পনাতীত। বরাবরের ভাব-প্রবণ হক সাহেব সেই অভ্যর্থনায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাওয়াই বন্দরের সেই অভ্যর্থনা থেকে সুরু করে কলকাতা শহরের বহু বিভিন্ন স্থানেই তাঁকে অভ্যর্থনা করা ও মানপত্র দেওয়া হয়। 'নেতাজী' ভবনেও। 'নেতাজী' ভবনে অভ্যর্থনার উত্তর দিতে গিয়ে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় সন্তান সুভাষচন্দ্রের কথা স্মরণ করে তিনি কেঁদে ফেলেন। সেই সব সভাতেই তিনি বহু কথাই বলেছিলেন। আজ এতদিন পরে আর সে সব কথা আমার মনে নেই। আমাকে আজ সব কিছুই লিখতে হচ্ছে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে। হয়তো কোথাও কোথাও কিছু ভুলও হতে পারে। যদি সেরূপ কোনও মারাত্মক ভুল থেকে থাকে এবং সহৃদয় পাঠকগণ সে ভুলের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে ভবিষ্যতে আমি তা সংশোধন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবো।

হক সাহেবের বক্তৃতার সব কথা মনে নেই; তবে যেটুকু মনে পড়েছে তা তাঁর বক্তৃতার মর্মার্থ মাত্র। আমার যতটা মনে পড়ে তাঁর সেদিনের সেই সব বক্তৃতার মর্মার্থটাই এখানে তুলে ধরছি :—

তিনি বলেছিলেন,—রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভাগ করা যেতে পারে কিন্তু বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর সংস্কৃতি, বাংলার বাঙালিত্বের যে একটা নিজস্ব ধারা বর্তমানের দুই বাংলার মধ্যেই একই প্রবাহে বয়ে চলেছে, তাকে কোনও শক্তিই কোনও দিনই বিভাগ করতে—পৃথক করতে পারবে না। দুই বাংলার বাঙালীই চিরকালই বাঙালীই থাকবে। তাঁদের মধ্যে বিভাগ কোনও কালেই কোন শক্তিই করতে পারবে না।

এই ধরণের অনেক কথাই সেদিন তিনি বলেছিলেন। দুই বাংলার বাঙালীর মন সেই সব বক্তৃতার খবর পড়ে যেমন আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিলো, তেমনি আবার মুসলিম লীগের নেতারাও সেই সব বক্তৃতার মধ্যে মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্বের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী কথা শুনে আতঙ্কে আঁৎকে উঠেছিলেন। মুসলিম লীগের সেই সব নেতাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বাঙালীও যে না ছিলেন তা নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন একজন বাঙালী। তিনি হলেন বগুড়ার জনাব মহম্মদ আলি।

জনাব হক সাহেবের ঐ সব বক্তৃতা তাঁর শত্রুপক্ষ মুসলিম লীগ নেতাদের তাঁকে অপসারণের একটা সুযোগ এনে দেয় তো বটেই, তার উপর তাঁরা

চক্রান্ত করেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আইন-শৃঙ্খলা ঘটিত শাসন ব্যাপারেও একটা আঘাত হেনে হক সাহেবের মন্ত্রিসভাকে অবিলম্বে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। হয়েছিলও তা-ই। সেই কথাটাই বলছি।

মুসলিম লীগের সমর্থক ঢাকার ও করাচির সংবাদপত্রগুলো হক সাহেবের কলকাতার বক্তৃতা নিয়ে জোর 'সোর-গোল' তুলতে সুরু করেন এবং সাথে সাথে প্রচার করতে থাকেন যে পূর্ব পাকিস্তানে আর আইনের শাসন নেই— 'আইন-শৃঙ্খলা' একদম ভেঙে পড়েছে !

ইতিমধ্যে হক সাহেব তাঁর মন্ত্রিসভাকে পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তোলেন। আওয়ামি মুসলিম লীগের নেতারাও মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে শপথ নেন। নতুন মন্ত্রী হিসাবে যাঁরা শপথ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবর রহমান সাহেব ছিলেন। যেদিন তাঁরা শপথ নিলেন, সেই দিনই (ঠিক মনে নেই, সম্ভবত সেই দিনই) অথবা শপথ নেওয়ার ২।৪ দিনের মধ্যেই ঢাকার নারায়ণগঞ্জের 'আদমজী পাট কলে' বাঙালী-অ-বাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে এক ব্যাপক দাঙ্গা বেধে যায়। এই দাঙ্গায় অ-বাঙালী শ্রমিকরাই আক্রমণকারী ছিল এবং ঐ 'জুটমিলে'র অ-বাঙালী দারোয়ান জুটমিলের বন্দুকও বাঙালী শ্রমিকদের উপর ব্যবহার করে বহুসংখ্যক বাঙালীকে নিহত করে। জুট-মিলের মধ্যেই ঐ হত্যাকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকে না, বাঙালী শ্রমিক-বস্তীর উপরেও আক্রমণ চলতে থাকে। খবর পেয়েই মন্ত্রিসভা, মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঐ দাঙ্গা দমন করতে পাঠান। শেখসাহেব, ঘটনাস্থলে পৌঁছেই, অবস্থার গুরুত্ব দেখে যথাসাধ্য সংযম, অথচ দৃঢ়তার সাথে অল্প সময়ের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে আনেন। দাঙ্গাকারীদের অনেককে গ্রেপ্তারও করান। দাঙ্গা বন্ধ করাটাই বোধহয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার 'কাল' হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার এবং তাঁদের প্রতিনিধি, শেখ মুজিবর সাহেব, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে মন্ত্রিত্বের পদ-গৌরবের ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেখানে অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম করেছেন ! এই অজুহাতে 'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভাকে তৎকালীন সংবিধানে ৯৩ ধারা বলে বাতিল করেছেন, কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার। বিধান-সভাকেও সাময়িক-মূর্ছামগ্ন করা হয়। মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পাঠান হয় এবং বর্ষীয়ান নেতা-মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক্ সাহেবকে তাঁর ঢাকার বাড়িতেই আইনত না হলেও পুলিশবেষ্টনী দিয়ে কার্যত গৃহবন্দী

করা হয়। হক্ সাহেবকে গৃহবন্দী করেই এই নাটকের যবনিকাপাত করা হয় না। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার জনাব মহম্মদ আলি সাহেব বিশ্বব্যাপী এক ঘোষণায় বলেন যে, হক্ সাহেব দেশদ্রোহী—বিশ্বাস-ঘাতক! সম্পূর্ণ পরিকল্পনা, আগে থেকেই মুসলিম লীগ সরকারের তৈরি করাই ছিল। এখন তাকেই রূপ দেওয়া হ'ল। পূর্ব পাকিস্তানের জেলায় জেলায় এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। সব জেলা থেকেই (রাজসাহী জেলা বাদে) যুক্তফ্রন্টের সমর্থক শুধু মুসলমান নেতাদেরই গ্রেপ্তার করা হয়। এইসব গ্রেপ্তারের মধ্যে রাজনীতি করেন না এমন সব বহু হিন্দু-মুসলমান প্রধান ব্যক্তিরাও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-কবিরাজ, ব্যবসায়ী ও শিক্ষকেরাও। এই গ্রেপ্তারের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, সারা দেশ জুড়ে—বিশেষ করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে—'যুক্তফ্রন্ট'-এর নামে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করা। সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটালেন রাজসাহীর তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—জনাব আব্দুস সালাম চৌধুরী সাহেব। এই সুদক্ষ ন্যায়পরায়ণ রাজকর্মচারীটির একটু ব্যক্তিগত ও চরিত্রগত পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করি। তিনি ছিলেন সিলেটের অধিবাসী। ওকালতি পাশ ক'রে কিছুদিন 'কোর্টে' আইন ব্যবসাও করেন এবং পরে মুন্সেফের কাজ নিয়ে সরকারী চাকুরীতে ঢোকেন। 'মুন্সেফ' থাকাকালেই তিনি আসামে (সিলেট জেলা তখন আসামের মধ্যে ছিল) 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা দেন এবং পাশ করে, বিচার-বিভাগ থেকে শাসন-বিভাগে বদলি হন। তিনি প্রথম জীবনে উকিল ও মুন্সেফ ছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁর চরিত্রে আইনের মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে একটা গভীর আস্থা গড়ে উঠেছিল। তাঁর মত একজন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, ধর্মভীরু শাসক আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁর চরিত্রের এই সব মহৎ গুণই পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রচণ্ড দোষ হ'য়েই দেখা দিয়েছিল। তাঁর নিজ মুখ থেকেই শুনেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে সংবিধানের ৯৩ ধারা জারির পরে, তাঁর কাছে সরকারী উচ্চমহল থেকে একটি নামের তালিকা সহ তাঁদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ আসে। সেই তালিকার মধ্যে রাজনীতি করেন না, এমন নাকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু কিছু প্রধান উকিল-মোক্তার, ডাক্তার, প্রভৃতিও ছিলেন। রাজনৈতিক নেতাদের তো কথাই নেই! চৌধুরী সাহেব (ম্যাজিস্ট্রেট) তদুত্তরে না কি, সরকারকে জানান যে, জেলার মধ্যে শান্তি

অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিনিই যখন সম্পূর্ণভাবে দায়ী, তখন তাঁর সেই দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই তিনি মনে করেন যে ঐ তালিকামত গ্রেপ্তার করতেই অশান্তি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা—গ্রেপ্তার না করলেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারবেন। তিনি, কাউকেই গ্রেপ্তার করেন না এবং জেলার মধ্যে কোথাও কোনও রূপই অশান্তি দেখা দেয় নি। শান্তি পরিপূর্ণভাবেই জেলার সর্বত্রই বিরাজ করে। কিন্তু তা' হলে হবে কি? শান্তি বজায় রাখাই তো সরকারের উদ্দেশ্য নয়। সরকারের উদ্দেশ্য আতঙ্ক সৃষ্টি করা! সরকারের সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে গেল; সুতরাং তার ফল জেলাশাসককেই ভোগ করতে হবে। করেছিলেনও। তাঁকে জেলাশাসকের 'চেয়ার' ও 'কোয়ার্টার' থেকে বিদায় নিয়ে আঞ্চলিক খাদ্য সংগ্রহণ অফিসার হিসাবে রাজসাহী শহরে এক ভাড়াটে বাড়িতে থেকে কাজ করতে হয়। রাজসাহী ছাড়া অন্য কোনও জেলায় তাঁর অফিস স্থানান্তরের তাঁর প্রার্থনাও সরকার বাতিল করেন। তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করা। তিনি যখন আঞ্চলিক খাদ্য সংগ্রহণ অফিসার হিসাবে সরকারের ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন, সেই সময় আমি তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করায় তিনিই আমাকে ঐসব তথ্য দেন: সুতরাং এটা অপরের মুখের শোনা কথা নয়। এই গ্রন্থের সূচনাতেই রাজসাহীর আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট (স্বাধীনতার পরের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট) জনাব আলি তায়েব সম্পর্কে বলেছিলেম যে তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ন্যায়বিচার করতে গিয়ে কিভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে অপসারিত হ'য়ে ঢাকা সচিবালয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কেরানী হয়েছিলেন: এখন, আর একজন ম্যাজিস্ট্রেটের অবস্থা দেখে ও শুনেও কি আজো যাঁরা মুসলিম লীগ সরকার সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে চলছেন, তাঁদের কি জ্ঞানোদয় হবে না? ভারত সরকারের চোখ খুলবে কবে, জানি না! ভারতের জনগণ যদি একটু সজাগ হ'য়ে পাকিস্তানের হিন্দুসম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাঁরা, নিজেরা যদি একটা বলিষ্ঠ নীতি নেন, তাহলেই ভারত সরকারের নীতিও বদলানোর সম্ভাবনা আছে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই "পাক-ভারতের রূপরেখা"কে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছি। এর পরেও যদি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে কিছু সাড়া না জাগে, তবে সে দোষ, শুধু আমার অক্ষম লেখনীর। আমি বিষয়বস্তুগুলো

জনসমক্ষে তুলে ধ'রে, প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদের কাছে আমার অন্তরের আকুতি জানিয়ে নিবেদন করতে চাই যে আমার অক্ষম লেখনী যা পারে নি, সেই কাজের ভার যেন তাঁরা নেন!

আমি এখানে কেবল পাকিস্তান সরকার বনাম পূর্ব পাকিস্তানের 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারের কথাই তুলে ধরেছি, সেই অবস্থার সাথে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ আশা করি ইতিহাস আলোচনা করার মতই পূর্ব পাকিস্তানের সেদিনের অবস্থার সাথে পশ্চিম বাংলার আজকের অবস্থার তুলনামূলক বিচার ক'রে দেখবেন, হাওয়া কোন দিকে বইছে!

সংবিধানের ৯৩ ধারায় পূর্ব-পাকিস্তান বিধানসভা মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে আছে। দেহ আছে। প্রানহীনও হয় নি; তবে, সম্পূর্ণ অসাড়, নিস্পন্দ। জীবনের সাড়া কোথাও নেই—সম্পূর্ণভাবেই সংজ্ঞাহীন। শ্বাস-প্রশ্বাসও চলে কি না, বোঝা দায়। বিধানসভার কাজকর্ম তো কিছু নেই-ই, সদস্যদের ভাতাও বন্ধ। আমার তো বরাবরই "অন্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ:" অবস্থা। বিধানসভার সদস্য হিসাবে যা পেতাম তার মধ্যে থেকে নিজের খাওয়া-পরার খরচ বাদে যা কিছু বাঁচতো, তার সবটুকুই দেশের ও জনসেবার কাজেই খরচ হয়ে যেত। এক কপর্দকও মজুত ছিল না, বা আমার কোনও জমি-জমাও ছিল না, সুতরাং, তার কোনও আয়ও না। বিধানসভা এইরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এগারো মাসের কিছু উপরে চলে। এই অবস্থায় আমার সাহায্যে অযাচিতভাবেই এগিয়ে আসেন, আমার পাড়ারই এক সহৃদয় বন্ধু—শ্রীসুরেশচন্দ্র পাণ্ডে। তিনি আমাকে 'ধার' হিসাবেই (!) পরপর যে টাকা দিয়ে চলেন, তার পরিমান, সাত শত টাকার উপরেই হবে। তাঁর কাছ থেকে আমার টাকা নিতে আত্মসম্মানে ঘা লাগতে পারে মনে করেই বোধহয় তিনি 'ধার' বলেই টাকা দেন কিন্তু তিনি বিশেষ ভালভাবেই জানতেন যে বিধানসভা, আবার যদি তার সংজ্ঞা ফিরে না-পায় এবং সদস্যদের ভাতা আবার যদি দেওয়া না হয়, তাহলে ঐ টাকা শোধ করার আমার কোনই সঙ্গতি ছিল না। ঐ টাকার জন্য তিনি, আমার কাছ থেকে কোনও ঋণ-পত্রের দলিলও নেন নি বা অন্য কোনও লোককে সাক্ষীও রাখেন না। মুখে যদিও তিনি বলেছিলেন—টাকাটা তিনি ধার দিচ্ছেন কিন্তু আমার মনে হয় তিনি কার্যত হয়তো ঐ টাকাটা দানের হিসাবেই তাঁর জমাখরচের খাতায় খরচ লিখেই থাকবেন। যাই হোক,

ভগবানকে ধন্যবাদ যে এগারো মাস পরে, বিধানসভা আবার সংজ্ঞা ফিরে পেলে তাঁর টাকাটা আমি তাঁকে সম্পূর্ণভাবেই দিতে পেরেছিলেম। এখানে অর্থের প্রশ্নই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় নি। আমি দেখেছি, রাজসাহীবাসীর আমার প্রতি তাঁদের স্নেহ ভালবাসা। আমি তাঁদের দিয়েছি যতটুকু, পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে তার অনেকগুণ বেশী। যা পেয়েছি তা হাটে-বাজারে বিক্রী হয় না—টাকা দিয়েও তা কেনা যায় না। অন্তরের দেওয়া জিনিস অন্তর দিয়েই উপলব্ধি করতে হয়। আমি করেছিও তাই-ই। আজ পেছনে চেয়ে দেখছি, রাজসাহীবাসীর কাছে আমার ঋণের বোঝাই ভারী হয়ে আছে। তাঁদের কাছ থেকে আমার সেই ঋণ পরিশোধ না করেই যে আজ এখানে (পশ্চিমবঙ্গে) আমাকে চলে আসতে হয়েছে, সে যে কত বড় দুঃখের ও বেদনার তা কেবল জানেন, আমার অন্তরের দেবতা ; আর, সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করি আমি। কী অবস্থার চাপে যে আমি পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসার জন্য এসে আর ফিরে যেতে পারি নি, তার বিস্তারিত বিবরণ আমি যথাকালে দেব।

এই তো হল আমার অবস্থা। বগুড়ার নেতা শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (এখন পরলোকগত) মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যতটা জানতাম, তাতে মনে হয় তাঁরও দশা আমার মতই বা আমার চেয়েও খারাপ হয়েছিল। আরও হয়তো কারো হয়ে থাকবে, তাঁদের কথা আমার জানা নেই। আর, জানি আর একজনের কথা। তিনি হলেন, জনাব ফজলুল হক সাহেব। তাঁর, আমাদের মত অর্থের কষ্ট হয় নি। তিনি ভুগছিলেন অন্তরের একটা অব্যক্ত বেদনায়। তিনি সারাজীবন ধরে যে বাঙালি মুসলমানকে সেবা করেছেন, সেই সেবারই কি এই পরিণাম যে একজন বাঙালি (জনাব মহম্মদ আলি) প্রধানমন্ত্রীর গদিতে থেকে তাঁকেই বললেন—"দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক!" মনের ঐ ব্যথা, তাঁর এগারো মাসের কার্যতঃ—বন্দীদশায় প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রতি রাতের স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর নিজ মুখের কথাতেই এটা জেনেছিলেম। তাঁর ঐ ব্যথারও কিন্তু পরে অবসান হয়েছিল এবং কেমনভাবে হয়েছিল, সে কথা একটু পরেই বলছি।

এই এগারো মাসের মধ্যেই কিন্তু পাক-রাজধানী করাচির পাদদেশে প্রবাহিত আরব সাগরের ঘোলা জল, আরও ঘোলা হয়ে ওঠে। গভর্নর

জেনারেল গুলাম মহম্মদ সাহেবের রাজভবনে প্রাসাদ-চক্রান্ত বেশ জমে ওঠে। তিনি যে প্রাসাদ-চক্রান্তের সুরু করেন, সেই চক্রান্তই তাকেও একদিন সম্পূর্ণভাবেই গ্রাস করে—তিনি একদম নিষ্প্রভ হয়ে গদিচ্যুত অবস্থায় শেষ নিশ্বাসত্যাগ করেন, তাঁরই একজন ভূতপূর্ব সহকর্মী (রাজ-কর্মচারী) ইস্কান্দার মির্জা সাহেবের চক্রান্তে! আমলাতন্ত্রের কাছে রাষ্ট্র-নায়কগণ আত্মসমর্পণ করলে, তার পরিণতি এই-ই হয়। পাকিস্তানে এটা ভালভাবেই দেখেছি। আমলারাই হয়ে উঠেছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রপতি। এখনও সেখানে তাই-ই চলছে। এই অবস্থা দেখেই, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী, একবার পাকিস্তান সরকারকে বলেছিলেন—'দপ্তরী গভর্নমেণ্ট।' নেহরুজী আজ আর নেই কিন্তু তিনি থাকলে তিনিও হয়তো দেখে আঁৎকে উঠতেন যে তাঁর স্বপ্নের প্রগতিশীল ভারতও আজ সেই পথেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে! আমার আশঙ্কা হয়, ভারত সরকার ও ভারত-বাসীরা যদি এখনও সজাগ ও সতর্ক না হন, তাহলে ভারতও হয়তো পাকিস্তানের পথেই চলতে সুরু করবে! দেশ-বিদেশের অতীতের ইতিহাসই প্রত্যেক দেশেরই চলার পথের দিশারী হয়ে তাকে পথ-নির্দেশ দিতে পারে। কোনও দেশ যদি সেই ইতিহাসের নির্দেশ অমান্য করে চলতে থাকে, তবে তাকে তার দামও দিতে হয়—'গণতন্ত্র' সেখানে নিঃশেষ হয়ে যায়। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র 'পাকিস্তান'—সেই ইতিহাসেরই একটা জলন্ত নিদর্শন।

যাক, যা বলছিলেম, তাতেই আবার ফিরে যাই। গভর্নর জেনারেল চক্রান্ত করে সংবিধান-সংসদ তথা পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে জনাব মহম্মদ আলি সাহেবকে নির্দেশ দেন যে, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রিসভা নতুনভাবে গড়তে। পাকিস্তানে যখন এই ভাঙার কাজ চলছিল, জনাব সুরাবর্দী সাহেব তখন দেশের ভেতরে ছিলেন না। তিনি অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। আরোগ্য লাভ করে যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন গভর্নর জেনারেল গুলাম মহম্মদ সাহেব, ভাঙার পর গড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সুরাবর্দী সাহেবকেও মন্ত্রিসভায় নেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। ঢাকায় গিয়ে সুরাবর্দী সাহেব, তাঁর দল—'আওয়ামি লীগের'—(আগেই "আওয়ামি মুসলিম লীগের" 'মুসলিম' কথাটা উঠিয়ে দিয়ে দলের নাম করা হয়েছে—'আওয়ামি লীগ')—মত নিয়ে করাচি ফিরে

মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার তাঁর সম্মতি জানান। জনাব সুরাবর্দী সাহেব মন্ত্রিসভায় যাচ্ছেন শুনেই জনাব ফজলুল হক সাহেবের 'কৃষক-শ্রমিক দল' ও তার সমর্থকেরাও দাবি করেন যে তাঁদের একজন প্রতিনিধিকেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতে নিতে হবে। তাঁদের দাবিও স্বীকৃত হয় এবং জনাব হক সাহেবের ও তাঁর দলের প্রতিনিধি হিসাবে জনাব আবু হোসেন সরকার সাহেবকে কেন্দ্রের একজন বিশেষ দূত এসে রংপুর জেলার গাইবান্ধা (সরকার সাহেবের বাড়ি ছিল, গাইবান্ধা সহরে) সহর থেকে করাচিতে নিয়ে যান। রাজনীতিক দলের এই সমস্ত নেতাদের মন্ত্রিসভাতে স্থান দেওয়া ছাড়াও গভর্নর জেনারেল গুলাম মহম্মদ সাহেব আর একটি এমন কাজ করেন যার সুদূরপ্রসারী ফল হিসাবে 'পাকিস্তান' আজও পিষ্ট হয়ে চলেছে। গভর্নর জেনারেলের আদেশে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আয়ুব খান সাহেবকেও মন্ত্রিসভায় নিতে হয়। সেনাবাহিনীর প্রধানকে রাজনীতিতে টেনে আনা হয় এবং তার ফল যা হওয়ার তাই-ই আজ হচ্ছে, পাকিস্তানে। গরুখেকো বাঘ, না কি, মানুষের রক্তের স্বাদ একবার পেলে মানুষ ছাড়া আর গরু খেতে তার রুচি হয় না! এই রকমই একটা প্রবাদ আছে। সেইজন্যই বোধহয় ইংরেজ আমলে সেনাবাহিনীকে সব সময়েই রাজনীতির বাইরে রাখা হত, 'পাকিস্তান', তার ব্যতিক্রম করলেন এবং তার ফল যা হওয়ার তা-ই হয়েছে—আজও সেনাবাহিনীর প্রধানের এক-নায়কত্বের দুর্ভোগ ভুগে চলেছেন! নেহরুজীর জীবিতকালে ভারতেরও সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল থিমায়া—একবার ভারতের রাজনীতিতে একটা সঙ্কটের চাপ সৃষ্টি-করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর কঠোর ব্যবস্থাপনায় সে চেষ্টা অঙ্কুরেই ব্যর্থ হয়ে যায়। নেহরুজী সেদিন দৃপ্তস্বরে বলেছিলেন যে রাজনীতিকরা সব সময়েই সৈন্য ও সেনাবাহিনীর উপর প্রাধান্য করে চলবেন। তাঁর সেদিনের কঠোর নীতি অবলম্বনের ফলই আজ পর্যন্তও ভারতে রাজনীতিক ও সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনও গোলযোগ দেখা দেয় নি। জানি না, কতদিন আর এই পারস্পরিক সহযোগিতার ও সেনাবাহিনীর উপর রাজনীতিক নেতাদের প্রাধান্য বজায় থাকবে।

পাকিস্তানে কিন্তু গুলাম মহম্মদ সাহেবের কোনও গভীর মতলবেই হোক, বা অবিবেচনায়ই হোক—সেদিনের কাজ সেনাবাহিনীকে রাজনীতিক নেতাদের প্রতি আনুগত্যে ও সহযোগিতায় ফাটল ধরিয়েছিল। সেনাবাহিনীর প্রধান

সেইদিন থেকেই মনে ভাবতে সুরু করেন যে তিনি ইচ্ছা করলেই সর্বেসর্বা হতে পারেন! পরবর্তীকালে হলেনও, গভর্নর জেনারেল গুলাম মহম্মদ সাহেবের মনের কোণে, হয়তো, মতলব ছিল যে তিনি, সেনাবাহিনীর সাহায্যে পাকিস্তানের এক-নায়ক শাসক (ডিক্টেটার) হয়ে বসবেন এবং সেই জন্যই জেনারেল আয়ুব খানকে মন্ত্রিসভায় এনে তাঁকে, তাঁর (গভর্নর জেনারেল) পার্শ্বচর স্বরূপ কাছাকাছি রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি যে সংবিধান-সংসদ তথা 'পার্লামেণ্ট' ভেঙে দিয়েছিলেন, তা আর পুনরায় গড়ার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তা হতে পারলো না। সংবিধান-সংসদের তৎকালীন সভাপতি ফরিদপুরের জনাব তমিজুদ্দিন খান সাহেব, গভর্নর জেনারেলের কাজ বে-আইনী হয়েছে বলে শ্রেষ্ঠ আদালতে মামলা করেন। সে মামলাতে তিনি অবশ্য হেরে যান কিন্তু জনৈক 'পেটেল' উপাধিধারী ভদ্রলোক (নাম এখন মনে নেই) যে মামলা করেন, তাতে তার জয় হয়। তাঁর মামলার বিষয়বস্তু ছিল যে সংবিধান-সংসদ বাতিল হয়ে যাওয়ার পর গভর্নর জেনারেল কর্তৃক যে সব আইন ও আদেশ জারি করা হয়েছে তা সংবিধান-সংসদ বা 'পার্লামেণ্ট' কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় সবই বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। এই মামলায় পেটেলের পক্ষে আদালতের 'রায়' হওয়ায় এক নতুন পরিস্থিতি দেখা দেয়। সেই পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবিলম্বে আর একটি নতুন গণ-পরিষদ গড়ে গভর্নর জেনারেলের তৈরী করা আইন-কানুন ও আদেশ-গুলোকে নতুনভাবে গণ-পরিষদ দ্বারা স্বীকৃতি দিয়ে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাই গুলাম মহম্মদ সাহেবকে আবার একটি গণ-পরিষদ, তথা 'পার্লামেণ্ট' গঠনের কথা ঘোষণা করতে হয়। গণ-পরিষদের ভোটদাতা হচ্ছেন প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা। পূর্ব পাকিস্তান আইনসভা তো মূর্ছাগ্রস্ত। জীবনের সাড়াও তার দেহে কোথাও নেই। সে কথা আগেই বলেছি। এই অবস্থার প্রতিকারে পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার মূর্ছা ভাঙানোর দরকার হয়ে পড়ে এবং বিধানসভার মূর্চ্ছাও ভাঙা হয়। আমরা—যাঁরা বিধানসভার সদস্য ছিলেম তাঁরাও আবার—সদস্য হিসাবে জীবনের সাড়া ফিরে পাই। আমাদের মূর্চ্ছাকালের এগারো মাসের বন্ধ ভাতাও আবার ফিরে দেওয়ার আদেশ হয়। ঐ টাকা পেয়েই আমি, শ্রীসুরেশ পাণ্ডের আমাকে দেওয়া ধারের টাকা শোধ করে দিই।

এই সব কিছুই কিন্তু ঘটে যায় সেই এগারো মাসের মধ্যেই। এগারো

মাস পরে এইবার আমাদের আবার গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতে হবে। আমাদের দলের আমরা তের জন সদস্য এই দীর্ঘদিন পরে আবার ঢাকার গিয়ে মিলিত হই গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের দলের প্রার্থী মনোনয়ন করতে। জনাব ফজলুল হক সাহেব, তাঁর মন্ত্রিসভা গড়ার প্রাক্কালে একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, যে সব সদস্য প্রাদেশিক বিধানসভা ও গণ-পরিষদসভার সদস্য নির্বাচিত হবেন, তাঁদের মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে না। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঠিক করি, আমাদের দল-নেতা শ্রীধীরেন্দ্র-নাথ দত্ত মহাশয় যাতে মন্ত্রিসভাতেই যেতে পারেন, তারই ব্যবস্থা করা দরকার।

সেই জন্যই আমরা আগেকার গণ-পরিষদের প্রখ্যাত সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে এবারের নতুন গণ-পরিষদে মনোনয়ন না দিয়ে তাঁর স্থানে আমাদের বন্ধু ও ঢাকার বিখ্যাত 'সার্জন'—ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে মনোনয়ন দিই। আমাদের দলের সদস্য-সংখ্যা হিসাবে আমরা দুইটি আসন পেতে পারি। সেই হিসাবেই আমাদের দলের আর একজন সদস্য হন বাংলাদেশের বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা ও প্রসিদ্ধ আইনজীবী কুমিল্লার শ্রীকামিনী-কুমার দত্ত মহাশয়। তিনি আগেকার গণ-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। আমাদের মনোনীত ঐ দুইজন সদস্যই যথারীতি নির্বাচিতও হয়েছিলেন। কিন্তু ধীরেনবাবুকে আমরা যে উদ্দেশ্যে গণপরিষদ থেকে বাইরে রেখে ছিলেম তা' সহজে সফল হয়ে ওঠে না। জনাব ফজলুল হক সাহেব যখন ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে তাঁর ৪ সদস্যের আংশিক মন্ত্রিসভা গড়েন, তার আগে থেকেই আরম্ভ করে তার পরেও অনেকবারই আমরা 'মহারাজ' (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী) ধীরেনবাবু সহ আমাদের দলের অনেকেই—হক সাহেবের সাথে দেখা করে ধীরেনবাবুকে মন্ত্রিসভায় নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই, কিন্তু তাঁর স্বল্পকালীন স্থায়ী (দুই মাসেরও কম সময়ের) মন্ত্রিসভায় তিনি তখনও কোন হিন্দু-সদস্যকেই নেওয়ার সুযোগ করে উঠতে পারেন নি; সুতরাং, ধীরেনবাবুকেও নেওয়া হয় নি। এই তো গেল এদিককার পরিস্থিতি।

ওদিকে, অর্থাৎ কেন্দ্রে, প্রত্যেক প্রদেশ থেকেই যথারীতি গণ-পরিষদের নতুন সদস্য সব নির্বাচিত হয়ে গেলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের বিধানসভার মুসলমান সদস্য প্রায় সকলেই তো ছিলেন মুসলিম লীগের বিরোধী দলভুক্ত;

সুতরাং তাঁরা যে প্রতিনিধি গণ-পরিষদে পাঠালেন, তাঁরাও মুসলিম লীগের বিরোধী। কিন্তু সব প্রদেশের নির্বাচিত মুসলমান সদস্যদের মধ্যে একত্রে মুসলিম লীগেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাঁড়ায়। এইবার তাঁদের দলপতি নির্বাচনের পালা। যিনি দলপতি হবেন, তিনিই হবেন প্রধানমন্ত্রী দলপতি-নির্বাচনে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার জনাব মহম্মদ আলি আর দলনেতা হতে পারেন না; দলনেতা নির্বাচিত হন চৌধুরী মহম্মদ আলি সাহেব। ফলে, প্রধানমন্ত্রিরূপে এক মহম্মদ আলির বিদায়, আর এক মহম্মদ আলির আগমন। বগুড়ার মহম্মদ আলির দ্বারা যে সব ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য কাজ করিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল, তা' যখন শেষ হয়ে গেল—তাঁকে দিয়েই জনাব ফজলুল হক সাহেবের মত লোককেও 'দেশদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী' ঘোষণা করা শেষ হল—তখন তাঁকে আবর্জনা-স্তূপে নিক্ষেপ করা হল—অ-বাঙালী পাঞ্জাবী মহম্মদ আলি সাহেব নতুন নেতা নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসলেন। এরই নাম রাজনীতি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও আজ রাজনীতির যে খেলা সুরু হয়েছে, তা' দেখে মনে আমার স্বভাবতই আশঙ্কা জাগে, এখানকার রাজনীতিও বোধ হয় পাকিস্তানের পথ অনুসরণ করেই চলছে। জানি না, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভাগ্যে কী ফল লেখা আছে!

বগুড়ার মহম্মদ আলি সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী অবস্থায় একদা যে ফজলুল হক সাহেবকে 'দেশদ্রোহী', 'রাষ্ট্রদ্রোহী' প্রভৃতি আখ্যায় জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ফজলুল হক সাহেবই কিন্তু একই মুসলিম লীগ সরকারের আর এক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলি সাহেবের মন্ত্রিসভায় পাকিস্তান-রাষ্ট্রের একেবারে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী (!) হয়েই করাচিতে গেলেন। 'রাষ্ট্রদ্রোহীর' হাতেই রাষ্ট্রকে রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্বভার অর্পিত হল। এ এক বিচিত্র রাজনীতি! একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে অবশ্য অনেক দেশেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে, অতীতের সরকারের কাছে যিনি ছিলেন 'রাষ্ট্রদ্রোহী', তিনিই হয়েছেন রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা—প্রধানমন্ত্রী কিন্তু পাকিস্তানে তো তা' সেদিন হয় নি। দেশ-শাসনের মালিক যে মুসলিম লীগ 'সরকারের'ই এক প্রধানমন্ত্রী যাকে ঘোষণা করলেন 'দেশদ্রোহী' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহী', সেই মুসলিম লীগ সরকারেরই আর এক প্রধানমন্ত্রী তাঁকেই করলেন 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী'। পাকিস্তানে রাজনীতির যে বিচিত্র খেলা দেখেছি, ভারতেও যে সেই বিচিত্র খেলারই কিছু কিঞ্চিৎ না-চলছে, তা' মনে হয় না।

কাশ্মীরের এককালের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা সাহেবের প্রশংসায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজীকে দেখেছি অতি মুখর হতে, শেখ সাহেবের প্রশংসায় সারা ভারতকে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেও দেখেছি; আবার এও দেখেছি যে সেই শেখ সাহেবই রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বন্দী-জীবন যাপন করছেন, বছরের পর বছর ধরে। তার চেয়েও বিচিত্র ব্যাপার দেখলেম যেদিন, সেই শেখ সাহেবই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজীর মহামান্য অতিথিরূপে কয়েকদিন থাকার জন্য দিল্লীর বিমান-বন্দরে এসে বিমান থেকে নামলেন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের একজন অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীই গিয়ে সেদিন প্রথম অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানালেন, প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজীর পক্ষ থেকে শেখ সাহেবকে? তার পরে আবারও শেখ সাহেব বন্দী হয়েছেন, রাষ্ট্রদ্রোহেরই অভিযোগে আজ পর্যন্তও তিনি বন্দী হয়ে আছেন। শোনা যাচ্ছে, আবারও তিনি সত্বরই মুক্তি পেয়ে পাক-ভারত সৌহার্দ্য সৃষ্টির মহান্ দেশসেবকের ভূমিকায় নামবেন। সংবাদটি যদি সত্য হয়, তাহলে সেটা যে একটা সুখবর সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, শেখ সাহেব দেশসেবক না দেশদ্রোহী! কোন্টা সত্যি? যদি সত্যি সত্যিই তিনি দেশদ্রোহীই হন, তাহলে তাঁকে সেইভাবেই রাখতে হয়। সম্প্রতি ভারত-সরকারের কথায় জানা গিয়েছে যে বর্তমানে শেখ সাহেবকে বন্দী করে রাখার ফলে, ভারত-সরকারের মাসিক খরচ হচ্ছে, ষোল হাজার টাকা। ভারত সরকারের কোনও মাননীয় মন্ত্রীর জন্যও কি এত টাকা খরচ হয়? যদি কেউ সত্যি সত্যিই দেশদ্রোহী হন, সেখানে ব্যক্ত বা ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন মোটেই আসে না—আসা উচিত নয়। ব্যক্তির চেয়ে দেশ অবশ্যই বড়। সেই দেশেরই যিনি শত্রুতা করেন। তাঁর অতীতের পদ-গৌরব যতই বড় হোক না কেন, ন্যায়-নীতি ও আইনের দৃষ্টিতে তাঁর এক 'কানা কড়ি'ও মূল্য থাকে না—থাকা উচিত নয়। পাকিস্তান কিন্তু সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেন। জনাব ফজলুল হকের মত সর্বজনমান্য একজন বর্ষীয়ান নেতাকেও যখন "দেশদ্রোহী" বলে পাক-সরকার ঘোষণা করেছিলেন, তখন তাঁর প্রতি কোনও সম্মান তো দেখানই নি, পরন্তু তাঁর জন্য বিশেষ কোন খরচও সরকারী তহবিল থেকে করেছেন বলেও আমার জানা নেই। ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্র-পরিচালনার নীতির পার্থক্যই এখানে। তা'তে ভারতের পক্ষে ফল কী দেখা যায়? দেখা যায়, জন-মনে একটা প্রকাণ্ড

রাজনীতিক বিভ্রান্তি। এইটা দেখা দিয়েছে বলেই আজ ভারতের বহু সংখ্যক নাগরিক, রাজনীতিক নেতারা এবং এমন কি বহু সংখ্যক সংসদ সদস্যরাও একযোগে দাবি জানাচ্ছেন, শেখ সাহেবের মুক্তির জন্য। শেখ সাহেব সম্পর্কে ভারত-সরকারের এই "বিড়াল-ইঁদুর" নীতিই তার জন্য দায়ী। আজ অনেকের মনেই এই সন্দেহ জেগেছে যে, সত্যিই শেখ সাহেব দেশদ্রোহী কি না! না, তিনি রাজনীতিক নেতাদের ক্ষমতালাভের শিকার হয়েছেন? জন মনে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, রাজনীতিক দিক থেকে অবিবেচনার কাজ কি না, দেশবাসীর ও নেতাদের তা' ভেবে দেখা উচিত। পাক-ভারতের রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি বহুক্ষেত্রেই এক পথ ধরেই চলছে দেখতে পাচ্ছি; তবে, তার রূপায়ণের পদ্ধতিতে কোথাও কোথাও কিছুটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। পদ্ধতিগত যে পার্থক্য দেখা যায়, তা ভারতের পক্ষে ভাল করছে না মন্দ করছে, সে বিচার করবেন ভাবীকালের ঐতিহাসিকরা। আমি কেবল আমার মনের সংশয় ও সন্দেহের কথাই তুলে ধরছি।

যাক, জনাব ফজলুল হক সাহেব বন্দী-দশা থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে গেলেন রাজধানী করাচিতে এবং তাঁর ও তাঁর দল—কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যে আবু হোসেন সরকার সাহেব ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতে, তিনিই আবার হক সাহেবের ও তাঁর দলের প্রতিনিধি হিসাবেই পূর্ব পাকিস্তানে এসে দলীয় নেতা রূপে মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

জনাব আবুহোসেন সরকার সাহেব ঢাকায় এসে তাঁর মন্ত্রিসভা গড়লেন। তাতে সুরাবর্দী-ভাসানি সাহেবের আওয়ামি লীগের কোনও প্রতিনিধিই থাকলেন না। কেন যে তাঁরা থাকলেন না, তার সঠিক কারণ আমি জানি না। জনাব ফজলুল হক সাহেবের দলের প্রতিনিধি হিসাবে জনাব আবুহোসেন সরকার সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় 'কৃষক-শ্রমিক' দলের প্রাধান্য বেড়ে গেল বলেই 'আওয়ামি লীগের' কোনও প্রতিনিধি দলীয় কারণে সেই মন্ত্রিসভাতে বিদ্বেষ বা অভিমানবশেই যোগ দিলেন না, না 'কৃষক-শ্রমিক' দলই দলীয় শত্রুতাবশে আওয়ামি লীগের কোনও প্রতিনিধিকে—মন্ত্রিসভায় নিলেন না, তা' আমাদের পক্ষে জানা সম্ভবপরও নয়—আমিও জানি না; তবে এইটুকু জানি যে হক সাহেব যখন তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভা গড়েছিলেন, তখনই একবার হক সাহেবের সাথে ভাসানি-সুরাবর্দী সাহেবের প্রথম মন-কষাকষি দেখা দিয়েছিল, যার ফলে হক সাহেবকে আওয়ামি লীগ দলকে বাদ

দিয়েই তাঁকে কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর ৪-সদস্যের মন্ত্রিসভা চালিয়ে যেতে হয়েছিল। পরে অবশ্য তাঁদের উভয় দলের মিলন হয়ে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল কিন্তু সেই মন্ত্রিসভা, মাত্র কয়েকদিন কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'যুক্তফ্রন্ট' দলের মধ্যে এই মনোমালিন্য ও মন-কষাকষির পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাদের মধ্যে তখন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উচ্ছেদ করার জোর ষড়যন্ত্র চলছিল। আমার মনে হয় যুক্তফ্রন্ট দলের মধ্যকার গৃহ-বিবাদই মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই ষড়যন্ত্রকে—পরবর্তীকালে পরিপূর্ণভাবে সফল করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিল। আজ ১৯৬৭ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার, বনাম পশ্চিম বঙ্গের 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারের মধ্যেকার সম্পর্ক দেখে আমার পাকিস্তানের সেই অতীত দিনের কথাই মনে পড়ে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ ভেবে আমি বেশ কিছুটা আতঙ্কিত হই। এটা আমার মনের অ-মূলক আশংকা কি না, দেশবাসী সকলে পাকিস্তানের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোর ঘটনাবলী জেনে ভাল করে একবার বিবেচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা ভাবীকালের জন্য একটা সুপথের সন্ধান পেতে পারবেন, সেই আশাতেই পাকিস্তানের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো এখানে জনসমক্ষে তুলে ধরছি।

যাক, হক সাহেবের প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কালেও দলীয় মন-কষাকষি থাকলেও 'যুক্তফ্রন্ট' যুক্তই ছিল কিন্তু আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার কালেই যুক্তফ্রন্ট একেবারে বিযুক্ত হয়ে গেল। সুরাবর্দী-ভাসানি সাহেবের আওয়ামি লীগ দল সরকার বিরোধী দলের ভূমিকায় নেমে বিরোধী দলের আসন নিলেন।

আবুহোসেন সরকার সাহেব, যে মন্ত্রিসভা গড়েন, তা'তে প্রথম কিছুদিন পর্যন্ত কোনও হিন্দু-সদস্য ছিল না, তবু কিন্তু আমরা—অতীতেও স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেসীরা—সরকার সাহেবের সমর্থক দলেই ছিলেম। আবুহোসেন সরকার সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় সম্ভবত আমরা সকলেই খুব খুশিই হয়েছিলেম। "সম্ভবত" কথাটা এখানে উল্লেখ করছি এই জন্যই যে আমি তো সকলের মনোভাব জানি না; আমার নিজের মনোভাব ও কংগ্রেসের অতীত আদর্শের কথা মনে করেই আমি কংগ্রেসী সকলের কথাই এখানে বলেছি। সংগ্রামী কংগ্রেসের আদর্শই ছিল ভারতবর্ষের

জাতীয়তাবাদ। সেখানে কে কোন্ ধর্মী—কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে পার্শি, কে খৃষ্টান—সেটা কংগ্রেসীদের কাছে মোটেই ধর্তব্য বা বিচার্য ছিল না। হিন্দু প্রধান স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বাধিনায়ক প্রধান কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেবকে করতেও মহাত্মা গান্ধীর আপত্তি তো ছিলই না, তিনি একবার সে প্রস্তাবও জিন্নাহ সাহেবের কাছেই করেছিলেনও। তার আগে 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের জন্য 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে যে একটা সাম্প্রদায়িক চুক্তি করেছিলেন, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সবগুলো আসনই যদি জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাই পান, তাতেও তার অসন্তুষ্টি বা আপত্তি একটুও নেই—কখন হবে না। এই-ই ছিল সেকালের কংগ্রেসের আদর্শ এবং আমরা সকলেই সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করেছি। এই তো গেল কংগ্রেসীদের সকলের সম্পর্কের কথা কিন্তু এই কংগ্রেসী দলেই অতীতের বিপ্লবী দলেরও বহু নেতা ও কর্মী ছিলেন। তাঁদের তো জীবনটাই গড়ে উঠেছিল সেই আদর্শের মধ্য দিয়ে; কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকায় নামার বহুকাল আগে থেকেই। পূর্ব পাকিস্তানের বিধান পরিষদের তৎকালীন সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অতীতের বিপ্লবী দলের সদস্য; সুতরাং তঁাদের সকলের পক্ষ থেকে যদি তাঁদের মত সম্পর্কে সঠিক কিছু না জেনেও বলি যে কোনও হিন্দু-সদস্য আবুহোসেন সরকার সাহেবের মন্ত্রিসভায় তখন পর্যন্ত না থাকলেও আমরা কেউই তার জন্য বিশেষ ক্ষুব্ধ হই নি, তাহলে বোধ হয় খুব অন্যায় আমি করি নি। অ-মুসলমান সদস্যদের মধ্যে অনেক অ-কংগ্রেসী তপশিলী সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের মধ্যেও একটা জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে এই আশা করেই আমি অ-মুসলমান সদস্য সকলের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমার আশার ও আশঙ্কার কথা ধরে নিয়েই আমি "সম্ভবত" কথাটা ব্যবহার করেছি। বিশেষ জোরের সাথে বলতে না পারলেও অনুমানের ওপর নির্ভর করেই সকলের সম্পর্কেই বলেছি। আমার অনুমান বোধ হয় একেবারে মিথ্যেও নয়, কারণ অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ-ই তখনও সরকার সাহেবের মন্ত্রিসভার বিরোধী হন নি—সকলেই তখনও সরকার সাহেবের সমর্থকই ছিলেন।

এইবার আমার নিজের মনের কথা বলি। আবুহোসেন সরকা

সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত খুশিই হয়েছিলেম। কেন যে হয়েছিলেম সে কথা অপরকে বোঝাতে হলে আবুহোসেন সাহেবের জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে আমি যা শুনেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে যেমনটি দেখেছি ও তাঁর সম্পর্কে যতটা জেনেছি, সেই চিত্রটাও সকলের সামনে তুলে ধরা দরকার মনে করি।

আবুহোসেন সরকার সাহেবের বাড়ি হচ্ছে রংপুর জেলার গাইবান্ধার মহকুমা শহরে। সেই শহরেরই প্রবীণ বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনেছি যে সরকার সাহেব নাকি ছোটবেলায় অত্যন্ত "ডানপিটে" ছেলে ছিলেন। সরকার সাহেবের নিজমুখ থেকে আরও শুনেছি যে তিনি নাকি এককালে কোনও একটি বিপ্লবী দলের গুপ্ত সমিতিরও সদস্য ছিলেন এবং ঐ দলের নির্দেশিত কোনও একটি দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়ে বন্দুকের গুলীতে আহতও হয়েছিলেন এবং সেজন্য বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তাঁকে আত্মগোপন করেও থাকতে হয়েছিল। আমি নিজেও ছিলেম উত্তরবঙ্গের একজন অতি-পুরাতন বিপ্লবী এবং 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র সদস্য। সরকার সাহেব কোনও বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত ছিলেন কিনা, তা আমি ব্যক্তিগত ভাবে না জানলেও তাঁর কথা আমি অবিশ্বাস করি নি। বিপ্লবী দলগুলোর সাথে যে কিছু কিছু মুসলমান যুবকরাও সংযুক্ত ছিলেন, তা আমি জানি। বগুড়ার জনাব আব্দুল কাদের সাহেব (হিলি স্টেশন লুণ্ঠন মামলার একজন ভূতপূর্ব কয়েদী) অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। মৈমনসিংহের জনাব গিয়াসুদ্দিন আহমেদ সাহেবও (পরে তিনি আবুহোসেন সরকার সাহেবের মন্ত্রিসভারও সদস্য ছিলেন) নাকি প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের (বর্তমানে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে একজন 'এম-পি' এবং কংগ্রেস সংসদ দলের একজন 'ডেপুটি লীডার') দলের সাথেও যুক্ত ছিলেন এবং তাঁরই দলের পক্ষ থেকেই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য হয়েছিলেন। আবুহোসেন সরকার সাহেবও মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগ্রামী রূপ নিলে ১৯২১ সাল থেকেই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। সরকার সাহেবের সাথে আমার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে সেই সময় থেকেই পরিচয়। সেই সময় থেকে তাঁকে যতটা জেনেছি, তাতে তাঁর কথা আমি অবিশ্বাসও করি না। দেশ বিভাগের তথা 'পাকিস্তান'

সৃষ্টির পরেও তিনি যেভাবে মুসলিম লীগের এবং তার শ্রেষ্ঠ নেতা জনাব জিন্নাহ্ সাহেবের বিরোধিতা করে যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে অপমান ও লাঞ্ছনা বরণ করে নিয়েছেন, তাতে তাঁর কথায় অবিশ্বাস করার মত কিছু আমি খুঁজে পাই নি। দুই-একজন বিপ্লবী দলেরই বন্ধু বলেছেন যে সরকার সাহেবের ঐ সব গল্প-কথা! আমি কিন্তু সেই মতের সমর্থক নই; 'নই' যে তার কারণ, আমি জানি 'ডানপিটে' ছেলেরাই হন জীবনে বে-পরোয়া: আর জীবনে বে-পরোয়া না হলে কেউ 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে স্বাধীনতা সংগ্রামে পা বাড়ান না। আবুহোসেন সরকার সাহেব যে একটি 'ডানপিটে' ছেলে ছিলেন, সেকথা সেই বিপ্লবী বন্ধুরাও বলেছেন।

যাক, আবুহোসেন সরকার সাহেব কোনদিন বিপ্লবী দলে ছিলেন কি-না বা ঐ দলের কোন কাজে গিয়ে তিনি আহত হয়েছিলেন কি-না, সে প্রশ্নের মধ্যে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে চাই না; কারণ, তার প্রামাণ্য মীমাংসার সূত্র আমার হাতে নেই; তা জানারও সুযোগ আমার পক্ষে হয়নি; সুতরাং ঐ প্রশ্নকে অমীমাংসিত অবস্থায় রেখেই আমি তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ও চরিত্রের দৃঢ়তা যেমন দেখেছি ও জেনেছি তাতে আমি অকপটে স্বীকার করি যে তাঁর ওপর আমার একটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মনোভাব আগে থেকেই ছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আরও যতই জেনেছি, ততই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েই গিয়েছে। 'কংগ্রেস' কর্তৃক স্বাধীনতার সংগ্রাম চলাকালে তাঁকে দেখেছি তিনি ছিলেন রংপুর জেলার একজন অন্যতম জাতীয়তাবাদী শ্রেষ্ঠ নেতারূপে।

জাতীয়তাবাদের কথা এখানে কথা-প্রসঙ্গে এসে পড়ায় একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও, আমার মনের চিন্তাধারার একটা কথা এখানে তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। আজ ভারতে এসে দেখছি কংগ্রেসের নেতারা এবং ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ খুব সঙ্গত কারণেই সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ওপর খুব জোর দিচ্ছেন। মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেসের সকল নেতাই তো হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতি বরাবরই অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। কর্মীরাও বাদ যান নি। আমার মনে পড়ে, কংগ্রেসের সংগ্রামের প্রথম

থেকেই আমরাও কোন শোভাযাত্রায় বের হলেই যখনই বলতেম, 'বন্দেমাতরম' তখনই সাথে সাথেই বলতেম, 'আল্লা-হো-আকবর'; যখনই বলতেম, 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়', পরমুহূর্তেই সাথে সাথেই বলতেম 'মৌলানা মহম্মদ আলি কি জয়, মৌলানা সৌকত আলি কি জয়'! তবু কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয় নি; আর হয় নি বলেই অখণ্ড ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ খণ্ডিত ও নিহত হয়েছে, দেশ বিভক্ত হয়ে দুইটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে! কেন এমনটি হল? এই প্রশ্নটি আমার মনে, শুধু আমার মনেই নয়—আমার মত জাতীয়তাবাদী অনেকের মনেই বারবার জেগেছে। আজও জাগছে। আমি আত্মানুসন্ধান করেও জানতে চেষ্টা করেছি কোথায় আমাদের গলদ, যেজন্য হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য আজও হতে পারছে না! আমার মনে আমি প্রশ্ন করেছি, আমি একজন হিন্দু হিসাবে নিজেকে চিন্তা করে মুসলমানকে ঘৃণা করি কি? বা তার উপর কি বিদ্বেষ পোষণ করি? বিবেক যে উত্তর দিয়েছে, তাতে কিন্তু আমার মনের ঘৃণা বা বিদ্বেষের সমর্থন পাই নি। পূর্ববঙ্গের মুসলমানের মধ্যে আবুহোসেন সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের মধ্যে এই বহরমপুর শহরেই রেজাউল করিম সাহেবকে এবং এককালের সর্বভারতীয় নেতা খান আব্দুল গফুর খানকে ও তাঁর ভাই ডাঃ খান সাহেবকে আমি তো সারা অন্তর দিয়েই শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি ও ভালবাসি! তাঁরা ধর্মে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কাউকেই তো নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও সহকর্মী ছাড়া আজও অন্য কিছু ভাবতে পারি না! সুতরাং আমার মনে হয়েছে, মুসলমান বলেই জাতীয়তাবাদী হিন্দুর মনে—মুসলমান বিদ্বেষ নাই—থাকতে পারে না। তবে এর কারণ কি? কারণ সম্পর্কে আর একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের উক্তি এখানে তুলে ধরছি। ১৯২১ সালে মৌলভি লিয়াকত হোসেন সাহেব গিয়েছেন রাজসাহী শহরে, কোথায় বন্যা বা দুর্ভিক্ষ কিছু একটা হয়েছে তার জন্য চাঁদা তুলতে। ফেরার সময় তিনি ও আমি কলকাতার পথে রাজসাহী থেকে লালগোলা ঘাট পর্যন্ত স্টীমারে আসি। স্টীমারে অনেক কথাই তাঁর সাথে হয়। তার মধ্যে কথা-প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেন,—"আপলোকন কো ই ক্যায়া বাৎ হ্যায়? 'বন্দেমাতরম' ফুকারনে-সে 'আল্লা-হো আকবর' আপলোক ফুকারতে হেঁ, ফিন, গান্ধী কি জয় ফুকারনেসে মৌলানা মহম্মদ আলি, মৌলানা সৌকত আলি কি জয় ফুকারতে হেঁ! আপলোক জানতে হেঁ, মৌলানা মহম্মদ আলি,

মৌলানা সৌকত আলি কোন হ্যায়? ইন লোক তো "কমরেড" (সংবাদপত্র) ওয়ালা হ্যায়। ইন লোক অ্যান্টি স্বদেশী থে, ফিন 'অ্যান্টি স্বদেশী' হো যায়েঙ্গে। সিপায় 'বন্দেমাতরম' দুসরা কোই বাৎ নেহি হ্যায়—কিসিকা জয় ভি নেহি হ্যায়।" এই ছিল, লিয়াকত হোসেন সাহেবের সেদিনের কথা। সেই কথা যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মতই পরে ফলে গিয়েছিল। মৌলানা মহম্মদ আলি সাহেবই কংগ্রেসে থাকতেই একদিন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি 'সর্বপ্রথমে একজন মুসলমান, তারপরে তিনি ভারতবাসী'! এটাই কি জাতীয়তাবাদের কথা! এই মনোভাবের দরুণই আলি-ভ্রাতৃদ্বয়, পরে জাতীয়তাবাদী 'কংগ্রেস' একেবারে ত্যাগ করে দেশের সংহতি ধ্বংসকারী 'মুসলিম লীগে' যোগ দিয়েছিলেন। মুসলমানের মধ্যে অধিক সংখ্যকেরই ঐ মনোভাব ছিল বলেই দেশ-বিভাগ হয়েছে। আজও যে সব মুসলমানেরই মন থেকে ঐ ভাব সম্পূর্ণভাবে দূর হয়েছে, তা অবস্থা পর্যালোচনা করে আমার মনে হয় না। 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠানও তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে সেই মনোভাবকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলছেন। নির্বাচনে কংগ্রেস মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে মুসলমানকেই দাঁড় করান; আর জাতীয়তাবাদী (!) কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যরাও হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে নির্বাচনে দাঁড়াতে চান না! জনাব হুমায়ুন কবির সাহেবকে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস থেকে বহরমপুর শহরের নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়াতে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি এখান থেকে না দাঁড়িয়ে ২৪ পরগণা জেলার একটি মুসলমান কেন্দ্রই ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে বেছে নিয়েছিলেন! ভারতে যৌথ নির্বাচন-প্রথা চালু হওয়া সত্ত্বেও এই মনোভাব আজও জাতীয়তাবাদী সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-এর মধ্যে আছে বলেই হিন্দুরা ভাবেন হিন্দু হিসাবেই এবং মুসলমানও ভাবেন মুসলমান হিসাবেই। 'কংগ্রেস' তার এই নীতি বদল না করে যদি হাজারবার চীৎকার করেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তাহলেও যে সেই সম্প্রীতি গড়ে উঠবে, তা আমার মনে হয় না।

জাতীয়তাবাদী আবুহোসেন সরকারের মধ্যে আমি আমার মনের প্রতিচ্ছবিই দেখেছি; তাই তাকে আমি শ্রদ্ধা করেছি ভালবেসেছি। আমার মনের প্রতিধ্বনি যে তাঁর মধ্যে শুনেছি। তার আরও দুই একটি ঘটনার কথা বলছি।

দেশ-বিভাগের তথা পাকিস্তান সৃষ্টির পরে আবুহোসেন সরকার সাহেব

রংপুর জেলাবোর্ডের 'চেয়ারম্যান' ছিলেন। রংপুর 'বারের' তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলও ছিলেন। সেই অবস্থায় একদিন 'বার-লাইব্রেরী'তে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নাকি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান ও তার শ্রেষ্ঠ নেতা—জনাব জিন্নাহ সাহেবের সম্পর্কে এক অশিষ্ট (!) উক্তি করেন এবং ফলে, তাঁকে মুসলিম লীগ সরকার ঐ 'বার-লাইব্রেরী' ঘরেই গ্রেপ্তার করে তাঁর কোমরে দড়ি ও হাতে 'হাতকড়া' দিয়ে বেঁধে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হাঁটিয়ে জেলখানায় নিয়ে যান। এই ঘটনার কথা সেদিনের সংবাদপত্রেও বের হয়েছিল। সকলেই দেখেছিলেম। আমিও দেখেছিলেম। আবুহোসেনের স্পষ্টবাদিতার সেই দুঃসাহসের জন্য আমি অন্তরে গর্ববোধও করেছিলেম। সেদিনে তাঁর উপরে আমার যে শ্রদ্ধা আগেও ছিল, তা আরও বেড়ে গিয়েছিল। আমি ছিলেম, একজন জাতীয়তাবাদী অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী; আজ দেশ-বিভাগের পরে যে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের দুরভিসন্ধির ফলে, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ নিহত হয়েছে এবং আমার জন্মভূমি আমার স্বদেশ, আজ আমার কাছে 'বিদেশ' হয়েছে—এত কাছাকাছি আজ বাস করেও (পদ্মা নদীর একপারে মুর্শিদাবাদ জেলায় থাকি আমি, আর তার অপর পারেই আমার জন্মভূমি, আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের বহু স্মৃতিজড়িত রাজসাহী) আমার কাছ থেকে বহু দূরে সরে গেল! সেই জাতীয়তা-বিরোধী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানকে এবং তার সমর্থকদের আমি আমার অন্তর দিয়ে কোনদিনই শ্রদ্ধা করতে পারি নি—আজও পারি না। একথা আমি অকপটে স্বীকার করি যে আমার মনের ক্ষোভই এইখানে। একে যদি কেউ বিদ্বেষ বলতে চান, তা-ও বলতে পারেন। তাতেও আমার দুঃখ বা আপত্তি নেই।

আমার এই মনোভাবের মত মনোভাবাপন্ন আরও বহু লোক আছেন—বিশেষত পূর্ববঙ্গবাসী ভুক্তভোগিগণ যাঁদের বুকে দেশ ভাগের ব্যথা অহরহ একটা কাঁটার মত বিঁধছে। আমার মনে হয়, এখনও ভারতে এক শ্রেণীর এমন মুসলমান আছেন যাঁরা মরহুম্ মৌলানা মহম্মদ আলির মতই মনে করেন যে তাঁরা ভারতবাসী হয়েও 'সর্বপ্রথমে মুসলমান, তারপরে ভারতবাসী!' এই মনোভাব থাকলে তা খণ্ডিত ভারতেরও স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক কি-না, সে-বিষয়ে আমি ভারতবাসী মুসলমান সম্প্রদায়কে ভালভাবে আর একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আমার মনে হয়, ভারতের মুসলমান সমাজের নেতৃবর্গ যদি তাঁদের সমাজকে ভারতীয়

জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করানোর প্রেরণা দিতে পারেন, তাহলে সাম্প্রদায়িক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। এখন পর্যন্ত অনেক মুসলমান নেতাই যদিও রাজনীতিক দলে— বিশেষ করে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলে যোগ দিয়েছেন, তবু মনে হয় তাঁরা যেন আত্মরক্ষার জন্যই রাজনীতিক ঐ দলের সদস্য হয়েছেন; ফলে তাঁরা পরোক্ষভাবেই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যদি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে নেমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও অখণ্ডতাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়ে আসেন, তাহলে আমার বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশই লোপ পাবে; অন্যথায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য হাজার চীৎকারেও বিশেষ ফল হবে বলে আমি মনে করতে পারছি না। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও যদি সত্যিই সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, তাহলে যৌথ-নির্বাচন প্রথার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথেই তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে এবং বর্তমান নীতিও বদলাতে হবে।

রাজনীতিক জীবনে আমার এই চিন্তাধারার সাথে আবু হোসেন সরকার সাহেবের চিন্তাধারার হুবহু মিল আমি দেখেছি। এইবার তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। সেই ছবিটা তুলে ধরলেই সকলে বুঝবেন তাঁর চরিত্র কোন্ ধাতু দিয়ে গড়া এবং কেন আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি।

সরকার সাহেবের পারিবারিক জীবন যে কোথায়ও একটা দুঃখ ও বিষাদের কাঁটা বিঁধে ছিল তা তাঁর চাল-চলন ও ব্যবহারে বাইরের কোনও লোকের পক্ষে তো বোঝার বা জানার সম্ভাবনাই ছিল না। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও অনেকেই বোধ হয় জানেন না। আমিও জানতেম না। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তাঁকে সর্বদাই দেখেছি হাস্যোজ্জল ও আনন্দোচ্ছল। গল্পে তিনি একাই সকলকে জমিয়ে রেখেছেন, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিদের কবিতা কথায় কথায় আওড়ান, মজলিশি মানুষ আবুহোসেন একাই মজলিশকে প্রাণবন্ত করে রাখেন। সেই আবু হোসেন সরকারের মনে যে কোথাও দুঃখ বা বেদনার লেশমাত্রও থাকতে পারে তা কারোরই বোঝার সাধ্য নেই। আমিও কোনদিনই বুঝতে পারি নি। অবশেষে হঠাৎই একদিন আমার পক্ষে সরকার সাহেবের সেই বেদনার কথাটা সম্যক জানার ও বোঝার সুযোগ আসে। সরকার সাহেব তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। শীতকাল

সন্ধ্যার পরে আমি একদিন ঢাকায় তাঁর সরকারী ভবনে গিয়েছি দেখা করতে। সরকার সাহেব তখন তাঁর উপরের শোয়ার ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। খবর পাঠাতেই আমাকে তাঁর সেই ঘরেই নিয়ে যাওয়া হয়। সরকার সাহেব খাটে শুয়েছিলেন। আমি খাটের পাশেই একটি চেয়ারে বসি। দু'জনে কথাবার্তা বলছি। এমন সময় ঘরে ঢোকেন সরকার সাহেবের স্ত্রী এবং ঢুকেই সরকার সাহেবের খাটে শুয়ে পড়েন। সরকার সাহেব তখনই অতি যত্নের সাথেই পায়ের তলার দিক থেকে গোটান লেপটা তুলে তাঁর স্ত্রীর গায়ে দিয়ে দেন এবং আমাকে বলেন,—"এই আমার স্ত্রী। আপনি যে একজন অপরিচিত বাইরের লোক এখানে বসে আছেন, সে-জ্ঞান ওর একটুও নেই। কোনও বিষয়েই ওর বাহ্যজ্ঞান একদমই নেই। এই তো কিছুদিন আগে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল—কত লোকজন এলেন—কত ধুমধাম হল। ও কিন্তু কিছু জানে না। কারো সাথে কোন কথাও বলে না। খাওয়া-দাওয়ার ও বাহে-প্রস্রাবেরও কোন তাগিদ বা জ্ঞান নেই। সকালে উঠে আমাকে বা আমি না থাকলে ছেলেমেয়েদের কাউকে পায়খানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিতে হয়। পায়খানা করার সময়টা ঠিক থাকে বলে তা সম্ভব হয় কিন্তু প্রস্রাবের বেলায় তো তা সম্ভবপর হয় না। যেখানে বসে থাকে সেখানে প্রস্রাব করে এবং হয় আমাকেই বা ছেলেমেয়েদের কাউকে কাপড় ছাড়িয়ে আবার সব ঠিক করে দিতে হয়। অন্য আর কোনও রকমেই কাউকে জ্বালাতন করে না—নিজের মনে নিজেই এক জায়গায় সারাদিন চুপ করে বসে থাকে। খেতে দিলে খায়, না দিলেও খাওয়ার কোন 'তাগিদ' দেয় না। বাহ্যজ্ঞান একদমই নেই। আজ আঠার বছর ধরে এই পাগলিকে নিয়ে চলেছি। কত রকম চিকিৎসা করিয়েছি, কত টাকা খরচ করেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় নি। ওর কোনও জ্ঞানই নেই, কেবলমাত্র এক বিষয়ে ওর ঠিক জ্ঞান আছে যে আমার খাটে আমার পাশে এসে ও শোবে। সারারাত ধরে এটা বোঝারও উপায় নেই যে একটা জীবিত লোক আমার পাশেই শুয়ে আছে। সেটা বুঝি তখনই, যখন অসাড়েই ও বিছানায় মূত্রত্যাগ করে ফেলে এবং বিছানা ভিজে উঠে আমার পিঠের তলাও ভিজিয়ে দেয়। শীতের রাতে তখনই একটু কষ্ট হয়। এই অবস্থার মধ্যেই আমি সংসার করে চলেছি, এই আঠারো বছর ধরে।"

সরকার সাহেবের কথা শুনে তাঁর অসীম ধৈর্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই এবং বলি—"আপনাদের তো চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা 'ফরজ'। আবার বিয়ে

করলেই তো পারতেন।" তার উত্তরে তিনি বলেন—"প্রভাসবাবু যখন বিয়ে করেছিলেম, তখন তো ভাল দেখেই বিয়ে করেছিলেম। লেখাপড়াও জানে। ম্যাট্রিক পাশ। এক সাথেই দু'জনেই কংগ্রেসও করতেম। কত সভাতেই না দু'জনেই বক্তৃতাও করেছি। এতগুলো ছেলেমেয়ে হওয়ার পর এখন এই বৃদ্ধকালে ওকে ফেলি কোথায়, ও কি করে? ওকে এই অবস্থায় দূরে সরিয়ে দিলে 'আল্লাহ'র বিচারে কি আমি 'বেইমান' হব না! এই পাগল অবস্থায়ও দেখছি ওর জীবনে একটামাত্রই বোধ হয় সুখের ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা আছে এবং তা হচ্ছে আমার কাছে থাকা। সেই শান্তিটুকুও ওর কাছ থেকে কেড়ে নিই কি করে? পাগল হওয়ার আগে পর্যন্ত যে তার দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে আমার সেবা করে এসেছে, আজ তার অসুখের সময় তাকে আমি পরিত্যাগ করি কেমন করে? ধর্মে কি তা সইবে?"

সরকার সাহেবের কথা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ ও বিমূঢ় হয়ে পড়ি। ভাবি,—পারিবারিক জীবনে আপনি মহৎ—অতি মহৎ। জানি না আর কোনও লোকই—তিনি মুসলমানই হোন বা হিন্দুই হোন—এইরূপ অবস্থায় এত মহত্ত্ব দেখাতে পারতেন কি না! তঁার রাজনীতিক জীবনেও এই মহত্ত্বই তঁার মধ্যে দেখেছি দেশ-বিভাগের পরে মুসলিম লীগের আমলে তিনি যে 'জেলে' গিয়েছিলেন, সেই 'জেল' থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে তিনি কোনও সদস্যপদ প্রার্থীও নিজে থেকে হন নি; যুক্তফ্রণ্টের তিন প্রধান—হক্-ভাসানি-সুরাবর্দী সাহেবেরাই—তঁাকে বহু অনুরোধ-উপরোধ করে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিলেন। আমি জানি, সদস্যপদ বা মন্ত্রিত্বের গৌরবপ্রাপ্তির আশায় তিনি পদের পেছনে ছোটেন নি বা কারো কাছে কোনও 'উমেদারি'-ও করেন নি—পদগৌরবই তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁর ঘাড়ে চেপে বসেছিল।

এহেন লোক ছিলেন আবুহোসেন সরকার সাহেব। তাঁর মধ্যে আমি আর একটি জিনিসও আমার মনের মতই দেখেছিলেম। আমি দেখেছিলেম তাঁর ভেতরে ধর্মের কোনও গোঁড়ামি ছিল না কিন্তু তাই বলে তিনি অধার্মিক বা নীতিভ্রষ্টও ছিলেন না। মুসলিম লীগের আমলে তখন দেখেছি রোজার মাসে দিনের বেলায় কোনও হিন্দুর পক্ষেই প্রকাশ্যভাবে রাস্তায় বিড়ি-সিগারেট খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল এবং হিন্দুর খাওয়ার দোকানগুলোর বা

হোটেলগুলোর কাজ চালাতে হত পর্দার আড়াল দিয়ে! মুসলমানগণ খাবার দেখে যাতে প্রলুব্ধ না হয় তারই জন্ম ঐ ব্যবস্থা! এই অবস্থার পরে সরকার সাহেবের আমলে দেখলেম তিনি নিজেই রোজার মাসে প্রকাশ্যভাবেই সচিবালয়ে বসে পান চিবুচ্ছেন! সুতরাং হিন্দুর পক্ষেও আর কোনও বাধাই ছিল না। এই জন্যই অনেক গোঁড়া মুসলমানরা তাঁকে "কাফের" আখ্যা দিতেন। আমি দেখে'ছি রাজসাহীর উকিল-'বারে' অনেক প্রবীণ মুসলমান উকিলকেই হিন্দু সদস্যদের ঘরে গিয়ে ধূমপান করতে এবং তাঁরাই আবার সেখান থেকে নিজেদের ঘরে ফিরে এসে এমন ভাব দেখাতেন যে তাঁরা যেন 'রোজা' করেই আছেন! ধর্মের এই ভণ্ডামি আমি আবুহোসেনের মধ্যে দেখি নি। তাঁর ভেতর ও বা'হির এক রকমই ছিল। সেখানে কোনও লুকোচুরি ছিল না। আমার কাছে, এই জিনিসটাও বেশ ভাল লাগত। এইসব নানাদিক ভেবেই আমি সরকার সাহেবকে পছন্দ করতেম, শ্রদ্ধা করতেম এবং ভালও বাসতেম। সেইজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়াতে আমি খুশিই হয়েছিলেম। তিনি উত্তরবঙ্গের (রাজশাহী বিভাগের) লোক বলেও বোধ হয় তাঁর উপর আমার কিছু আকর্ষণ ছিল। বাংলার ইতিহাসে উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গ থেকে তিনিই পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। সেটাও আমার কাছে কিছুটা যে আনন্দদায়ক হয়েছিল, তা অস্বীকার করতে পারি না। উত্তরবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যেই একটা ক্ষোভ ছিল যে, উত্তরবঙ্গের লোক উপযুক্ত মর্যাদা পান না। তাঁদের মনের এই গোপন কথাটারই আমি মুসলিম লীগের আমলে পূর্ববঙ্গ বিধানসভায় প্রতিধ্বনি তুলেছিলেম, উত্তরবঙ্গকে একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গড়ে তোলার দাবি তুলে। সর্বোপরি স্বাধীনতা-সংগ্রামী কংগ্রেসের একজন মুসলমান নেতা যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সেটা শুধু আমার কাছেই নয় আমাদের কংগ্রেসী সকল বন্ধুদের কাছেই যে অত্যন্ত সুখকর হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। আমি অন্তত মনে করেছিলেম যে তিনিই হয়তো মুসলিম লীগ আমলে হিন্দুদের মনোবল যা একদমই ভেঙে পড়েছিল সাম্প্রদায়িক সরকারী নীতির জন্য সেই ভাঙা মনোবলকে আবার 'চাঙ্গা' করে তুলতে পারবেন। এইসব কারণেই আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমরা অতীতের কংগ্রেসী সদস্যরা সকলেই সরকার সাহেবের মুখ্যমন্ত্রিত্বলাভ করাটাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেম এবং তাঁর সমর্থকই ছিলেম, যদিও তিনি প্রথম

কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর মন্ত্রিসভাতে কোনও হিন্দু সদস্যই নেন নি—তিনি তাঁর মন্ত্রিসভাতে হিন্দু সদস্য না নিলেও আমাদের মনে কোনও ক্ষোভ ছিল না ঠিকই, কিন্তু মন্ত্রিসভায় আমাদের দলের লোকও যে যথাযোগ্য আসন কেউ পান, সে-বিষয়ে আমাদের আগ্রহ যথেষ্টই ছিল। ব্যক্তিগত কারণ কার মনে কি ছিল তা সঠিক বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়; তবে সমষ্টিগতভাবে একটা প্রধান কারণ আমাদের চিন্তাধারায় ছিল যে হিন্দুদের ভাঙা-মনে আবার নতুন চেতনা, নতুন বল সঞ্চার করতে হলে মন্ত্রিসভায় আমাদেরও লোক দিয়ে হিন্দুদের একথাটা বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার যে আমরা—হিন্দুরাও পাকিস্তানের মুসলমানদের মতই সমান অধিকারসম্পন্ন একটি সম্প্রদায়। মুসলিম লীগের আমল থেকে লীগের নেতারা ও রাষ্ট্রনায়করা সব সময়ই হিন্দুদের শুনিয়েছেন যে পাকিস্তান হচ্ছে মুসলমানদের বাসভূমি—হিন্দুরা এখানে "জিম্মি", অর্থাৎ মুসলমানরাই হিন্দুদের রক্ষাকর্তা! অনবরত ঐরূপ কথা শুনতে শুনতে হিন্দুদের মনেও একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে পাকিস্তানে তাঁদের নিজস্ব কোনই অধিকার নেই—তাঁরা সেখানে থাকেন মুসলমানদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে! একটা স্বাধীন জাতির পক্ষে এইরূপ মনোভাব শুধু একটা সম্প্রদায়ের পক্ষেই নয়, সমস্ত 'জাতির, (Nation) পক্ষেও অত্যন্ত মারাত্মক। মুসলিম লীগের নেতাদের ঐ মনোভাবের যে সুদূরপ্রসারী ক্রিয়াফল কী হতে পারে তা বোঝার মত দূরদৃষ্টি ছিল বলে মনে হয় না। তাঁরা হিন্দুদের মনোবল যে ভেঙে দিতে পেরেছেন, সেইটাতেই তাঁদের আনন্দ! হিন্দুদের মনোবল একদম ভেঙে পড়েছিলও। আমার কাছে এমন ঘটনার সংবাদও এসেছে যে একজন হিন্দুর বাড়ির উপরেই আমের গাছে আম ধরেছে, একটি তরুণ মুসলমান যুবক এসে দিন-দুপুরেই সেই গাছ থেকে আম পেড়ে নিচ্ছে; বাড়ির মালিক যুবকটিকে আম পাড়তে নিষেধ করায় গাছের উপর থেকেই যুবকটি বলেছে—"জানিস না, এটা পাকিস্তান! মুসলমানদেরই রাজত্ব! চলে যা "হিন্দুস্থানে" তোদের দেশে, তোদের রাজত্বে।" এই কথা শোনার পর মালিক আর কিছু বলতে সাহস পান নি। হিন্দুদের মনোবল এতখানিই ভেঙে পড়েছিল! এই ভাঙা-মনে আবার বল সঞ্চার করতে হলে তাঁদের দেখান দরকার যে তাঁদের প্রতিনিধিরাও মুসলমানদের প্রতিনিধিদের মতই সমান মর্যাদায়—সমান আসনে বসেছেন। সেই জন্যই আমরা

আমাদের দলের লোকও যাতে মন্ত্রিসভায় স্থান পান তার জন্য আগ্রহী ছিলেম। আমাদের আগ্রহের কারণ জেনে আবুহোসেন সাহেব পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের পরিষদ দলীয় নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীবসন্তকুমার দাশ মহাশয়কে এবং ঐ দলেরই তপশিলী সম্প্রদায়ের যশোরের নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তাঁর মন্ত্রিসভাতে কিছুকাল পরে নেন। বসন্তবাবুই সর্বপ্রথম বর্ণহিন্দু অর্থমন্ত্রী হন। গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর পদের পরই গুরুত্বপূর্ণ পদ হচ্ছে অর্থমন্ত্রীর। সেই পদটিই পান বসন্তবাবু! দেশ বিভাগের আগে ১৯৪৬ সাল থেকে দেখেছি মুসলিম লীগের শাসনকালে—কি যুক্ত বাংলায়, কি পূর্ব পাকিস্তানে—কোথায়ও শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন কোনও হিন্দুকেই—বিশেষ করে জাতীয়তার আদর্শবাদী কোনও কংগ্রেস নেতাকেই মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয় নি! যুক্ত বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবের আমলে হিন্দু মন্ত্রী হিসাবে দেখেছি শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয়কে এবং তাঁর অনুগামী তপশিলী সম্প্রদায়েরই শ্রীদ্বারিক বাড়োরী মহাশয়কে। তাঁরা উভয়েই মুসলিম লীগের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী দ্বিজাতি-তত্ত্ব নীতির বিরুদ্ধে কোনদিনই প্রতিবাদ করেন নি; তাঁরাও মুসলিম লীগের সুরেই সুর মিলিয়ে মন্ত্রিত্বের গদি বজায় রেখেছেন। জনাব ফজলুল হক সাহেবের যুক্তফ্রণ্টের প্রথম মন্ত্রিসভাতে কোনও হিন্দুকেই নেওয়ার মত সময়ও তিনি পান নি; কাউকেই নেওয়া হয় নি। আবুহোসেন সরকারের আমলেই স্বাধীনতা-সংগ্রামী একজন শ্রেষ্ঠ কংগ্রেস-নেতাকে সর্বপ্রথম মন্ত্রিসভায় নেওয়া হল—শুধু, মন্ত্রিসভাতেই নেওয়া হল না, মন্ত্রিসভায় শাসন-পরিচালনার কাজে অর্থমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদটিও দেওয়া হল। সরকার সাহেবের এই মন্ত্রী-মনোনয়নে আমরা সকলেই খুব খুশি হয়েছিলেম ঠিকই কিন্তু তবু, আমাদের "সংযুক্ত প্রগতিশীল দল"-এর পক্ষ থেকে আমাদের দলীয় দাবিও তাঁর কাছে তুলেছিলেম। আমাদের দাবি ছিল, আমাদের দলের নেতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কেও তাঁর মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ার জন্য। ধীরেনবাবু সম্পর্কে আমাদের দলের সকলেরই একটা নৈতিক দায়িত্বও ছিল। 'পাকিস্তান-গণ-পরিষদ' ও 'পাকিস্তান-পার্লামেণ্ট'-এর সদস্য হিসাবে ধীরেনবাবু খুব যোগ্যতার পরিচয় যে দিয়েছিলেন, সেটা আমরাই শুধু নয়, সকলেই স্বীকার করেন; তবু আমরা তাঁকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরে আবার যে গণ-পরিষদের নির্বাচন হয়, তাতে গণ-

পরিষদের মনোনয়ন দিই নি। তার কারণ ছিল, হক সাহেবের সেই বিবৃতিটি (যার কথা আগেই বলেছি) যাতে তিনি বলেছিলেন যে, প্রদেশের ও কেন্দ্রের—দুই সভাতেই যাঁরা সদস্য হবেন, তাঁদের তিনি মন্ত্রিসভায় নেবেন না। ঐ বিবৃতির উপর নির্ভর করেই, ধীরেনবাবুকে আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে মন্ত্রী করতে চাই বলেই তাঁকে আমরা গণপরিষদে পাঠাই নি। এখন সেই ধীরেনবাবুকে মন্ত্রী করতে না পারলে ধীরেনবাবুর কাছে তো বটেই. দেশের কাছেও আমরা নীতিগতভাবে অপরাধী হই, তাই ধীরেনবাবুর নাম আমরা সরকার সাহেবের কাছে প্রস্তাব করি এবং তিনি উত্তরে আমাদের বলেন,—"আপনাদের দলের একজন নেতা শ্রীকামিনীকুমার দত্ত মহাশয় কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছেন। পাকিস্তান কংগ্রেসের কেউ কেন্দ্রে মন্ত্রী নেই। এখানে তাঁদের দলের দুইজনকে নেওয়া হয়েছে। আপনাদের দলেরও একজন যদি আবার নেওয়া হয়, তাহলে অন্যান্য সদস্যদের আপত্তির কারণ হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। সে অবস্থায় আমি কি করতে পারি বলুন।" তাঁর এই অসহায় অবস্থার কথা তিনি বলে একটা প্রস্তাব দেন। ধীরেনবাবু তাঁর অতি পুরাতন একজন বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের খাতিরেই হোক বা গণতন্ত্রে কোনও দলের মন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে হলে সেই দলের সদস্য সংখ্যাও; অর্থাৎ গরিষ্ঠতাও বজায় রাখতেই হয়। সুতরাং পাকিস্তানে যখন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ছিল, তখন সেখানেও দেখেছি, এখন ভারতে এসে এখানেও দেখছি যে সদস্যরাও কোনও বেয়াড়া দাবি তুললেও তারা অযৌক্তিকতা সত্বেও তাঁদের কিছু-না-কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেই হয়; নচেৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হতেও বেশিদিন দেরি হয় না। এইভাবেই দলত্যাগ চলে এবং 'সরকারের' স্থায়িত্বও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে—এই সব কথা বিবেচনা করেই হোক, আবুহোসেন সাহেব প্রস্তাব দেন যে, তিনি আভ্যন্তরীণ জলপথ ও জলযান সম্পর্কে একটা 'কমিটি' করবেন এবং ধীরেনবাবুকে তার 'চেয়ারম্যান' করতে চান। ঐ 'চেয়ারম্যান'-এর বেতন, মন্ত্রীদের বেতনের চেয়ে বেশি—মাসিক দুই হাজার টাকা। এই প্রস্তাবটি অর্থপিপাসু ব্যক্তি বা দলের কাছে অবশ্যই অত্যন্ত লোভনীয় হত। কিন্তু তা ধীরেনবাবুর কাছেও হয় নি,—আমাদের কারো কাছেই হয় নি। আমরা যে উদ্দেশ্যে ধীরেনবাবুকে মন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেম প্রস্তাবটি আমাদের সেই উদ্দেশ্যের তো মোটেই সহায়ক ছিল না, উপরন্তু আমরা মনে

করেছিলেম, আমাদের অর্থের লোভ দেখান হয়েছে; তাই ঐ প্রস্তাবটি আমরা সরাসরিই প্রত্যাখ্যান করি এবং সরকার সাহেবের মন্ত্রিসভায় ধীরেনবাবুরও আর যাওয়া হল না।

এই তো গেল, একদিকের অবস্থা। অন্যদিকের অবস্থা হল, আবুহোসেন সাহেবের দলে ক্রমশ তাঁর উপর অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ৯৩ ধারায় বিধানসভা মূর্হাগত থাকাকালে সরকার-সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাতে প্রাণ-সঞ্চার করেন। ৯৩ ধারার আমলেই রাজ্যপাল (গভর্নর) কর্তৃক বছরের বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ ঘোষিত হয়েছিল। সুতরাং, সেদিক দিয়ে আবুহোসেন সাহেবের বিধানসভা ডাকার বিশেষ কোনই তাগিদ ছিল না। তিনি বিধানসভা ডাকেনও নি; এই না-ডাকাই তাঁর মন্ত্রিসভারও 'কাল' হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরবর্তীকালে। বিধানসভা চলাকালে সদস্যরা যে ভাতা পান, তা থেকে বেশ কিছুটা টাকা তাঁদের 'পকেটে যায়। সভা না ডাকায় সেই টাকা আর সদস্যদের পকেটে যেতে পারে না এবং সদস্যরা বিধানসভায় তাঁদের ভাষণ দিয়ে নিজ নিজ নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে যে তাঁদের চিত্র তুলে ধরবেন সে সুযোগও হয় না; ফলে তখন থেকেই কিছু কিছু সদস্যদের মধ্যে বিশেষ করে তাঁর দলেরই মুসলমান সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় বিরোধী আওয়ামি লীগও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেন না; তাঁরাও তাঁদের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাতে হয় তার জন্য সরকারপক্ষের অসন্তুষ্ট সদস্যদের মধ্যে এবং হিন্দু সদস্যদের মধ্যেও দলত্যাগের প্রচার চালিয়ে যান।

এই অবস্থা যখন চলছিল, তখন গণ-পরিষদে আর একটি ঘটনা ঘটে। জনাব ফজলুল হক সাহেব আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, গণ-পরিষদে যখন নির্বাচন-প্রথা সম্পর্কে আলোচনা উঠবে তখন তিনি যৌথ নির্বাচন-প্রথা চালু করার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে, তিনি যথাকালে কিছুই করলেন না। শোনা যায় যে, গণ-পরিষদের মুসলমান সদস্যদের বিরোধিতাতেই তিনি কিছু করতে পারেন নি। যাই হোক, যৌথ-নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের হিন্দু সদস্য সকলেরই মনে যে আন্তরিক আগ্রহ ছিল, তাতে প্রচণ্ড একটা বাধা ও আঘাত আমরা পেয়েছিলেম এবং ক্ষুব্ধও যথেষ্টই হয়েছিলেম। সেই জন্য আমাদের দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে কামিনীবাবুকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। কামিনীবাবু সেই নির্দেশ

পেয়ে জনাব হকসাহেবের এক বাণী নিয়ে ঢাকায় এসে আমাদের দলকে জানান যে, পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার অধিকাংশ মুসলমানের ভোটে যৌথ-নির্বাচনের প্রস্তাবটি পাশ করাতে পারলে তাঁর হাত গণ-পরিষদে শক্তিশালী হবে। কামিনীবাবু যখন এই সব কথা বলছিলেন, তখন আমাদের দলের অধ্যাপক পুলিন দে কামিনীবাবুর হাতে আমাদের দলের দ্বিতীয় প্রস্তাবের একটা নকল দেয়। ঐ প্রস্তাবে ছিল, কামিনীবাবু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ না করায় তাঁর সাথে দলের সম্পর্ক ছেদ করা হল। আমার অনুপস্থিতিতেই ধীরেন বাবুর সভাপতিত্বে ঐ প্রস্তাবটি পাশ করা হয়। যে মুহূর্তে কামিনীবাবুর হাতে ঐ প্রস্তাবের নকলটি দেওয়া হয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি রাজসাহী থেকে ঢাকায় গিয়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত হই ; তখন আর আমার করার কিছুই ছিল না।

ওদিকে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসও আমাদের প্রস্তাবের কথা জানার পরে পূর্ব-পাকিস্তানের তাঁদের দুইজন মন্ত্রীকেও নির্দেশ দেন মন্ত্রিত্ব ছাড়ার জন্য। মন্ত্রীরা অবশ্য দিনকয়েক পর্যন্ত তাদের যুক্তিতর্ক দিয়ে মন্ত্রিসভা ত্যাগ না করার জন্য দলকে বোঝাতে চেষ্টা করার পরও অকৃতকার্য হয়ে অবশেষে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন।

কামিনীবাবুর সাথে আমাদের দলের সম্পর্কচ্ছেদ ও কংগ্রেস দলেরও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ, সাময়িকভাবেই হয়েছিল। 'কংগ্রেস' ও 'সংযুক্ত-প্রগতিশীল' দলে এই যে দুটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তা' ঐ দলের সদস্যদের যৌথ নির্বাচন প্রথার প্রতি একান্ত আন্তরিকতারই পরিচায়ক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থেই তাঁদের জীবন ও ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্যই আমরা মনে করেছিলেম, পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনে—যৌথ নির্বাচনপ্রথা চালু করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের সংবিধানে এই যৌথ নিবাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে ; ফলে, এখানকার সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মন যুগিয়েই সব রাজনীতিক দলগুলোকেই চলতে হয়। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ও এখানে একটি রাজনীতিক শক্তি হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে ; তাই ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউই আজ আর স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করে পাকিস্তানে যেতে চান না—যানও না। পাকিস্তানেও, আমি মনে করি, ঠিক এই অবস্থাই হত, যদি গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সেখানে যৌথ নির্বাচন প্রথা চালু করা যেত। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের

মধ্যে এতদিন পরে আজ আবার কেউ কেউ (যদিও সংখ্যায় তাঁরা সামান্যই) চাইছেন পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু করতে। পাকিস্তানে আমিও একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেম। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি অত্যন্ত জোরের সাথেই বলতে পারি যে পৃথক নির্বাচনের দাবি তোলা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে আত্মহত্যা করারই সামিল। তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণের চেয়ে অ-কল্যাণই হবে বেশি—পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যেমন ক্রমশ দেশত্যাগ করে চলে আসতে হচ্ছে—আজও তার বিরতি হয় নি, যদি ভারতে পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু হয় তাহলে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও সেই পথই অনুসরণ করে চলতে হবে। একথা যেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা কখনও না ভোলেন, এই-ই আমার অনুরোধ। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আমি এখানে পাকিস্তানের ও ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলে, তাঁদের প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতে চাই। সেটি হচ্ছে, 'পাকিস্তান' ভারত সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই তাকে 'ভারত' বা 'ইণ্ডিয়া' কখনই বলেন না—তাঁরা বলেন "হিন্দুস্থান" কিন্তু 'ভারত' যদি সত্যি-সত্যিই 'হিন্দুস্থান' কোনও দিন হয়, তাহলে সেই হিন্দুস্থানের মুসলমানকেও পাকিস্তানের হিন্দুদের মতই, আমার আশঙ্কা হয়, দেশত্যাগ করে পাকিস্তানে পাড়ি দিতে হবে। সেটা পাকিস্তানের পক্ষেও সুখকর হবে না—ভারতের মুসলমানদের পক্ষে তো নয়ই; সুতরাং পাকিস্তান সরকারকে আমি ধীর মস্তিষ্কে আবারও বিষয়টি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও পাকিস্তানের ঐ অবিবেচনাপ্রসূত নীতির বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। অবশ্য তাঁদের প্রতিবাদে যে পাকিস্তান সরকার কান দেবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই; তবু ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কথা প্রসঙ্গেই এই কথাগুলো এসে পড়লো। কথাগুলো অবান্তর হলেও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় নয়।

যাক পূর্ব পাকিস্তানের সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের বিষয়েই আবার ফিরে যাই। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবুহোসেন সরকার সাহেবের বিরুদ্ধে তাঁর দলের মধ্যেই কিছু সংখ্যক সদস্য ক্রমশই বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। পাকিস্তানে তখন যে গণতান্ত্রিক শাসন চলছিল তাতে সেখানেও দেখেছি এবং আজ ভারতে এসে এখানেও দেখছি, কোনও মুখ্যমন্ত্রীই যদি

তাঁর দলের সদস্যদের ন্যায় অন্যায় যে দাবিই হোক, তা' মেনে না নেন, তাহলে সেই সব সদস্যদের মধ্যে প্রথমে দেখা দেয়, দলত্যাগ! আজকের ১৯৬৭ সালের বিভিন্ন প্রদেশের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই অবস্থাটা সকলেই বুঝবেন। আবুহোসেন সরকার সাহেবের অবস্থাও সেদিনে ঐরূপই হয়েছিল। সরকার সাহেব অবশ্য কিছু কিছু কৌশলগত ভুলও করেছিলেন। আগেই বলেছি, বিধানসভা আহ্বান না করে তিনি একটা বড় রকমের ভুল করেছিলেন। সোজা ও সরল মানুষ আবুহোসেন সরকারের মধ্যে সততা, আন্তরিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শাসন পরিচালনা করতে যে কূট-কৌশলী হতে হয়, সেই কূট-কৌশল তাঁর মধ্যে ছিল না; সেই জন্যই তিনি তাঁর দল ঠিক রাখতে পারেন নি—দলের মধ্যে কিছু সদস্য বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এই অবস্থা যখন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের মধ্যে চলছিল, তখন বিরোধী আওয়ামি লীগ দলও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন না—তাঁরা তাঁদের দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁরা 'কংগ্রেস' ও 'সংযুক্ত প্রগতিশীল' দলের কাছেও তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার (Co-alition) প্রস্তাব নেন।

এই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী আবুহোসেন সরকারের সাথে তাঁদের কৃষক-শ্রমিক দলের সদস্য—বিধানসভার 'স্পীকার' জনাব আব্দুল হাকিম সাহেবের বেশ একটু গোলমাল বেধে যায়। আব্দুল হাকিম সাহেবকে দেখেছি, তিনি বরাবরই একটু উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁর একজন মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছাই প্রথম থেকে ছিল কিন্তু তা' হতে না পেরেও তিনি তখন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন নি; কারণ তখন জনাব ফজলুল হক সাহেবই হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তিনিই হাকিম সাহেবকে করেছিলেন বিধানসভার 'স্পীকার'। হক সাহেবের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত শক্তি ও সাহস সেদিনে তাঁর দলের কারোরই ছিল না, যেমন ভারতে ছিল না নেহরুজীর মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত শক্তি ও সাহস অপর কোনও মন্ত্রীর। হাকিম সাহেবও তাই নীরবেই হক সাহেবের ব্যবস্থাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু আবুহোসেন সরকার সাহেবের তো সারা পূর্ব পাকিস্তানে হক সাহেবের মত জনসাধারণের উপর প্রভাব ছিল না; তাই হাকিম সাহেব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন। তিনি দাবি করেন যে পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার সচিবালয়কে (Secretariat) একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সচিবালয় করতে হবে, যার উপরে থাকবে না গভর্নমেন্টের

অর্থ ও স্বরাষ্ট্রদপ্তরের কোনই তদারকী ক্ষমতা। তিনি বিধানসভার সমস্ত বিভাগের উপর গভর্নরের মত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে নিজের খেয়ালখুশি মত চলতে চেয়েছিলেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আবুহোসেন সরকার তাতে রাজী হন নি; সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী ও স্পীকারের মধ্যে গোলমাল বেশ পেকে উঠতেই থাকে। আওয়ামি লীগ দলও সেই গোলমালের পুরো সুযোগ নিতে ছাড়েন না। তাঁরা স্পীকারের উচ্চাভিলাষে উৎসাহ দিয়েই তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখে চলেন।

ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির এই 'ডামাডোল' অবস্থা দেখে আমার ঢাকার কাজ শেষ করেই আমি রাজশাহীতে ফিরি এবং ফিরেই আমার নির্বাচন এলাকার তিনটি মহকুমার প্রধান তিনটি শহরে গিয়ে প্রধান প্রধান লোকদের সাথে মিলিত হই এবং তাঁদের ঢাকার রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে "ওয়াকিবহাল" করি। আমি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনাই আমার নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রধানদের জানিয়ে তাঁদের মতামত নিতেম। এতে নির্বাচকমণ্ডলীও খুশি হতেন এবং নিজ মতে চলার দায়িত্বের বোঝাও আমার কাছে অনেকটা হাল্কা হয়ে যেত। এটাই ছিল আমার নীতি। এবারেও আমি সেই নীতিরই অনুসরণ করে ঢাকার রাজনীতিক সব অবস্থা ও সুরাবর্দী সাহেব পরিচালিত আওয়ামি লীগের আমাদের কাছে দেওয়া প্রস্তাবের কথাও তাঁদের জানাই। তাঁরাও আমাকে নির্দেশ দেন যে, অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি যা ভাল মনে করবো, তাই করতে পারি কিন্তু আমি যেন সুরাবর্দী সাহেবের সাথে হাত না মেলাই। এই ছিল আমার নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধানদের আমার উপর নির্দেশ। সুরাবর্দী-ভীতি আমার জেলায় হিন্দুদের মধ্যে কত যে প্রবল ছিল, তাঁদের আমার উপর দেওয়া নির্দেশেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সব কাজ শেষ করতে করতেই ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস এসেযায় এবং বাজেট উপলক্ষে ঢাকায় বিধানসভার অধিবেশন ডাকার 'সমন' পাই। অধিবেশন ডাকা হয়েছিল মার্চ মাসের শেষাশেষির দিকে। যথানির্দিষ্ট স্থানেই আমরা ঢাকায় গিয়ে অধিবেশনে যোগ দিই। মুখ্যমন্ত্রী আবুহোসেন সাহেব অর্থমন্ত্রী হিসাবে (বসন্ত দাস মহাশয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পরে মুখ্যমন্ত্রীই ঐ দপ্তরটিও নিজের হাতেই রেখেছিলেন) 'বাজেট' উথাপন করতে দাঁড়ালেই—বিরোধী আওয়ামি লীগ দল থেকে শেখ মুজিবর রহমান সাহেব বৈধতার প্রশ্ন তুলে এক সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা

ছিল মার্চ মাস শেষ হতে মাত্র আর ৮।১০ দিন বাকী আছে ; ঐ অল্প সময়ের মধ্যে বাজেটের দফাওয়ারী সব বিষয়ের বিষদ আলোচনা হওয়া সম্ভবপর নয় ; সুতরাং ঐ অল্প সময় হাতে থাকতে 'বাজেট'-এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করতে দেওয়া অবৈধ ও অ-গণতান্ত্রিক। অনেকেই বলেন, স্পীকারের সাথে পরামর্শ করেই ঐ বৈধতার প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সে সম্বন্ধে আমি সঠিক কিছু বলতে পারি না, তবে পূর্ব পাকিস্তানে তখন যেমন দলীয় ও অন্তর্দলীয় ষড়যন্ত্র চলছিল, তাতে ঐরূপ কিছু হয়ে থাকলে তাও আমি অবিশ্বাস করি না। বৈধতার প্রশ্নটি শোনার পর 'স্পীকার' আব্দুল হাকিম সাহেব অপ্রত্যাশিত-ভাবে তাঁর 'রুলিং' দেন যে বাজেট উত্থাপন করতে দেওয়া যায় না ! ঐ 'রুলিং' দিয়েই তিনি বিধানসভা ছেড়ে ছুটে (এক রকম পালিয়ে যাওয়াই বলা যেতে পারে) তাঁর ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন ! বাজেট পাশ করতে না পারায় পূর্ব পাকিস্তানে এক সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার ইতিহাসে ৮।১০ দিনের মধ্যে 'বাজেট' পাশের 'নজির' অবশ্য ছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পরে জনাব নুরুল আমিন সাহেবের মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভাও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 'বাজেট' পাশ করে নিয়েছিলেন। আসামের ভূতপূর্ব স্পীকার (দেশ বিভাগের আগের) শ্রদ্ধেয় শ্রীবসন্ত দাস মহাশয়ও স্পীকারের কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। তিনি সেদিন ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বলেছিলেন, বৈধতার প্রশ্নে স্পীকারের ঐ 'রুলিং' সম্পূর্ণভাবেই অন্যায় ও অবৈধ। কিন্তু তা' হলে কী হবে ! স্পীকারের 'রুলিং'-এর উপর কারো যুক্তিতর্কও চলে না—কোনও আইন-আদালতেরও আশ্রয় নেওয়াও চলে না ; সুতরাং স্পীকারের 'রুলিং'-ই সেদিন 'বহাল' থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছে এক সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দেয়।

১২ বছর পরে দেখছি, আজ ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গেও 'স্পীকার' মাননীয় শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী মহাশয়ের রুলিং-এর ফলে এক গুরুতর সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিধানসভাকে পাশ কাটিয়ে বিধানসভায় অজয়-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ না হওয়ার আগেই তাঁর নিজের কাছে উপস্থিত অনিশ্চিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী মহাশয়কে বিধানসভা অবিলম্বে আহ্বান করে আস্থ-ভোট নিতে অনুরোধ করেন। সংবিধান-

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, রাজ্যপালের ঐরূপ অনুরোধ বে-আইনী। কিন্তু সংবিধানের বিচারে বে-আইনী হলে কি হবে? রাজ্যপাল হচ্ছেন শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ একটি রাজনীতিক দলের মনোনীত ব্যক্তি; সুতরাং তিনি সেই রাজনীতিক দলের একজন 'এজেন্ট' হিসাবেই সাধারণত চলেন। তার উপরে পশ্চিমবঙ্গের 'রাজ্যপাল' আবার হলেন একজন ভূতপূর্ব 'সিভিলিয়ান' রাজকর্মচারী, যিনি সারা জীবন উপরওয়ালার হুকুমই তামিল করে, নিজের চাকুরীজীবন কাটিয়েছেন, তিনি রাজ্যপালের অতি সম্মানিত আসনে বসলেও তাঁর সারা জীবনের অর্জিত স্বভাব বদলান কেমন করে? পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরও তা' পারেন না। ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী—দিল্লী ও কলকাতার মধ্যে চলে সলাপরামর্শ এবং অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু রাজ্যপালের ঐ অবৈধ আদেশ মেনে নিতে রাজী না হওয়ায়, তাঁর (অজয়বাবুর) মন্ত্রিসভাকে ২১শে নভেম্বরের রাতের আঁধারের মধ্যে ৮টা বাজার কিছু পরেই নিজ ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল বাতিল করে দেন এবং রাত প্রায় ৮টা বেজে ২০ মিনিটের সময় ১৭ জন সদস্যের দলনেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে তাঁর অপর দুই সদস্য সহ মন্ত্রিত্বের শপথবাক্য পাঠ করান। ডঃ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাজ্যপালকে ২৯শে নভেম্বর বিধানসভা ডাকার জন্য উপদেশ দেন। এই ২৯শে নভেম্বরে আহূত বিধানসভায় 'স্পীকার' বিজয়বাবু তাঁর 'রুলিং' দেন যে একমাত্র বিধানসভারই যে ক্ষমতা আছে, মন্ত্রিসভাকে ভাঙ্গা ও গড়ার তার সেই ক্ষমতার প্রতি উপেক্ষা করে রাজ্যপাল, অবৈধভাবে অজয়বাবুর মন্ত্রিসভাকে বাতিল করেছেন, অবৈধভাবেই ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভা গড়েছেন এবং অবৈধভাবেই নিযুক্ত মুখমন্ত্রী ডঃ ঘোষের নির্দেশে এই বিধানসভা ডেকেছেন; সুতরাং এই সভাও অবৈধ। এই 'রুলিং" দিয়ে 'স্পীকার' তাঁর 'রুলিং'-এ বর্তমান মন্ত্রিসভার গঠনই বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছেন। এর ফলে যে সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার সমাধান আজ পর্যন্ত (১৯৬৭ সালের ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত) হয় নি। সব সমস্যারই সমাধানও আছে। এই সমস্যারও সমাধান একদিন-ন'-একদিন আইন মত ভাবেই হোক বা বে-আইনীভাবেই হোক—হবেই। পূর্ব পাকিস্তানের সাংবিধানিক সঙ্কট অল্পতেই মিটে গিয়েছিল। সংবিধানের ৯৩ ধারায় প্রয়োগ করে বিধানসভা সহ মন্ত্রিমণ্ডলীকে সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়ে সেখানকার রাজ্যপাল ৬ মাসের জন্ত একটা 'বাজেট' ঘোষণা করে

আবার ২।৩ দিনের মধ্যেই মন্ত্রিসভা সহ বিধানসভাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্কটের অত সহজে কোনও সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—আজ পর্যন্তও পাওয়া যায় নি; তবে সত্বরই একটা পথ বের করতেই হবে এবং হবেও। রাজনৈতিক দলের সামনে যখনই যে কোনও সঙ্কটই দেখা দিক না কেন, তাই হয়ে দাঁড়ায়, দেশের সঙ্কট! দেশের সঙ্কট দেখা দিলে তখন আর আইন-বে-আইনের প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়ে। আমরা অতীতে দেখেছি যে শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভায় যখন "প্রেসিডেণ্ট"-এর পদ থেকে বিতাড়িত করে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মহাশয়া সভায় সভানেত্রী হয়ে বসে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত করেন, তখন তিনিও দেশের স্বার্থের খাতিরে (!) সেদিন ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেন নি। একটি বৈধতার প্রশ্নে তিনি সেদিন সদম্ভেই ঘোষণা করেছিলেন যে, —"ন্যায় হোক, আর অন্যায় হোক, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তাঁকে ঐ কাজ করতেই হবে।" করেছিলেনও।

এবারের এই সঙ্কটকালেও আমার মনে হয়, দেশ রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থের কথাই আসবে এবং সেই স্বার্থেই 'কম্যুনিস্ট-অধ্যুষিত' 'যুক্তফ্রণ্ট' সরকারকে গদিচ্যুত করার প্রশ্নটাও বড় হয়ে দেখা দিয়ে থাকবে। আমি আইনজ্ঞ নই—সংবিধান-বিশেষজ্ঞ তো নই-ই; সুতরাং সংবিধানের দিক থেকে অজয়-মন্ত্রিসভার 'থারিজ' ও ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার গঠন ন্যায় হয়েছে, কি অন্যায় হয়েছে সে বিচার করতে চাই না। যেখানে সংবিধান-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরাই একটা সমাধান-সূত্র খুঁজতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, সেখানে আমার মত একজন আইন-অনভিজ্ঞের পক্ষে কোনও মতামত দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র হবে; সুতরাং সেদিক দিয়ে আমি যেতে চাই না; তবে আমার মনে এই সম্পর্কে আজ যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেইটাই পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরতে চাই। আমার মনের প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে রাজ্যপাল হচ্ছেন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দলের মনোনীত ব্যক্তি, সেখানে রাজ্যপালকে যদি একনায়কত্বের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে সেটা ভবিষ্যতে আরও একটা গুরুতর সঙ্কটরূপেই দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আজ ভারতের কংগ্রেস সরকার যে 'নজির' সৃষ্টি করেছেন, তা, ভবিষ্যতে একদিন "ফ্র্যাংকেনস্টাইন"-এর মত সেই কংগ্রেসেরই ঘাড়ে চেপে বসবে। এটাই

আমার আশঙ্কা। আমার মনে হয়, অজয়বাবু যে ১৮ই ডিসেম্বর বিধানসভা ডাকতে চেয়েছিলেন, সেই তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই 'সরকারের' পক্ষে উচিত ছিল। সেই সভাতে অজয়বাবুর মন্ত্রিসভা বিধানসভার সদস্যদের ভোটে পরাজিত হলে যুক্তফ্রন্টের 'পাল' থেকে হাওয়া বের হয়ে যেত এবং তার পরে যদি 'যুক্তফ্রন্ট' দল তাই নিয়ে কোনও আন্দোলন গড়তে যেতেন, তাহলে তাঁরা দেশবাসীর সমর্থন মোটেই পেতেন বলে আমি মনে করি না। ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যদি রাজ্যপাল অপেক্ষা করে থাকতেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ভারত থেকে পৃথক হয়ে নিশ্চয়ই ঐ সময়ের মধ্যেই একটা 'স্বাধীন রাজ্য' হয়ে যেত না! আমার আরও মনে হয়, 'সরকার' ও রাজ্যপাল এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যস্তবাগীশের ভূমিকা নিয়ে যে মন্ত্রিসভাকে তাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ মন্ত্রিসভা বলছেন, তাঁদেরই পাতা-ফাঁদে পা' দিয়েছেন! 'সরকার' ও রাজ্যপাল তাড়াহুড়ো করে যে একনায়কত্বের পথে পা' বাড়িয়েছেন, বিধানসভার 'স্পীকার' দেশের একজন সন্তান হিসাবেই তাঁর ঐতিহাসিক 'রুলিং' দিয়ে দেশবাসীর দৃষ্টির সামনে ভাবীকালের সেই বিপদের কথাটাই তুলে ধরেছেন। পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার 'স্পীকার'—জনাব হাকিম সাহেব—তাঁর নিজের উচ্চাভিলাষ পূরণের একটা প্রকাণ্ড বাধা, মুখ্যমন্ত্রী আবুহোসেন সাহেবের মধ্যে দেখে তাঁকে 'গদি' থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, আর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 'স্পীকার', দেশেরই একজন দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক হিসাবেই দেশবাসীর সামনে এই সাংবিধানিক সঙ্কটের মাধ্যমে আগামী অনাগতকালের বিপদের ইঙ্গিত তুলে ধরেছেন। এই দুইজন স্পীকারের উদ্দেশ্য একই না হলেও, ফল কিন্তু অনেকটা একইরকম হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে আবুহোসেন মন্ত্রিসভার বিক্ষুব্ধ সদস্যরা বিরোধী আওয়ামি লীগের দিকে আরও ঢলে পড়েছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গেও অজয়বাবুদের যুক্তফ্রন্টের মধ্যেকার উচ্চাভিলাষী বিক্ষুব্ধ সদস্যদের মধ্যেও একই অবস্থা দেখা দিয়েছে। তবে দুই বঙ্গের অবস্থার মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও যে না-আছে তা' নয়। সরকারী হঠকারীতায় মন্ত্রিসভার উপর হস্তক্ষেপ করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের প্রতি জন-সমর্থন বেড়েছে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে, তা' হওয়ার সুযোগ পায় নি। তফাৎটা এইখানেই।

যাক, ভারতের সংবিধানের ১৬৪ ধারায় রাজ্যপালকে নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার একনায়কত্বের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কি না, জানি না। সে ব্যাপার নিয়ে সংবিধান-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিচার-বিবেচনা করছেন

এবং করবেন। এই সম্পর্কে আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই যে, ভারতের সংবিধানে রাজ্যপালকে যদি ঐরূপ একনায়কত্বের ক্ষমতা দেওয়া হয়েই থাকে, তাহলে সংবিধান পুনরায় সংশোধন করে রাজ্যপালদের নির্বাচিত প্রতিনিধি (মনোনীত নয়) হওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত; নচেৎ কেন্দ্রের শাসনব্যবস্থা যে দলের হাতেই যখন থাকবে, তখন তাঁদের পক্ষে নিজ দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্যপালকে তাদের কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

দেশ বিভাগ যেদিন হয়েছিল, সেদিন দেশ বিভাগের সাথে সাথে অখণ্ড ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদও খণ্ডিত ও নিহত হয়েছিল, সে বিষয়ে দেশের কোন নেতাই সেদিন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। জনসাধারণও নির্বিচারেই নেতাদের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছিলেন। তার যে ফল হয়েছে সেই বিষফল খাওয়ার দুর্ভোগ আজ ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশেরই জনগণ রক্তের কণায় কণায় ভোগ করছেন। স্বাধীনতার বিশ বছর পরে ভারতের লোকেরা রাজনীতিক-চেতনায় আজ আর বিশ বছর আগের মত শুদ্ধতার পর্যায়ে নেই। রাজনীতি সচেতন জনতার সামনে আশঙ্কিত একনায়কত্বের ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলার পথে একটা সাময়িক বাধা সৃষ্টি করে দেশের লোকের দৃষ্টি যে সেই দিকে আকর্ষণ করেছেন, সেজন্য আমি অন্তত পশ্চিমবঙ্গের স্পীকার মহোদয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দেশবাসী সকলে অবশ্যই এই সাময়িককালের সাংবিধানিক সঙ্কটের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ভেবে দেখার সুযোগ পাবেন, তাঁদের আগামীদিনের জন্য পথ-নির্দেশের। সঙ্কটকালে দেশের জনসাধারণের মধ্যে যদি আত্মপ্রত্যয় ও আত্মানুসন্ধান সম্যকভাবে দেখা দেয়, তাহলেই হবে সত্যিকারের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—এই নব-ভারতে। সুতরাং স্পীকারের সৃষ্ট এই সাংবিধানিক সঙ্কটকে আমি ভারতের ভাগ্যবিধাতার অভিসম্পাত বলে মনে করি নি—আমি তাঁর আশীর্বাদ বলেই বরণ করে নিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, এই দেবভূমি ভারত সব বিপদই কাটিয়ে উঠে শেষ জয়ের পথে এগিয়ে চলবেই।

আজ ১৯৬৭ সালে যে সাংবিধানিক সঙ্কট পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছে ১৯৫৮ সালে ঠিক অনুরূপ না-হলেও একটা সঙ্কট পূর্ব পাকিস্তানেও দেখা দিয়েছিল। অবস্থা দেখে মনে আশঙ্কা হয় যে, উভয় বঙ্গের ঘটনাপ্রবাহ যেন একই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। পূর্ববঙ্গ আগে আগে চলেছে, আর পশ্চিমবঙ্গ তার পিছু

পিছু! আমি যে আশঙ্কা করছি, তা' যে আর কারো মনে হচ্ছে না, তা' নয়। সম্প্রতি লণ্ডনের বিখ্যাত "ইকনমিস্ট" নামক সংবাদপত্রেও অনুরূপ আশঙ্কা করে বলেছেন যে, আয়ুব খানের পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতা-দখলের পথেই কি ভারতও চলেছে? রাজনীতিক প্রবাহের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে আশা করি রাজনীতি-সচেতন ভারতবাসী ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করবেন এবং সময় থাকতে 'হুঁশিয়ার' হবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট তো অল্প সময়ের মধ্যেই কেটে গিয়েছিল। ২।৩ দিনের মধ্যেই রাজ্যপালের ঘোষিত (Certified) বাজেট নিয়ে আবুহোসেন সরকার সাহেব আবার গদিতে ফিরে এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের চিত্র কিন্তু অনুরূপ হবে, মনে হয়। অজয়-মন্ত্রিসভা সহসা যে আবার গদিলাভ করবেন, তা' মনে হয় না। সারা দেশ, হয়তো একটা বিপর্যয়ের মুখেই যাবে। আজ ১৫ই নভেম্বরের রেডিওতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিম-বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীকে লেখা চিঠির যে বয়ান শুনলেম, তাতে সেই আশঙ্কাই মনে জাগে।

যাক, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্কে যে কথা বলছিলাম, তাতেই আবার ফিরে যাই।

জনাব আবুহোসেন সরকার আবার গদি ফিরে পাওয়ার কিছুদিন পরে আমাকে একদিন ঢাকায় (আমি তখন ঢাকায় ছিলেম এবং ধীরেনবাবু ছিলেন কুমিল্লায়) বলেন যে তিনি ধীরেনবাবুকে মন্ত্রিসভায় নিতে মনস্থ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সচিবালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর 'চেম্বার' থেকে কুমিল্লা জজ সাহেবের ঘরের ফোনের মাধ্যমে তিনি ধীরেনবাবুর সাথে কথাবার্তাও বলেন। আমি তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেম। সরকার সাহেবের কথা সবই শুনতে পাই। তিনি ধীরেনবাবুকে অবিলম্বে ঢাকায় এসে মন্ত্রিত্বের শপথ নিতে আহ্বান করেন। কুমিল্লা থেকে ধীরেনবাবু কি বললেন, তা' তো শুনতে পাই নি কিন্তু সরকার সাহেব বলেন যে, ধীরেনবাবু রাজী হয়েছেন এবং শপথ নেওয়ার জন্য আগামীকাল সন্ধ্যার পরে ঢাকায় এসে পৌছবেন। পরদিন সন্ধ্যার পরে ধীরেনবাবু সত্যি-সত্যিই ঢাকায় এলেন কিন্তু ঐ রাতে আর আমাদের বাসায় আসেন নি। আসেন পরদিন বেলা ৯।১০-টার সময়। পরে তাঁর কাছে জানি যে তিনি ঢাকা রেল-স্টেশনে নামার পরই আবুহোসেন সরকারের দলেরই কয়েকজন সদস্য তাঁকে তাঁদের একজনের বাসায় নিয়ে

যান। এই সদস্যরা ছিলেন আবুহোসেন সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ। সম্ভবত এঁদের মধ্যে ফরিদপুরের জনাব ইউসুফ আলি চৌধুরী (ওরফে স্বনামধন্য মোহন মিঞা)-ও ছিলেন। তাঁরা ধীরেনবাবুকে বোঝান যে সরকার সাহেবের মন্ত্রিসভার পতন তাঁরা সত্বরই ঘটাবেন; সুতরাং তিনি যেন ঐ মন্ত্রিসভায় যোগ না দেন। সরকার সাহেবের মন্ত্রিসভার পরে যে নতুন মন্ত্রিসভা গড়া হবে, তাতে তাঁকে নেওয়া হবে। এই সব কথা শ্রদ্ধেয় ধীরেনবাবুর কাছেই আমরা শুনেছিলেম। এই সব কথা শুনে ধীরেনবাবুর মন স্বভাবতই সংশয়-দোলায় দোলে। তিনি কি করবেন, সে সম্বন্ধে তখনও মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। এই অবস্থার মধ্যে ছোট-বড় নানা মংল থেকে কিছু কিছু বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ-উপরোধও আমাদের কাছে আসতে থাকে। এমন কি কোন কোনও উচ্চমহল থেকে ব্যক্তি-বিশেষের যুক্তি-তর্ক, অনুরোধ-উপরোধ ও চাপ আসে। একদিন তো উপরমহলের কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি ধীরেনবাবুকে ও আমাকে তাঁর আবাসে আহ্বান করেন। আমরা উভয়েই এক সাথেই দেখা করতে যাই। এক ঘণ্টারও উপর তাঁর সাথে কথাবার্তা হয়। যুক্তি হিসাবে তিনি বলেন যে,—"ভারত ও পাকিস্তান—এই উভয় দেশের মঙ্গল করতে হলে এই দুই দেশকে বন্ধুরাষ্ট্র হতেই হবে; নচেৎ, উভয় দেশেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার! ভারত একটি বিশাল দেশ, সুতরাং হাজার ক্ষতি হলেও শেষ পর্যন্ত ভারত হয়তো টিকে থাকতে পারবে কিন্তু পাকিস্তান! সে তো হয় ধ্বংস হয়ে যাবে নয় সাম্রাজ্যবাদী কোনও ধনী দেশের কাছে সম্পূর্ণভাবেই তাকে আত্মবিক্রয় করে তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে হবে।"

এই যুক্তির সাথে আমাদের কোনই মতভেদ ছিল না। আমরা—বিধান-সভার কংগ্রেসী সদস্যরা—বিরোধী দল থেকে মুসলিম লীগের আমলে বরাবরই ঐ কথাটাই বিধানসভায় ও দেশের সামনে তুলে ধরেছি, কিন্তু আমাদের সেই সব যুক্তির কথা না-শুনেছেন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল, না-শুনেছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনসাধারণ! বিশিষ্ট ব্যক্তির যুক্তির সাথে তো আমাদের কোনও মতভেদ নেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে সেই যুক্তির সার্থক রূপায়ণ করা যায়? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি (তাঁর সবিশেষ পরিচয় আমার জানা থাকা সত্ত্বেও আমি নাম দিতে চাই না। আশা করি, সুবিজ্ঞ পাঠকেরা তাঁদের কৌতূহল এ বিষয়ে সংযতই রাখবেন) আমাকে বলেন যে,—পাকিস্তানের বর্তমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র সুরাবর্দী সাহেবই সবচেয়ে

শক্তিমান নেতা। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন ঘটাতে পারেন। এহেন শক্তিশালী নেতা সুরাবর্দী সাহেবই তাঁকে কথা দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের হিন্দু সদস্যরাও যদি তাঁর সাথে যোগ দিয়ে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করে তোলেন, তাহলে তিনি ঐ দুঃসাধ্য কাজটিকে সুসাধ্য করে তুলবেন।"

সুরাবর্দী সাহেব যে মহাশক্তিশালী নেতা, সে বিষয়ে আমার কোনও-দিনই সংশয় ছিল না। আমার সংশয় ছিল শুধু একটা বিষয়ে যে, মহাশক্তিধর সুরাবর্দী সাহেবের শক্তির প্রয়োগ আমি কোন সৎ কাজেই অতীতে কখনও দেখি নি,—দেখেছি, তাকে যত সব নোংরা কাজের মধ্যে। কলকাতার গুণ্ডা-শ্রেষ্ঠ মীনা পেশোয়ারীর সাথেও তার নাম যুক্ত হতেই শুনেছি। সেই সুরাবর্দী সাহেব করবেন এই মহৎ কাজ! আমার মনে সংশয় দেখা দেয়। শক্তিধর সুরাবর্দী সাহেবের নাম শুনেই আমার বুকটা কেঁপে ওঠে! আমার মনে পড়ে যায় আমার নির্বাচকমণ্ডলীর আমার প্রতি নির্দেশের কথা। আমি সন্দেহ প্রকাশ করি। আমার ঐ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের উত্তরে ঐ বিশিষ্ট মণ্ডলটি বলেন,—"সুরাবর্দী আর আগের সেই সুরাবর্দী নেই। তিনি এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত একজন মানুষ।" আমি সে কথা পুরোপুরি মেনে নিতে পারি নি, আমি ভাবি, উচ্চ মহলের ঐ ভদ্রলোকটি বোধহয় ভুল করছেন যে বিরোধীর ভূমিকায় সুরাবর্দী সাহেবও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সুরাবর্দী সাহেব হচ্ছেন, সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ব্যক্তি—একজন অপরের ঠিক বিপরীতধর্মী! আমার মনের সেই সন্দেহের কথা তাঁকে জানিয়ে আমি বলি,—"আমার মনে তো সন্দেহ আছে-ই, তাছাড়া, আমার নির্বাচকমণ্ডলীর আমার উপরে কঠোর নির্দেশ আছে, সুরাবর্দী সাহেবের সাথে হাত না-মেলাতে; সুতরাং আপাতত আমি সুরাবর্দী সাহেবের সাথে হাত মেলাতে পারছি না। আমাদের আরও অনেক বন্ধুই তো সুরাবর্দী সাহেবকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর সাথে হাত মেলাচ্ছেন। সুরাবর্দী সাহেব ও তাঁর দল ক্ষমতায়ও আসবেন। তাঁরা ক্ষমতায় আসার পর যদি দেখি, আমিই ভুল করেছি, তাহলে তখন আমি তাঁকে অবশ্যই সমর্থন করবো কিন্তু এখনই বর্তমান অবস্থায় পারবো না।" আমার ঐ সাফ কথার পরে, ঐখানেই আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে যায়। আমি ও ধীরেনবাবু তাঁর কাছথেকে বিদায় নিয়ে আমাদের বাসার দিকে চলি।

এর পরে, ধীরেনবাবু আমাদের দলের সভা আহ্বান করার নির্দেশ দেন। সভার আলোচ্যসূচী ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা। নির্দিষ্ট দিনে সভা বসে। আমাদের পরিষদদলে মোট তেরজন সদস্যই উপস্থিত হন। ধীরেনবাবু তাঁর মত আগেই ঠিক করেছিলেন ; আমিও আমার মত ঠিক করেছিলেম ; সুতরাং আমাদের দুইজনেরই আর মত ঠিক করার কোনও প্রশ্ন ছিল না। মত ঠিক করার প্রশ্ন ছিল অপর এগারজন সদস্যের। সভা আরম্ভ হলে ধীরেনবাবু তাঁর সভাপতির ভাষণে আওয়ামি লীগের সাথে আমাদের হাত মেলান যে উচিত সেই সম্পর্কেই বিশেষ যুক্তিসহ বলেন। আমিও আমার মত সম্পর্কে বলি। আমি বলি যে,—"দল হিসাবে আওয়ামি লীগ যে একটি অত্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ দল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এটা ঠিক যে, আবুহোসেন সাহেবের যুক্তফ্রন্ট দল একটা 'হচ-পচ' পার্টি—একেবারে কুম্ভমেলা'! সেখানে উচ্চস্তরের সাধু-সন্ন্যাসীও আছেন; আবার চোর-জুয়াচোর বাটপাড়ও আছে! তবে, সেখানে নেতৃত্বে আছেন আবুহোসেন, আস্রাব উদ্দিন, গিয়াসুদ্দিন প্রমুখ অতীতের কংগ্রেস-নেতারা, যাঁদের আমরা চিনি ও জানি। এঁরা আর যাই হোন, মুসলিম লীগের মত লীগের হিন্দু-বিতাড়ন-নীতি সরকারের নীতি হিসাবে কখনই গ্রহণ করবেন না বলে আমি বিশ্বাস করি। আবুহোসেন সাহেবের শাসনকালে, হিন্দুদের মধ্যে আবার যে ধীরে ধীরে আস্থার ভাব ফিরে আসছে, তা' সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। বিরোধী আওয়ামী লীগ দলে এবং তাঁদের সহযাত্রী অন্যান্য দলে যথা ভাসানী সাহেবের 'ন্যাশনাল আওয়ামি' দলে এবং 'গণতন্ত্রী' দলে বর্তমানে যে-সব সদস্য আছেন, তাঁদের মধ্যেও আমরা কোনও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় অবশ্য পাই নি কিন্তু তাঁরা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এবং তাঁদের অধিকাংশের অতীত রাজনীতিক জীবনে যেটুকু ইতিহাস আমি জানি, সেটুকু শুধু মুসলিম লীগেরই ইতিহাস মাত্র। তারপরে অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এই সব সদস্যরা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখি নি। কিন্তু তবু আমার মনে একটা প্রকাণ্ড ভয় থেকে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, আওয়ামি লীগ দলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাশক্তিধর

নেতা হলেন শহীদ সুরাবর্দী সাহেব, যাঁর অতীত রাজনীতিক জীবন অতি ভয়াবহ নিষ্করুণ রক্তের অক্ষরে লেখা। তিনি কখন যে কোন্ মূর্তি ধরবেন, তা কেউ বলতে পারে না। গান্ধীজীর সাথে বেলেঘাটায় আমরা বৈষ্ণবের বেশে দেখেছি। এখন পর্যন্ত অবশ্য তাঁর মধ্যে সেই 'রেশ' চলছে। ক্ষমতা-চ্যুত সুরাবর্দী ও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সুরাবর্দী একই লোক না-হওয়ারই আশঙ্কা আমার মনে আছে। আমার নির্বাচকমণ্ডলীও আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সুরাবর্দী সাহেবের সাথে হাত না-মেলাতে। আওয়ামি লীগের পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের সঙ্গে হাত মেলাতে আমার আপত্তি ছিল না, যদি আমি বুঝতেম যে এই সব সদস্যদের সুরাবর্দী সাহেবের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার শক্তি আছে; সুতরাং আমি ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামি লীগের সাথে হাত মেলাতে রাজি নই।"

আমার ভাষণের পরে নোয়াখালি জেলার একমাত্র অবিসম্বাদী নেতা বন্ধু শ্রীহারাণচন্দ্র ঘোষচৌধুরী মহাশয় বেশি কিছু না বলে, শুধু বলেন যে, "আপনারা সকলেই যদি আওয়ামি লীগের সাথে হাত মিলিয়ে সুরাবর্দী সাহেবের নেতৃত্ব মেনে নেন, তা' হলেও আমি একলাই থাকবো, তাঁর বিরোধী দলে। আমি তাঁর নেতৃত্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারব না।" সম্ভবত বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে সুরাবর্দী সাহেব নোয়াখালি জেলার বুকে যে আঘাত হেনে সেখানকার সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের বুকে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ক্ষতের বেদনা হারাণবাবুর মনে তখনও ছিল। থাকারই কথা। তিনি তো সারা নোয়াখালি জেলায় সেই নাটকীয় বীভৎস হত্যা, লুণ্ঠন, নারী-ধর্ষণ ও ধর্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি দুষ্কার্যের পরে গান্ধীজীর সাথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর পক্ষে সে দৃশ্য ভোলা সহজ ছিল না। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভোলেনও নি। তাই তিনি, সুরাবর্দী সাহেবের দলে যোগ দিয়ে তাঁকে শক্তিশালী করে তুলতে কিছুতেই রাজী হন নি। আমাদের তেরজন সদস্যের দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নোয়াখালির শ্রীহারাণচন্দ্র ঘোষচৌধুরী, কুমিল্লার শ্রীআশুতোষ সিংহ ও শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাশ, চট্টগ্রামের শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া (বৌদ্ধ প্রতিনিধি) ও রাজসাহীর শ্রীঋষিরাজ রায়বর্মন, শ্রীদাগ্রাম মাঝি (উভয়েই তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি) ও শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (বর্তমান প্রবন্ধের লেখক) সহ সাতজন সদস্য একমত হয়ে সুরাবর্দী সাহেবের ও তাঁর দলের

সাথে হাত না-মেলানোর সিদ্ধান্ত নেন। ওদিকে, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের আওয়ামি লীগের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নেন, মৈমনসিংহের পরম শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতা শ্রীত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী ("মহারাজ"), ফরিদপুরের শ্রীফণী মজুমদার ও শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, বরিশালের শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও চট্টগ্রামের অধ্যাপক শ্রীপুলিন দে মহাশয়গণ। ধীরেনবাবুর মত সমর্থন করেন তিনি সহ ছয়জন সদস্য। সংখ্যাবিচারে অবশ্য, আমাদের মতাবলম্বীদের দিকে পাল্লাই ভারী হয়, কিন্তু গুণবিচারে, ধীরেনবাবুর মতাবলম্বীদের পাল্লাই বেশি ভারী, মনে হয়। প্রথমত ধীরেনবাবু ছিলেন, আমাদের দলের দলপতি; আমি ছিলেম, তাঁর সহকারী মাত্র (ডেপুটি লীডার)। তা ছাড়া ধীরেনবাবুর ছিল, সংসদীয় কাজের বহু দিনের অভিজ্ঞতা। আমাদের কারোরই সেই অভিজ্ঞতা ছিল না। তার পরে, ধীরেনবাবুর মত যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু যুদ্ধের সেনানায়ক—বিশেষ করে, "মহারাজ" ছিলেন একাই একশো। ভারতের বিপ্লবীযুগের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা ছিল—সেই নাম আজও অম্লান হয়ে আছে, আমাদের মতাবলম্বীদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় তাঁর ধারে-কাছে দাঁড়ানোর মত তেমন কেউই ছিলেন না। তবু কেন আমরা সুরাবর্দী সাহেবের হাতকে শক্তিশালী না করে আবুহোসেন সরকার সাহেবের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম, সেই বিষয় নিয়ে সেই সময়ও কোনও কোনও বন্ধুদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, আজও এতদিন পরেও—কারো কারো মনে হয়তো সেই প্রশ্ন থেকেই যাওয়া সম্ভব; সুতরাং সেই প্রশ্নটির বিশ্লেষণ একটু বিষদভাবেই করা দরকার। অনেকে মনে করতে পারেন যে, আমরা সেদিন হয়তো ভুল পথেই পা বাড়িয়েছিলেম। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সুরাবর্দী সাহেবের পরবর্তীকালের কার্যকলাপের ইতিহাস কিন্তু তা' বলে না। চিতা বাঘ তার রং বদলাতে পারে না। সুরাবর্দী সাহেবও পারেন নি। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের বন্ধুগণ সহ আমাদের ঐ ছয়জন বন্ধু সুরাবর্দী সাহেবকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সমর্থন করেন; ফলে পরবর্তীকালে সুরাবর্দী সাহেব, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিত্বের গদিও লাভ করেন এবং তাঁর আওয়ামি লীগ দলের হাতেও পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা আসে। সে কথা পরে বলবো। এখানে

শুধু একটি কথাই মাত্র বলছি যে, আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণের ও উপর তলার জ্ঞানী-গুণী যে সব ব্যক্তি একদিন সুরাবর্দী সাহেবের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের সকলেরই আশাই তিনি ভঙ্গ করলেন শাসন ক্ষমতার সিংহাসনে বসেই। মুসলিম লীগের মতই তিনি 'জিগির' তুললেন, কাশ্মীর সম্পর্কে। শেষদিকে মুসলিম লীগের পেছনে জনসমর্থন ছিল না; সুতরাং তাঁদের কাশ্মীর সম্পর্কের 'জিগির' পূর্ব পাকিস্তানে মোটেই দানা বাঁধতে পারে নি। কিন্তু সুরাবর্দী সাহেব ছিলেন এক মহাশক্তিশালী নেতা। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাঁর দল—আওয়ামি লীগও ছিল একটি সু-সংগঠিত শক্তিশালী দল। যে পূর্ব পাকিস্তানবাসী জনসাধারণ কাশ্মীরের কথা মুসলিম লীগের শেষ অবস্থায় প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন—কেউ আর 'কাশ্মীর' নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতেন না, সেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকেই সুরাবর্দী সাহেব, তাঁর 'জেহাদী' হুঙ্কারে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন। ঢাকায় লক্ষ লোকের সমাবেশে কাশ্মীর নিয়ে আবার ভারত-বিরোধী প্রচার তিনি সুরু করেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। গোয়া নিয়ে পুর্তুগাল সরকারের সাথে যখন ভারত সরকারের ঠাণ্ডা-লড়াই চলছিল, তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবই পুর্তুগালে গিয়ে "সালাজার-সরকার"কে মদৎ দেন। এই সবই ইতিহাসের কথা—ভারত ইতিহাসের ছাত্রদের সে কথা মনে থাকাই সম্ভব; সুতরাং এই প্রসঙ্গে আর বেশি কিছু এখানে বলতে চাই না। পরবর্তীকালে তিনি যে আরও চমকপ্রদ কাজ করেন, তার কথা পরে বলবো। সব অবস্থা বিবেচনা করে দেখলে সকলেই বুঝবেন যে, আমরা সেদিনে যে সুরাবর্দী সাহেবের সাথে হাত না-মেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম, তাতে আমরাই ভুল করেছিলেম কি না বা আমার নির্বাচক-মণ্ডলী আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে তাঁদেরই ভুল হয়েছিল কি না।

যা'ক, সেদিনে আমাদের মধ্যে মতভেদের ফলে, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে চরম আঘাতই পেয়েছিলেম। ১৯৩৬ সালে বন্ধুভাবেই ধীরেনবাবুর সাথে মিলেছিলেম তৎকালীন "বেঙ্গল এসেম্বলি"তে। সংসদীয় কাজে তিনি আমার গুরু স্থানীয়ই ছিলেন, আর "মহারাজ" তো ছিলেন, আমার জীবনের

"ধ্রুবতারা"—পথের দিশারী। তাঁদের সাথে মতভেদ যে আমাকে কী দারুণ আঘাত করেছিল, তা' কেবল জানেন আমার অন্তর্যামী ভগবান! একদিন যাঁদের সাথে বন্ধুভাবেই মিলিত হয়েছিলেম, রাজনৈতিক কারণে বন্ধুভাবেই আবার তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। এই-ই রাজনীতির বিচিত্রতা!

পূর্ব পাকিস্তানের যে রাষ্ট্রীয় তরণীর কর্ণধার তখন হয়েছিলেন জনাব আবুহোসেন সরকার সাহেব, সেই তরণীর তলা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। ফুটো দিয়ে অনবরত নৌকায় জল উঠছিল। নৌকা 'ডুবু ডুবু' অবস্থায় তখনও ভেসে ছিল। এই অবস্থা জেনেও আমরা যে সাতজন 'প্রগতিশীল সংযুক্ত দল'-এর সদস্য, ধীরেনবাবু পরিচালিত ঐ দলের অপর ছয়জন সদস্যের সাথে একমত হতে না-পেরে পৃথক হয়েছিলেম, তাঁরা আবুহোসেনের 'ফুটো' নৌকারই যাত্রী হওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম। একদিকে 'আওয়ামি লীগ দল' ও তার সহযাত্রী 'ন্যাপ' দল ও 'গণতন্ত্রী দল', আবুহোসেন সাহেবের 'যুক্তফ্রণ্ট' দলের চেয়ে অনেক বেশি সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত দল এবং প্রগতিশীলও বটে ছিল এবং অপর দিকে, আবুহোসেন সাহেবের 'যুক্তফ্রণ্ট' দল যে একটা 'হচ-পচ' পার্টি ছিল, সে কথা আগেই বলেছি; তবু আমরা সেই দলের সাথেই হাত-মেলাতে গিয়েছিলেম কেন, সেই কথাটা সেদিনেও পূর্ব পাকিস্তানের কোনও কোনও বন্ধু-বান্ধবের মনে প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। আজ এতদিন পরে, ভারতে এসেও দেখছি ওইটে এখনও একটা প্রশ্ন হয়েই কারো কারো মনে আছে। কেউ কেউ বা নিজের নিজের মত-মাফিক তার একটা সমাধানও বের করে ফেলেছেন! দুই-একজন সত্যানুসন্ধানী সুধী ব্যক্তি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করতে গিয়ে এমন ইঙ্গিতও আমার সম্পর্কে করেছেন যে, আমার মনের দুর্নিবার 'মন্ত্রী' হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষাতেই না কি, সেদিন আমি ও আমার অপর ছয়জন সঙ্গী আবুহোসেন সাহেবের সাথে হাত মিলিয়েছিলেম! আমার ও আমাদের সকলের মনের দিক থেকে গভীর অভিনিবেশসহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমি যে সত্য জেনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, ঐরূপ ধারণা যাঁরা পোষণ করেন তারা আমার ও আমার বন্ধুদের প্রতি ঠিক মত সুবিচার করতে হয়তো কিছুটা ভুলই করে থাকেন। এই শ্রেণীর সহৃদয় সুধীজনেরা যদি আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারেন, তাহলে তাঁদের কাছে আমার অন্তরের একটি অতি বিনীত নিবেদন

তুলে ধরে অত্যন্ত জোরের সাথেই বলতে চাই যে, আমার মনে 'মন্ত্রী' হওয়ার সাধ বা দুরাকাঙ্ক্ষা কোনদিনই ছিল না। আজ থেকে ষাট বছরের ও অধিককাল আগে আমি যে বিপ্লবীসংস্থা "অনুশীলন সমিতি"র সংস্পর্শে এসে যে শিক্ষা পেয়েছিলেম, তাতে 'অর্থ ও সম্মান'কে জীবনের আবর্জনার মত দূরে ঠেলে ফেলে চলতেই শিখেছিলেম। সে পথ ছেড়ে আজ অনেক দূরে সরে এলেও যৌবনের সেই শিক্ষা আজও আমাকে আঁকড়ে ধরেই চলেছে এবং আমাকে ঐসব মোহের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। আমার অবস্থা যাঁরা জানেন, তাঁরা একথা সকলেই জানেন যে, অর্থের বিচারে আমি অতি দীন, রাজনীতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে দীনতম আমাকে বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমার এক বিঘা জমিও ছিল না আজও নেই; আমার কোনও বাড়ি-ঘরও ছিল না—আজও নেই; আমার ব্যাঙ্কে কোনও মজুত টাকাও ছিল না—আজও নেই। পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল হয়ে যাওয়ার পরে, পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভাও যখন বাতিল হয়ে যায় এবং সদস্যদের ভাতাও বন্ধ হয়, তারপরেও আমি তিন বছর পূর্ব পাকিস্তানেই ছিলেম এবং তিন বছর কাল আমার খাওয়া-পরা চলেছিল, পূর্ব পাকিস্তানের বহু নাম-জানা ও নাম-না-জানা বন্ধু-বান্ধবদের মাসিক অর্থ সাহায্যে। ভারতে আসার পরে (১৯৬২ সালের শেষ থেকে) আমার সমস্ত কিছু খরচপত্র ও খাওয়া-পরার দায়দায়িত্বের ভার নিয়েছিল, আমার ছোট ভাই জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী এবং তার পরলোকগমনের পর থেকে তার পুত্রেরাই আমার সমস্ত দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় তাদের নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তাদের আমার কোন কথাই বলতে হয় না। আমি কখনও কারো কাছেই কিছু চাই নি। তাদের কাছেও কোন কিছুই আজ পর্যন্ত চাই নি। তারা নিজেরা বুঝে নিয়েই সব ব্যবস্থা করে চলে। আজ আমি ৭৫ বছরের বৃদ্ধ। আমার দ্বারা সংসারে এক পয়সার কাজও হয় না। সংসার সম্পর্কে আমার কোনও অভিজ্ঞতাও নেই; তবু তারা যে অযাচিতভাবেই আমার সব দায়দায়িত্ব নিয়ে আমার সুখ-সুবিধার জন্য সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে, তাতে আমি মনে মনে যথেষ্টই গর্ব ও আনন্দের সাথে সঙ্কোচও বোধ করি। অর্থ রোজগারের সুযোগ বিধানসভার সদস্য থাকাকালে অনেকই ছিল। আমার চেয়ে কম সময়ের সদস্যদেরও কেউ কেউ 'বাড়ি-গাড়ি' প্রভৃতি অনেকই করেছেন কিন্তু আমার কিছুই নেই। এই তো আমার আর্থিক অবস্থা। আর, সম্মানের দিকের বিচার

করলে, যাঁরা আমাকে ভালভাবে জানেন, তাঁরাই এ-কথাও জানেন যে আমার জেলা রাজসাহীতে আমার যে সম্মান হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ছিল, তা' কোনও মন্ত্রীর সম্মানের চেয়ে কম তো মোটেই নয়, বরং তার চেয়ে অনেক বেশিই। আমার ঐ সম্মান শুধু রাজসাহী জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার হিন্দু-মুসলমান—যাঁরাই আমাকে চিনতেন, জানতেন, তাঁরাই আমাকে সেই সম্মান দিতেন। এমন কি, বিরোধী দলের লোকেরাও। আমার দুঃখ ও অন্তরের বেদনা এইখানেই যে আমাকে ও আমার সহযাত্রী অপর ছয়জন বন্ধুকে ভালভাবে না জেনে, না বুঝেই ভারতের ২।৪ জন মহাশয় ব্যক্তিকে দেখি যে তাঁরা আমাদের সম্পর্কে ভুল বিচার করছেন। পাকিস্তানে থাকতে হিন্দু-মুসলমান—কেউই কিন্তু আমাদের সম্পর্কে এইরূপ হীন ধারণা পোষণ করতেন বলে আমার তো জানা নেই।

মন্ত্রিত্বের সম্মানের ও অর্থের মোহই যদি আমার মধ্যে না ছিল, তবে আমি আমার ছয়জন অনুগামী বন্ধুকে নিয়ে আবুহোসেন সাহেবের ফুটো নৌকার যাত্রী হয়েছিলেম কেন? সেই প্রশ্নের-ই উত্তরটা এখানে দিচ্ছি:

আমাদের ভয় ও আশঙ্কা, আওয়ামী লীগ দল ও তাঁদের সহযাত্রী দলগুলোর সম্পর্কে ছিল না—আমাদের একমাত্র সর্বপ্রধান ভয় ছিল আওয়ামী লীগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা জনাব শহীদ সুরাবর্দী সম্পর্কে। তিনি ছিলেন মহাশক্তিশালী রাজনীতিক নেতা এবং তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অপর সকলের কাছে ছিল অতি দুর্জ্ঞেয়। তিনি যে কখন কী করবেন—কোন্ পথে চলবেন তাঁর মনের সেই গোপন কথা অন্য কেউ-ই জানতে পারতেন না। মহাশক্তিশালী নেতা যে তিনি ছিলেন সে কথা আমাদেরও খুব ভালভাবেই জানা ছিল। সাথে সাথে এও আমরা তাঁর অতীতের কার্যকলাপ থেকে জানতেম যে তাঁর সেই অসীম শক্তি তিনি কখনও কোনও দেশের মঙ্গলের কাজে ব্যবহার করেন নি। ভয় ছিল আমাদের সেখানেই। যিনি এতবড় শক্তির অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলেও ভালও যে না করতে পারতেন, তা নয়। ভালও করতে পারতেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা তাঁর শক্তি ভাল কাজে লাগাতে দেখি নি। দেশেরও দুর্ভাগ্য যে তাঁর শক্তি তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য না লাগিয়ে এক অখণ্ড ভারতবর্ষকে বিভাগ করে তার জাতীয়তাবাদকে ধ্বংসের কাজেই লাগিয়েছিলেন। বহু ভারতীয় নেতা ও কর্মীদের বহুদিনের আপ্রাণ

প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে যে অখণ্ড জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, তাকে ধ্বংস করার পক্ষে তিনিই প্রধান হাতিয়ার হয়ে 'মুসলিম লীগ' দলে দেখা দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সৌহার্দ্যের সূত্র গড়ে তোলার অনেক প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস এখানে-সেখানে দিলেও আমরা সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছিলেম না। আমরা সেই জন্যই তিনি আবার ক্ষমতায় এসে শক্তিশালী হন তা চাই নি। নোয়াখালির নেতা শ্রদ্ধেয় হারান ঘোষচৌধুরী মহাশয় সেই জন্যই ছিলেন সুরাবর্দী সাহেবের ঘোরতর বিরোধী। আর, আমার সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে আমার নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচকমণ্ডলীর আমার উপর তাঁদের একটিমাত্রই নির্দেশ ছিল এবং সেই নির্দেশ হল—সুরাবর্দী সাহেবের সাথে হাত না-মেলানোর। তা ছাড়া আমার নিজের মনে তো ছিলই তাঁর প্রতি একটা দারুণ বিরূপ ভাব। তিনি সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে যে ভারত বিভাগের পথকে প্রশস্ত করেছিলেন, তাঁর সেই অপকার্যের জন্য। আমার মনে তাঁর সম্পর্কে একটা আশঙ্কা সেই থেকেই দানা বেঁধেছিল। আমার ও আমাদের অপর সকলের মনের সেই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ দেশবাসী সকলেই পেয়েছেন তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই। যে কাশ্মীর সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ আর মাথা ঘামাতেন না, সেই কাশ্মীরের কল্পিত সমস্যাই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে আবার 'জীইয়ে' তোলেন—সারা পাকিস্তানকেই আবার ভারত-বিরোধী করে তোলেন, একদিকে কাশ্মীরকে এবং অপর দিকে ভারতে পর্তুগালের উপনিবেশ গোয়া-দমন-দিউ প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে। এ ছাড়াও আরও তিনি কি করে-ছিলেন সেকথা যথাস্থানে পরে বলব।

ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে যদি কোনও সুধী ব্যক্তি সুরাবর্দী সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে যতদিন তাঁর দলের হাতে শাসন-ক্ষমতা ছিল, ততদিন পর্যন্ত যেসব কাজ করেছেন, তার বিচার করে দেখেন, তাহলে ক্রোধে অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে যে আমরা সুরাবর্দী সাহেবের সাথে হাত না মিলিয়ে এবং আমার নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক-মণ্ডলী আমাকে ঐ হাত-মেলানোর নির্দেশ না দিয়ে মোটেই অন্যায় কিছু তাঁরা করেন নি, আমরাও করি নি। বরং আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম, সেইটাই সঠিক ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী

লীগ দলও তাঁদের সহযাত্রী দলগুলো প্রগতিপন্থী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সুরাবর্দীর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত শক্তিও তাঁদের কারোরই ছিল না এটাও ঠিকই। সেই কথাটাই পরে দেখাতে চেষ্টা করব। যেসব বন্ধু-বান্ধবরা বা উপর মহলের লোক ও কিছু কিছু সাংবাদিকরা আমাদের সুরাবর্দী সাহেবের হাতকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রথমদিকে আমাদের অনুরোধ-উপরোধ করেছিলেন, তাঁদেরই মধ্যেকার কেউ কেউ তাদের পরবর্তীকালের কাজের মধ্যে দিয়েই বা নিজেদের ভুল স্বীকার করেই প্রমাণ দিয়েছেন যে আমরা সেদিনের ঐ সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল করি নি। সেসব কথা পরে বলব।

সুরাবর্দী সাহেবের সাথে হাত না মিলিয়ে ভুল না করলেও কেউ কেউ মনে করেন আবুহোসেন সাহেবের যুক্তফ্রন্টের সেই 'জগা-খিঁচুড়ি' দলকে সমর্থন করে আমরা ভুল করেছিলেম। যদি সেটা ভুলই করে থাকি তাহলে সেই ভুলের মুলে কি কি কারণ ছিল, সেই কথাটাই এখন বলছি।

সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান কারণ হল যে আবুহোসেন সরকার সাহেবের ব্যক্তিগত রাজনীতিক জীবন। তিনি, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ছিলেন, একজন সংগ্রামী ও জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী নেতা। যে মুসলিম লীগ দল ছিল ভারতবর্ষের অ-খণ্ডতার ও জাতীয়তার বিরোধী, সেই মুসলীম লীগ দলের নীতির বিরুদ্ধে তিনি প্রাক-স্বাধীনতা যুগে তো বটেই এবং স্বাধীনোত্তর, তথা দেশ বিভাগের ও পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও পাকিস্তানে বাস করেও বিরোধিতা করেছেন এবং তার জন্ত লাঞ্ছিতও হয়েছেন। এ হেন একজন কংগ্রেস নেতাকে সমর্থন করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলেই মনে করেছিলেম। আমার নিজের মনের কথা বলি, আমি মুসলিম লীগের নীতি কোনও দিনই সমর্থন করি নি—আজও করি না। মুসলিম লীগের নীতিকে আমি বরাবরই দেশদ্রোহিতার সামিল বলে গণ্য করেছি। দেশ বিভাগের পরে যখন ভারতে দেখেছি যে ভারতের এক কালের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, কেরালা রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্ত জাতীয়তাবিরোধী সেই মুসলিম লীগ দলের সাথে হাত মিলিয়েছেন, তখন কংগ্রেসের সেই নীতিহীনতার জন্ত আমি মনে-প্রাণে অত্যন্ত ব্যথিতই হয়েছি; ভেবেছি, মহাত্ম গান্ধীর জাতীয়তাবাদী সেই অতীতের কংগ্রেস, আর আজকের এই কংগ্রেস! নীতির দিক দিয়ে

কত তফাৎ এবং কত নিচে নেমে এসেছে! আমি মুসলিম লীগ দলের সদস্যদের ঘৃণা করি নি—তাঁদের মধ্যে আমার অনেক ব্যক্তিগত বন্ধুও ছিলেন কিন্তু মুসলিম লীগের জাতীয়তাবিরোধী দ্বিজাতি নীতিকে আমি আগেও মনে-প্রাণে ঘৃণা করেছি—দেশ বিভাগের পরে আমার সেই ঘৃণা আরও হাজার গুণে বেড়ে গিয়েছে। আমার মনে সর্বদাই কাঁটার মত আজও ফুটে আছে যে নীতির ফলে আমাদের সোনার দেশ বিভক্ত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহহীন, বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশত্যাগী হতে হয়েছে, সেই নীতির সাথে আমি কিছুতেই আপোষ করতে পারি না—সেই নীতিকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আবুহোসেন সাহেবকেও তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই দেখেছি, সেই নীতির বিরোধী: তাই তাঁকে সমর্থন করতে স্বভাবতই আমার মন সেদিকে কিছুটা যে ঢলে পড়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার উপরও আমার মনে হয়েছিল যে কংগ্রেসের নীতির বিরোধীতা করে মুসলিম লীগ যে পাকিস্তান সৃষ্টি করলেন, সেই পাকিস্তানের একটি রাজ্যেই একজন কংগ্রেসীই যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, সেটা মুসলিম লীগ দলের গালে এক প্রকাণ্ড চপেটাঘাতের সমতুল! জানি না, আমার সেই ভাবাবেগে বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছিল কি না? সে বিচার আমি করতে পারি না—করবেন দেশের সুধী সমাজ। যদি আমার বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে আমি কিছু ভুল করে থাকি, তাহলে সেই—বিচার ভুলের দায়িত্ব ও অপরাধ আমি নতমস্তকেই স্বীকার করে নেব; তবে, সেই সাথে আমি আমার দেশবাসীকে এইটুকুও জানাতে চাই যে আমার মনে কোনও অর্থ ও পদগৌরবের মোহ সেদিন ছিল না। আমি তখন যা করেছিলেম তা সম্পূর্ণ শুভবুদ্ধির প্রেরণাতেই করেছিলেম। আমার মনের ভাব সম্পর্কে তো বললেম। আমার অপর ছয়জন বন্ধুদেরও মনোভাব অনুরূপই ছিল। তাঁদের সাথেও আলোচনায় জেনেছি। তা ছাড়াও আবুহোসেন সাহেবের মন্ত্রিসভায় কয়েকজন অতীতের প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা ও কর্মীও ছিলেন। সেটাও আমাদের পক্ষে একটা আকর্ষণই ছিল। আমি ও আমার বন্ধুরা বিশ্বাস করতেম যে আমরা তাঁর অতীতের সহকর্মী কংগ্রেসী সদস্যরা যদি তাঁকে সমর্থন করি, তাহলে তাঁকে সামনে রেখে আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদী নীতিরই রূপায়ণ করতে পারবো এবং মুসলিম লীগের নীতির ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে

ভারতবিরোধী, তথা হিন্দুবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে তাও ক্রমশ লোপ করতে পারবো। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যা পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল, সেটাকে ধ্বংস করাই আমাদের—সকল কংগ্রেসী বন্ধুদেরই—পাকিস্তানের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। এ বিষয়ে আমার এবং আমাদের অপর সকল কংগ্রেসী বন্ধুরা যাঁরা আমাদের থেকে বিভিন্ন দলে আলাদা ছিলেন তাঁরা সকলেই ঐ একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ছিলেম। আমরা মনে করেছিলেম, আবুহোসেন সরকারের সাথে যোগ দিয়েই সেই কাজটা সুসম্পন্ন করা যাবে, আমাদের অপর বন্ধুরা মনে করেছিলেন যে সেই কাজটির সুষ্ঠু রূপায়ণ হবে প্রগতিশীল আওয়ামি লীগ ও তাঁদের সহযাত্রীদের সাথে যোগ দিলে। তফাৎ শুধু ছিল, আমাদের ঐখানেই। যাই হোক, আমরা সাতজন সদস্য আবুহোসেন সাহেবকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। সেটি হল আমাদের দলপতি শ্রীধীরেন দত্ত মশায়কে মন্ত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ। ধীরেনবাবু গণপরিষদের সদস্য হিসাবে পূর্বে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও আমরা যে পরের নতুন গণপরিষদের সদস্য হিসাবে তাঁকে আর মনোনীত করি নি—তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে জনাব ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান করে দেওয়ার জন্যই, সে কথা আগেই বলেছি। এখন তাঁকে মন্ত্রিত্বের আসনে বসানোর দায়িত্ব আমাদের সকলেরই ছিল। হক সাহেব তাঁর মন্ত্রিসভা গড়ার পর থেকে ধীরেনবাবু 'মহারাজ'কে নিয়েও কয়েকবার হক সাহেবের কাছে আমাদের দাবি তুলে ধরেছিলেন। আমরা সমবেতভাবেই গিয়েও হক সাহেবের কাছে আমাদের সেই একই দাবি তুলে ধরেছিলেম কিন্তু হক সাহেবের আমলে ধীরেনবাবুকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়ে ওঠে নি। আবুহোসেন সাহেবের আমলেও তাঁর কাছে আমাদের দাবি তুলে ধরেছিলেম। সে কথা আগেই বলেছি। তখনও আমাদের দাবি রক্ষিত হয় নি। 'কংগ্রেস'-এর পক্ষ থেকে শ্রীবসন্ত দাশ মহাশয় ও শ্রীশরৎ মজুমদার মহাশয় তখন হিন্দু সদস্য হিসাবে সরকার সাহেবের মন্ত্রিসভায় ছিলেন। তার পরে তাঁরা ঐ মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন। সে কথাও আগেই বলেছি। পরবর্তীকালে বসন্তবাবু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী হিসাবে যান। আবু-

হোসেন সাহেব এইবার আমাদের দল থেকে ধীরেনবাবুকে তাঁর মন্ত্রিসভায় নেওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি কুমিল্লার জজ সাহেবের আদালতের 'টেলিফোনের' মাধ্যমে ধীরেনবাবুর সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে মন্ত্রিসভায় নেওয়ার প্রস্তাব দেন। ধীরেনবাবুও সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেই ঢাকায় আসেন। আমাদের বাসায় এসে যখন তিনি দেখেন যে আবুহোসেনের মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়া নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে, তখন তিনি আমাকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আবুহোসেন সাহেবের বাসায় তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে আমাদের মধ্যেকার মতভেদের কথা জানিয়ে সরকার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমরা দু'ভাগ হয়ে গেলেও তিনি তাঁকে মন্ত্রিসভায় নিতে রাজী আছেন কি না? সরকার সাহেব তাতেই রাজী। এইসব কথাবার্তার পর আমি ও ধীরেনবাবু আমাদের বাসায় ফিরি। আমিও নিশ্চিন্ত হই এই ভেবে যে এতদিনে আমাদের চেষ্টা সফল হল! কিন্তু হঠাৎ আবার কী হয়ে গেল, ভগবানই জানেন! ধীরেনবাবু তাঁর মত পাল্টালেন। আমাদের নির্ধারিত সভায় তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রিসভায় যেতে চান না। এই নিয়েই আমাদের মধ্যে দুই ভাগ হয়ে যায়। ধীরেনবাবুর সাথে তিনি সহ তাঁরা হলেন ছয়জন এবং আমাদের দলে আমরা হলেম সাতজন। আমরা সাতজন সদস্য মুখ্যমন্ত্রী আবুহোসেন সরকার সাহেবকে জানাই যে আমরা তাঁকে সমর্থন করব কিন্তু সেই সমর্থনের জন্য সর্ত হিসেবে আমাদের কোনও মন্ত্রিত্বের দাবিও নেই—আমাদের মধ্যে দলপতি হিসেবে আমি পরিষ্কারভাবে সরকার সাহেবকে জানিয়ে দিই যে আমি মন্ত্রিত্ব নিতে মোটেই প্রস্তুত বা উৎসাহী নই। সরকার সাহেব ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য জনাব আব্দুস সালাম খান, জনাব গিয়াসুদ্দিন আহমেদ ও জনাব হাসেমুদ্দিন আহমেদ আমাকে মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার জন্যই পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। এই একই অবস্থা দেখছি আজ এতদিন পরে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ এখানে মন্ত্রিসভা গড়েছেন। অনেকেই মনে করেন এই মন্ত্রিসভা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও ভারত সরকারের মধ্যেকার এক বিরাট ষড়যন্ত্রের ফল। অসম্ভবও নয়, বরং তার সম্ভাব্যতার পক্ষের যুক্তির পাল্লাই ভারী। পাকিস্তানেও সেদিনে গভর্নর জেনারেল গুলাম মহম্মদ সাহেব যে 'প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র'-এর (palace

intrigue) সূত্রপাত করেছিলেন, সেই ষড়যন্ত্রের দানব একদিন জনাব ইস্কান্দার মীর্জা সাহেবের সাথে হাত মিলিয়ে জনাব গুলাম মহম্মদকেও গ্রাস করেছিল। ইতিহাসের সেই শিক্ষা জনাব মীর্জা সাহেবও গ্রহণ করেন নি। তিনি গভর্নর জেনারেল থাকাকালে সেই ষড়যন্ত্রের দানব আরও পুষ্ট ও শক্তিশালী হয়েই দেখা দিয়েছিল। একদিন আবার সেই দানবই আয়ুব খান সাহেবের সাথে হাত মিলিয়ে গভর্নর জেনারেল মির্জা ইস্কান্দার সাহেবকেও পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবেই গ্রাস করে ফেলে; ফলে শুনেছি মীর্জা সাহেব এখন নাকি লণ্ডনে এক হোটেলওয়ালা হয়ে দিন গুজরান করছেন। এটাই ইতিহাসের নিষ্করুণ শিক্ষা। দেওয়ালের লিখন যাঁরা না পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁদের পরিণতিও মীর্জা সাহেবের মতই হয়। অবস্থা দেখে মনে হয় 'ভারত সরকার' ও 'কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান' এখনও পাকিস্তানের ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষালাভ করে সতর্ক হচ্ছেন না। জানি না ভারতের কোনও "আয়ুব খান" একদিন দেখা দেবেন কি না! সময় থাকতে দেশের লোক যেন ঘটনা-প্রবাহের গুরুত্বের প্রতি সম্যক অবহিত হন এবং দেশ যেন সেই দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা পায়

যাক, পাকিস্তানের কথাতেই আবার ফিরে যাই। পাকিস্তান সরকারও একদিন পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভাকে উপেক্ষা করেই জনাব ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিসভাকে বাতিল করেছিলেন। এই 'নজির' সামনে রেখেই গভর্নর জেনারেল গুলাম মহম্মদ সাহেব একদিন গণপরিষদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকেও বাতিল করেছিলেন। তারপরে আইনের শাসনে আবার তিনি গণপরিষদের তথা পার্লামেন্টের নতুন নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হন। নির্বাচন শেষে বগুড়ার মহম্মদ আলি প্রধানমন্ত্রিত্বের গদি হারান। গদি দখল করেন এইবার চৌধুরী মহম্মদ আলি। যে ফজলুল হক সাহেবকে বগুড়ার মহম্মদ আলি প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে বিশ্ব সমক্ষে "দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক" ঘোষণা করেছিলেন, সেই ফজলুল হক সাহেবকেই চৌধুরী মহম্মদ আলি সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে হক সাহেবকে অভিযোগমুক্ত তো করলেনই এবং সাথে সাথে তাঁর মত একজন শক্তিশালী নেতাকেও সমর্থক দলে টেনে নিলেন। রাজনীতিক নেতা ভাবপ্রবণ হলে তাঁর চলার পথে ছন্দপতন এইভাবেই হয়। হক সাহেবের জীবনেও এই ছন্দপতন বহুবারই দেখা গিয়েছে। তিনি তাঁর

রাজনৈতিক জীবনে কখন 'কংগ্রেসী' কখন মুসলিম লীগপন্থী, কখনও বা 'কৃষক-প্রজা' অথবা 'কৃষক-শ্রমিক' হয়েছেন! সেবারে কিন্তু "মুসলিম লীগপন্থী" আর হন নি, তবে চৌধুরী মহম্মদ আলির 'খপ্পরে' বেশ ভালভাবেই পড়েছিলেন মনে হয়। হক সাহেবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব লাভের পেছনে পাকিস্তানের তৎকালীন তিন প্রধান—(১) জনাব গুলাম মহম্মদ, (২) জনাব ইস্কান্দার মীর্জা ও (৩) জনাব চৌধুরী মহম্মদ আলি সাহেবদের কোন ষড়যন্ত্র ছিল কি না জানি না। থাকলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পাকিস্তানে তখন 'প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র' বেশ জমে উঠেছিল। বগুড়ার মহম্মদ আলি সাহেব ফজলুল হক সাহেবকে 'দেশদ্রোহী' ঘোষণা করায় তিনি অন্তরে যে অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, সেকথা আগেই বলেছি। চৌধুরী মহম্মদ আলি সাহেব তাঁকে সেই অবস্থা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করাতে স্বভাবতই তাঁর মত ভাবপ্রবণ রাজনৈতিক নেতার পক্ষে 'মীর্জা-চৌধুরী' প্রেমে গদগদ হওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু না-ও হতে পারে; তবে মুসলিম লীগের সাথে যে তিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন। সেকথা সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়ার মত কোনও প্রমাণ আমি পাই নি; সুতরাং সে সম্পর্কে আমি জোরের সাথে পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলতে পারি না।

কেন্দ্রের রাজনীতি যখন এই অবস্থায় চলছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের রাজনীতি এসে পড়ে হক সাহেবের দলেরই শীর্ষস্থানীয় নেতা জনাব আবুহোসেন সরকারের হাতে। জনাব আবুহোসেন সরকার বরাবরই জনাব ফজলুল হক সাহেবের দলেই ছিলেন; তাই বলে যে তিনি হক সাহেবের একজন অন্ধ ভক্ত ছিলেন অতীতের ইতিহাস কিন্তু সেকথার কোনও প্রমাণ দেয় না; বরং তার বিপরীতটাই বলে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে হক সাহেবের 'কৃষক-প্রজা' পার্টি নির্বাচনে সাফল্যলাভ করেও যখন 'কংগ্রেস'-এর সাথে মিলে যৌথ একটা সরকার করতে না পেরে 'মুসলিম লীগ'-এর সাথে হাত মেলান এবং হক সাহেব নিজেও লীগের সদস্য হয়ে যান, তখন আমরা দেখেছি আবুহোসেন সাহেব তাঁর 'নেতা'-কে পরিত্যাগ করে 'কৃষক-প্রজা' পার্টিতেই থেকেছেন। রাজনৈতিক জীবনের অতীত যাঁর এতখানি নিষ্কলুষ ছিল যে, তাঁকে অবিশ্বাস করার আমার কোনও কারণ ঘটে নি। তাঁর সাথে একসঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভাতে পরে কাজ করেও কোনদিনই আমি এমন কিছু দেখি নি বা বুঝি নি যে তিনিও কোন ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন!

ভারতে এসে ইদানীংকালে দেখেছি কেউ কেউ এইরূপ মনে করেন। আমার হাতে সেরূপ কোনও প্রমাণ না থাকায় আমি তাঁকে আগেও যেমন বিশ্বাস করতেম আজও তেমনই করি। এই বিশ্বাস করতেম বলেই তাঁকেই সমর্থন করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম। 'বিশ্বাস' ছাড়াও আরও কতকগুলো কারণ অবশ্য আমাদের ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে ছিল। সেইগুলোই এখন বলছি।

আমাদের যৌথ-নির্বাচন প্রথা পাকিস্তানের সংবিধানে চালু করার যে প্রবল আগ্রহ ছিল সেকথা আগেই বলেছি। কামিনীবাবুর মারফৎ ফজলুল হক সাহেব খবর দিয়েছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার অধিকাংশ মুসলমান সদস্যদের দিয়ে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করার অনুরোধ যদি পাশ করান হয় তাহলে সংবিধান সংসদে তাঁর পক্ষে কাজটি সহজ হবে। তাই আমরা দেখি যে আওয়ামি লীগ ও তাঁদের সহযাত্রী দলে তো বিধানসভার মুসলমান সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থন নেই ; সরকার সাহেবের 'যুক্তফ্রণ্ট' দল থেকে যদি মুসলমান সদস্যদের অন্তত কিছু সংখকের সমর্থন সেদিকে নেওয়া যেতে পারে তবেই অধিকাংশ মুসলমান সদস্যদের ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হওয়া সম্ভব। সেই জন্তই আমরা 'যুক্তফ্রণ্ট' দলের সমস্ত শরিক দলনেতাদের কাছে একটি মাত্রই সর্ত দিই যে আমরা তাঁদের সমর্থন করলে তাঁদেরও 'যৌথ-নির্বাচন' প্রথা সমর্থন করতে হবে। তাঁরাও রাজী হন। আমাদের এই সর্তে 'যুক্তফ্রণ্ট' সরকারকে সমর্থন করার ফলেই আওয়ামি লীগের শাসনকালে যখন যৌথ-নির্বাচনের প্রস্তাবটি বিধানসভায় আসে তখন একজন মুসলমান সদস্যও ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 'ভোট' দেন না। ঐ প্রস্তাবে আপত্তি ছিল 'নোম-ই-ইসলাম' পার্টির নেতা একমাত্র মৌলানা আতাহার আলি সাহেবের কিন্তু তাঁর দলের অনুরোধে ভোট দেওয়ার আগেই তিনি বিধানসভা থেকে সরে পড়েন। সুতরাং প্রস্তাবের বিপক্ষে একটি ভোটও পড়ে না। যাঁরা বিরোধিতা করতেন, তাঁরাও সেদিন কোন বিরোধিতা করেন নি। এই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিল আমাদের 'যুক্তফ্রণ্ট'-কে সমর্থন করার সিদ্ধান্তের ফলেই। দুঃখের ও আফশোষের কথা যে এত করেও কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধানে যৌথ-নির্বাচন প্রথা চালু করা গেল না। ফজলুল হক সাহেব বিশেষ কিছুই করেন নি বা করতে সাহস পান নি। অশীতীপর অতিবৃদ্ধ 'বাংলার বাঘ' (শের-ই-বাঙ্গাল) জনাব হক সাহেবের মেরুদণ্ড এক আঘাতেই এমনভাবে ভেঙে দিয়েছিলেন

প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি সাহেব (বগুড়ার) যে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলি সাহেব তাঁকে স্বরাষ্ট্রদপ্তরের মন্ত্রিত্বের প্রলেপ দিয়ে তাঁর সেই প্রচণ্ড আঘাতের ব্যথা-বেদনা কিছুটা লাঘব করতে পেরেছিলেন মাত্র, হক সাহেবের ভাঙা মেরুদণ্ড আর জোড়া লাগাতে পারেন নি—হক সাহেবও আর শিরদাঁড়া খাড়া করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন নি।

এইসব জেনে-শুনেও আমরা সেই ফজলুল হক সাহেবের-ই মনোনীত নেতা জনাব আবুহোসেন সরকার সাহেবকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলেম এ প্রশ্ন আজও কারো কারো মনে জেগে আছে। কেউ হয়তো মনে করেন যে আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং আমি নিজে অর্থ ও পদ-গৌরবের মোহেই আবুহোসেন সরকারের সমর্থক দলে ভিড়েছিলেম! আমার জীবনের অতীত দেখে আমার কথার উপরে যদি কেউ বিশ্বাস করতে পারেন তাহলে তাঁদের আমি শপথ করে বলতে পারি যে আমার সেরূপ কোনও মোহ ছিল না। এর বেশি আমার কথা দিয়ে বোঝানোর আর কী শক্তি থাকতে পারে? আর কিছু নেই-ও। কেন যে আমরা ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেম তার কারণ উপরেই বলেছি। আরও একটি কারণ সম্পর্কেও আগেই বলেছি যে কৃষক-শ্রমিক দলের ও আওয়ামি লীগের নেতৃত্বের সম্পর্কের বিচারেও ঐ সিদ্ধান্ত নিতে আমাদিগকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল। "বাংলার বাঘ" ফজলুল হক সাহেব অতিবৃদ্ধ—এখন নখদন্তহীন। আগের সেই হুঙ্কারও আর তাঁর নেই। তাঁর আমাদের ভাল করারও যেমন আর ক্ষমতা নেই মন্দ যে করবেন সে মনোবলও আর নেই। কিন্তু আওয়ামি লীগের শ্রেষ্ঠ নেতা সুরাবর্দী সাহেবেরও কি সেই অবস্থা? না, তা নয়। তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ শক্তিশালী নেতা। তাঁর পরিকল্পিত অভীষ্ট সিদ্ধির পথে যে-কোনও বাধাই সামনে আসুক-না-কেন তাকে তিনি গুঁড়িয়ে-মাড়িয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে চলার শক্তি রাখতেন। এটা আমরা সেদিনে বিশ্বাস করেছিলেম এবং আমাদের সেই বিশ্বাস অমূলক ছিল না। মুসলমানদের মধ্যকার রাজনীতিক দল হিসেবে আওয়ামি লীগ ও তাঁদের সহযাত্রীরা নিঃসংশয়রূপেই 'যুক্তফ্রণ্ট' দলের চেয়ে ভাল ও প্রগতিপন্থী ছিল; তা সত্ত্বেও আমরা জানতেম যে দল হিসেবে তাঁরা যতই প্রগতিপন্থীই হন-না-কেন সুরাবর্দী সাহেবের কোন অসৎ পরিকল্পনায় বাধা দেওয়ার তাঁদের ক্ষমতা ছিল না। যদিও আমাদের মন ছিল আওয়ামি লীগ ও তাঁদের সহযাত্রী দলগুলোর সাথেই হাত-মেলানোর—কিন্তু

দুর্ধর্ষ নেতার ভয়েই আমরা তা পারি নি ; বিশেষ করে আমার নির্বাচক-মণ্ডলীরও যে নির্দেশ ছিল সেকথাও আগেই বলেছি।

এইসব বিষয়ে চিন্তা করেই আমরা সমর্থন করি আবুহোসেনের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে। আমাদের অপর সব কংগ্রেসী বন্ধুরা যোগ দিলেন আওয়ামি লীগ ও তার সহযাত্রী দলের সাথে। আমরা যে যুক্তফ্রণ্টে যোগ দিয়েছিলাম তার মধ্যে অনেকে ধর্মান্ধ গোঁড়া মুসলমান মৌলানা, মৌলবী ছিলেন। স্বভাবতঃই সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে তাঁরা উৎসাহ বোধ ক'রতেন। কিন্তু আমরা ঐ দলে যোগ দেওয়ায় তাঁরা একটু সংযত হয়ে চলতেন। অনেক অমঙ্গলের মধ্যে থেকেও বোধ হয় এই একটা মঙ্গল সেদিন হয়েছিল।

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	লাইন	আছে	পড়ুন
২	১১	উপযুক্ত	উপযুক্ত
৩	৯	সশস্ত্র	সশস্ত্র
৫	৮	"কোম্পানীর	"কোম্পানীর"
৫	১১	মাহাত্মা	মহাত্মা
১৪	১০	শাসন-সংস্কার	শাসন-সংস্কার
১৫	৭	adepuate	adequate
২০	১৯	সাম্প্রদায়িক। মনোভাব	সাম্প্রদায়িক মনোভাব
২১	১৬	সম্পাদকীয়	সম্পাদকীয়
৩৮, ৫৪	২১, ২১	পরস্পর	পরস্পর
৫০	৩	নতী	নতি
৫৪	২২	পরস্পস্পরকে	পরস্পরকে
৫৪	২৩	পরস্পরের	পরস্পরের
৫৫	৯	constitnent Assembly	constituent Assembly
৫৭	২২	সুস্পষ্ট	সুস্পষ্ট
৫৯,৬৬,৬৯ ৭৯, ৯৯	৩০,৬,২১, ২৮, ১৭	মন্ত্রীসভার	মন্ত্রিসভার
৬৪	৭	যাদুস্পর্শ	যাদুস্পর্শ
৬৫	৯	প্রধানমন্ত্রীত্বের	প্রধানমন্ত্রিত্বের
৬৫	১৮	মুখ্যমন্ত্রীত্ব	মুখ্যমন্ত্রিত্ব
৬৫	২৫	ছায়া-মন্ত্রীসভা	ছায়া-মন্ত্রিসভা
৬৫,৭৯	২৬,২৬	মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
৬৫	২৭	ছায়া-মন্ত্রীসভাতে	ছায়া-মন্ত্রিসভাতে
৬৮	১৩	ভৎ'নায়	ভৎ'সনায়
৬৯	১৬	মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব
৭২	২০	হৃদেয়র	হৃদয়ের
৭৩	২৬	টেম্পাচার	টেম্পারেচার
৭৪	২৯	মুখ্যমন্ত্রীত্বে	মুখ্যমন্ত্রিত্বের
৭৬	১৭	দৃষ্টিসম্পন্ন	দৃষ্টিসম্পন্ন
৭৮	২০	মন্ত্রীত্বের	মন্ত্রিত্বের
৭৯	২৫	Co-aliation	Co-alition
৭৯	১০	সম্পাদক	সম্পাদক

পৃ	লাইন	আছে	পড়ুন
৮৩	১২	মৃশংস	নৃশংস
৮৬	৯	মুসসলানদের	মুসলমানদের
৮৭	১৬	মূলসুত্রের	মূলসূত্রের
৮৮	৯	মহম্মম	মহম্মদ
৮৯	২৩	সীমান্তের	সীমান্তের
৯৩	৬	সম্পর্কেই	সম্পর্কেই
৯৪	২০	মন্ত্রীত্বেই	মন্ত্রিত্বেই
৯৬	১১	মন্ত্রীসভায়	মন্ত্রিসভায়
১১৪,১১৫, ১৩৫,১৩৬	৮,৬,২৬,২৩	সম্পর্কে	সম্পর্কে
১১৫	৮	করেতে	করতে
১২৩	২	বলেছিনে	বলেছিলেন
১২৫	৯	ছিলেম	ছিলেন
১২৫	২০	সিরাগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ
১২৯	২৮	পাহেব	সাহেব
১৩১	৭	সচিবালয়ে	সচিবালয়ে
১৪৪	৩০	এখন হচ্ছে	মানেই এখন হচ্ছে
১৬৩	২৬	নির্বতমূলক	নিবর্তনমূলক
১৭০	৫	infilation	inflation
১৮১	১৭	স্বাধনীন	স্বাধীন
২১২	২০	সুচিকিৎক !	সুচিকিৎসক !
২১৯	২৮	মৈমসিংহ	মৈমনসিংহ
২১৯	৩০	বেশি সময়। থেমে থাকত	বেশি সময় থেমে থাকত।
২৫৬	১৬	মমকুমার	মহকুমার
২৩৭	২৮	'হালের মুঠা' করে	'হালের মুঠা' ধরে
২৪৮	২৩	libertics	liberties
২৫৫	১১	১০৫০	১৯৫০
২৮৫	৩০	pakistan	Pakistan
৩১০	২৩	উললক্ষে	উপলক্ষে
৩৩২	১	সঙ্কস্যও	সদস্যও
৩৩৮	১২	সযোগিতা	সহযোগিতা
৩৫১	২৮	লাঞ্জনা	লাঞ্ছনা
৩৮০	৫	নির্বাচকমণ্ডীর	নির্বাচকমণ্ডলীর
৩০২	৩	ছেড়	ছেড়ে